নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল।

সূচী পত্র।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	চরিত-চিত্র (বঙ্কিমচন্দ্র)	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	৬৭১
২।	চক্র বা চড়ক্ (কবিতা)	„ গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	৬৮৭
৩।	ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৮৯
৪।	শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জৈনমত খণ্ডন	„ দ্বিজদাস দত্ত	৬৯৭
৫।	বৈশাখী (কবিতা)	„ ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৭১২
৬।	ভাষার কথা	„ প্রফুল্লকুমার সরকার	৭১৩
৭।	শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি	„ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী	৭১৭
৮।	মির্জ্জা হোসেন আলী	„ বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৭২২
৯।	আমার কথা	শ্রীমতী জগদম্বা দেবী	৭২৯
১০।	মরণে জয় (কথা-নাট্য)	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৭৪১
১১।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	„ বিপিনচন্দ্র পাল	৭৬৯
১২।	অন্তর্যামী	„ ,,	৭৭৮

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ টাকা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵৹ পাঁচ আনা।

ও ডাকমাশুল ৵৹ এক আনা।

২০নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা]   [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

চরিত-চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র

২।

বীজ ও বংশের কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের ও প্রতিভার প্রকৃত মূল্য কষিতে হইলে, একদিকে যেমন তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার, অন্যদিকে সেইরূপ যে বংশধারাতে, যে বীজ হইতে, তাঁর জন্ম হইয়াছিল, তাহারও যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। মানুষ কেবল বাহিরের অবস্থাতেই গড়িয়া উঠে না; এসকল অবস্থা ও ব্যবস্থা, তার ভিতরকার জীব-শক্তিকেই নানাভাবে ফুটাইয়া তুলে। উদ্ভিদ্-জগতে যেমন বীজ সেইরূপই গাছ হয়। কাঁটালবীজে কাঁকুড় ফলে না। সর্ব্বত্রই এইরূপ—যেমন বীজ তেমনি জীব। কিন্তু উদ্ভিদ্-জগতেও কেবল বীজেতেই গাছ হয় না, তার জন্য মাটিও চাই। এই মাটির গুণাগুণ বীজেতে প্রবেশ করিয়া, একই বীজ হইতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে। শ্রীহট্টের কমলালেবু খাসিয়া পাহাড়ে জন্মায়, ঐ পাহাড়ীয়া মাটির গুণেই এই লেবু এমন সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়। এই কমলালেবুর বীজ বাঙ্গালা দেশের সমতল জমিতে পুতিলে কমলালেবু আর ফলে না, গোঁড়া লেবু হইয়া যায়। বীজের শক্তি

মাটির গুণে নানা আকার ধারণ করে। কেবল তাহাই নহে, উদ্ভিদের বিকাশের জন্য আকাশের বায়ু, রৌদ্র এবং বৃষ্টিরও প্রয়োজন। এই জমি, এই রৌদ্র, এই বৃষ্টি, এ সকলই উদ্ভিদের বিকাশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। উদ্ভিদের বিকাশে বীজটি তার হেরিডিটি (heredity); জমি, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার আধার ও আবেষ্টন, তার এন্‌ভাইরণমেণ্ট্‌স্ (environments)। আধুনিক অভিব্যক্তিতত্ত্বে বা ইভোলিউষণে (evolution'এ) এই হেরিডিটি ও এন্‌ভাইরণমেণ্ট দুইটিই মূলতত্ত্ব। হেরিডিটি জীবের বীজকোষের মধ্যে নিহিত থাকে। এই বীজকোষ হইতে এই বীজ-শক্তিকে আমরা পৃথক্ করিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে কোষ মাত্রেই আধার, আধেয় নহে। বীজকোষও বীজের আধার, আধার বলিয়াই তাহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত। তাহাকেও এন্‌ভাইরণমেণ্টই বলিতে হয়। কিন্তু এই আধারের সঙ্গে ঐ আধেয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, নিতান্ত অঙ্গাঙ্গী। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানেতে আমরা ইহাদের পৃথক্ করিয়া দেখিতে, জানিতে, বা ভাবিতে পারি না। এই বীজকোষেতে যে বস্তুটি নিগূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, তাহাই জীবের জীবত্ব, তাহাই তার নিত্যত্ব; সেই বস্তুকে দেখি না, কিন্তু দেখি না বলিয়া, তাহা যে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ জীবের যে সকল পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করি, তার অন্তরালে একটা কিছু নিত্য বস্তু না থাকিলে, এই প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনেরও কোনই অর্থ হয় না।

তিলেষু তৈলং, দধিনীব সর্পিঃ স্রোতস্বাপঃ
অরণীষু অগ্নিঃ—

তিলেতে যেমন তৈল নিগূঢ়ভাবে থাকে, তার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকে, অথচ তাহাকে দেখা যায় না; দধিতে যেমন ঘৃত থাকে; শুষ্ক নির্ঝরিণী-গর্ভে যেমন জল থাকে; অরণীতে যেমন অগ্নি থাকে;— সেইরূপ প্রত্যেক বিকাশশীল জীবের মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন

থাকে, যাহা তার একত্ব, তার জীবত্ব, তার নিজস্ব ও নিত্যত্বের ভূমি এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়াই তার বিকাশ-ধারার সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয়। এইটিই তার মূল বস্তু। এইটিই তার বীজ। এই বস্তুই তার হেরিডিটির মূল উপাদান। এই বস্তু তার পৈত্রিক ও পুরুষানুক্রমাগত। জীবের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা এই বস্তুকেই তার নিজের শক্তিতে ও নিজের আকারে, নিজের বৈশিষ্টের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলে। উদ্ভিদের এই বস্তু তার স্বজাতীয়ত্ব; আমের ইহাই আম্রত্ব; ইহাই কাঁটালের কাঁটালত্ব; ইহাই গোলাপের গোলাপত্ব ও অপরাজিতার অপরাজিতাত্ব; ইহাই বটের বটত্ব ও অশোক-পলাশের অশোকত্ব ও পলাশত্ব। আমাদের এই বস্তু কেবল সাধারণ মনুষ্যত্ব নহে, কিন্তু ইহাই ইংরাজের ইংরাজত্ব, জার্ম্মাণের জার্ম্মাণত্ব এবং কাফ্রির কাফ্রিত্ব। আবার ইহাই জনের (John) জনত্ব, কার্লের (Karl) কার্লত্ব, রামের ও শ্যামের রামত্ব ও শ্যামত্ব, প্রত্যেকের কুলধারার বৈশিষ্ট ও প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই বঙ্কিমত্ব। এই প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় বস্তুতেই তাঁর জীবনের, চিন্তার ও চরিত্রের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্রের মধ্যে তাঁহার একত্ব ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়াছে। এই বস্তুর দ্বারাই তিনি তাঁর দেশের, সমাজের, সময়ের, অপর সকল লোক হইতে পৃথক্ ও বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃপুরুষানুক্রমিত এই বীজটিই তাঁর বিকাশের মূল বস্তু, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতিতে এই বস্তুকেই নানাদিকে ও নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈজিক বস্তুটি অতি শ্রেষ্ঠজাতীয় ছিল। অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর অতিশয় বুদ্ধিমান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইংরেজ-সরকারে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কুল-গৌরব, পদ-গৌরব, ধন-গৌরব, বিদ্যাগৌরব, সকলই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে বিদ্যমান ছিল। এ সংসারের সকল বস্তুরই একটা ভালর দিক আর একটা মন্দের দিক থাকে। কুলগৌরবাদি-প্রতি

ষ্ঠিত আভিজাত্যেরও ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ইহার প্রভাবে মানুষের চরিত্রে কতকগুলি গুণ ও তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছু কিছু দোষ ফুটিয়া উঠে। কুল, পদ, ধন ও বিদ্যা যেখানে একাধারে মিলিত হয়, সেখানে চরিত্রের একটা অসাধারণ শক্তি জাগিয়া থাকে। এরূপ পরিবারে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা প্রবল স্বাতন্ত্র্যাভিমান, একটা খাতিরনদারৎভাব, একটা দেমাকের ঢং দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে আবার এ সকলের সঙ্গে একটা সংযম এবং শীলতাও মিশিয়া থাকে। এরূপ আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রায়ই আত্মস্থ থাকে, আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয় না। সকলে যাঁহাদের কথা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া চলে, তাঁহারা অপরের কথায় কান দিবার প্রবৃত্তির অনুশীলন করিবার প্রয়োজনবোধ করেন না। সকলে যাঁহাদিগকে মানিয়া চলে, তাঁহারা লোকমতের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে শিখেন না। তাঁহাদের মধ্যে একটা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বাভিমান বা অনধীনতার ভাব আপনি জন্মিয়া যায়। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা পর্য্যন্ত সহজ এবং নির্ভীক হইয়া থাকে। সমাজের ভয় যে কি বস্তু, ইহা প্রায়ই তাঁহারা জানে না। এই সকল যে কেবলই গুণের কথা, তাহাও নয়; ইহা দোষের কথাও হয়। কিন্তু এই জাতীয় দোষগুণ মিলিয়াই এ সংসারে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র লোক-নায়ক-চরিত্র গঠিত হয়। এই জাতীয় দোষগুণ দু'ই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখা গিয়াছে। এই চট্টোপাধ্যায়বংশের অহঙ্কারের তেজে, শুনিয়াছি, লোকে তাঁদের কাছে ঘেঁসিতে সাহস পাইত না। আবার অন্যপক্ষে যাঁহারা এই ব্যূহভেদ করিয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ জীবনে একবার প্রবেশ করিতে পারিতেন, তাঁহারা ইহাঁদের সৌজন্যে এবং অমায়িকতায় চিরদিন মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট তাঁর নিজের প্রতিভারই ফল ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর চরিত্রের তেজ, তাঁর অসাধারণ আত্মনির্ভর ও ব্যক্তিত্বাভিমান বা পারসনালিটি (personality),—তাঁর দেমাক, তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা

এসকলকে যে তাঁর পারিবারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা এনভাইরণ-মেণ্টস্ই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবারে না জন্মিলে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র হইতেন কিনা, বলা যায় না। যাঁরা মানুষের জন্মটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তাঁরা এরূপ ভাবিতেও বা পারেন; হিন্দুর জন্মতত্ত্ব যাঁরা বুঝেন, তাঁদের পক্ষে এরূপ ভাবা সম্ভব নহে।

বীজের জন্ম ও কর্ম্ম-কথা

ইউরোপীয় লোকেরা জীবের জন্মটাকে একটা অহেতুক, আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, ইহা জানি। ইংরাজি ভাষায় এইজন্য accident of birth বলিয়া একটা কথা আছে। আমাদের ভাষায় তার অনুরূপ কোন কথা নাই। আমরা কস্মিনকালেও মানুষের জন্মটাকে এরূপ একটা অকারণ, আকস্মিক কার্য্য বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। সৃষ্টির কোথাও যে কিছু অকারণ ও আকস্মিক কোনও কিছু অন্ধঘটনাসম্পাত হইতে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, হিন্দু কোনও দিন এমন অদ্ভুত কল্পনা করে নাই। মানুষের জন্ম তার কর্ম্মের ফল। যার যেমন কর্ম্ম, সে সেই কর্ম্মোচিত দেহলাভ করিয়া সেই কর্ম্মফলের ভোগ এবং ক্ষয় করিবার জন্যই সংসারে আইসে। আর যে পিতার বীজে, যে মাতার গর্ভে, এই উদ্দেশ্যের উপযোগী উপাদান আছে, জীবের কর্ম্ম তাহাকে সেইখানেই টানিয়া আনে। আজিকালিকার ইউরোপীয় জীব-বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধি কিম্বা ল' অব ন্যাচার‍্যাল সিলেক্‌সন্—Law of Natural Selection—বলে, তাহা যে জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে দখল করিয়া তার বিকাশ-ক্রমকে নিয়মিত করে, এমন নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বা ন্যাচার‍্যাল সিলেক্‌সনের অর্থ এই যে প্রত্যেক জীব-কোষাণু সর্ব্বদা, সকল অবস্থাতেই আপনার জীবনরক্ষার ও বিকাশসাধনের অনুকূল যাহা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া চলে, যাহা ইহার প্রতিকূল তাহাকে প্রাণ-

পণে বর্জ্জন করিতে চাহে। এই গ্রহণ ও বর্জ্জন লইয়াই জীবের জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যে জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়, ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানও একথা বলে না। জীব-কোষের উৎপত্তি হইতেই এই সংগ্রাম চলিতে আরম্ভ করে। মায়ের গর্ভে এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তার আরও পূর্ব্বে এই জীবকোষ যখন পিতার শুক্রেতে, মাতার শোণিতে বীজাবস্থায় থাকে, তখনও এই সংগ্রাম চলে। জীববিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়, ততদূর পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম লক্ষিত হয়। যাহা জীব-বিজ্ঞান দেখে না ও জানে না, সেখানে কি এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম নাই? হিন্দুর কর্ম্মবাদ এই জীববিজ্ঞানের অতীত ও অজ্ঞাত ভূমিতেও এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করে। এই জীবন-সংগ্রাম, এই গ্রহণ ও বর্জ্জন-চেষ্টা জীবের নিত্যধর্ম্ম। যেখানে জীব, সেই-খানেই এই প্রয়াস রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান যাহাকে জীবন বলে, জীবের জন্মের পূর্ব্বে তার এই জীবন থাকে, না থাকে না? যদি না থাকে, তবে জন্মকালে এ বস্তু আসে কোথা হইতে? অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, ইউরোপের জীববিজ্ঞানও আজি পর্য্যন্ত একথা সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই। অজীব-জনন-বাদ বা abiogenesis এর মত এখনও প্রমাণপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়, এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজেও এই মতটাই প্রবল রহিয়াছে। জীবদেহটাকেই যদি সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীব বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে পিতৃমাতৃ দেহ হইতে এই জীবের উৎপত্তি হয়, এই কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই দেহতত্ত্বেতে জীব সম্বন্ধে সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ত হয় না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই আমাদের শাস্ত্রে অন্নময়কোষ বলিয়াছেন। অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না, কল্পনা করাও কঠিন। এই দেহের উপরে প্রাণ। এই প্রাণ বস্তু কি, কে বলিবে? এই প্রাণকে দেখি না, শুনি না, ধরি না, ছুঁই না, কোনও ইন্দ্রি-

য়ের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ ইহা সকল দেহ ও সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপিয়া আছে। দেহ ছাড়া জীবের কেবল প্রাণই যে আছে, তাহাও নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, অহঙ্কার আছে, আর সকলের উপরে অহংপ্রত্যয়-বাচক একটা বস্তু আছে, যাহাকে আমরা তার আত্মা বলি, যে বস্তু তার জীবনের অনিত্যতার মধ্যে নিত্য, তার মৃত্যুর মধ্যে অমৃত; সে বস্তু তার জীবনের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের চিরসঙ্গী ও চিরসাক্ষী হইয়া আছে। নিত্যের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্মেও সে থাকে, জন্মের পূর্ব্বেও থাকে, মৃত্যুকালে সেই মৃত্যুরও সাক্ষী, মৃত্যুর পরেও সে থাকে। আজি-কালিকার বিজ্ঞান যাহাকে হেরিডিটি বলে, তাহাও এই নিত্য বস্তু যে আত্মবস্তু, তাহারই এন্‌ভাইরণমেণ্ট বা আধার ও আবেষ্টন বা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত। এই এন্‌ভাইরণমেণ্ট-সহায়ে এই আত্মবস্তু আপনার কর্ম্মকে ফোটাইয়া তুলে ও ক্ষয় করিয়া থাকে। এই আত্মা ভোক্তা; তার ভোগ আছে। এই ভোগের আবার ক্ষয় আছে। এই ভোগের জন্যই তার কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। এই ভোগ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সে এই সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ করে। এই ভোগ এবং কর্ম্মই তার আত্মচরিতার্থতার বা self-realisationএর পথ। আমরা যে অবস্থাটাকে জীবের জন্ম বলি, তাহা লাভ করিবার জন্য পিতৃমাতৃ-নির্ব্বাচন প্রয়োজন। এই নির্ব্বাচনের নিয়ন্তা জীবের এই ভোগ-বাসনা ও এই সঞ্চিত কর্ম্ম। এখানেও উপায় উদ্দেশ্যের সংযোগ আছে। না থাকিলে, জন্মটা অর্থহীন, অন্ধঘটনা-সম্পাতে পরিণত হয়। জন্মের কোনও অর্থ আছে মানিলে, ইহার অন্তরালেও এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিধানটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই "বার্থ্‌টা আর একটা "অ্যাক্‌সিডেণ্টে" পরিণত হয় না। প্রাকৃতজনের পক্ষে যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ লোকোত্তরচরিতদিগের পক্ষে জন্মটা নিতান্ত একটা আকস্মিক ঘটনাসম্পাত বলিয়া মনে করা কঠিন। ইঁহারা

সংসারে যে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কর্ম্মের উপযোগী আয়োজন সংগৃহীত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহাদের বংশ-ধারা এই কর্ম্মের অনুকূল হয়। তাঁহাদের পিতৃমাতৃ-চরিত্র এই কর্ম্মোপযোগী গুণের বীজ তাঁহাদিগকে দান করে। তাঁহাদের পারি-বারিক ও সামাজিক ব্যবস্থানও ইহার উপযোগী হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও ইহাই দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের মূল সরঞ্জামগুলি তাঁহার পিতামাতার, তাঁহার বংশধারার এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। কুল, পদ, ধন এবং বিদ্যার অপূর্ব্ব যোগাযোগে তাঁর পিতৃপরিবার নিজেদের সমাজে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। কেবলমাত্র কুলগৌরবে বঙ্কিম-চরিত্রের অসাধারণ ঔদার্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিত না। কেবলমাত্র পদমর্য্যাদায় কিম্বা ঐশ্বর্য্য-প্রভাবেও আবাল্য হইতে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক করিতে পারিত না। কেবলমাত্র বিদ্যার জোরেও তিনি, জীবদ্দশাতেই, বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের রাজা হইয়া বসিতে পারিতেন না। যে স্ব-রাট নহে, সে সম্রাট হইতে পারে না। যার ভিতরে, কোনও দিকে, কিছু অপরিহার্য্য হীনতাবোধ থাকে, সে কখনওই স্বরাট হইতে পারে না। জন্মাবধি বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনও বিষয়ে কাহারও নিকটে মাথা হেঁট করিতে হয় নাই; এইজন্যই তিনি প্রথমে নিজের স্বারাজ্য ও ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি-সহকারে, আপনার সহযোগীগণের মনের সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের আধুনিক-কালের অপরাপর চিন্তা-নায়কগণের মধ্যে কেবল রাজা রামমোহন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেই কুল, পদ, ধন এবং বিদ্যার এই অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল। আর এইজন্যই রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর কেহ দেশের লোকের চিন্তা ও চরিত্রের উপরে এমন অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারেন নাই। এই তিনজনই স্ব-রাট ও সম্রাট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ও পিতামহের কথা যতটা শোনা যায়, তাহাতে

তাঁর বৈজিকধারা বা হেরিডিটি যে অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখি না। যে জমিতে এই বীজ পড়িয়াছিল, অর্থাৎ তাঁর পিতৃ-পরিবারের অবস্থা ও ব্যবস্থাও এই বীজকে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার বিশেষ উপযোগী ছিল বলিয়াই মনে হয়। তারপর তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল। সেই সময়কার নব্য-শিক্ষার্থী বাঙ্গালীর পক্ষে যতটা উদার ও উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করা সম্ভব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পাইয়াছিলেন। তখন এদেশের ইংরাজি-শিক্ষার বাল্যাবস্থা বলিলেও চলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তিনি সেকালকার সিনিয়ার স্কলার্শিপ পাশ করিয়াই লেখাপড়া শেষ করিতেন। কিন্তু তাঁর অধ্যয়নসমাপ্তির প্রাক্কালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া বি, এ, উপাধিদানের আয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অল্প কয়েকদিন মাত্র বি, এ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া, পরীক্ষা দিতে গমন করেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর বিদ্যাচর্চ্চার শেষ হয় নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিত্য নূতন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সেবা কেবল সখের ব্যাপার ছিল,—যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থের উপস্বত্ব নিতান্ত কম দাঁড়ায় নাই। কিন্তু অন্য কোনও দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সখের সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য তিনি যতটা শ্রমস্বীকার করিতেন, তাঁর পরবর্ত্তী কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যিক এ পর্য্যন্ত ততটা শ্রমস্বীকার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। বিশেষ বিশেষ তথ্যের সন্ধানে, বিশেষ বিষয়ের গবেষণায় কেহ কেহ ইদানীং আপনাদের সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়া যাই নাই। জগদীশচন্দ্রের বা প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বা অক্ষয় মৈত্রেয়র ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান, এ সকল নিতান্ত সখের

ব্যাপার বা amateur work নহে। ইঁহারা আপনাপন বিদ্যার অনুশীলনে বিস্তর শক্তি ও সময় নিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে ইঁহাদের যতই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হউক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে যে অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায়, ইঁহাদিগকে সেই অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায় না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব,—এ সকলই ইঁহাদের মূল সাধ্য—সাহিত্য নহে। ইঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সাধ্য ছিল। বিস্তৃত অর্থে, বিজ্ঞান ইতিহাসাদিও সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে লোকে সাহিত্য বলিতে মৌলিক রসসৃষ্টিই বুঝিয়া থাকে। রসবস্তু ভিতরের। আন্তরিক রসানুভূতির উপরে এই রসের প্রতিষ্ঠা। শব্দাত্মক, বা বর্ণাত্মক, বা ধ্বন্যাত্মক, কিম্বা মৃণ্ময়, কি ধাতুময়, কি প্রস্তরময় চিত্রাদির সাহায্যে এই আন্তরিক রসানুভূতিকে সম্যক্‌রূপে বাহিরে ফুটাইয়া তুলাই সাহিত্য, চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য্য, প্রভৃতি ললিতকলার উদ্দেশ্য। এইজন্য সচরাচর, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, সাহিত্যিকেরা অন্তরের রসানুভূতির অনুশীলনে যতটা তৎপর হইয়া থাকেন, বাহিরের জগতের বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ততটা যত্ন করেন না। বাহ্যবস্তুর সহিত মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ যে কতটা ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, মানুষের জ্ঞান ও ভাবের যে একটা অনন্যাপেক্ষীত্ব আছে, বিষয় বিশেষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মনের গতি ও প্রকৃতি যে বদলাইয়া যায় এবং এই কারণে বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বহির্বিদ্যার আলোচনা ও প্রচারের দ্বারা আন্তরিক রসানুভূতির প্রকার এবং শক্তিও যে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এ সকল কথা মামুলী সাহিত্য-সেবাতে বড় একটা গণনার মধ্যেই আসে না। আর এই কারণেই আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি অনেক সময় কেবল স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যই

লাভ করে, পারমার্থিক সত্য লাভ করা ত দূরের কথা, ব্যবহারিক সত্যের উপরেও যথাযোগ্যভাবে গড়িয়া উঠে না।

সাহিত্যের সাধনা।

মানুষকে লইয়াই ত সাহিত্য। মানুষের মন লইয়াই ত সাহিত্যের যাবতীয় লীলাখেলা। মানুষের ভাবকে আকার দিয়া, রং দিয়া, আদিতে ও মূলে যাহা অতীন্দ্রিয় তাহাকে নানা ইঙ্গিতে, সংকেতে, উপমায়, রূপকে সাজাইয়া কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারে টানিয়া আনাই সাহিত্যের লক্ষ্য। মানুষ আপনার অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে যে সকল অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান লাভ করে, তাহাকে জগতের অশেষবিধ জ্ঞাত বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে অনুমান উপমানাদির দ্বারা যুক্ত করিয়া, জ্ঞানগোচর করিয়াই সাহিত্য-সৃষ্টি আপনার যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। ইংরাজি ফ্যান্সি (Fancy) শব্দকে যদি আমরা বাঙ্গালায় কল্পনা বলি, তাহা হইলে ইংরাজিতে যাহাকে ইমেজিনেষণ (imagination) কহে, তাহাকে আমাদের ভাষায় অপরোক্ষ অনুভূতি বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। সাহিত্যে এই সত্য কল্পনা বা ইমেজিনেষণকেই আমি অপরোক্ষানুভূতি বলিতে চাই। এখানে এই অর্থেই অর্থাৎ ইংরাজি ইমেজিনেষণের প্রতিশব্দরূপেই, অপরোক্ষানুভূতি শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এই অন্তরঙ্গ-অনুভূতি, এই অতীন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জ্ঞান বা রসবোধই ইমেজিনেষণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কখনও জানা যায় না তাহাকে ব্যক্ত করাই এই অপরোক্ষানুভূতির বা অন্তরঙ্গ-অনুভূতির কর্ম্ম। এইজন্যই এই অনুভূতি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল মন্ত্র।

——as imagination bodies forth,
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

ইহাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু মানুষের অজ্ঞাতকে ধরিবার শক্তি ও প্রণালী সর্ব্বদাই সে যাহা ও যতটুকু জানে, তাহার উপরেই নির্ভর করে ও তাহারই দ্বারা নিয়মিত হয়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দুইটা একান্ত বিচ্ছিন্ন রাজ্য নয়। জ্ঞাত যাহা তাহা অজ্ঞাত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু সেইরূপ আলোক যাহা তাহাও ছায়া নহে, ছায়া যাহা তাহা আলোক নহে, একথাও সত্য এবং প্রত্যক্ষ। অথচ ছায়া আর আতপকে পরস্পর হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ছায়ার পাশেই আতপ, আতপের সঙ্গেই ছায়া সর্ব্বদা থাকে। সেইরূপ জ্ঞাত এবং যাহাকে অজ্ঞাত বলি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা এবং যাহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলি, ইহারা উভয়েও সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়াই যেন থাকে। গুণকে যেমন গুণী হইতে, চিন্তাতে পৃথক্ করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে কদাপি পৃথক্ দেখা যায় না; সেইরূপ যাহা জানি, তাহা হইতে কিছুতেই যাহা জ্ঞানাতীত ও অজ্ঞেয় তাহাকে আলাহিদা করা সম্ভব হয় না। এইজন্যই বহির্বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্যোপলব্ধি এবং আনন্দানুভূতি বা রসানুভূতির প্রকৃতি ও প্রসার উভয়ই বাড়িয়া যায়। দেহের জ্ঞান যত বাড়ে, চৈতন্যের উপলব্ধি তত বিস্তৃত ও গভীর হয়। এই জ্ঞানপ্রভাবে দেহের উপরে মানুষের আধিপত্য যত বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে তার রসসম্ভোগের মাত্রা এবং বৈচিত্রও বাড়িয়া যায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের রসানুভূতিও পরিপক্বতা ও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য অনন্যাপেক্ষীত্ব আছে। সেইরূপ জ্ঞানের এবং ভাবের বা রসের,—সায়েন্স (Science) এবং আর্টের—মধ্যেও একটা অনন্যাপেক্ষা রহিয়াছে। আপনার যুগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া, কিম্বা তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, গভীর, প্রাণগত, প্রত্যক্ষযোগ রক্ষা না করিয়া, কোনও সাহিত্যই সত্য ও শ্রেষ্ঠ রসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা এই অতি মামুলী ও মোটা কথাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছি

বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই বাঙ্গালা দেশে সত্য সাহিত্য-সৃষ্টি যেন ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশে আজিকালি বিজ্ঞানচর্চ্চা বাড়িয়াছে, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক গবেষণা বেশ হইতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিশেষ মৌলিকতার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। এ সকল বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যের ধারা যেন ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছে। সাহিত্যসৃষ্টি যেন কেবলই একটা অলীক অন্তর্মুখীনতার অভিনয়ে ব্যস্ত হইয়া, বিমানচারিণী হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্য-কলায় কেবলই যেন একটা আবছায়ার লীলা আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য ও বিশ্বাবত্তা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এটি হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের সাহিত্যের সম্রাট, সেই যুগের আদিতেও আজিকালিকার মতন বাঙ্গলা সাহিত্য এতটা পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হয় নাই। আর হয় নাই এইজন্য যে সেকালের বাঙ্গালী লেখকেরা প্রায় সকলেই, আপনাদের সমসাময়িক শিক্ষা ও সাধনার বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি প্রায় সকল অঙ্গকেই স্বল্পাধিক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গলা শব্দযোজনা আজিকালিকার মতন তখন এত সহজও ছিলনা; আর যে সুললিত শব্দযোজনা করিতে পারিত, সে'ই, সেই ঝঙ্কার-সম্পদের বলে, একটা দীগ্‌গজ সাহিত্যিক হইবার উচ্চ আশা লইয়া পাঠকসমাজেও আসিয়া দাঁড়াইত না। এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায় অনেকেই হয় স্বয়ং সিদ্ধ, না হয় কৃপা-সিদ্ধ। সাহিত্য-সৃষ্টির যে একটা বিশেষ, কঠোর সাধনা আছে, এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল। তাঁর পূর্ব্বে অক্ষয়কুমারকে এবং ঈশ্বরচন্দ্রকেও কঠোর সাধনাপথে সাহিত্য-জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল। সেকালের হিসাবে অক্ষয়কুমারের বিস্তর পড়াশুনা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কত বিস্তৃত পড়াশুনা ছিল তাঁর গ্রন্থাদিতে তার যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর

সংগৃহীত পুস্তকরাশিতে তদপেক্ষা বেশী পরিচয় পাই। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর কাহাকেও এদেশে খুঁজিয়া পাই না। সে সময়ের ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে, তাঁর জীবদ্দশায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর একটিও পণ্ডিতলোক বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বলিয়া জানি না। তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্ব্বত্র এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কুত্রাপি তিনি যে নিজের বিদ্যা জাহির করিতে চাহিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও এ সন্দেহটা মনে জাগে না। আপনার সৃষ্টিকে সাজাইবার কিম্বা নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রয়োজনমত অপরের প্রামাণ্য বা উদ্ভাবিত সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও নিজের বিদ্যার গৌরবপ্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। বিদ্যা তাঁর প্রতিভার কিঙ্করী হইয়াই ছিল, তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রভু হয় নাই। বিদ্যা তাঁর যতই বেশী হউক না কেন, প্রতিভা এই বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে বড় ছিল। আমাদের শিক্ষিত-সমাজ আজিকালি কল্চারের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে কোলাহলান্বিতও হইয়া উঠে। বঙ্কিম-"মণ্ডলে" এ স্ফীতমস্তকের বা এ কোলাহলের উৎপাত দেখা যায় নাই; অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের যে পড়াশুনা ছিল, এখন তার কিছুই নাই বলিলে চলে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা পড়িতেন, তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা তাহা একেবারেই হজম করিতে পারিত। অধীত বিদ্যাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্তু তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়া, তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁর নিজের মোহরাঙ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতু যেমন টাঁকশালে এক আকারে যায়, কিন্তু সেখান হইতে আর এক আকারে বাহির হইয়া আইসে, সেইরূপ অধীত বিদ্যাসকল একভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যাইত, কিন্তু অন্য আকারে তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইয়া আসিত। জীবমাত্রেরই বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রয়োজনীয় তাহাকে

নিজের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিবার ও যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহাকে উৎসর্জ্জন করিবার শক্তি থাকে। এই শক্তিই জীবের জীবনের প্রধান লক্ষণ। মনেরও এই ধর্ম্ম আছে। যে মনের এই জীবন-ধর্ম্মটি আছে, সে যেমন অনায়াসে বাহিরের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ আহরিত বিষয়ে যাহা নিষ্প্রয়োজন বা হানি-কর, অর্থাৎ যাহা তার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে না, তাহাকে বর্জ্জনও করিতে পারে। যে মন এইরূপ বর্জ্জনক্ষম নহে, তাহা অজীর্ণ-বিদ্যার উৎপাতে শীর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যা তার মান-সিক শক্তিবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তাহার হ্রাস এবং অপচয়ই করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজীবনে কোনও দিন কেহ এ অজীর্ণরোগ দেখিতে পায় নাই। পড়াশুনা তাঁর মধ্যে যে সার্থ-কতালাভ করিয়াছিল, অতি অল্প লোকের মধ্যেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ লোকের মধ্যেও পাওয়া যায় না, পণ্ডিত-দের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন্ তত্ত্বটা জানিতেন না, এদেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এদেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্বাদিস্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবী, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য, রামায়ণমহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, এ সকলের সঙ্গে তাঁর কতটা যে পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলিতে, কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউ-রোপীয় দার্শনিক ক্যান্ট হেগেল কুজেঁা, কোম্‌টে এবং ইংরাজ চিন্তা-নায়ক স্পেন্‌সার্, মিল্, বেন্থাম, হক্সলি, টিণ্ডেল্, ফ্রেডারিক্ হ্যারিসন্ প্রভৃতি, আর একদিকে মেথু আর্‌নল্ড্, রেনাঁ প্রভৃতি, এমন কি আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism এবং মেসমেরিজম্ (mes-

merism) পর্য্যন্ত তার কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল,—এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটুও অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটা অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। নিজের শক্তির উপরে যে দাঁড়াইতে পারে, নিজের প্রতিভার মৌলিকতা যে বুঝে, সে পরের বস্ত্র লইয়া বড়াই করিতে যাইবে কেন? স্বারাজ্যে যে প্রতিষ্ঠিত, সে পরের নিকট হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের যশোভাতি বা জয়শ্রী ধার করিয়া আনিবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ইহাতে যে তার ইজ্জৎ যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চক্র বা চড়ক্

(১)

অবিরাম-গতি লভি'
ঘুরে পরমাণু, বিশ্ব, গ্রহ, তারা, রবি ;
রাশিচক্র, নীহারিকা,
ঘুরে ধূমকেতু—পুচ্ছে বাষ্পময়ী শিখা ;
ষড় ঋতুচক্র ঘুরে—
শীতাতপভেদ স্ফুরে ;—
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"—

(২)

শৈশব বার্দ্ধক্যে পূরে—
কর্ম্মফল ল'য়ে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরে ;
সুখ-দুঃখ-আবর্ত্তন,
ঘুরে জন্মমৃত্যু-ধারা—উত্থান-পতন ;
ঘুরে ফিরে সৃষ্টি—নাশ,
হ্রাস বৃদ্ধি—বৃদ্ধি হ্রাস ;—
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"

(৩)

স্থূল সূক্ষ্ম—অনুক্রমে
জীব হ'তে ব্রহ্ম,—পুনঃ জীব মায়া-ভ্রমে ;
অংশ হ'তে পরিণাম,
পূর্ণ হ'তে খণ্ড পুনঃ—ক্রম অবিরাম ;
তরু হ'তে বীজ ভ্রূণ,
বীজ হ'তে তরু পুনঃ ;—
মহাকাল ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"

(৪)

কালমূলে মহাকাল
ঘুরাইছে চক্রনেমি—আবর্ত্ত ভয়াল !
ঘৃষ্ট-পিষ্টে জীব মরে,
'দয়া নাই—স্নেহ নাই'—কাঁদে আর্ত্তস্বরে ;
বল তারে অবিচার,
নিয়ামক নির্ব্বিকার ;—
অই শুন ঘন দেয় ডাক,—
"দে পাক—দে পাক।"

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত *

আমি যে আজ আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, সে ঠিক আমার দোষে নহে। আমারই কয়েকজন ছাত্রবন্ধু ষড়যন্ত্র করিয়া এই বিপত্তি ঘটাইয়াছেন; তাঁহারা আপনাদের সমিতির সভ্য, সুতরাং আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পরে আপনারা তাঁহাদিগকে এজন্য যেরূপ ইচ্ছা শাসন করিতে পারিবেন। আমি এই প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের নাম করিয়া দোষী হইতে পারিব না, কিন্তু সে সকল ষড়যন্ত্রকারী, অনাবশ্যকরূপে ব্যস্ত, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিতে প্রস্তুত, হারুণ-উল-রসীদের মত মেজাজের লোক দেখিলেই আপনারা কলেজের ছাত্র বলিয়া নিশ্চিত চিনিতে পারিবেন। তাঁহারা যে আমাকে কলিকাতার যাদুঘর হইতে ভবানীপুরের মানবপিতামহশালায় কেন টানিয়া আনিয়াছেন, ইহার একটি সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কার করিতে এতদিন চেষ্টা করিতেছিলাম। যাঁহারা প্রায় ৩৬৫ দিন আমার বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আবার এ নূতন সখ কেন মনে আসিল, তাহাই আমি ভাবিতেছিলাম। ইহা আমার বক্তৃতারই আকর্ষণী শক্তি, এরূপ মনে করিবার মত হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানশূন্যতা, অনেকের থাকিলেও, আমার নাই। এতদপেক্ষা যুক্তিযুক্ততর অনুমান এই যে ইঁহারা আমার বক্তৃতা তেমন ভাবে কখনও শুনেন নাই—নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই 'শতকরা' রক্ষা করিয়া সারিয়া আসিয়া থাকেন, পদ্মপত্রের বারির ন্যায় একেবারেই অনাসক্ত! যাক্, যে কারণেই হউক, আজ এই নববর্ষের প্রথম দিনে

---

* ১৩২২, ১লা বৈশাখ তারিখে ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

আপনাদিগকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাইতে আসিয়াছি. আপনারা অতিথির সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কোনও সভা সমিতিতে এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধরূপে পঠিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আপনারা যদিচ বিষয় নির্ব্বাচনে আমার সহিত এক-মত হইতে না পারেন, তথাপি আমার মৌলিকতা আপনারা অস্বী-কার করিতে পারিবেন না। যেহেতু যতদূর জানা যায় তাহাতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও সভাস্থলে কোনও বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই। আপনারা যদি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা একটুকু মাপ করেন, তবে আমি প্রসঙ্গ-ক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। বর্ত্তমান যুগে, মৌলিকতার ন্যায় আদরণীয় জিনিস কিছুই নাই। আপনারা যদি ভবানীপুরের সহিত রাণী ভবানীর কোনও যোগ দেখাইতে পারেন, আলিবর্দ্দী খার সহিত আলিপুরের কোনও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ বাহির করিতে পারেন, কালীঘাটের মন্দিরে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন খুঁজিয়া পান, অগত্যা এটা স্থির করিতে পারেন যে শশার আঁশে অতি মোলায়েম কাগজ প্রস্তুত হয়, বা বিড়ালের লোমে বিচিত্র শাল হয়, তাহা হইলে আপনাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হউক বা না হউক, আপনাদের মৌলিকতার সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্যকার এই সান্ধ্য সম্মিলনে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও, ভ্রমণে বড় একটা নূতনত্ব আর নাই। আজকাল প্রায়ই একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের অন্যতম পেশা ভ্রমণ। বায়ু-সেবনই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য। যেখানে সাধারণতঃ মাছ-মাংস, ঘি সস্তা এই বায়ু-ভোজনকারীদিগের গন্তব্য স্থান সেই সকল দেশ। বারাণসীতে বেণীমাধবের ধ্বজা বা সারনাথ অপেক্ষা দশাশ্ব-মেধের বাজারে মৎস্যের দরই ভ্রমণকারীদিগের অধিকতর প্রিয়।

বায়ুভোজীদিগের প্রাণ-বায়ুর ন্যায় হাল্‌কা, আহার্য্য বায়ুর অপেক্ষা অনেকগুণ ওজনে ভারী এবং গতি আশুগতিরই ন্যায় দ্রুত এবং হিসাবের বাহিরে।

ভ্রমণের উপকারিতা অনেক : নিকর্ম্মাদিগের কর্ম্ম ভ্রমণ, বহুকর্ম্মাগণের অবসর-বিনোদন ভ্রমণ এবং যাঁহাদের কর্ম্ম তত বেশী নহে, তাঁহারা কর্ম্মের ভাণ করিয়া যদি পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন মন্দ হয় না। ভ্রমণের আর একটি উপকারিতা এই যে যাঁহাদের অর্থবাহুল্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে ভ্রমণ Safety valve এর কাজ করে। অর্থের ন্যায় ভ্রমণ ও অঘটন-ঘটন-কুশল। সাত ঘাটের জল একত্র করিতে ভ্রমণ অদ্বিতীয়। এই প্রখর গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের নির্ব্বাত উত্তাপে নেহাত যদি তোমার দম আটকাইয়া আসে, তবে চট্ করিয়া পুরীতে কি ওয়ালটেয়ারে সরিয়া পড়, ঝড় বহিয়া তোমার সমস্ত ক্লেশ হরণ করিবে। যদি গ্রীষ্মের ফল আম, তরমুজ, পটলে তোমার অরুচি হইয়া থাকে, তবে ঝাঁ করিয়া একবার দার্জ্জিলিংও ঘুরিয়া এস, কপি, মটরশুঁটি, কমলা ইত্যাদি শীতকালের ফল তোমার রসনা পরিতৃপ্ত করিবে।

এ সকল জাগতিক ভোগবাসনা যদি না থাকে, তবে লোটা ও কম্বল লইয়া জলধর দাদার মত গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা কর। ফিরিয়া আসিয়া একখানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলিও কিছু পয়সা হইবে।

আমি একটি কথা আপনাদিগকে সবিনয়ে বলিয়া রাখিতে চাই যে আমি অতদূর যাইতে পারি নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় আপনাদের বেশী দূরে স্থিত নহে। অল্পদিন হইল আমি বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম, তাহারই একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আপনাদের সমীপে পেশ করিব বলিয়া আজ আমার এই সযত্ন-প্রয়াস। দূরত্ব বেশী নহে বলিয়া আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। আজকাল সাহিত্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বেশ আদর আছে বলিয়া মনে হয়। আমি বিলাত বা

তিব্বত না গিয়া থাকিলেও, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কতকগুলি সাধারণ ঘটনা আমার এই সামান্য বর্দ্ধমান-ভ্রমণেও ঘটিয়াছিল। যথা দৈনিক একাধিক বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চা-পান, বহুবার জলপান ইত্যাদি। একখানি ম্যাপ ও খানকয়েক ছবি দিয়া সাজাইয়া দিলে যে কোনও মাসিক পত্র আমার এই বর্দ্ধমান-ভ্রমণ-কাহিনী যত্নসহকারে গ্রহণ করিবে, এখন কেবলমাত্র গোটাকতক চটকদার ঘটনা জুটাইতে পারিলেই হইল। সম্প্রতি একখানি মাসিকপত্রে একজন মহিলা নরওয়ে-ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, জাহাজের প্রত্যেক রমণীই নিতান্ত পলিত গলিত না হইলে—কাহারও না কাহারও সঙ্গে প্রেমসূত্রে বাঁধা পড়িতেছেন। একজন মহিলার লেখনী হইতে এমনতর চটকদার ঘটনাসম্বলিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যে নিতান্ত মারাত্মক, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বর্দ্ধমান নরওয়ে হইতে কিছু নিকটে—আমার অসুবিধা ঠিক এইখানে। কিন্তু তাহাতে উপেক্ষার বিষয় কিছু নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি এই বর্দ্ধমান-ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পুস্তকখানি যে এক সুরসাল ভ্রমণকাহিনী তাহা হয় ত অনেকে জানেন না।

নরওয়েই হউক, আর বর্দ্ধমানই হউক, ভ্রমণ ভ্রমণই। পৃথিবী অনন্ত শূন্যে নিরলসভাবে অবিরত তীব্র বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের এই 'জগৎ' অর্থাৎ একান্ত গতিশীল Solar Express ক্রমাগত চলিয়া আজ কিছুক্ষণের জন্য আপনাদিগকে ১৩২২ সালের দ্বারদেশে নামাইয়া দিয়াছে। ইহার উপর আবার শারীরিক ভ্রমণ আছে, শুধু প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের কথা বলিতেছি না, অহোরাত্র আমরা হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেই ভালবাসি। এই হাওয়া খাওয়ার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর এত বেশী যে, কোনও কাজ করিতে গিয়াও আমরা হাওয়া খাইয়া বসি। ব্যবসা বাণিজ্য হাওয়া খাইতে গেলে চলে না; কাজেই সেদিকে আমরা বড় একটা ঘেঁসি না। সনাতন পাণের

ডিপে, আর কাঁচিমার্কা সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ফেলিয়া আড়ং-ঘাটা হইতে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আফিসে Daily Passenger হিসাবে হওয়া খাইয়া বেড়াইতেই আমরা পটু।

তার পর, আমাদের মস্তিষ্কও নিতান্ত বসিয়া থাকে না। এই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, আমরা নিয়ত ছুটিতেছি, আর্দালীসহ বড় সাহেব ছুটিতেছেন, তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক বেচারীও খুব ছুটিতেছে। মস্তিষ্ক ঘুরাইতে পারি বলিয়া আমরা এখনও টিকিয়া আছি। তবে মাথাটা কিছু বেয়াড়া রকম ঘুরিয়া গেলেই যা' বিপত্তি।

হৃৎপিণ্ডটিও দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে, ঘড়ির কাঁটার মত একস্থানে নিবদ্ধ থাকিয়াও, চলিতেছে। তিলমাত্র বিরাম নাই। এইরূপ চলিতে চলিতে যেদিন Terminusএ পৌঁছিবে, সেইদিনই চলার শেষ। যতদিন Terminus না মিলিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য সকলকে মালগাড়ীর মত Sidingএ ফেলিয়া 'আগে চল, আগে চল ভাই।'

এইখানেই ভ্রমণের শেষ নহে। হিন্দুরা বলেন অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে জীব মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ হিন্দুদের দর্শন, তন্ত্র ধর্ম্মনীতি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা সত্বেও ইয়ুরোপীয়েরা বলেন যে হিন্দুদিগের সভ্যতার মূল মন্ত্র স্থিতিশীলতা, গতিশীলতা নহে। এ কথা বলিলে আর গতি কি?

রেল ষ্টীমার বাইসিকেল না থাকিলেও সেকালে হিন্দুদের মনের গতি যে দ্রুত ছিল, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্বভাবতঃই মনের গতি অতি দ্রুত। কিন্তু উহা ত আমরা লক্ষ্য করি না। মনের গতি ঠিক ঘুঁড়ির মত। নিদাঘের মধ্যাহ্নে রাখাল বালক একটি গাছের তলায় বসিয়া নিমীলিত নয়নে তাহার ঘুঁড়ির সূত্র-প্রান্ত হাতে ধরিয়া আছে। আর তাহার ঘুঁড়িখানি বাজিয়া বাজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার মনে মুক্ত আকাশের সঙ্গে কত খেলাই খেলিতেছে। মনের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তই মানবজাতির ইতিহাস।

কথায় কথায় বর্দ্ধমান ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা হয়ত ব্যস্ত হইতেছেন, বর্দ্ধমানে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম তাহাও অন্ততঃ এতক্ষণ আপনাদিগকে বলা উচিত ছিল। বর্দ্ধমানে দেখিবার মত জিনিস আছে—রাজপ্রাসাদ সঙ্গিনের খোঁচার ভয়ে তাহা এ যাত্রা দেখিতে বিরত হইয়াছি। শের আফগানের এক সমাধি আছে, সময়াভাবে সে দিকে যাইতে পারি নাই। কতকগুলি বড় দীঘী আছে তাহার জল এমন কাল ও শীতল যে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। আর এক আছে গোলাপবাগ—বর্দ্ধমান রাজের চিড়িয়াখানা ও সম্ভ্রান্ত অতিথিশালা। সম্ভ্রান্ত অতিথির সহিত চিড়িয়ার কি সম্বন্ধ আছে—যে জন্য এতদুভয়ের একত্র অবস্থান ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার গবেষণায় আমি এতাবৎ কাল নিযুক্ত আছি।

গোলাপবাগ বেশীদূর দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে দুই বৃহৎ সর্প আমাদিগকে তাড়া করিল। বন্ধুবর রাজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী, অশোক ধর্ম্মপদ প্রণেতা চারুচন্দ্র বসু ও আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাম। বর্দ্ধমানরাজের চিড়িয়াখানায় এই সাপগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া খেলা দেখান হইতেছে, এ রহস্যটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না।

বর্দ্ধমান ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য আপনারা জানেন—অষ্টম সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিয়া সাহিত্যচর্চ্চার ও সীতাভোগ মিহিদানার সৎকারে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন। সাহিত্যের সঙ্গে প্রকৃত রসের এবম্বিধ সুমধুর সম্মিলন এই অষ্টম অধিবেশনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য অনেক দর্শক ও প্রতিনিধি বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মিলনের বৈঠকে খুব লোক সমাগম হয় নাই। মণ্ডপে পাছে স্থান সংকুলান না হয়, এজন্য সূক্ষ্মদর্শী মহারাজ প্রতিনিধিবর্গের আবাসস্থলে প্রচুর খাদ্য ও পেয়ের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। আমার বোধ হয় সেইগুলির প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া অনেকে সম্মিলনের বৈঠকে আসিবার

অবসর করিতে পারেন নাই। হয়ত পরবর্ত্তী সম্মিলনে চেষ্টা করিবেন।

বৰ্দ্ধমানের সম্মিলন মহাসম্মিলন নামে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইহার সভাপতি মহামহোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজাধিরাজ, জনতাও এক মহাগুরুতর ব্যাপার। সম্মিলনের চারিটি শাখা ছিল—'চতুস্কন্ধেব সা চমূ'। একটি শাখার অধিপতি ছিলেন অদ্যকার যিনি সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমিও অধিকাংশ সময় ইঁহার শাখায় বিচরণ করিয়াছি। কিন্তু যতই হউক, দর্শনশাখা তেমন জমে না। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, ন্যায়ের ষোড়শ প্রথা, বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ং, বের্গসনের ইনটুইশন, অয়কেনের আধ্যাত্মিকতা শুনিয়া শুনিয়া অরুচি ধরিয়া গেল। সাহিত্যশাখায় অনেক উপভোগ করিবার বিষয় ছিল। সাহিত্যে অন্ততঃ নয়টি রস আছে—ইচ্ছামত সেগুলিকে বাক্যজালে ফেলিয়া, ফেনাইয়া ছানিয়া নিরনব্বইটি করিয়া লওয়া যায়। সাহিত্যবিভাগে সেইজন্য বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের মত আমোদের সঙ্গে অনেক উপদেশ ছিল। কেহ ঘুষি বাগাইয়া বীররসে বক্তৃতা করিতেছেন, কেহ বা নাকিসুরে করুণরসের অবতারণা করিতেছেন, আর সভাপতির ঘণ্টাধ্বনি Summary-বিচারে অধিকাংশ বক্তৃতার অভিনন্দন করিতেছে।

সর্ব্বঘটে বিদ্যমান ব্যোমকেশবাবু অন্যের রচিত কবিতা পাঠকালে তাহার সঙ্গে যথেষ্ট মৌলিকতা মিশাইয়া দিতেছেন। কারণ অধিকাংশস্থলে তিনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কবিরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

ইতিহাস শাখার বল্লালসেনের দেবগ্রাম লইয়া সাত আটশত বৎসর পরে আবার যুদ্ধঘোষণা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ শাখার অধিনায়ক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার অতিকষ্টে শ্বেতপতাকা উড্ডীন করিয়া দিনকয়েকের মত Truce করিয়া দিয়াছেন।

বিজ্ঞানশালায় একটি ফল ফলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে—কাশিম-

বাজারের মহারাজা ভারতীয় পদ্ধতিতে জ্যোতিষের আলোচনা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন।

সম্মিলনে একটি বিষয় আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই বলিয়া আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ করিব। তাহাও এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। সম্মিলনে দেখিলাম সভাপতি ব্যতীত সকলেই ভ্রমণ-পরায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন শাখার সাহিত্যসেবিগণ ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া যুগপৎ সম্মিলনের কার্য্যের আদ্যকৃত্য ও পরিপাক ক্রিয়ায় সৌকর্য্য সাধন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভ্রমণের গতিকে সম্মিলনটি নিতান্তই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বক্তারা যেমন স্ব স্ব প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র, অপরদিকে শ্রোতৃগণও তেমনি ভ্রমণ করিতে পটু। আমিও যথারীতি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যখন আমার ডাক পড়িল, তখন রুমালে উপচক্ষু পরিমার্জ্জিত করিয়া নিতান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে সেই চলিষ্ণু জনমণ্ডলীকে দেখিয়া লইলাম। প্রবন্ধ শুনাই কাহাকে? প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ শুনিয়া শুনিয়া সভাপতি ততক্ষণে উপনিষৎ-তত্ত্বে সম্ভবতঃ মনোনিবেশ করিয়াছেন। দুই চারিজন বন্ধু কৃপাপরবশ হইয়া স্থাণুর ন্যায় আসন পরিগ্রহ করিয়া রহিলেন, অবশিষ্ট ভ্রমণশীল। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবন্ধ পাঠ সুরু করিয়া দেওয়া গেল। দর্শকগণ—শ্রোতা নহে—আমাদের কক্ষে এক একবার একটু থামিয়া কক্ষান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেহ হাই তুলিয়া বক্তার প্রতি চাহিয়া বুঝাইয়া দিলেন—জগৎ নশ্বর। কেহ কেহ বা গতিশীল অবস্থাতেই করতালিতে যোগদান করিয়া জানাইতে চাহিলেন যে কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই।

এই প্রকারে বক্তৃতা শেষ করিয়া আমি সেই ভ্রাম্যমাণ জনপুঞ্জকে আরও পরিভ্রমণের অবকাশ দিয়া সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জৈন মত খণ্ডন

অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারার্থ শঙ্করাচার্য্য আধুনিক ভারতবর্ষের বাহিরে বর্ত্তমান পারস্যরাজ্যস্থিত বাহ্লিক দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। বাহ্লিক (Balkh) দেশে অবস্থানকালে একদা তিনি শিষ্যদিগের নিকটে স্বীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জৈন বা আর্হত মতাবলম্বী কতিপয় পণ্ডিত তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিচারের বর্ণনা পাঠকের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য আমি প্রথমে সংক্ষেপে আর্হত বা জৈন মতের বর্ণনা করিতেছি। "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" এ বিষয়ের মোটামোটি আলোচনা আছে।

আর্হত মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ,—চিৎ বা বোধাত্মক জীব, এবং অচিৎ বা অবোধাত্মক বা জড়াত্মক অজীব। জীব ত্রিবিধ,—সংসারী, মুক্ত, এবং নিত্যসিদ্ধ। আর্হত বা জিন নিত্যসিদ্ধ। অন্যেরা কেহবা সাধনাদ্বারা মুক্ত, কেহবা বদ্ধ। যাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে, তাহারাই বদ্ধ বা সংসারী। সংসারী জীব দুই প্রকার,—সমনস্ক এবং অমনস্ক। যাহারা শিক্ষা, ক্রিয়া এবং আলাপাদি গ্রহণে সমর্থ তাহারা সমনস্ক। যাহারা তাহার বিপরীত তাহারা অমনস্ক। অমনস্ক জীব দুই প্রকার,—'ত্রস' বা চলনশীল এবং 'স্থাবর'। শঙ্খ কৃমি প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের অন্ততঃ দুইটি ইন্দ্রিয় আছে তাহারা 'ত্রস' বা চলনশীল। 'ত্রস' চারি প্রকার, অর্থাৎ দুই, তিন, চার, অথবা পাঁচ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং বনস্পতি সকল স্থাবর। পৃথিবীকে

জীব এবং অজীব

যে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে কি করিবে, সেই পৃথিবীকায়ক বা পৃথিবীজীব। জল বায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

"জীবাকাশ-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদ্গলাস্তিকায়"

আর্হত সিদ্ধান্তে নিত্য এবং অনিত্যাত্মক তত্ত্ব কাহারো কাহারো মতে সপ্ত, কাহারো কাহারো মতে নব,—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সম্বর, বন্ধ, নির্জ্জরণ এবং মুক্তি। বোধাত্মক জীব এবং অবোধাত্মক অজীবের যোগে জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় এবং পুদ্গলাস্তিকায়,—এই পঞ্চ প্রকার ভেদযুক্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি। কালত্রয় সম্বন্ধ হেতু স্থিতিবাচক 'অস্তি' শব্দ এবং অনেক প্রদেশবর্ত্তীত্ব হেতু শরীরবাচক 'কায়' শব্দ—উভয়যোগে অস্তিকায় শব্দ ইহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায়, একত্বশালী (singular, not generic terms) এবং নিষ্ক্রিয়। ইহারা দ্রব্য সকলের দেশান্তর প্রাপ্তির কারণ। অবস্থিতি এবং গতি ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত। প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মাস্তিকায়ের এবং স্থিতি দ্বারা অধর্ম্মাস্তিকায়ের অনুমান হয়। যেখানে এক বস্তু আছে সেখানে অন্য বস্তুর প্রবেশের নাম 'অবগাহ', এবং তাহা আকাশের কার্য্য। আকাশাস্তিকায় দুই প্রকার,—লোকাকাশ এবং আলোকাকাশ। উপর্য্যুপরিস্থিত লোকসকলের মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান তাহার নাম লোকাকাশ। তাহাদের উপরিস্থিত মোক্ষ স্থানের নাম আলোকাকাশ। পুদ্গলাস্তিকায় স্পর্শ, আস্বাদন, এবং বর্ণযুক্ত। তাহা দুই প্রকার—অণু এবং স্কন্ধ। যাহা ভোগের অবিষয় তাহাই অণু। দ্ব্যণুকাদি ভোগ্য বস্তুই স্কন্ধ। দ্ব্যণুকাদির ভঙ্গ বা বিগলনে অণুর উৎপত্তি, এবং অণুসকলের পরস্পর যোগে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি। পূর্ণ করে অর্থাৎ গঠন করে, এবং বিগলিত বা ভগ্ন করে, এজন্য বলা হয় পুদ্গল। সংকর্ম্ম পুদ্গলের নাম পুণ্য, তাহার বিপরীত পাপ।

শরীরের চলনে আত্মার চঞ্চলত্ব। যাহাকে 'যোগ' বলে,

তাহাই আশ্রব। যে জলমধ্যগত দ্বার দিয়া নদীর জল শ্রবিত বা বহির্গত হয়, তাহাকে 'আশ্রব' বলে। সেইরূপ কর্ম্ম সকলও 'যোগরূপ' প্রণালী দ্বারা আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হয়, এজন্য যোগেরই নাম 'আশ্রব'। আর্দ্র বস্ত্র যেরূপ বায়ুদ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আহৃত ধূলিকণা সকল গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ কষায় বা পাপরূপ জল দ্বারা আর্দ্র হইয়া, যোগরূপ বায়ু দ্বারা সর্ব্বপ্রদেশ হইতে আনীত কর্ম্মসকল গ্রহণ করে। কুগতি প্রাপ্তি দ্বারা আত্মার কর্ষণ অর্থাৎ হিংসা করে, এজন্য ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভকে 'কষায়' বলা যায়। অহিংসাদিকে শুভ কায়যোগ এবং সত্য, মিত, এবং হিত ভাষণাদিকে শুভ বাঙ্‌যোগ বলা যায়। কায়া মন এবং বাক্যের সহিত কর্ম্মের যোগের নাম আশ্রব। পুণ্যের আশ্রব শুভ এবং পাপের আশ্রব অশুভ।

"আশ্রব"

মিথ্যা দর্শন, অবিরতি, প্রমাদ এবং কষায় হেতু 'যোগ' দ্বারা আত্মা নানা স্থান হইতে কর্ম্মবন্ধের হেতুভূত পুদ্গল সকল স্বীয় সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে গ্রহণ করে, এবং আপনাতে যোগ করে, তাহাকেই 'বন্ধ' বলে। বন্ধ নানা প্রকার, তন্মধ্যে প্রকৃতিবন্ধ বা কর্ম্মবন্ধ আবার অষ্ট প্রকার,—(ক) জ্ঞানাবরণীয়, অর্থাৎ সম্যক জ্ঞানলাভেও মোক্ষসিদ্ধি হয় না, যেহেতু জ্ঞানদ্বারা বস্তু লাভ হয় না,—মনের এরূপ ভ্রম ধারণা। (খ) দর্শনাবরণীয়, অর্থাৎ আর্হতদিগের "দর্শন" অভ্যাসদ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হয় না—এরূপ ভ্রম। (গ) 'বেদনীয়', অর্থাৎ কোন বস্তু যুগপৎ আছে এবং নাই মনে করিলে অসিধারাতে মধুলেহনের ন্যায় মনে যে যুগপৎ সুখ এবং দুঃখের উদ্রেক হয়। (ঘ) 'মোহনীয়', অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব তাহাদিগেরও জ্ঞানাভাব—এইরূপ ভ্রম —অথবা তত্ত্বালোচনায় অশ্রদ্ধা, এবং অসংযত চরিত্র। (ঙ) আয়ুস্ক, অর্থাৎ দেহধারণের প্রতি আসক্তি। (চ) নামিক, অর্থাৎ স্বীয় নামেতে অহঙ্কার। (ছ) গোত্রিক—বা স্বীয় গোত্রে অভিমান।

বন্ধ

(জ) অন্তরায়—দানাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কাতরতা, অথবা দানাদিকে মোক্ষলাভের বিঘ্নকর জ্ঞান। ইহারই নাম কর্ম্মাষ্টক। জৈনমতে এই কর্ম্মাষ্টকের ক্ষয়ে মুক্তির উদয়।

পূর্ব্বোক্ত আশ্রবের নিরোধের নাম সম্বর। সম্বর দ্বারা আত্মাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ হয়। সম্বর নানা প্রকার; যথা, গুপ্তি, সমিতি ইত্যাদি। কায়-মনোবাক্যের নিগ্রহ দ্বারা সংসার-গতির কারণ-ভূত আশ্রব হইতে আত্মাকে রক্ষা করার নাম 'গুপ্তি'। প্রাণীগণের পীড়া পরিহার পূর্ব্বক সঞ্চারণের নাম সমিতি। সংসার-গতির কারণ আশ্রব এবং মোক্ষলাভের কারণ সম্বর।

সম্বর

তপঃ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের নির্জ্জরণ বা ক্ষয় সাধনের নাম নির্জ্জরা। নির্জ্জরার প্রভাবে এই দেহ দ্বারাই চিরপ্রবৃত্ত পাপপুণ্য এবং সুখদুঃখের ক্ষয় সাধিত হয়। সংসারের বীজভূত কর্ম্মসকলকে নিঃশেষরূপে জরণ বা পরিপাক করে, এইজন্য ইহাকে নির্জ্জরা বলা হয়। নির্জ্জরা দ্বিবিধা,—কামাদি পাকজা এবং কর্ম্ম-নির্জ্জরা। কর্ম্ম স্বীয় ফলদান করিলে পর স্বভাবতঃই কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহার নাম "কাম পাকজা নির্জ্জরা।" আর তপস্যার বলে কর্ম্ম স্বয়ংই যখন মুক্তিলাভরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হয়, তখন সেই কর্ম্মকেই "কর্ম্ম-নির্জ্জরা" বলা যায়।

নির্জ্জরা

মিথ্যা দর্শনাদি বন্ধ-কারণের নিরোধ-হেতু অভিনব কর্ম্ম-প্রবাহের নিরোধ, এবং নির্জ্জরা দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, কর্ম্মবন্ধ হইতে যে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। মৃত্তিকালিপ্ত অলাবু (লাউ) জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু সেই অলাবু মৃত্তিকা হইতে মুক্ত হইলে পুনরায় জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। আত্মাও সেইরূপ কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত হইলে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনঙ্গত্ব ধর্ম্ম হেতু ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, কারণ অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধগতিই আত্মার স্বভাব।

মোক্ষ

আর্হতগণকে একপ্রকার সংশয়বাদী (Sceptic) অথবা অনির্ব্বাচ্যবাদী (Agnostic) বলা যায়। আর্হতগণ বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী, কারণ তাহারা বলেন, যদি কোন স্থায়ী আত্মা না থাকে, তবে লৌকিক কর্ম্মফল ভোগের নিয়ম বিফল হয়। একজন কর্ম্ম করে, আর একজন তাহার ফল ভোগ করে, এরূপ সম্ভব নয়। তাহা হইলেও আর্হত মতে বস্তুর স্বভাব সত্ত্ব কি অসত্ত্ব ঠিক্ বলা যায় না। এজন্য তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার মত প্রচলিত :—সৎবাদ, অসৎ-বাদ, সদসৎ-বাদ, এবং অনির্ব্বচনীয়-বাদ। এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার মত আছে, তাহা সদাসদাদি বাদ-চতুষ্টয়ের সহিত অনির্ব্বচনীয় বাদের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার তাহারা যখন কোন বস্তু আছে কি নাই বলেন—সেই সঙ্গে তাহারা "কথঞ্চিৎ" অর্থে 'স্যাৎ' বা 'ইয়ৎ' শব্দের যোগ করেন—কারণ তাহারা অনৈকান্তিকত্বের (non-absolutism) পক্ষপাতী,— যথা 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি। তাহাদের উপদেশ যে, যখন কোন বস্তু আছে বলিতে চাও, তখন বলিবে "কোন প্রকারে হয় ত আছে"—'স্যাদস্তি'। যখন কোন বস্তু নাই বলিতে চাও, তখন বলিবে "কোন প্রকারে হয় ত নাই"—'স্যান্নাস্তি'। স্যাৎ শব্দ এস্থলে অনৈকান্তত্বদ্যোতক অথবা কথঞ্চিৎ বোধক। ইহারই নাম 'স্যাদ্বাদ'। স্যাদ্বাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বথা 'একান্ত'-ত্যাগ। যখন কোন বস্তু সম্বন্ধে বাদী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে, সেই বস্তু কি আছে ? তখন হয় ত 'কোন প্রকারে আছে'—'স্যাদস্তি' এই উত্তর শ্রবণে সে লজ্জায় নীরব হয়। তাহাতেই স্যাদ্বাদীর জয় নিশ্চিত। অন্যান্য মতাবলম্বীর পক্ষ-প্রতিপক্ষ আছে, কিন্তু স্যাদ্বাদী অপক্ষপাতী, কারণ সকল প্রকার মতই তাহার নিকট সমান। এই স্যাদ্বাদকেই জৈনগণ সর্ব্বদা "সপ্তভঙ্গীনয়" নামে উল্লেখ করেন। একান্ততা ত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয় "সপ্তভঙ্গীনয়" তাহাই প্রদর্শন করে, যথা (১) 'স্যাদস্তি', 'হয় ত আছে',

সপ্তভঙ্গীনয় অথবা 'স্যাদ্বাদ'।

(২) 'স্যান্নাস্তি,' 'হয় ত নাই', (৩) 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ', 'হয় ত আছে অথচ নাই', (৪) 'স্যাদবক্তব্যং', 'হয় ত বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৫) 'স্যাদস্তি চাবক্তব্য', 'হয় ত আছে কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৬) 'স্যান্নাস্তি চাবক্তব্য', 'হয় ত নাই কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৭) 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্য', 'হয় ত আছে এবং নাই তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় না'। এই 'স্যাদ্বাদ' দুই প্রকার প্রমাণ মাত্র স্বীকার করে—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান।

জিন বা আর্হতই জৈনদিগের দেবতা এবং গুরু। তাহাদের মতে তিনি যথার্থ তত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা। বৌদ্ধদিগের যেমন বুদ্ধ, জৈন-দিগের পক্ষেও সেইরূপ জিন বা আর্হত। জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—(১) শ্বেতাম্বর, এবং (২) দিগম্বর।

আর্হত পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার।

আর্হত পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের যে বিচার হইয়াছিল, মাধবাচার্য্য তাহা এইরূপে বর্ণন করিতেছেন,—

আর্হত। জীব (বোধাত্মক), অজীব (জড়াত্মক), আশ্রব (ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম), শ্রিতবং (মিথ্যা বা অশুভ প্রবৃত্তি), সম্বর (শমদমাদি শুভ প্রবৃত্তি), নির্জর (পুণ্যাপুণ্য নাশের সাধন), বন্ধ এবং মোক্ষ এই সপ্ত প্রকার পদার্থ, এবং অস্তি-নাস্তি ইত্যাদি সপ্ত-ভঙ্গীনয় কেন স্বীকার কর না।

শঙ্কর। হে আর্হত, তোমাদের মানিত জীবাস্তিকায়ের স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা কর।

আর্হত। হে বিদ্বন্, জীবাস্তিকায় দেহেরই ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট এবং কর্ম্মাষ্টক দ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টিত।

শঙ্কর। জীব যদি দেহের সমান পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা বড়ও না হয়, ছোটও না হয়, তবে ত জীব ঘটাদিরই তুল্য। তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় জীবও নিত্য হইতে পারে না। আবার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন গজদেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে,

তখন সে সমগ্র গজদেহ কিরূপে অধিকার করিবে? অথবা যখন পতঙ্গদেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে, তখন সমগ্র জীব কিরূপে তাহাতে সমাবেশ লাভ করিবে?

আর্হত। জীব যখন কোন ক্ষুদ্রতর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে নূতন অবয়ব লাভ করে; এবং যখন কোন বৃহত্তর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন জীব তাহার অবয়বের কতক অংশ পরিত্যাগ করে। এইরূপে জীব যখন যে দেহ ধারণ করে, তখন তত্তৎ দেহের সহিত তাহার সমব্যাপ্তি হেতু জীব সেই সেই দেহের সমানই থাকে।

শঙ্কর। যদি শরীরের স্থায় জীবের পক্ষেও অবয়বের সমাগম এবং অপগম সম্ভব হয়, তবে শরীরাবয়বের জড়ত্বের স্থায় সেই সকল জীবাবয়বেরও জড়ত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত হয়। সেই সকল অনাত্মভূত অবয়ব কিরূপে জীবের মধ্যে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করিবে?

আর্হত। সেই সকল অবয়বও জন্ম বা ক্ষয় রহিত, কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও অপ্রকাশিত থাকে। হস্তী প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্তই প্রকাশিত হয়, আর পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্ত প্রকাশিত হয় না।

শঙ্কর। বল দেখি সেসকল অবয়ব চেতন কি অচেতন? যদি চেতন হয়, তবে যেহেতু অবয়ব সকল অনেক, এবং তাহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, অতএব সেইসকল চেতন অবয়বের পরস্পর বিরোধ হেতু শরীর উন্মথিত হইবে। আর যদি জীবাবয়ব সকল অচেতন হয়, তবে তাহাদের যোগে শরীরে চৈতন্যলাভ অসম্ভব। অচেতন অবয়বকে জীবাবয়বই বলা যাইতে পারে না।

আর্হত। হে বিদ্বন্, অনেক অশ্ব যেমন একমত হইয়া একটি রথ চালনা করে, সেই রূপে জীবাবয়বসকলও বিরোধরহিত হইয়া চৈতন্য-যোগ দ্বারা শরীর-চালনারূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করুক।

শঙ্কর। হে সুমতে, সারথিরূপে অশ্বসকলের উপরে একজন চালক থাকে বলিয়াই অনেক অশ্ব একমত হইয়া রথ-চালনা-কার্য্য নিষ্পন্ন করে। কিন্তু এস্থলে তোমাদের কল্পিত অবয়বসকলের উপরে সেরূপ কোন নিয়ামকের অভাব হেতু ঐকমত্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

আর্হত। হে যতিরাজ, জীবাবয়বের তাদৃশ উপগম অথবা অপগম নাইবা হইল। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। জলৌকা যেমন অবলীলাক্রমে কখনও সঙ্কুচিত এবং কখনও বা প্রসারিত হয়, জীবও সেইরূপ বৃহত্তর শরীরে প্রসারিত এবং ক্ষুদ্রতর শরীরে সঙ্কুচিত হয়।

শঙ্কর। জড়পদার্থের ন্যায় জীবের পক্ষে যদি আকুঞ্চন-প্রসারণাদি বিকার ভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে জীব ও ঘটাদি অপরাপর জড়বস্তুর ন্যায় নশ্বর হইবে। জীব নশ্বর হইলে কৃতের নাশ বা সদ্বস্তুর অসত্তা, এবং অকৃতের অভ্যাগম বা অসদ্বস্তুর সত্তা সম্ভব হয়। আবার এরূপ হইলে সংসার-সাগরে নিমগ্ন স্বকর্ম্মাষ্টকভারে পীড়িত জীবের পক্ষে জলমগ্ন অলাবুবৎ সতত উর্দ্ধগমনশীলতারূপ জীবের মোক্ষলাভবিষয়ক তোমাদের সিদ্ধান্ত সাধিত হয় না। হে আর্হত, তোমাদের কথিত সপ্তভঙ্গীনীতিরও আমরা আদর করি না। কারণ সৎ এবং অসৎ এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একাধারে যুগপৎ স্থিতি সম্ভব হয় না।

এইরূপে আর্হত বা জৈনগণ শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইলেন।

জৈন-দর্শন আমাদিগের নিকটে বৌদ্ধ-দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর অপরিচিত। অনেকের ধারণা যে, জৈন-দর্শন এবং ধর্ম্ম বৌদ্ধ-দর্শন এবং ধর্ম্মেরই শাখা বিশেষ। জৈনগণও বোধ হয় ভিন্ন সম্প্রদায়ীদিগকে তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার অধিকার এবং সুবিধা প্রদানে অনিচ্ছুক। যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, আস্ম-

জৈন দার্শনিক

তত্ত্বের অনুশীলনে এবং আত্মার বিকাশসাধন বিষয়ে জৈনগণ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে শঙ্কর জৈন দার্শনিকদিগের মতের এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন,—"স্রোতঃ-সন্তাননিত্যতান্যায়েনাত্মনো নিত্যতা স্যাৎ" (২-২-৩৫), 'নদী-প্রবাহের নিত্যতার ন্যায় আত্মার নিত্যতা' (compare Emerson's "No man can see the same thing twice") এই কথার ভিতরে আমরা বৈদান্তিকদিগের সোপাধিক এবং নিরোপাধিক (কূটস্থ) ভেদেরই কতক আভাস পাইতেছি। অধ্যাত্ম ধর্ম্মসাধনা বিষয়ে জৈনদিগের আদর্শ যে কত উচ্চ তাহা তাঁহাদের পদার্থ-বিচার* পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হয়। মোক্ষ সম্বন্ধেও জৈনমত প্লেটো (Plato) প্রভৃতি অতি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতেরই অনুরূপ। মোক্ষবিষয়ক জৈনমত শঙ্কর এইরূপ বর্ণন করিতেছেন,—"কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসার-সাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ উর্দ্ধগামিত্বং ভবতি"— (২-২-৩৫)। (জ্ঞানাবরণীয়াদি) কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিত সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের মৃত্তিকাদ্বারা উপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃত্তিকার অপগমে উর্দ্ধারোহণের ন্যায়, কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদে জীবের উর্দ্ধগতি লাভ হয়। প্লেটো আত্মার উর্দ্ধগমনশীলত্ব পক্ষীর উপমা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, জৈন

---

* আস্রব-সম্বর-নির্জ্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণা। তত্র মিথ্যা প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। সম্যক্ প্রবৃত্তিস্তু সম্বরনির্জ্জরৌ। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। অন্যে তু কর্ম্মাণ্যাস্রবমাহুঃ। সেয়ং মিথ্যা প্রবৃত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ। শমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ। নির্জ্জরস্তনাদি কাল প্রবৃত্তি কষায় কলুষ পুণ্যাপুণ্য প্রহানহেতুঃ বন্ধো ? ষটবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং। জ্ঞানাবরণীয়ং, দর্শনাবরণীয়ং, মোহনীয়মন্তরায়ং। উর্দ্ধগমনশীলো হি জীবো ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকা যেন বদ্ধস্তদ্বিমোক্ষাৎ যদূর্দ্ধং গচ্ছত্যেব স মোক্ষঃ"। ভামতী ২-২-৩৫৪।

স্যাদিত্যব্যয়ং তিঙন্ত প্রতিরূপকং কথঞ্চিদর্থকং" রত্নপ্রভা।

দার্শনিক তাহাই মৃত্তুপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃদপগমে উর্দ্ধারোহণের উপমা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

শঙ্করাচার্য্য নিজে তাহার সূত্রভাষ্যে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদও এস্থলে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শঙ্কর জৈন দার্শনিকদিগের প্রতি কতদূর সুবিচার করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। শঙ্কর বলিতেছেন,—"দিগম্বর" বা জৈনমতে

সূত্রভাষ্যে শঙ্করের কৃত জৈনমত খণ্ডন।

সাতটি পদার্থ,—জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, এবং মোক্ষ। সংক্ষেপে দুইটি পদার্থও বলা হয়,—জীব (ভোক্তা) এবং অজীব (ভোগ্য), কারণ যথাসম্ভব অন্যসকল এই দুইয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন তাহারা আবার পঞ্চ অস্তিকায় নামক প্রপঞ্চেরও বর্ণন করেন:—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় এবং আকাশাস্তিকায়। তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত এসকলেরও আরও অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ তাঁহারা স্বীকার করেন। আবার তাঁহারা সর্ব্বত্র এই সপ্তভঙ্গীনয় নামক ন্যায়েরও অবতারণা করেন:—(১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, (৪) স্যাদবক্তব্যঃ, (৫) স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদাস্তিচনাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। একত্ব, নিত্যত্বাদি বিষয়েও তাহারা এই সপ্তভঙ্গীনয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা, স্যাদেকঃ, স্যাদনেকঃ, স্যান্নিত্যঃ, স্যাদনিত্যঃ ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে এরূপ মত সঙ্গত নয়। কেন? কারণ একই পদার্থে তাহা অসম্ভব। একই ধর্ম্মীর মধ্যে শীতোষ্ণের যুগপৎ সমাবেশের ন্যায় সদসত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব। আর তাহাদের যে সপ্ত পদার্থ তাহা যে সংখ্যক এবং যেরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত তাহা কি সেরূপই অথবা সেরূপ নয়? যদি নিশ্চয় করিয়া তাহা না বলা যায়, এবং তাহা যদি এরূপও হইতে পারে, এরূপ নাও হইতে পারে, তাহা হইলে

সংশয়ের ন্যায় এরূপ অনির্দ্ধারিত জ্ঞান প্রমাণের অযোগ্য। যদি বল যে বস্তু অনেকাত্মক হওয়াতে, যে জ্ঞান নির্দ্ধারিত আকারে উৎপন্ন হয় তাহা সংশয় জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ হইতে পারে না। আমরা বলিতেছি, তাহা নয়। যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ অনেকান্তত্ব বা অনিশ্চয়তা স্বীকার করেন, বস্তুত্বাবিশেষত্ব হেতু তাঁহাদের সেই নির্দ্ধারণও স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি ইত্যাদি বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে তাহাও অনির্দ্ধারণাত্মক বা সংশয়যুক্ত হইবে। এরূপ নির্দ্ধারণ-কর্ত্তার নির্দ্ধারণের ফল স্যাৎপক্ষে অস্তিতা এবং অস্যাৎপক্ষে নাস্তিতা হইবে। এরূপ হওয়াতে যখন সেই তীর্থঙ্করের প্রমাণ, প্রমেয়-প্রমাতৃ-প্রমিতি সকলই অনির্দ্ধারিত, তখন তিনি প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য উপদেশ করিবেন কিরূপে? আর যাঁহারা সেই তীর্থঙ্করের উপদেশ অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই বা সেই অনির্দ্ধারিত-স্বরূপ উপদিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন কিরূপে? ফল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইলেই তাহার সাধনের অনুষ্ঠানে লোকসকল অনাকুলচিত্তে প্রবৃত্ত হয়, নতুবা হয় না। অতএব অনির্দ্ধারিতার্থক শাস্ত্র প্রণয়ন করাতে সেই তীর্থঙ্করদিগের বচন মত্ত বা উন্মত্তের বচনের ন্যায় গ্রহণের অযোগ্য। আর অস্তিকায়-পঞ্চকের পঞ্চত্ব সংখ্যা "অস্তিবা নাস্তিবা" এই পরস্পর বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে এক (বা স্যাৎ) পক্ষে হইতে পারে, এবং পক্ষান্তরে (বা নস্যাৎ পক্ষে) নাও হইতে পারে, তদ্দ্বারা সংখ্যার ন্যূনাধিক্যও সম্ভব হইতেছে। আর পদার্থসকলের অবক্তব্যত্ব বিষয়ে তাহাদের মত সম্ভব নয়। কারণ যদি প্রকৃতপক্ষে অবক্তব্যই হইত, তবে তীর্থঙ্করেরাও সেই সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। উক্ত হইতেছে, অথচ বলা হইতেছে অবক্তব্য! উক্ত হইতেছে, অতএব অবধারিত। অথচ বলা হইতেছে অবধারিত নয়! এসকল বিরুদ্ধ বাক্য প্রলাপতুল্য! তাহাদের অবধারণের ফল সম্যক্‌দর্শনও আবার "অস্তি বা নাস্তি বা", এবং তদ্বিপরীত অসম্যক্‌ দর্শনও "অস্তি বা নাস্তি বা!" এরূপ প্রলাপ মত্ত বা উন্মত্তের পক্ষেই শোভা পায়, বিশ্বাস-উৎপাদনেচ্ছু

উপদেষ্টার পক্ষে নয়। স্বর্গ এবং অপবর্গ সম্বন্ধেও এক দিকে ভাব, অন্যদিকে অভাব; এক দিকে নিত্যতা, অন্যদিকে অনিত্যতা, অবধারণের অভাব হেতু তৎপ্রতি লোকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। আবার অনাদিসিদ্ধ জীব প্রভৃতিরও স্বভাব তাহাদের শাস্ত্রে যেরূপ অবধারিত হইয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রমতেই সেই অবধারিত স্বভাবের বিপরীতও হইতে পারে। জীবাদি পদার্থের সম্বন্ধেও দেখা যায়—একই ধর্ম্মীর মধ্যে সত্ব এবং অসত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, অর্থাৎ সত্বরূপ এক ধর্ম্ম থাকিলে অসত্বরূপ অপরধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, এবং অসত্ব-রূপ ধর্ম্ম থাকিলে সত্বরূপ ধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, এই আর্হত মত অসঙ্গত। ২-২ ৩৩।

আবার পরের সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন,—"একই ধর্ম্মীর মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অসম্ভব" (Law of contradiction) ইহা যেরূপ স্যাদ্বা-দের একটি দোষ, সেইরূপ "জীবাত্মার অকার্ৎস্ন্য"ও আর একটি দোষ। সে কি? আর্হতেরা বলেন যে "জীব শরীর-পরিমাণ" "শরীরপরিমাণোহি জীবঃ"—আত্মা যদি শরীর পরিমাণ হয়, তবে তাহা অকৃৎস্ন বা অসর্ব্বগত এবং পরিচ্ছিন্ন, অতএব ঘটাদির ন্যায় আত্মাও অনিত্য হওয়াই সম্ভব। আর শরীর-পরিমাণের স্থিরতা না থাকাতে মনুষ্য-জীব যখন মনুষ্য-শরীর-পরিমাণ হইয়া পুনরায় কোন কর্ম্মবিপাকে হস্তীজন্ম লাভ করে, তখন তাহা সমস্ত হস্তী-শরীরব্যাপী হইবে না। আবার সেই জীব যখন পতঙ্গজন্ম লাভ করে, তখন সমস্ত পতঙ্গদেহে সেই জীবের সমাবেশ হইবে না। একই জন্মেও কৌমার, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যের ভেদে এই দোষ সমানই। (যদি বল) তাহা হয় হউক। কিন্তু জীবাবয়ব অনন্ত, এবং ক্ষুদ্র শরীরে সেই অনন্ত অবয়ব সঙ্কুচিত এবং বৃহত্তর শরীরে তাহা প্রসারিত হয়।* তাহা হইলেও বলা আবশ্যক সেই অনন্ত

---

* টীকাকার দীপাবয়বের দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—"যথা দীপাবয়বানাং ঘটে সংকোচো গেহে বিকাশস্তথা জীবাবয়বানাং"।

জীবাবয়বের কল্পনা সমান-দেশত্বের কল্পনা দ্বারা ব্যাহত হয় কি হয় না? যদি বল যে ব্যাহত হয়, তবে পরিচ্ছিন্ন দেশে অনন্ত অবয়বের সমাবেশ হইতে পারে না। যদি বল যে ব্যাহত হয় না, তবে যেহেতু একই অবয়ব সেই পরিচ্ছিন্ন স্থান পূর্ণ করিতে পারে তখন সেই পরিচ্ছিন্ন স্থানে অনন্ত অবয়বের প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে জীবকে অণুমাত্রই বলিতে হয়। আবার জীবাবয়ব সকল শরীর-মাত্র-পরিচ্ছিন্ন (অতএব পরিমিত) হওয়াতে, তাহাদের অনন্তত্বের কল্পনাও অসঙ্গত।" ২-২-৩৪।

পরের সূত্রে শঙ্কর আবার বলিতেছেন :—"আবার পর্য্যায়ক্রমে হস্ত্যাদি বৃহৎ শরীর লাভে জীবায়ব উপগত হয় আর পুত্তিকাদি ক্ষুদ্র শরীর-লাভে জীবাবয়ব অপগত হয়—এই মতের বিরুদ্ধে বলা যাইতেছে,—পর্য্যায়ক্রমে অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারাও জীবের দেহ-পরিমাণত্ব মত অব্যাহত ভাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। কেন? কারণ তাহা হইলে আত্মা সম্বন্ধে বিকারাদি দোষের অনুমান সিদ্ধ হয়। অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারা দিবানিশি আপূর্য্যমাণ এবং অপক্ষীয়মান হইলে জীবের বিক্রিয়াবত্ত্ব অপরিহার্য্য। বিক্রিয়াবত্ত্ব স্বীকার করিতে গেলে চর্ম্মাদির ন্যায় জীবের অনিত্যত্বের আশঙ্কা অপরিহার্য্য। তাহা হইলে (জৈনদিগের) বন্ধমোক্ষের মত, যথা,—কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিত হইয়া (মৃত্তিকালিপ্ত) অলাবুবৎ সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের সেই কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ হইলে, ঊর্দ্ধগামিত্ব লাভ হওয়া, বাধিত হয়। আর কি? উপগত এবং অপগত অবয়ব সকলের উপগম এবং অপগম ধর্ম্মবত্ত্বহেতু শরীরাদির ন্যায় তাহাদেরও অনাত্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। আত্মার অবয়ব সকলের এরূপ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে, কোন অপরিবর্ত্তিত নিয়ত-অবস্থিত অবয়ব-বিশেষই আত্মা হইবে, অথচ এইটিই সেই বলিয়া তাহার নিরূপণ করাও অসাধ্য। আর কি? যে জীবাবয়ব সকল আসিতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে, আর যেসকল অবয়ব চলিয়া যাইতেছে

তাহারাই বা কোথায় চলিয়া যাইতেছে ? তাহাও বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু জীব অভৌতিক, অতএব ভূতসকল হইতে জীবাবয়ব প্রাদুর্ভূত হয় এবং ভূতসকলেই বিলীন হয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন সাধারণ অথবা অসাধারণ জীবাবয়বের আধারও নিরূপণ করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণাভাব। আর কি ? আর এরূপ হইলে আত্মার পরিমাণ এবং স্বরূপ অনবধারিতই থাকিতেছে। কারণ যেসকল অবয়ব আসিতেছে এবং যাইতেছে তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। উল্লিখিত দোষ হেতু পর্য্যায়ক্রমে আত্মার অবয়বের উপগম এবং অপগমের মত গ্রহণ করা যায় না। আবার যদি বলি পর্য্যায়ক্রমে পরিমাণের অনবস্থা সত্ত্বেও স্রোতঃসন্তান বা জলপ্রবাহের নিত্যত্বের ন্যায় আত্মারও নিত্যতা হইতে পারে। রক্তপট বা বৌদ্ধদিগের মতে বিজ্ঞানের অনবস্থা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসন্তান বা বিজ্ঞান-প্রবাহের নিত্যতার মতের ন্যায় দিগম্বর (জৈন) দিগেরও আত্মার নিত্যতা মত স্রোতঃসন্তান নিত্যতার ন্যায় হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া উত্তর করা যাইতেছে :—সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি অবস্তু হয়, তবে (বৌদ্ধদিগের) নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদই দাঁড়ায় (যাহা জৈনগণ স্বীকার করেন না)। সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি বস্তু হয়, তবে (তাহা সন্তানী দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলে কূটস্থবাদ, এবং সন্তানী হইতে অভিন্ন হইলে) আত্মার অনিত্যত্ব এবং জন্মাদি বিকার দোষপ্রসঙ্গ, অতএব সন্তানাত্মপক্ষও তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত।" ২- -৩৬।

শঙ্কর আবার বলিতেছেন,—"আবার জৈনেরা মোক্ষবস্থাগত জীবের অন্ত্য পরিমাণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাহা হইলে সেই অন্ত্য পরিমাণের ন্যায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আদ্য মধ্যম জীব-পরিমাণেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। এবং এই পরিমাণ ত্রয়ের মধ্যে কোনও প্রকার ইতর বিশেষ থাকে না। তাহা হইলে জীবের এক নিত্য শরীর-পরিমাণতাই স্বীকার করিতে হয়, বর্দ্ধিত অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত শরী-

রান্তরপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না। অথবা অন্ত্য জীব-পরিমাণের অবস্থিতত্ব বা নিত্যত্ব হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী আদি এবং মধ্য অবস্থাদ্বয়েও জীবের পরিমাণ অবস্থিত বা নিত্যই হইবে। অতএব জীবকে নির্ব্বিশেষ ভাবে সর্ব্বদাই অণু অথবা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কারণে জীবের শরীর-পরিমাণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্র ২-২-৩৩ হইতে ৩৬।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বৈশাখী

যমুনার কালো জলে গাগরী ভাসিয়া যায়,
অঞ্চল লুটিছে নীরে সাঁঝের চঞ্চল বায়।
দূরে ডুবু' ডুবু' রবি, ধরার কনক-ছবি
মুছিয়া যেতেছে ধীরে মলিন আঁধার ছায়,—
কি ভাবে বিভোরা বালা কিছু না দেখিতে পায়!

২

কদম্বের শ্বেত রেণু কিশোরীর কালো কেশে
সুগন্ধ-পশরা নিয়ে উড়িয়া পড়িছে এসে'।
লুকায়ে কদম্ব-শাখে পিক্ কুহু কুহু ডাকে,
একে একে তারাগুলি চাহিছে মধুর হেসে,'—
কিছু না দেখিছে, হিয়া কোথায় গিয়াছে ভেসে'!

৩

দেখিতে দেখিতে ক্রমে আঁধার ঘনায়ে আসে,
গগনে নীরদমালা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ভাসে;
ক্রমে পড়ে বারিধার, সারা অঙ্গ ভিজে তার,—
তবু না চেতনা ফিরে বালার শরীর-বাসে,
না জানি পরাণ বাঁধা কি গভীর প্রেম-পাশে!

৪

পিছু হ'তে আসি বঁধু সহসা বাঁধিল বুকে,
তবু না চেতনা ফিরে, তবু নাহি কথা মুখে!
অমর পিরীতি তার না রহে যে দেহে ছার,
কেমনে ফিরিবে আর পরাণ পরশ-সুখে?
নেহারো চরণ ধরি' বঁধুয়া কাঁদিছে দুখে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ভাষার কথা

কিরূপ ভাষায় বাঙ্গলা সাহিত্য রচনা করিতে হইবে—ইহা লইয়া আজকাল মহা তর্কবিতর্ক চলিতেছে। দুই পক্ষের বড় বড় মহারথীগণ শরজাল-বর্ষণে রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। দর্শকস্বরূপ আমরা নিরীহ পাঠক বেচারারা হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু নিরীহ পাঠক সম্প্রদায় যে এই ব্যাপারের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক শূন্য তাহা নহে। যুদ্ধে যাহারা যোগ দেয় না, সেই নির্লিপ্ত সাধারণ লোকদেরও যেমন যুদ্ধের পরিণামের সঙ্গে স্বার্থসম্বন্ধ আছে, বাঙ্গালী পাঠকদেরও তেমনই এই ভাষা-যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই পাঠকদের পক্ষ হইতে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই রচনা করিতে হইবে,—সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজি বা হিব্রুতে নহে; এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারো মতদ্বৈধ নাই। বাঙ্গলা ভাষার একটা নিজস্ব গতি, প্রকৃতি এবং চেহারা আছে। বাঙ্গলা সাহিত্য তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবে;—কাহারো কাছে ধার করিয়া বড়মানুষী করিবে না। গরিবের ছেলের নিজস্ব গরিবানা পোষাকটি সামান্য হইলেও, তাহাতেই তাহার আত্মসম্মান বজায় থাকে; আর ভিক্ষালব্ধ রাজবেশের জাঁকজমক তাহার দীনতাকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলে। তাই মদনমোহনী, অক্ষয়কুমারী বা বিদ্যাসাগরী ভাষা সংস্কৃতের নিকট ধার করিয়া যে কৃত্রিম ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আমরা নিজস্ব বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। বঙ্কিম যখন খাঁটী বাঙ্গলা মায়ের জিনিসটি দেখাইয়া দিলেন, তখনই আমরা আনন্দে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু এখনকার তর্কটা এদিক্‌কার নহে। এখনকার তর্কটা হইতেছে প্রধানতঃ কথিত ও লিখিত ভাষা লইয়া। একদল লেখক বলিতেছেন, যে, তোমরা যে লিখিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতেছ, সে ভাষাটা নিতান্ত প্রাণহীন, কৃত্রিম, পোষাকী ভাষা। উহাতে সাহিত্য রচিত হইলে সে সাহিত্য প্রাণের জিনিস হইবে না—প্রাণহীন, সুদৃশ্য মর্ম্মরমূর্ত্তি হইয়া উঠিবে। সাধারণতঃ দৈনিক জীবনে মানুষে যে কথাবার্ত্তা বলে, তাহাই হইতেছে প্রাণের ভাষা। আর সাহিত্যে দেশের প্রাণের নাড়ীর সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে এই ভাষাতে সাহিত্য রচনা করিতে হইবে।

কথাটা শুনিয়া বোধ হয় যে যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যেন সমগ্র বাঙ্গলাদেশের লোকেরা একই রকম কথিত ভাষা ব্যবহার করে। সকলেই জানেন যে ঘটনাটা মোটেই তাহা নহে। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে নানা বিচিত্র কথ্যভাষা চলিত আছে। চট্টগ্রামী কথা ও রাঢ়ী কথা এক নহে; আবার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কথাও এক-রূপ নহে; এমন কি কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরের কথাও বিভিন্ন রকমের। আর এটা কেবল বাঙ্গলাদেশেরই বৈশিষ্ট নহে। পৃথিবীর সকল বৃহৎ দেশেই, বিভিন্ন প্রদেশের কথ্যভাষা ভিন্নরূপ। ইংলণ্ডেরও উত্তর ও দক্ষিণের ভাষা একরকম নহে। ফ্রান্সেও তদ্রূপ।

এখন যদি কথিত ভাষাই সাহিত্যে চালাইতে হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন প্রদেশের কথ্যভাষা চালাইতে হইবে? সক-লেরই নিকট নিজের নিজের কথ্যভাষা প্রিয়। সুতরাং শ্রীহট্ট বলি-বেন, আমার কথাটা চলুক; ঢাকা বলিবেন, আমার কথাই ভাল; আবার কলিকাতা বাঁকিয়া বলিবেন যে, আমি যখন রাজধানী, তখন আমারই দাবী বেশী। ভোট লইয়া যে এরূপ বিষয়ের সুমীমাংসা হইবে তাহাও সম্ভব নয়। সুতরাং সকল প্রদেশের লোকেই যদি নিজ নিজ কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে থাকেন, তবে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা একটু কল্পনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

এরূপ ক্ষেত্রে নানা বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যে "প্রাণ" জিনিসটা জাগিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্যময় যে তখন কতকগুলি "প্রাণ"-রূপ ভূত মিলিয়া প্রাণান্তকর দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিয়া তুলিবে, তাহা বোধ করি আর খুলিয়া বলিতে হইবে না।

আসল কথা এই যে, কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা, অথবা হাল ফ্যাসানের কথায় আটপৌরে ও পোষাকী ভাষায় অল্পবিস্তর সকল দেশের সাহিত্যেই একটু প্রভেদ থাকে। সাহিত্যটা কাহারো ঘরোয়া জিনিস নহে—ইহা সাধারণের সম্পত্তি। কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় না, একাও উপভোগ করা যায় না। দশজনের জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, দশজনে মিলিয়াই ইহার আনন্দ উপভোগ করিতে হয়। আর যে কাজটায় সাধারণ দশজনের সম্পর্ক, সেটা দশজনের মনের মতন করিয়াই করিতে হয়, নহিলে তাহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। সকল কাজই নিজের রুচিমত করা যায় না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিজের ঘরের ভিতর নগ্নদেহে বসিয়া থাকিবার সকলেরই আমাদের বিধিদত্ত অধিকার আছে; কিন্তু তাই বলিয়া সভাসমিতিতে দশজনের সঙ্গে যখন মেলামেশা করিতে হয়, তখন একটু ভদ্রবেশেই বাহির হইতে হয়। নিজের ঘরে নিজে রোজই দগ্ধকচু খাইতে পারি, কাহারও তাহাতে কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু দুই দশজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিলে, গৃহলক্ষ্মীর একটু কষ্টস্বীকার করিতেই হইবে। বৈঠকখানায় বসিয়া নানা অসংলগ্ন বাজে কথা বলা যায়; কিন্তু সাধারণের কাছে কোন একটা কথা নিবেদন করিতে হইলে, একটু সাজাইয়া গুছাইয়া না বলিলে চলিবে না। ইহাতে "প্রাণের" অভাব প্রকাশ পায় না—কৃত্রিমতাও ব্যক্ত হয় না। দশজনের সঙ্গে প্রাণের যোগ, রসের যোগ রাখিতে হইলে, এইরূপই করিতে হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতার বা ঢাকার আটপৌরে ভাষায় রচনা করিলে চলিবে না।

তাহাকে সমগ্র বাঙ্গালীর সেব্য ও উপভোগ্য সার্ব্বজনীন বাঙ্গলা ভাষাতেই আকার দিতে হইবে। এখনকার লিখিত ভাষাই সেই সার্ব্বজনীন ভাষা। তা সে ভাষাকে পোষাকীই বল', আর কৃত্রিমই বল'। সাহিত্য "প্রাণ", আর ভাষা "দেহ"। প্রাণের পূর্ণপ্রকাশ করিতে হইলে দেহকে নীরোগ, সবল ও সুস্থ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার এমন একটা অদ্ভুত গঠন দিতে হইবে যে, তাহা সকলের অবোধ্য একটা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস হইয়া দাঁড়াইবে ইহা স্বীকার করিতে পারি না। সকল মানুষেরই রুচি প্রবৃত্তি অনুসারে নানারূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছু কিছু সঙ্কোচের দরকার। সাহিত্যেরও তেমনিই একটা সমাজ আছে। এখানেও সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারই চলিতে পারে না; এখানে স্থান পাইতে হইলেও কিছু কিছু সংযম অভ্যাসের প্রয়োজন।

বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিস—আদরের জিনিস। ইহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা—তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে হইবে। ইহারই সাহায্যে তাহার শিক্ষা দীক্ষা সাধনার চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে হইবে। ইহাই তাহার জাতীয়তার ভিত্তি—ঐক্যের বন্ধন—মুক্তির সোপান। আজিকালিকার সঙ্কট সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তিতে দলাদলির খেয়ালে বা দম্ভের আনন্দে ভাগবাঁটোয়ারার বহাল করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সুমহৎ জাতীয় অমঙ্গলেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত যত প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই সার্ব্বজনীন ভাষা ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন নাই। কিন্তু—কার "ভিন্ন গোঠ" সেকথা দীনবন্ধু মিত্র বহুপূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি

আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে কীট ও পতঙ্গাদির প্রকৃতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার উৎসাহ তেমন নাই। বোধ করি সেইজন্যই কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে হইলেই আমাদিগকে ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যগ্রহণ করিতে হয়। কোন ভারতীয় গ্রন্থে কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে তেমন কোন মৌলিক আলোচনা নাই। দুই একটি গ্রন্থ যাহা খোঁজ করিলে পাওয়া যায়, সেগুলিও আবার স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণের ফল নয়—নিছক অনুবাদ। বহু দিন হইতে ইউরোপে কীট ও পতঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়াতে, ইউরোপীয় কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ কীট সম্বন্ধে বিস্তর নূতনজীবতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। বিলাতে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা বিদ্যালয়ের ছেলেদের একটা খেলার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আমরা বিলাতী অনেক বিষয়েরই অনুকরণ করিয়া থাকি; এই অনুকরণের যুগে আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে এই প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণটার অনুকরণ করিলে বোধ হয়, আমাদের বিস্তর উপকার ও উন্নতি হইতে পারে। অনুকরণটাকে আমরা অনেক রকমে অনেক দিক দিয়া রীতিমত আয়ত্ত করিতেছি; কিন্তু যেদিক দিয়া করিলে অনুকরণটা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতাকে ফুটাইয়া না তুলিয়া পক্ষান্তরে তাহার বিপরীত ভাব জাগাইয়া তোলে, সেদিক্ দিয়া অনুকরণ-অভ্যাসটাকে আমরা এখনও তেমন ভাবে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করি নাই। ভাল বিষয় অনুকরণ করিতে গেলেই প্রথমে সফলতার পরিবর্ত্তে আমরা বিফলতার মূর্ত্তিই দেখি। কিন্তু সেইজন্য যদি নিরুদ্যম না হইয়া বরং নব উদ্যমের সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকি, অবশ্যই একদিন না একদিন সম্পূর্ণ সফলতালাভ করিতে পারিব। এই সত্য বহুক্ষেত্রে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। কোন ইংরাজি গ্রন্থের সহায়তা না লইয়াই আমরা সম্প্রতি কীটপতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। সুতরাং আমাদের পর্য্য-

বেক্ষণের মাঝখানে অনেক রকমের নূতনত্ব থাকিতে পারে। হয় ত সেগুলি কতকাংশে ঠিক, কতকাংশে ভুল। কিন্তু তাহা অনিবার্য্য। দেশের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বাদপ্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে আমরা ইউরোপীয় কীটতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছাকাছি পৌঁছাইতে পারিব। কীট ও পতঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলে লাভ যে আছে তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। একদল লোক কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার পরিচয় দিতে পারিবেন। অন্য দল, ইহাদের এই জীবন রহস্যকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্ফুটতর করিয়া তুলিতে পারিবেন। আমাদের দেশে সম্প্রতি কয়েকজন ব্যক্তি এই কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দেব মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মহিন্তা মহাশয় মাঝে মাঝে 'প্রবাসীতে' কীট ও পতঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন। নির্ম্মলবাবুর একটি মৌলিক প্রবন্ধ বিগত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। দেবেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুবাদ হইলেও, তাহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নির্ম্মলবাবুর নিকট হইতে আমরা ঐ শ্রেণীর আরও মৌলিক প্রবন্ধ পাইবার আশা রাখি।

আমরা যে শ্রেণীর পর্য্যবেক্ষণ-ফল বাহির করিয়া থাকি, তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ নয়, কিন্তু কীট ও পতঙ্গ-জীবনের বাহ্য পরিচয়ের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এইরূপ ভাবে কীটপতঙ্গের সহিত পরিচিত হইবার আবশ্যকতা যে নাই তাহাও নহে। যাহা হউক আমাদের পর্য্যবেক্ষণপদ্ধতি অত্যন্ত সাধারণ রকমের হইলেও, তাহার আবশ্যক আছে। নিম্নে আমাদের বিশেষ পরিচিত কীট, যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গে বিছা ও পশ্চিমবঙ্গে শুঁয়োপোকা বলা হয়, তাহার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শুঁয়োপোকার সহিত আমাদের যে পরিচয় ঘটিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ জ্বালা এবং দুঃখের মধ্য দিয়া হয় বলিয়া তাহার জীবনের সহিত অধিক গভীর ভাবে পরিচিত হইবার ইচ্ছা আমাদের হয় না।

আমাদের বাড়ীর মা মাসী, কিম্বা ছোট বোন এবং দিদিরা এই পোকার প্রধান শত্রু—(যদিও বন্য জগতে কীটপতঙ্গের প্রধান শত্রু পক্ষী)—তাঁহারা শুঁয়োপোকা দেখিলেই উনানের গরম ছাই হাতায় আনিয়া বেচারির সমাধি দিয়া থাকেন। ফলে তাহার ভব-যন্ত্রণার সুদীর্ঘ মেয়াদ, অল্পক্ষণ-ব্যাপী সুতীব্র অগ্নি-জ্বালাতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা এইরূপে শুঁয়োপোকাদের জীবনের যথার্থ আয়ুর মাঝখানে মৃত্যু-বজ্র নিক্ষেপ করি বলিয়া তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ অংশটুকু চক্ষে দেখি না।

বেশী দিনের কথা নয়, বছর দুইএক পূর্ব্বে, কালীঘাটে আমার কোন আত্মীয়ের বাসায় অবস্থানকালে একদিন প্রাতে গৃহাঙ্গণে একটি শুঁয়োপোকার দেখা পাই। আমি তাহাকে বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছি লক্ষ্য করিয়া একজন প্রবীণা আত্মীয়া আমায় দূর হইতে বলিলেন, "মেরে ফেল, মেরে ফেল, ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে লাগ্‌লেই গা জ্বালা কর্‌বে।" তাঁহার হাতে সে সময় কাজ না থাকিলে হয় ত বা তিনি তৎক্ষণাৎ পোকাটির দফা শেষ করিয়া দিতেন।

আমি গৃহকর্ত্রীর সদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া একটি দিয়াসেলাইর বাক্সের মধ্যে অতীব যত্নসহকারে, তাহাকে আটক করিলাম। আটক করিতে যাইয়া যে যত্ন এবং যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা যে কেবল পোকাকে নিরাপদ করিবার জন্য তাহা নহে, নিজের শরীরকেই বেশীর ভাগ নিরাপদ করা আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

দুই দিন অতীত হইলে দেখিলাম শুঁয়োপোকা লোপ হইয়া বাক্সের মধ্যে একটি ছোট পুত্তলী পড়িয়া আছে। এই পুত্তলীকে ইংরাজিতে pupa বলে। অষ্টম দিনের দিন এই পুত্তলী দীর্ণ করিয়া একটি ছোট প্রজাপতি বাহিরে আসিল।

ঐ ঘটনার পর আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত বহু শ্রেণীর শুঁয়োপোকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। সব শুঁয়োপোকার বিষয় এ

প্রবন্ধে সব কথা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্ত্তমান পোকার জীবন-ইতিহাসের পরিচয়ই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সাধারণতঃ বর্ষার সময় এই বিষাক্ত শুঁয়োপোকার প্রাতুর্ভাব হয়। গ্রামের বাড়ীর চারিধার অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে বলিয়া ঘরের মেজেতে, দেওয়ালে ও অন্যান্য জায়গায় পোকাগুলি আসিয়া পড়ে। ঐ সময় ইহারা খড়খড়ে শুখ্‌নো মাটির সন্ধান করে। পাখী প্রভৃতি পক্ষবিশিষ্ট জীব ইহাদের প্রধান শত্রু। শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য বিধাতা ইহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব শক্তি দিয়াছেন। সেটি অনুকরণ-শক্তি। ইহারা ধূসর মাটির বর্ণকে অনুকরণ করে বলিয়া পাখী সহজে আর ইহাদের ধরিতে পারে না। তার পর ঐ বিষাক্ত শুঁয়োগুলোও ইহার আত্মরক্ষার একটা প্রধান অস্ত্র।

কচি ঘাস ও অন্যান্য কোমল পাতালতাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু ইহারা যখন কীট জীবনের বার্দ্ধক্যে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর কিছু খায় না; চলা ফেরা বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধ এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর (sensitive) হইয়া বসিয়া থাকে। ইংরাজিতে এই সবিরাম অবস্থাকে pupal crysalis stage বলে।

এই সময় ইহারা সুকৌশলে স্বীয় অঙ্গের শুঁয়োপূর্ণ চর্ম্মাবরণকে নিজের শরীর হইতে ছাড়াইয়া আপনার কোমল দেহের চারিদিকে গুটাইয়া একটি ছোট দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ঐ দুর্গমধ্যে কীটটি অত্যন্ত কামল বোল্‌তার টোপের মত অনেকক্ষণ থাকিয়া অবশেষে বাদামী বর্ণের পুত্তলীতে পরিণত হয়। পুত্তলীর আবরণ বেশ শক্ত। পুত্তলীর রক্ষার জন্য দুর্গটি নির্ম্মিত না হইলে পিঁপ্‌ড়ে জাতীয় জীব পুত্তলীকে নষ্ট করিয়া নিজেদের উদর পূজার আয়োজন করিত। এ ছাড়া অতিরিক্ত বৃষ্টি আর আলোর অত্যাচারও ঐটুকু পুত্তলীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইত।

এই পুত্তলীর আকারে আট দিন * পর্য্যন্ত থাকিয়া নবম দিনে পোকাটি ধূসর বর্ণের একটি প্রজাপতির রূপ ধরিয়া পুত্তলী দীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে। এই শ্রেণীর প্রজাপতি নিশাচর। দিনের বেলায় ইহাদের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

* সময় সময় দশদিন পর্য্যন্তও পোকা পুত্তলীর অভ্যন্তরে থাকে, তবে সাধারণতঃ নবম দিনেই প্রজাপতি পুত্তলী দীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে।

মির্জা হোসেন আলী

[বৰ্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত]

এই মহাসভায় বাঙ্গলার সমস্ত বিদ্বজ্জন সম্মুখে আজ যে মহাত্মার পূত-চরিত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক, ভক্ত ও কবি-প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে তাঁহার নাম ও পরিচয় অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর নিকটই অজ্ঞাত। যদি কোন দিন ভগবদনুগ্রহে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী আলোচিত ও প্রকাশিত হয়, তবে সকলেই দেখিতে পাইবেন, কিরূপ একটি অমূল্য রত্ন এতদিন লোকচক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে জীবিত ও মৃত সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যিকের কথাই যথাযথ আলোচিত হইবার প্রথা ও সুযোগ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্ববঙ্গের অনেক উদীয়মান নব্য লেখকের ন্যায় কত মৃত ভক্ত সাধক ও কবির কাহিনী যে সাধারণের অপরিজ্ঞাত ও লোকচক্ষুর অগোচরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে? পূর্ব্ববঙ্গে আজ জীবিতের যে দশা, মৃতেরও সেই দশা। সকলেই,

"সমাজের প্রান্তভাগে তাপিত অন্তরে জাগে
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?"

মনের আবেগে দুইটা কথা বলিয়া ফেলিলাম, আর বাজে কথা বলিয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য যে মহাত্মার কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার নাম (মির্জা হোসেন আলী। ইনি ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী বরদাখাত পরগণার খোল্লাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেই অঞ্চলে একজন প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধ জমিদার ছিলেন।) কোন বিশেষ ঘটনায় তাঁহার

জীবন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং মধ্যজীবনেই ভোগ-লালসা ও পার্থিব ধনসম্পদে বীতস্পৃহ হইয়া ইষ্টচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সাধনপ্রণালীর এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যাহা সকলের শুনিবার যোগ্য। (তিনি হিন্দুর কৈবল্যদায়িনী কালীমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন এবং সর্ব্বদা কালীপূজা ও কালীগুণকীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতগুলি তৎকালে সকলের মুখে মুখে গীত হইত এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকটই আদৃত হইত। এই সব সঙ্গীত-গুলি যদিও অলঙ্কার ও বাক্যচ্ছটাবিহীন, কিন্তু ভক্ত সাধকের প্রাণের কথা বলিয়া ভাবসম্পদে পূর্ণ ও উপভোগের সামগ্রী।) তাঁহার বিস্তৃত জীবনী ও সমগ্র সঙ্গীতগুলি যদিও সংগৃহীত হয় নাই, সত্য কথা বলিতে কি, আজ পর্য্যন্তও কেহই ইহার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান নাই, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের জীবনকথা যাহাতে আর সাধারণের নিকট অজ্ঞাত না থাকে, তজ্জন্য কি জানি প্রাণে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। কৃতকার্য্য হইব কি না ভগবান জানেন, তবে চেষ্টা করিবার বাসনা রহিল।

(সাধক মির্জ্জা হোসেন আলীর সঙ্গীতগুলি পলাশীর যুদ্ধের কিছু-কাল পরে রচিত, কিন্তু প্রায় সমগ্র সঙ্গীতগুলির ভাব ও ভাষাই অতি বিশুদ্ধ।) মির্জ্জা হোসেন আলীর সম্বন্ধে এদেশে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রবাদ যাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি তাহা সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। মির্জ্জা সাহেব কি করিয়া কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হন সে সম্বন্ধে প্রবাদ এই ;—তিনি একদিন বাহির বাড়ীতে কাছারীঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় পক্ক কাঁটালের গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি সভাষদ্‌গণের নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। পরিশেষে মির্জ্জা সাহেব একজন সমাগত জ্যোতিষী ও সাধককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী বলিলেন, "আপনার জমিদারীর অন্তর্গত অমুক গ্রামের অমুক আজ তাহার

পিতার বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতেছে, ইহাতে সে পক্ক কাঁটাল দিয়াছিল, আপনি ইহারই গন্ধ পাইয়াছেন। কারণ আপনি পূর্ব্ব জন্মে এই ব্রাহ্মণ বালকের পিতা ছিলেন।” মির্জ্জা সাহেব কথাটা তত বিশ্বাস করিলেন না এবং অনুসন্ধানার্থ নিজে ছদ্মবেশে কথিত বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসান্তে অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ বালক প্রকৃতই সেদিন কাঁটাল দিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছে। পরে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর তারিখ অনুসন্ধানে জানিলেন যে ইহা মির্জ্জা সাহেবের জন্মগ্রহণের কিছুপূর্ব্বে। তিনি আর নিজের পরিচয় ও আগমন উদ্দেশ্য না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে তাহার বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ নিয়মিতরূপে করার জন্য একটি তালুক প্রদান করিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার মনে বিষয়-বাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা হয় এবং কি করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন, তজ্জন্য আকুল প্রাণে ঘুরিতে থাকেন। কিছুকাল ভ্রমণের পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সব্‌ডিবিসনের নিকটবর্ত্তী ভাদুঘর গ্রামের ৺কবি বানচন্দ্র তর্কালঙ্কারের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং কৈবল্যদায়িনী কালীনামে চৈতন্য লাভ করেন। ইহার পর হইতেই তিনি কালীপূজা ও কীর্ত্তনে এতদূর মত্ত থাকেন যে একটির পর আর একটি সম্পত্তি ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইতে থাকে। কথিত আছে যে এক একটী তালুক যাইত আর তিনি মাকে ষোড়শোপচারে ভোগ দিয়া পূজা দিতেন ও বলিতেন, মা! “একটা বন্ধন গেল।”

মিরজা সাহেব হিন্দু সম্প্রদায়ের কালীনামে মত্ত ছিলেন বলিয়া ঢাকা নগরের মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং যাহাতে তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মতে চলেন তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পান, কিন্তু মিরজা সাহেব কুলে মানে ও অবস্থায় সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপান্বিত ব্যক্তি, কাজেই কেহই তাঁহাকে প্রকাশ্যে কালীনাম পরিত্যাগ করিয়া ‘তৌবা’

করিতে বলিবার সাহস পান নাই। অবশেষে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া মক্কা সরিফ হইতে চারিজন মোমিন অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা অনিয়া মির্জা সাহেবকে 'দীনে' অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মের রীতিমত রোজা নমাজে আনয়ন করিবার চেষ্টা পান এবং পাথের পাঠাইয়া চারিজন মোমিন আনা হয়। তাঁহাদের সহ পরামর্শ করিয়া একটা হাউলি ভাড়া করা হয় এবং সকলে মিলিয়া মির্জা সাহেবকে একটা পত্র দেন যে, আগামী অমুক তারিখ শুক্রবার আছর নমাজের পূর্ব্বে অমুক হাউলিতে মক্কা হইতে আগত মোমিনগণসহ আছরের নমাজ পড়িয়া বাধিত করিবেন। মির্জা সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই নমাজ করিতে সমবেত হইলেন, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে তথাপি মিরজা সাহেব আসিতেছেন না দেখিয়া সকলে নিরাশ হইয়া নমাজ পড়িতে লাগিলেন এবং মির্জা সাহেব আসিতেছেন না দেখিয়া ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া হাউলির তোরণ-দ্বারে সমবেত হইতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, যখন মির্জা সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, তখন না আসিবার কোন কারণ দেখি না। যদি আমরা ফিরিয়া যাই ও তিনি আসিয়া ফিরিয়া যান, তবে বড় লজ্জার কথা। শুধু লজ্জা নহে, অন্যায়। এমন সময় একজন পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—আপনারা সকলে ফিরিয়া আসুন, মির্জা সাহেব মসনদে সুখে বসিয়া রহিয়াছেন ও হাসিতেছেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, আমরা 'আদাব' বাজা-ইতে পারিলাম না, লজ্জিত হইলাম। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,— হুজুর কোন্ দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন আমরা ইহার বিন্দু বিসর্গও টের পাইলাম না, ইত্যাদি। এইসব ভদ্রতাসূচক বাক্য বলাবলি শেষ হওয়ার পর মির্জা সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—বন্ধু-গণ, আমাকে এই হাউলিতে আসিতেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আপ-নাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছি ও আসিয়াছি। কোন্ পথ দিয়া কি করিয়া আসিয়াছি ইহার উত্তর পাওয়ার জন্য এত গোল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক। তখন নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোকগণ মোমিনদিগকে মির্জা সাহেবকে 'দীনে' ফিরিতে ও উপদেশ দিতে অনুরোধ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। তখন একজন মোমিন দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনারা মির্জা সাহেবকে যাহা বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে আনাইয়াছিলেন, মির্জা সাহেব ইহার খাসা জবাব দিয়াছেন"। কেহ কেহ অধীরতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মির্জা সাহেব হাসিতে লাগিলেন। তখন একজন মোমিন দাঁড়াইয়া বলিলেন,—যেমন গমনশীল লোকের যেস্থানে পৌঁছিবে বলিয়া লক্ষ্য আছে সেইস্থানে পৌঁছিলেই তাহার যাত্রা সফল হইল, সেস্থানে পৌঁছিবার রাস্তা সোজা হউক আর বক্রই হউক তাহার বিচার অনাবশ্যক। সৃষ্টিকর্ত্তা এক। তাঁহাকে যে ভাষায় যে মন্ত্রেই হউক ভক্তিযোগে উপাসনা করিলে সিদ্ধকাম হওয়া যায়। মির্জা সাহেবের কালী নামেই আল্লাবোধ হইয়াছে। ইহাই তাঁহার খোদার নিকট পৌঁছিবার রাস্তা; আপনারা আর কি বুঝিতে চান? সকলেই ইহার পর যার যার স্থানে প্রস্থান করিলেন। মির্জা সাহেব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর আরও অনেক গল্প আছে। (তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি একজন ভেদ-বুদ্ধিশূন্য উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন।) তিনি একাধারে যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ, অথচ ভাবুক কবি। তাঁহার সঙ্গীতগুলি উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ, কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবদুষ্ট নহে। ইহা মাতৃভক্ত সাধকের সরল প্রাণের সরল কথা; ভাষার ঝঙ্কার নাই, বাক্যচ্ছটা নাই, তবু অতি মনোরম। কোন কোন গান এত উচ্চাঙ্গের যে, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, অবশেষে প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। প্রচলিত সঙ্গীতগুলি হইতে মাত্র দুইটি সংগৃহীত সঙ্গীত নিম্নে প্রদান করা গেল। ইহা হইতেই সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে মির্জা সাহেব কিরূপ উচ্চস্তরের লোক ছিলেন;—

(১)

সকলই করিতে পার কালী।
এ গো মা সকলই করিতে পার কালী॥
ত্বং কালী করালী বনমালী।
কখন রত্ন সিংহাসন, কখন পাঠাও বন
কখন বৃন্দাবনে বনমালী—
মাগো সময়ে শঙ্কটভয়, তুমি বিনে কেহ নয়
তার সাক্ষী মির্জ্জা হোসেন আলী—
মাগো কালী বলে দিচ্ছি করতালি।

(২)

শমন তোমারে কি ডরি
আমার গুরু আছে যার কাণ্ডারী
কর' না মন জাগা জুরি
সামনে আছে জজ্র-কাছারী
আইনের মত রসিদ দিব
জামিন দিব ত্রিপুরারী।
কহে মির্জ্জা হোসেন আলী
যা কর মা জয় কালী
পুণ্যেতে মোর শূন্য দিয়ে
পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

ধন্য মির্‌জা সাহেব, ধন্য তুমি! তোমার নিকট যশ ও নিন্দা সকলই তুল্য। ইহ-জীবনেই তুমি সাধনবলে যশ ও অযশ, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এবং পাপ ও পুণ্যের অতীত হইয়াছিলে। হে নিষ্কাম যোগিন্, আবার বলি তুমি ধন্য; যখন তুমি মাতৃমন্দিরে পূজানিরত ও ধ্যান-

মগ্ন অবস্থায় "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" ভাবিয়া প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে, যখন কল্পনায়ও তোমার সেই পূত চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হয়, তখন ব্রাহ্মণত্বের তুচ্ছ অভিমান ভুলিয়া, তোমার চরণোদ্দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না।

শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

আমার কথা

আমি ভেবেছিলাম আমার যৌবন গেল, কিন্তু দেখি, সে যে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়াল। আর যেন চল্‌তে পারে না, পা যেন আর সরে না। তা সর্‌বে কেমন করে বল? ধড়ে প্রাণ থাক্‌লে ত? সে যে মরিয়া হয়ে গেছে। তার সঙ্গী চোর এগিয়ে গিয়েছিল, পেছুন ফিরে, যৌবনের দশা দেখে, থতমত খেয়ে গেল। সে এক পা এগ'য়, এক পা পেছ'য় কি করে! কেন? কেবল কি তোমরাই চুরি কর্‌তে জান? আমরা জানিনে? তোমরা না হয় বরাবরকার চোর, চোরের সাক্ষী চোর, পরের মর্‌জি যোগাতে চুরি কর। আমরা না হয় কালে ভদ্রে এক আধ দিন, আপনার প্রাণের দায়ে চুরি করি, না করে আমাদের চারা নাই বলে।

যদি তেমন তেমন, নয়ন-লোভন প্রাণ-গলান-গোছ কিছু হয়, আর সে ডেমাক করে ফিরেও না চায়, বরং আরো পালিয়ে যাবার ভয় দেখায়, তখন জান্ না নিলে কি আর জান্ থাকে বল! তবে আমাদের চুরির বাহাদুরী এইটুকু যে বেজাহান্ করে দিয়েও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখি। দয়া কত! এখন যৌবন জব্দ, আর যাবে কোথায়? এস তবে পথে এস, রাখ তবে বড়াই রাখ, ধর আমার পায়ে ধর। কি অম্‌নি অম্‌নি যাওয়া? যৌবন আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ল, হার মেনে হাত বাড়ায়ে দিল, বস্ আমার বশ হয়ে রইল। এখন আমার যৌবনের প্রাণ। তোমরা জান লুটপাট্, তোমরা জান লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন! চুরির কায়দা-কানুন কিছু জান কি? চুরি কর্‌ব, চোর বলে ধরা দিব, উল্টা আবার যার চুরি করি তারি দণ্ডবিধান কর্‌ব, তবে ত' বলি চুরি। লাভ,—নিতে এসে, দিয়ে বাঁচে। আর তুমি দাগা চোর! তুমি কি চুরি কর্‌তে পেরেছ, শুনি। সারা জীবনটা চুরিতে কাটাও, আর চুরির হালচাল শেখ না? চুরি

করতে এসেছিলে, চুরি করে চলে যাচ্ছ! কিন্তু চুরির উপর যে চুরি হয়ে গেল, চোরের উপর যে বাটপাড়ি, তার খবর কিছু রাখ কি? আচ্ছা, সব ত নিয়েছ, আমার স্বভাব নিতে পেরেছ কি? হে ভীরু চোর! সেখানে যে প্রেমময়ের প্রেম ছিল খাড়া পাহারা, কি দিনে কি রাতে। তুমি নিরীহ চোর! তুমি পারবে তার সঙ্গে পাল্‌টা দিয়ে? তার মত জবরদস্ত, তার মত ধূর্ত্ত, তার মত ছল, তার মত কৌশল, তার মত দুষ্ট হ'তে, তার মত মিষ্ট হ'তে তোমরা জানবে? তুমি আজন্মের চোর। চুরি ত শেখনি? দেখে চোর, ঠেকে চোর, সেয়ানা চোর। তুমি পারবে তার চোখে ধূলা দিতে? যারা এই প্রেমকে মানে না, পাহারা রাখে না, তাদেরই স্বভাব নিয়ে তোমরা পালাও। তারাই তখন স্বভাব হারিয়ে হাতড়ে মরে। আর তা না কর ত, শক্ত ঘা দিয়ে তা ফুট করে, ফাটিয়ে তা চৌচির করে নষ্ট করে রেখে যাও। তখন তাদের নষ্ট স্বভাবে কিছু ধরাতে না পেরে অবুঝের মত আঠা দিয়ে তা যোড়া লাগাতে যায়। তাতে যোড় ত লাগে না-ই, আরো লেঠা বাড়ায়। না যায় সে আঠা ধুলে, না যায় তা মলুলে।

তখন কেবল মন খারাপি সার। পাহারার ভয়ে হে নামজাদা চোর! আমার স্বভাব সাম্‌লাতে তোমার সাহসে কুলায় নি। আর দেখ, চেয়ে দেখ, আমার স্বভাব তোমার কি সাম্‌লেছে। আমি এখনও সে মুখপানে চেয়ে শিশুর মতই হক্‌-না-হক্ হাসতে পারি, আমার স্বভাবে তা দেয়। তেমন বাদলা রাতে, বাহিরে যখন বড় ঝড়ঝাপ্‌টা বয়, আমি অজ্ঞান অপোগণ্ডের মত, সে বুকে মাথা রেখে, নিশ্চিন্ত মনে আজও ঘুমই, সে কেমন করে? হে মূর্খ চোর! তুমি শৈশব নিয়েছ, তার নিছনি, এসব নিতে পেরেছ কি? আমি সে পায়ের আঙট্‌ পেলে, এখনও অঞ্চল মাটিতে লোটায়ে চঞ্চল হয়ে ছুটে যাই। যে বাচালতা আমায় তখন, যার তার কাছে, যা খুসী তা বলাতো, এখন না হয় সে, যার কথা তার কাছে যেমন করে খুসী বলায়, তফাৎটা

কি ? তুমি বাল্য বেঁধেছ, তার এই অসাবধানী, সহজ সুন্দর বিভ্রম বাঁধিতে পেরেছ কি ? দেখ আমি যেই মুগ্ধা সেই মুগ্ধা ! কৈশোরে মুগ্ধা ছিলাম তারে না জেনে, এখন মুগ্ধা হয়েছি তারে জেনে। মধু-মাখা বুলি আমার ছিল যে তখন, এখন কি বুলি মধুমাখা নয় বল্‌তে চাও ? তারপর যৌবনের তাজা প্রাণ, তার যা কিছু তারিফের সবই আমার স্বভাবে মজুত দেখছ না কি ? তুমি তবে নিলে কি ? মরণেরে দিবে কি ? তোমার ও পুঁটুলীতে বাঁধা শুধু কটি নামকরা জিনিস, তাদের সার পদার্থ কিছু আছে কি ? ভয় পেও না, আমি তোমার ও ফাঁকির মালে নজর দিব না। তুমি যাবার কালে সচ্ছন্দে তা নিয়ে যেও।

আমার পঞ্চ সেবাইত তাকে তাকে ছিল, কেমন করে চুরি ধরা যায়, কি করে চোর পাক্‌ড়াও হয় ! এখন কাবু দেখে, তারা সবাই মিলে এসে এ'কে ঘিরে দাঁড়াল। তখন তার মাথা নীচু করায়ে, তার নাকে খৎ দেওয়ায়ে, আপনাদের মনের ঝাল মিটালো। চোর নিঃশব্দে সব সহিল। আজ এঘরে যৌবন বাঁধা, চোর আটক। আর তাদের চালনে চলন, তাদের খেয়াল মাফিক কাজ নয়। আজ আমি চালক। রাশ আমার হাতে। হুকুমে চালাব, তেরিয়া হবে ত পিঠ্ চাপ্‌ড়ে দিব। পালানো কি মুখের কথা !

তোমরা সাবধানী গৃহস্থেরা, কেবল ঘর ঘর করে মর। ঘর সাম্‌-লাতে জান কি ? এই যে চুরির ভয়ে তোমরা ঘরের বা'র হওনা, কিন্তু চোর তবুও ত জবরদস্তি করে ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে পালায় ! তখন না পার তোমরা চোর ধর্‌তে, না জান তোমরা চুরির মাল ফিরিয়ে আন্‌তে। তোমাদের গেল ত, গেলই গেল, তোমাদের হারাল ত, হারালই হারাল। তখন হাতপা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বস, না ত সিধা পথে খুঁজে মর। তোমাদের মুখ দেখ্‌লে আমার মায়া হয়। বলি সিধা পথে কি চোর ধরা পড়ে, না চোর চলে ? সাধে কি আর আমি সিধা পথ সোজা পথ ছেড়ে, এই বাঁকা পথ, বেপথ,

কাঁটার পথ ধরেছি ? কাঁটা কি আর গায়ে ফোটেনা ? কিন্তু বিঁধে বেদনা জাগাতে না জাগাতে, আপন হাতে সে কাঁটা তুলে ফেলে দেয়, সে আমার দরদের দরদী। তাই আমি দুঃখু পেয়েও দুঃখের বাড়ী জানিনা, জ্বালার মধ্যে থেকেও জ্বলনিতে পুড়ি না, আমি কান্না-কাটার ধার ধারি না। আমার দিল্ খোস্, আমার মেজাজ সরিফ। যতদিন, এই যৌবনের প্রাণ লয়ে, আমার প্রেম বেঁচে থাক্‌বে, আমার স্বভাবে এম্‌নি সব বজায় রবে, ততদিন আমি কার পরোয়া করি ? আমাকে পায় কে ?

শুন শুন ওহে ঘর-ভাঙ্গনের, ঘর-ভাঙ্গানির দল! এবারে বেড়ী পায়ে বসে দেখ, আমার ভাঙ্গা ঘর দুরস্ত হয় কি না হয়। তোমাদের নিঠুর কঠোর পীড়নে এর গায়ের যত কিছু দাগ, যত কিছু ছাপ, বেমালুম করা যায় কি না যায়। ওগো কাঁচা কারি-গর! তোমাদের কাঁচা হাতের তুলির বেখাপ্পা পোঁছ সুধ্‌রে নিতে পারে কি না পারে। এবারে মহাশক্তিধর আমার সব বুঝে শুনে আপনার হাতে নিয়েছে। পরক কর বসে, আমার সেদিন গেছে, না আছে ? বিচার কর দেখে, আমার লাভ কি লোকসান হয়েছে ? সত্যি করে বল, আমার মরণ ঘনা'য়ে এসেছে, কি আমার বাঁচন দেখে তাকে দূরে যেতে হয়েছে ?

আমার ঘরে আজ মণিমাণিক্যের আলো জ্বল্‌ছে! এ আলো নিব্‌বার নয়, নিঃশেষ হবার নয়, এক ভয় চুরির। লাবণ্যের ছটা, বাহিরের আলো, বাইরে থেকে বাহিরকে আলোকিত করেছিল। আর এ প্রেম-জ্যোতিঃ ভিতর থেকে সব দাগ ছাপ ভেদ করে, সব স্বচ্ছ করে দিয়ে, বাহিরে এসে প্রকাশিত হ'ল। দেখ আমার চোখে মুখে সে জ্যোতিঃ ঠিক্‌রে পড়ছে কি না ? তবে তোমার লাবণ্য সম্বরে,' হে যৌবন! আমার লোকসান কি করলে ? আমার তবে সে দিন গেল্ কৈ ? আমার ঘরে ভাঙ্গনি ধরেছিল। তোমার প্রাণ পেয়ে, দেখ চেয়ে দেখ, কি কারিগরি ফলায়েছে আমার সে

প্রেম-কারিগর। এবারে শুধু বাহিরে তাক্ লাগানো নয়। দেখ দেখ, ভিতরকার শোভন সাজ দেখ, শোভা দেখ, দেখ কি হ'তে কি হল, নজর করে দেখ। আরো কি ভাঙ্গবার মতলব রাখ? হে বয়শ্চোর! তুমি তোমার সাথী জুয়াচোর, জীর্ণ শীর্ণ জরাকে সন্তর্পণে এ পুরীতে ঢুকে, অলক্ষিতে বসে বসে ঘরের বাঁধন ঢিলা করতে হুকুম দিয়েছিলে। বাঁধন খুলে গেলে, ঘর অমজবুত হলে, শেষকালে আপনি ভূমিসাৎ হবে ব'লে। ঢুক্‌বার মুখে আমার আনন্দের হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ মূরতি দেখে তাকে ভয়ে ভাঁগ্‌তে হ'ল ত? এখন সে লজ্জায় তুমি মুখ নীচু করলে কি হবে ভাই। অতঃপর তোমাদের তুলির এসব কাঁচা লিখন, সুধ্‌রে নিতে তার পাকা হাতের লাগে কতক্ষণ! এখন তবে তুমি ঘরে থাক্‌লে, বয়েস না যেতে পেলে, চুরির মাল মরণেরি পায়ে নিয়ে বুঝিয়ে না দিলে, মরণ কি আমায় থামাথাই এসে তলব করবে? তার কি আর নিজের কিছু ভাববার অবসর আছে? তাকে ফাঁকি দিয়ে, তাই ফাঁকতালে বেঁচে নিতে হয়, ছলে কৌশলে তোমাদের ধরে বেঁধে রাখ্‌তে হয়। তাকি জানে সকলে; তাকি পারে সকলে, প্রেম না হলে?

আমার পঞ্চ সর্দ্দার দেখ্‌ল চোর ত ধরা, পড়েছে কিন্তু ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবার মতও ওদের কিছু নেই। সে যে, ওদের সব নষ্ট করে দিয়ে গেছ্‌ল, চুরি করে ত নেয় নি। তা কি জানি ওরা কেমন করে, কার কাছ থেকে কি যোগাড় করে, আপনার আপনার কাজ বেশ চালিয়ে নিচ্ছে। হাতপা গুটিয়ে বসে থাকে নাই। আমিই বা তা থাক্‌তে দিব কেন? খাটতে এসেছে, খাটিয়ে নেব ত? শব্দের স্বরের বেশ একটু মাধুর্য্য টের পাচ্ছি, তাকে ঠিক মধুমাখা না বল্‌তে চাও, কিন্তু তাতে ক'রে প্রাণ-গলানো কাজ বেশ চলে। পরশের ভাঙ্গা পাত্র গলিয়ে, সব মোহ পড়্‌তে পায়নি, সময়ে নাকি ধরা পড়েছিল, পাত্র মেরামত হ'ল। রূপের

চোখের নীল কাঁচ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, তার রঙ্গাণ দেখার নেশা টুটাবে ব'লে। এখন খালি চোখে দেখা তার অভ্যাস হয়ে গেছে, সত্যিকার রঙ্ দেখ্তে পেয়ে তার সব ভুল ভ্রান্তি ঘুচে গেছে। যাক্ ভালই হয়েছে। অমঙ্গল কর্তে গিয়ে তার মঙ্গলই হয়ে গেল। রসের ভেজাল সব সে আপনা হাতে ছেঁকে নিয়েছে। ঠিক তেমনটি না হলেও মেশাল কিছু টের পাওয়া যাচ্ছে না। গন্ধের আমুদে স্বভাব, সে কি পারে তার খাতির খতম হবে বলে, আমোদ না ক'রে থাকৃতে! তবে তার আমোদে এসে কেউ যোগ দেয় কি না দেয়, আমি ভাই তা বল্তে পার্লাম না।

সবই ত আমার মনোমত হল, এক পারি না এই আমার "আমি"র সঙ্গে। দিনকের দিন সে যেন আরো গোঁয়ার গোবিন্দ গোছ হয়ে পড়্ছে। আমার যেজন চিরবাঞ্ছিত, আমি মনে প্রাণে যার মন তুষিতে চাই, কৈ সে ত ভুলেও একবার ভাবেনা আমি শুভ্র কি কালো, একবার বিচার করেনা আমি মন্দ কি ভালো! কিন্তু যারে আমি মোটেই মান্তে চাই না, তার অত আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা কেন বল ত? আমাকে শুভ্র দেখবার, আমাকে ভালো করবার দিকে ওর অত ঝোঁক কেন? বাপরে! কি কড়া শাসন! শাসনের চোটে যে আমি অস্থির। যদি সময় বুঝে, মনে রেখে চল্তে না জানতাম, তা হলেই হয়েছিল আর কি? দুই মাথা-ভাঙ্গায় মিলে কোন্ দিন একটা খুনখরাপি হয়ে যেত। অভিমান কোন্ দিকে সাক্ষী দিত তা ত বুঝ্তেই পার। আজকাল তাতে এতে যা গলাগলি ভাব! একজন আর একজনকে যেন চোখ থেকে হারায়। যদি নিত্যকার এসব অন্তঃপুরের বিবাদ, বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব কলহের কথা বল্তে যাই, তাহলে বুঝতে পার আমাদের কেরামত কতদূর। কে বলে আমরা অবলা দুর্ব্বলা? বীর নারী আমরা, বীরদর্প-হারিণী আমরা! আমাদের এক তর্জ্জনীর তর্জ্জনে জীবলোক থরহরি কম্পমান। আমাদের এক নয়ন-পাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীরপুত্র

সকলকে দূরে দাঁড় করে রাখি। আবার যদি মনে লয় ত আর এক চাহনিতে তাদের আমাদের আসনার্দ্ধে এসে বস্‌তে অনুমতি করি। তখন তারা তা ভাগ্য ব'লে মেনে নেয় কি না নেয়? আমাদের সঙ্গে চালাকি? সে কাপুরুষেরা যখন আসে আমাদের জাত তুলে গাল দিতে, তখন তাদের আস্পর্দ্ধা দেখে কি আর দু'কথা না শুনিয়ে পারি? তবে যে আমাদেরও মাঝে মাঝে, মাথা নীচু, কাঁচুমাচু করতে দেখ, সে কেবল যাদের বড় বড়াই, যাদের বড় চাই তাদের দিকে যে ছাই, সমানে চাইতে পারিনে তাইতে? এই দেখনা, আমি যতই এই "আমি"র ভয়ে তার মন যুগিয়ে, তার চোখ বাঁচিয়ে চল্‌ছি, ততই সে আমায় যেন পেয়ে বস্‌ছে। এখন দেখ্‌ছি, হামেসাই আমাকে "আমি"তে পায় আর অভিমানও সঙ্গে এসে ঘাড়ে চাপে। তখন যা বিতিকিচ্ছা কাণ্ড হয় তা আর কহতব্য নয়। আমি আর তখন মানুষ থাকি না। না থাকে তখন কোন বুদ্ধি বিবেচনা, না থাকে কোন লজ্জা সরম, না মান সম্মানের ধার ধারি। কি করতে যে কি করি, কি বল্‌তে যে কি বলি; যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। যারে এক মুহূর্ত্ত চোখছাড়া করতে চাই না, সে হয় ত এসে দাঁড়িয়েই আছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। যার মুখের কথার আমি কাঙ্গাল, হয় ত সে কত অনুনয়, কত বিনয় করছে কানেও তুলি না। ক্ষণে চক্ষের জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, ক্ষণে মুখে হাসির রেখা দেখা দিচ্ছে। আবার কার জানি অপমান কিসের জানি অপমান, আর সহ্য করতে না পেরে একেবারে ভূমেই গড়াগড়ি। দাঁড়িয়ে এসব ভৌতিক ব্যাপার দেখে, প্রাণভরে এক কৌতুক রস সম্ভোগ করে, নিমেষে ওঝার রূপ ধরে, মন্ত্র ঝেড়ে ভূত ভাগিয়ে দেয় বহুরূপী মায়িক সে আমার। তখন আর কি মুখ দেখাতে পারি? না কি চোখ তুলে চাইতে সাহসে কুলায়! লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাই, সরম রাখি কোথায়? অনুতাপ তখন তুষের আগুন জ্বেলে আমায় অঙ্গার করে ছাড়ে। তা দেখে আর এক মন্ত্রবলে,

সে অঙ্গারকে সংস্কারশুদ্ধ উজ্জ্বল মাণিক করে, বুকের মাদুলী করে, গলে পরে' থাকে, সে আমার সব মাণিকের মাণিক। তখন সে হৃদ-পরশে, জড়ে চিৎশক্তি এসে তাকে মানুষ করে তোলে! চমকে চেয়ে দেখি আমি তার কণ্ঠলগ্না। এখন দেখ্‌ছি আমার কিছুই ফ্যাল্‌না নয়। আমায় ভূতে না পেলে, তাপে না পোড়ালে, অঙ্গার কি হ'তাম? অঙ্গার না হলে মাণিক ব'লে তার গলে কি দুলতাম? সে গলায় না দুল্‌লে, সে হৃদ-পরশ না পেলে কি আর মানুষ হতাম? কেগো তুমি! একাধারে দৈত্যরূপে, দেবরূপে আমার মরণ ঘটায়ে আমার বাঁচন দেখাচ্ছ? এমন করেই কি আমায় মরণে মেরে, আমার বাঁচন দেখিয়ে, আমার মরণের ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছ? আমি বুঝে নিয়েছি, আমি দেখে নিয়েছি, সত্যি মরণ আমার হতে পারে না, তুমি তা হতে দিবেনা। আমি বড় খাতির জমা, আমার মন বড় নিশ্চিন্ত। হে দাতা ঠাকুর! দিয়ে দিয়ে কি আর তোমার আশ মেটেনা? আমার একলা প্রাণে এত কি ধরবে? উপ্‌চে পড়্‌বে যে। তাই বুঝি হে প্রাণ-প্রতিম! আমার প্রাণের প্রতিরূপ ধরে, ছলে আপনাতে কিছু ধরায়ে সব ধরাতে এসেছ? "আমি ত বুঝি না কি লাগি তোমার বিলাস হেন?" যদি আমায় চিরজীবী করেছ, তবে আর এক বর মাগ্‌তে হ'ল, আমার চিরসঙ্গী হয়ে থাক্‌তে হবে। শুধু তুমি আমার প্রাণ-প্রতিম হলে চল্‌বেনা, আমাকেও তোমার প্রাণ-প্রতিম হওয়াতে হবে। তবেই না সব মিশ খাবে, সব টেঁক-সই হবে।

আমাতে এখন সব এঁটেছে। আমার যৌবন আছে, আমার বয়েস রয়েছে, আমার ভূতগণ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। আমাতে "আমি" আছে, আমাতে অভিমান স্থান পেয়েছে, আমাতে আনন্দ ধরেছে। কিন্তু কি জ্বালা! এত "আছে" "আছে"র মধ্যে প্রাণ যেন কেমন আই-ঢাই করে, ঘেঁসাঘেঁসিতে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে! তারি জন্যে কিছু "নাই, নাই" চাই, কিছু "যাই যাই" থাকা লাগে। নয় ত,

মহাস্ফুর্তি, বড়তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি এরা যে সব রাক্ষসীর জাত! এদের দিয়ে কি কিছুর বিশ্বাস আছে? কখন যে কি গ্রাস করে ফেলে তার ঠিক কি?

আমি এসেছিলাম. বসন্তের এক অস্ফুটন্ত পাখী পরভৃতের কুলায়ে। তার পক্ষপুটের তলায়, তাপ দিয়ে আমায় ফোটাবে ব'লে। সে তাপ পেয়েছে, সে ফুটে উঠেছে। সে জেনে নিয়েছে, কেন তার এবাসায় আসা, কেন তার এবাসায় বাসা, এখন পাখী বুঝিবা বিমানে ওড়ে? দূরে সে ডাক শুনেছে, সে আপন ডাক, সে মিঠা ডাক, সে কুহু ডাক। আর কি তার পরবাসে মন টেঁকে? কালা-চাঁদ বাঁশরীতে তান ধর্‌লে পরে, আর কি রাধা ঘরে রইতে পারে?

যৌবন! আমি না বুঝে তোমায় বন্দী করে রেখেছিলাম। হে দীন চোর! খামাখা তুমি আমার ঘরে আটক আছ। এবারে যাও, তোমরা যার দাস তার কাছে চলে যাও। আমিও যার দাসী তার কাছে যাই। আর তোমাদের ধরে রাখা নয়। এতদিন তোমরা যেতে পাগল হয়েছিলে, এখন আমি যেতে পাগল হয়েছি। গেলে পরে, তোমরাও আর এমুখো হবে না, আমিও আর এমুখো হব না। তোমাদের সঙ্গে চিরবিদায়, জন্মজন্মের বিদায়। আমায় উন্মনা দেখে, আমাকে শাসনের বা'র দেখে, আমার "আমি", আমার অভিমান, আপনাথেকেই আমায় রেহাই দিয়েছে। তারা আর আমার মুখদর্শন কর্‌বে না বলে, একেবারে এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। তোমরা আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা এখন তবে কি কর্‌বে? আমি এক দুরন্ত অভিসারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করব, সঙ্গে কারোকে যেতে নাই। ওরা যাবে ওদের প্রভুর কাছে, মরণের কাছে, তোমরা যাবে কোন্ চুলয়? তোমরা আমাকে ছাড়া জান না? তোমরা আমার সঙ্গে যাবে? অভিসারে কি কেউ সঙ্গে যায় রে পাগল! আমি যে সব ছেড়ে, নিঃস্ব, নিরাভরণা, নিরাবরণা হ'য়ে, ঘোর রাতে, আমার সে লজ্জা-নিবারণের কাছে যাব, আঁধারে মিশে মিশে! এ ঘরের

কিছুই সঙ্গে নেব না, নিতে পারি না। তোমারা এ ঘরের নও? তোমরা আমার সঙ্গে এসেছিলে, আমার সঙ্গেই যাবে? আস্‌বার বেলাও তোমাদের আমি চোখে দেখ্‌তে পাই নাই, এখনও পাব না? তোমরা আমার চক্ষুর অগোচর হয়ে থাক্‌বে? চল তবে চল। জানি তোমরা ছাড়া আমি কাণা, আমি কালা, আমি খোঁড়া, আমি বেবশ। আমার তা'হলে যাওয়াই হয় না, আগে সেকথা ভাবি নাই। যদি ভগবান্ করেন, যদি আমার অভিসারের যাত্রা সফল হয়, যদি সে মিলন ঘটে, তবে তোমাদেরও গতি হবে? চল তবে চল, আর দেরী নয়। অনেক রাত হ'য়েছে, সবই নিঝুম! এই সকলকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার সময়, আজ অমাবস্যা নিশি! বাইরে ঘন ঘটা! উঃ বাচ্‌লাম। নয় ত সে লম্পট, সে নিশাকর, সে নেশাকর, আকাশে থাকলে আর আজ আমার রক্ষা থাক্‌ত না। একবার উঁকি মেরে আমায় দেখ্‌তে পেলে, নষ্টামি করে আমার সঙ্গ নিত। আমার প্রিয় সমাগমে বাদ সাধ্‌ত। তখন আমার কলঙ্কের বোঝা বাড়ায়ে আমাকে এপথ থেকে ফিরে যেতে হ'ত। ঘন ঘটাই আজ আমি চাইছিলাম। আমার সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন তাই ঘটিয়েছেন। কত ভাবনা তার আমার জন্য। তা বলে এ গুরু গুরু গরজন কেন? এখানেও শাসনের কথা শুন্‌তে হবে? এখানেও গুরুজন?

গুরু গুরু গরজন? হে মুখর মেঘ! তোমার পুরুষের প্রাণ, তুমি অভিসারের মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? তাই অসময়ে এসেছ ডাক্‌হাঁক্ করে আমায় ভয় দেখায়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিতে? আমি যে ঘরের বা'র হয়ে, ভয়েরও বা'র হয়ে গেছি? তুমি মনেও করোনা, আমার এই দুরু দুরু হিয়া, তোমার ও গুরু গুরু গরজনে? ঐ দেখ্‌ছনা কি, করুণ নারীহৃদয়, অভিসারের লাঞ্ছনার নিস্তারিণী, দ্যুতিধারিণী, দূতী দামিনী কেমন হেসে হেসে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, শুভ-মিলন ঘটাতে! তবে হে চঞ্চল-প্রভ! আবার চমকাও ত! আমি যে এখনও আমার সঙ্কেত স্থানের সন্ধান পাই নি। একবার সে স্থান

দেখায়ে, তোমার ত্বরিত গতিতে আমায় তথায় পৌঁছায়ে দাও ত! আমার যে আর তর সয়না। ও কি দেখালে? ও যে শ্মশান ভূমি! ঐ কি আমার সঙ্কেত স্থান? ঐ কি আমার মিলন মন্দির? প্রিয়তম কি সেইখানে আমার প্রতীক্ষায় আছেন? শব্দ! চুপ্, এখন সে ডাক শুনিও না; পরশ! তোমার পায়ে পড়ি সে ছোঁওয়া এখন লাগিও না; রূপ! ওরূপ এখন দেখিও না। এখনও যে পথ বাকী, এখনও যে পায়ে চল্‌তে হবে। গন্ধ! অমন করে ছুটোনা। তোমার আভাস গেলে, আমার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠায় উতলা প্রাণ যে, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হয়ে আমায় পেতে ছুট্ দিবে। তখন এ আঁধারে, তারে খুঁজে পাব কেমনে? ওকি! বাতাসে ও কার সুবাস? শূন্যে কার মধুমাখা ডাক্? দিকে দিকে কার মোহন রূপ? পথ ফুরিয়েছে কি? গায়ে ও কার পরশ? আর দূরে নও?

> "বিনিশ্চেতুং শক্যেন সুখমিতি, বা দুঃখমিতি বা,
> প্রবোধো নিদ্রাবা কিমুবিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
> তব স্পর্শে-স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

বিকার আর চৈতন্য! চৈতন্য আবার বিকার! শ্যাম আর রাধা, রাধা আর শ্যাম! না না, আধা শ্যাম, আধা রাধা! না না, শুধু শ্যাম! না না, শুধু রাধা! একে, একে দুই নয়। যুগল-মিলন নয়। আমি রাধা, তিনি রাধা! আমি শ্যাম, তিনি শ্যাম। আধায় আধায় পূর্ণ মিলন, মহামিলন! যুগযুগান্তের মিলন!

কলঙ্কিণী রাধা ঘরের বা'র হয়েছে, সে মরেছে। সকলে মিলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তার চিহ্নও রাখবে না বলে। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ছে আর, তার অন্তরঙ্গের। চোখের জল পুঁছ্‌ছে। এখন আগুন নিবেছে, রাধাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে

তারা সবাই ম্লানমুখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তারা এ মিলন, এ বিচিত্র বিলাস-যাত্রা দেখ্‌ল না, তারা চোখ তুলে চাইল না, তারা ভক্তি-ভাবে দেবতাকে প্রণাম কর্‌ল না। কেমন করে কর্‌বে? তারা কলঙ্কিণী রাধার, কৃষ্ণ-কান্তমণি পরশমণিকে চিন্‌বে কেমনে? কলঙ্কে কালো না হ'য়ে ভাল থেকে, কে কবে তাকে চিন্‌তে পেরেছে? তোমরাই এখন বল তোমাদেরই জন্ম সার্থক, কি আমারই জন্ম সার্থক?

শ্রীজগদম্বা দেবী।

মরণে জয়।

[কথা নাট্য]

প্রথম দৃশ্য।

[রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেছে...পূর্ণিমার চন্দ্র পরিপূর্ণ তরল জ্যোৎস্নাধারা ঢালিতেছে...শোভনা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া, তাঁহার কুন্তল আলুলায়িত...বাতাসে তরঙ্গ তুলিয়া কুন্তল দুলাইতেছে...জ্যোৎস্নার ধারা তাঁহার মুখ চোখ প্লাবিত করিয়া দিতেছে, চূর্ণ কুন্তলের উপর আলোক ও ছায়ার খেলা চলিতেছে...বাতাসে আম্রমুকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে...জানালার নিম্নে বাগান—বাগানে নানাবিধ ফুলের গাছ, বেল যূঁই মল্লিকার সারি, মল্লিকার উপর চাঁদের আলোর হাসি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একপার্শ্বে কতকগুলা শুষ্ক পত্র ও আবর্জ্জনা-রাশি জ্বলিয়া ভস্ম হইতেছে...সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছিল, এখনও অগ্নি নিভে নাই; সেই বহ্নি একটু একটু করিয়া কি রকমে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা সুন্দর মুকুলবেষ্টিত গোলাপ-বৃক্ষকে গ্রাস করিতে ধাইয়াছে। মাঝে মাঝে বাতাসে সেই ঘাস-পোড়ার তীব্র গন্ধ ভাসিয়া উঠিতেছে। দূরে—পথিপার্শ্বস্থিত সৌধরাজি...তাহার মধ্যে উচ্চ চূড়ার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। শোভনা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একাকিনী সব দেখিতেছিলেন...অকস্মাৎ চঞ্চল ভাবে...]

শোভনা। মালি! মালি! আঃ অমন সুন্দর গোলাপ গাছটা আগুনে পুড়ে গেল, তোদের ও জঙ্গল পোড়াবার কি দরকার ছিল—যাঃ...না শুখ্‌নো পাতা জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে আমার অমন

সাধের গোলাপ গাছে আগুন লাগ্‌ল...এখন'ত আগুন নিভান যেতে পারে, মালি! মালি! সব পুড়ে গেল...যাঃ—

[শোভনা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহিরের দিকে যাইতে গেলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী রমেন্দ্র মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে দ্বারের সম্মুখ দিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রমেন্দ্র। দাঁড়াও...সবুর ..যাক্‌ পুড়ে, তুমি নেকলেশটা খুলে দাও .. দাও...গোলাপ পুড়্‌ছে ত তোমার কি, ফুলের সঙ্গে ভাব করতে হয় এর পর ক'র। দাও, দাও, আঙুর তা না হলে মদ খাবে না...তোমার নেকলেশ ছড়াটা চাই!

[শোভনা প্রস্তর পুত্তলিকাবৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—স্থির দৃষ্টি, আঁখির পাতে পলক পড়িতেছে না—]

রমে। দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও। আঃ বল্‌ছি আঙুর তা না হ'লে মদ খাবে না। হো-হো—দাও, দাও, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?

শো। নেকলেশ ছড়াটা যে মা'র...

র। আঃ ..তোমার মা ত' চন্দন কাঠের সঙ্গে পুড়ে গন্ধ হয়ে উড়ে গেছে বাবা ..ধোঁয়া...ধোঁয়া...ছাই ছাই...দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও, বাজে কথা রেখে দাও—

শো। আমি আর একছড়া নেকলেশ দিচ্ছি বা'র করে...ওটা যে মা'র গলায় ছিল...

র। আঃ—আবার কথা কাটায়...মা'র গলায় ছিল ; মা'র গলাও চন্দন-কাঠে পুড়েছে, আছে পড়ে সোনা—তোমার গলাও চন্দন-কাঠে পুড়বে। সোনা কার' গলায় থাকে না, সোনা কার' গলায় থাকে না...দাও...দাও...আঃ...বল্‌ছি...আঙুর তা না হ'লে মদ খাবে না।

শো। তোমার পায়ে পড়্‌ছি—আমি আর একছড়া স্বরস্বতী হার তোমায় এনে দিচ্ছি—তার ত এর চেয়েও দাম বেশী...

র। না—না—বল্‌ছি আঙুর বলেছে—"তুই যে আমায় ভালবাসিস্‌—

তবে তোর মাগের গলার সেই নেকলেশ ছড়া এনে দে...
নইলে মদ খাব না...কিছু খাব না"—দাও, দাও, হুঁ—বলে কি
না, আমি আঙুরকে ভালবাসিনি। কল্জে কল্জে হুঁ...

শো। ওটা যে মা'র চিহ্ন...

র। হ্যাঁ, মা কোথায় তার আবার চিহ্ন...চিহ্ন...বলি তুমি আর আমিই কি ভিন্ন...ও তার গলায় থাকাও যা, তোমার গলায় থাকাও তাই দাও দাও ..এস দেরী কর না ; মদ জুড়িয়ে যাচ্ছে, ঢালা পড়ে রয়েছে...

শো। তোমার পায়ে পড়ি...তোমার পায়ে পড়ি...ও যে মা'র চিহ্ন।

র। তবে রে...দাও, দাও, শীগ্‌গির দাও (টানাটানি করিতে লাগিল)।

শো। দিচ্ছি...দিচ্ছি...আচ্ছা একটা কথা শোন—দিচ্ছি—(নিশ্বাস ফেলিয়া) তুমি কি আমার স্বামী নও—দিচ্ছি...দিচ্ছি... সবই ত দিচ্ছি—আজ তিন মাস পরে তোমার একবার দেখা পেয়েছি—তুমি যে আজ আমার গলার হার ধরে টেনেছ— এতে আমি নিজেকে—আঃ—কি সুখ, তবু ত তুমি আমায় ছুঁয়েছ, কিন্তু—যেন—তবু ত একবার দেখা পেলুম—হার নাও দিচ্ছি—মা'র গলার হার তাও দিচ্ছি, মা'র, মা'র, মা'র আরো চাও ..নাও...তবু একবার—একবার একটি বার ব'স, তোমায় একবার দেখি...একবার, একবার দেখি।

র। যাও—যাও—ওসব ভাল লাগে না···আমি এখন বস্‌তে পার্‌ব না...আঙুর এখনও মদ খায়নি, দাও...

শো। তুমি একটু বস্‌বে না—আচ্ছা তুমি আঙুরকে খুব ভালবাস— (রমেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া) খুব ভালবাস, তাতে আমার কিছু দুঃখ নেই। কিন্তু দিনান্তে একবার করে দেখা দেবে না ? বল—তাকে কেন, যাকে ইচ্ছা ভালবাস, একবার করে দেখা দেবে বল—বল...

র। সব শেয়ালের এক রা...প্রথমটাও ওই বলত। সেটা ম'ল গলায় দড়ী দিয়ে। তারপরটা ম'ল ফুল শুঁকে শুঁকে বুক শুখিয়ে গেল। যাও, যাও, ও বাগান পুড়ে যাওয়াই ভাল। আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। হাত ছাড়—আঙুর রাগ করে বসে রয়েছে। আঃ...

শো। আঙুর রাগ করেছে...আঙুর! আঙুর! বাঃ বেশ নামটী ত—আচ্ছা যাও, না না এস...তুমি যাকে ভালবাস তার নামটিও বেশ!—

র। আঙুর! আঙুর! আমি তোকে ভালবাসিনি—দেখ, দেখ,

(হারছড়াটা দোলাইয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান)

[একটা পাপিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল—শোভনা ধীর স্থিরভাবে দ্বারের পানে চাহিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ফিরিয়া জানালার ধারে গেল—দেখিল আগুন গোলাপগাছকে পুড়াইতেছে, ফুল ও কুঁড়ি পুড়িয়া ঝরিয়া পড়িতেছে...]

শো। সব ছাই করে দিলে বেশ—বেশ ত, শুখন গোলাপের গাছশুদ্ধ ছাই হয়ে গেল...একটা গলা চেপে মরেছে, আর একটা বুক শুখিয়ে, রক্ত শুখিয়ে হাহা করে মরেছে...হাহা হাহা, তাই চারিদিকে সেই হাহা...(গৃহকোণে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহার তৈল অভাবে সলিতা সব পুড়িয়া প্রদীপের বুকের মাঝখানটা জ্বলিয়া উঠিয়া প্রদীপটা নিভিয়া গেল) তোরও সেই হাহা, তোরও বুক পুড়ে গেল...তুইও নিভে গেলি?

[শোভনা 'মা গো' বলিয়া গৃহতলে আছড়াইয়া পড়িল। দূরে তখন পথ বাহিয়া উচ্চকণ্ঠে তীব্র ও মধুর স্বরে পথিক গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—]

প্রাণের কথা কইতে পারি বল্‌ব বল ও সই কারে,
পেলে সে রসিক সুজন দরদী তেমন্

প্রাণ খুলে সে বলি তারে।
প্রাণে প্রাণে কইলো কথা তার—
খালি করে ঢেলে দি সই ভরা বুকের ভার
ওলো সে আমার—
ঘুচে লো সকল ব্যথা রেখে মাথা বুকের 'পরে।
অনুরাগে গল্‌বে তারি মন
কাঁটা তুলে বুকে নিয়ে কর্‌বে লো যতন
(ওসে পরশ রতন)
চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' 'ভালবাসি' গলা ধরে।

[রমেন্দ্রের বৃদ্ধা মাতার প্রবেশ—সর্ব্বদাই মুখে বিরক্তি মাখান...]

র-মা। অ রমাই! রমাই! বৌমা—বৌমা—রমাই এয়েছিল না?

শো। চলে গেছেন।

র-মা। আহা, বাছা এল, আর তখনি চলে গেল? একে ত এদিক মাড়ায় না, তা মানুষকে দুটো ভাল কথা বল্‌তে হয়; তা নয়। একি, তুমি এমন করে পড়ে আছ কেন? আলো নিভিয়ে—অন্ধকারে? তাই বুঝি সে চলে গেল?—বুড়ো বয়সে আর পারিনে; হ্যাঁ, বিয়ে দিয়ে যেন আমারই যত জ্বালা। তিন তিনবার বিয়ে দিলুম গা, সব আঁটকুড়ির ঝি মর্‌তে মরে জ্বালিয়ে গেল! তোমারই ত যত দোষ, না কথা, না মায়া, না শ্রদ্ধা, ...এতে কি আর মানুষের শান্তি হয়। সেও অম্‌নি একেই ওই—না হলে আমার এমন দুর্দ্দশা—আমি বুড়ো মানুষ, আর কতদিকে সাম্‌লাব?

শোভনা। না মা, আমি তাঁকে বস্‌তে বলেছিলুম।

র-মা। 'বস্‌তে বলেছিলুম...বস্‌তে বলেছিলুম'...কেন পুরুষ মানুষ, অমন একটু বা'র দোষ থাকে, তা তাকে সাম্‌লাতে হয়, না অম্‌নি করে। কে জানে বাপু তোমাদের সবই অনাছিষ্টি। আমরাও

কত সাম্‌লেছি কর্ত্তার আমলে। তাই ত আজ আমার রমাই যা হোক, পাঁচজনের একজন ত বটে!

শো। মা তুমি কেবল আমারি দোষ দেখ।

র-মা। দেখ্‌ব না—দেখ্‌ব না—বটে, কেন আমি কি একচোখী নাকি? ভাল জ্বালা, ভাল বল্‌লে মন্দ হয়। এখন কলির ধর্ম্ম কিনা, লেখা পড়া শিখে সব কারুকে আর দেখ্‌তে পারে না—গ্রাহ্যই নেই। ওমা একটা এল, দিনরাত প্যান প্যান ঘ্যান ঘ্যান, আর বই মুখে করে বসে, শেষ আমার হাতে দড়ী দেবার যোগাড়...একটা এল, কথাই কয় না—কথাই কয় না—শেষ মুখদিয়ে রক্ত তুলে ম'ল।

শো। তারাও গেছে, আমিও গেলে সবাই জুড়ায়। যত দোষ ওই বই মুখে করে থাকা ঠিক্!

র-মা। আবার আমার সঙ্গে চোপ্‌রা? করবে অন্যায়—ভাল বল্‌লে সব মন্দ হয়। আমি আর ক'দিন? তোমারই ভালর জন্যই বলি,—আমার জন্যে ত কা'কেও বলিনি।

[রাগভরে বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন—শোভনা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

র-মা। (ফিরিয়া আসিয়া) আঃ ভালখাগীর মেয়ে আবার কান্না কিসের? অমন অলক্ষণে কান্না দেখ্‌তে পারিনে। কেন, কি বলাটা হয়েছে? ওঃ কি আমার সুবচনির হাঁস রে, দিনরাতই প্যাঁক প্যাঁক করছে—জ্বালাতন—ব্যাটার বিয়ে দিয়ে যেন আমিই চোর!

(রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বৃদ্ধা চলিয়া গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[আঙুরের বাসগৃহ—দেখিতে সুন্দরী...কপালের উপর চুলগুলি থাকা থোকা করিয়া পড়িয়াছে, মাথায় প্রজাপতির অনুকরণে কবরী

বাঁধা, তাহার চারিদিকে শুভ্র একছড়া ফুলের মালা জড়ান, মধ্যে—একটী রজনীগন্ধা...পরিধানে আশমানা রঙের আবরঙা কাপড় বক্ষ নিমায় ঢাকা। পায়ের আঙুলে চুট্‌কী। আঙুর গালিচার উপর বসিয়া সম্মুখে রূপার পাণদান লইয়া পাণ সাজিতেছে, মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সম্মুখের বৃহৎ দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহার পানে আকর্ণবিস্তৃতনয়নে কটাক্ষ করিয়া দেখিতেছে—আর একটু দূরে তাহার পরিচারিকা...শশী বসিয়া।]

শ। দাদাবাবু যে এখনও এল না...রাত যে দুটো বেজে গেল...তুমি বাপু কেমন কেমন—থাক থাক কেন যে ঝগড়া কর তা জানিনে, তার ত তোমা বই আর গতি নেই।

আঙুর—(হাসিল ... সুর করিয়া গাহিতে লাগিল ও পায়ের চুট্‌কীতে তাল দিতে লাগিল)—

"আর ভাল লাগে না আমার
বাঁধা কপির চড়চড়ি,
রয়ে রয়ে পড়ছে মনে শুল্প শাকের নপড়ি।—"

আর ও থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় ভাল লাগে না—বুঝ্‌লি শশী...এ রোজ ওই একঘেয়ে গান কর, আর মদ খাও, গান কর, আর মদ খাও—এ আর ভাল লাগে না শশী—

শ। কি যে বল তার ঠিক নেই, অমন সোনার চাঁদ বাবু—সোনা-দানা—অত আদর...তবু তোমার এ বাঁধা কপির চড়চড়ি ভাল লাগে না। কত পুণ্যি করলে তবে এমন হয় গো!

আ। শশি! আমার পুণ্যির ভাগটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই একে ভাগ্যি বলিস্? এই সত্যিক লোকের জুতো সোজা করতে করতে দিন কাটান—ভাগ্যি নয় বলিস্ কি?

শ। হ্যাঁগো হ্যাঁ—বল্লেই যদি হ'ত? তাও যদি বয়স থাকত তবে ত তোমার পুণ্যির ভাগ নিতুম্। আহা সে পোড়া যে

কবে এল কবে গেল তার ঠিকেনা নেই। আর এপথে আর কি উপায় আছে বল ?

আ। উপায়! উপায়! খুঁজে ত পাচ্ছিনি শশী—উপায় আর কি—এই নে তুই পাণ খা। (শশীকে পাণ দিয়া)—

"আর ভাল লাগে না আমার
বাঁধা কপির চড়চড়ি
রয়ে রয়ে পড়ছে মনে শুল্প শাকের নপড়ি
মজেছে মন কুমড়া শাকে দিয়ে তাতে ফুলবড়ি।"

বাবুকে আজ পাঠিয়েছি বাড়ী, রোজ আর মদের ঢেউ সাম্‌লাতে পারিনি, বুঝ্‌লি শশী...বলেছি তোমার মাগের গলার নেকলেশ যদি এনে দিতে পার, তবে তোমার সঙ্গে ভালবাসা—তবে কথা। শশী তোকে সত্যি কথা বল্‌ছি, আজ পাঁচ বছরেও তাকে ভালবাসতে পার্‌লুম না, কেন তা বল্‌তে পারিনি। লোকে বলে, ঘর কর্‌তে কর্‌তে সয়ে যায়—কই বুঝ্‌লুম না—

শ। কিন্তু তা যা বল বাপু...বাবুর তোমা অন্ত প্রাণ...

আ। একটু কম হলে হাঁফ্‌ ছাড়্‌তে পার্‌তুম্‌ শশী—ওই জন্যেই ত অত জ্বালা...

শ। কি জানি বাপু, তোমার কথার ভাব পাইনে...

আ। (আপনার মনে গান—)

"সরু ধুতিখানি পরিতে না জানি
না জানি বাঁধিতে কেশ—
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়ে
বঁধু চলে গেছে কোন দেশ"—

সেই কথাই এখন মনে পড়ে লো—ওঃ সে কতদিনের কথা—তার ওপর দিয়ে দামোদরের বান ডেকে চলে গেছে—তবু মনে পড়ে—তখন-—

(সুর করিয়া)

'না জানি বাঁধিতে কেশ'।

[নেপথ্যে—পথ বাহিয়া পথিক গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—]

অনুরাগে গল্‌বে তারি মন
কাঁটা তুলে বুকে নিয়ে কর্‌বে লো যতন
ওলো—পরশ রতন
চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি, 'ভালবাসি' গলা ধরে—

আ। বাঃ কি চমৎকার গান—আচ্ছা ওতো সবাই বলে, গলা ধরে আর ভালবাসি বলে, কিন্তু কি যে বলে—বুঝ্‌তে...তাদের কথার মাথামুণ্ড কিছু ত পার্‌লুম না। শশি তোকে মাইরি বল্‌ছি—যখন চুমু খায়, ঠোঁট দুটা পুড়ে যায়...তারা কি শান্তি পায় তা আমি ত বুঝিনি। এক এক সময়ে মনে হয় ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখি ঠোঁটে ফোস্‌কা পড়্‌ল কি না... [(নেপথ্যে)—চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' ভালবাসি গলাধরে] বেশ গলা মিষ্টি কিন্তু লোকটা পাগল নইলে অমন গান গাইতে পারে ..চল রাত হ'ল, শুইগে, আজ বুঝি মিন্‌সে আর ফির্‌ল না। আ-মর খোঁপাটা আবার খুলে যায় কেন...একটা রাত্রি ঘুমিয়ে বাঁচ্‌ব...

[নেপথ্যে রমেন্দ্র—আঙ্‌র! আঙ্‌র! আঙ্‌র। কি আমি ভালবাসিনি বটে, এই দ্যাখ এই দ্যাখ তবে...]

আঃ—ওই নে মড়া বল্‌তে বল্‌তেই হাজির।

র। (রমেন্দ্র প্রবেশ করিয়া)—এই দ্যাখ তার নেকলেশ...কি আঙ্‌র! কি আঙ্‌র! আমি ভালবাসিনি—এই দ্যাখ আঙ্‌র! আঙ্‌র! আমি ভালবাসিনি?

[নেপথ্যে গান—

চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' 'ভালবাসি' গলা ধরে—]

বা ভাই বেশ বেশ, আঙুর! চুমু খেয়ে বল্‌বে হাসি' 'ভালবাসি' গলা ধরে।

আ। তুমি কেড়ে এনেছ?—

শ। (স্বগতঃ) এইত বলি ভালবাসা হুঁ...আর সেকথা...যৌবন যে কবে এল কবে গেল, তা জান্‌তেও পার্‌লুম্‌ না, দূর্‌—দূর্‌—
(হারের দিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান)

আ। তুমি কেড়ে এনেছ?

র। আরে না। সে গলা থেকে খুলে দিলে, আবার বলে কি একটুখানি ব'স—হাহা...হাহা—আঙুর! কেমন এই হারে তোর হার আর আমার জিৎ—এখন এস ঢাল—কেমন এখন মদ খাবে কি না?

আ। ওত তুমি চেয়ে এনেছ, আমি ত কেড়ে আন্‌তে বলেছিলুম, ওত সে আমায় ভিক্ষে দিয়েছে, ও আমি নেব না—আমি কি তোমার ভিখিরী নাকি?

র। কি রকম...কি রকম...আমি তার গলার নেকলেশ ধরে টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌লুম, সে খুলে দিলে...এ ভিক্ষে দেওয়া কি রকম—যাও, যাও ও সব বাজে কথা রাখ, ঢাল—ঢাল।

আ। না নিয়ে যাও তোমার ও নেকলেশ, ও আমি চাইনি, আমার যেমন অদৃষ্ট তাই ভিক্ষে নিতে যাব—যাও—যাও নিয়ে যাও... এই তুমি আমায় ভালবাস? না...

র। কি রকম—দেখ আঙুর—নাঃ—মদ খাবে কিনা—না—তুমি—

আ। না আমি মদ খাব না—কখন—খাব না—

র। খাবে না? খাবে না? খাবে না?

আ। না আমি মদ খাব না। যাও...

র। আচ্ছা চল্লুম—আর যদি কখন—

আ। কি—কি—কখন কি?

র। আর যদি কখন বলি; হুঁ...আর যদি কখন—

আ। কি কি বলনা—বলি বলি কি, বলেই ফেল—

র। না চল্লুম—বলব আর কি...চল্লুম—

আ। আর আস্তে হবে না ত ?

র। দেখা যাবে ..

আ। বটে আচ্ছা দেখা যাবে—

র। দেখা যাবে—এই নে তোর মদ—কোন শালা—আর—

(মদের বোতল ও গেলাস ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল ...)

আঁ। আচ্ছা এই যেন মনে থাকে—

র। (নেপথ্যে) ..হ্যাঁ মনে থাকে।

আ। আর পারিনে; নিজেকে এমন করে মিথ্যা ভাণ করে আর পারিনে শশি! শশি! দেখ্ ত মড়া কোথায় গেল ?...

(শশি জানালার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল; দেখিল রমেন্দ্র টলিতে টলিতে যাইতেছে।)

শ। ওই যে—

আ। যাক্ গে মরুক মুখপোড়া—আচ্ছা কার জন্যে এ করি...কি সুখের জন্যে তা বুঝ্তে পারিনি—দূর···দূর—জীবনটা—মলেই বাঁচি আর ভাল লাগেনা—শশি! ও শশি! চুলোয় যাক, একটা রাত্তির ঘুমিয়ে বাঁচি—আর ভাল লাগেনা—শশি অ শশী—

(ডাকিতে ডাকিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল—আবার ফিরিয়া আসিল।)

আ। ওই যে রস কত—আবার ফিরে আস্‌ছে।

(রমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

র। দেখ আঙুর! আমি আর আস্‌ছিনি।

আ। তবে আর কি সখি রে মরে আছি···তা আবার বল্‌তে—আস্‌বার দরকারটা কি···

র। না তাই বল্‌ছি···চল্লুম···

আ। শোন—তোমার ও নেকলেশ নিয়ে যাও, তুমি কি মনে করেছ তোমার ওই নেকলেশের জন্যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি? কখন না...কখন না...দেখ আমি মেয়ে মানুষ...মেয়ে মানুষের মনের ধরণ বুঝ্‌তে পারি—যে ভালবাসে সে যে কত রকমে তার সেই তাকে চায় এ আমি বুঝ্‌তে পারি—আমি আমার ভালবাসার জিনিস না পেয়ে যে কষ্ট অনুভব করছি, তোমার শোভনাও তেমনি করছে—তুমি ত তা বুঝ্‌তে পার না... তোমার প্রথম স্ত্রী ইন্দিরা যখন গলায় দড়ী দিয়ে ম'ল—তুমি আবার বিয়ে করলে...তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী প্রফুল্ল...ভেবে ভেবে শুখিয়ে মরে গেল—তুমি আবার বিয়ে করলে—আজ শোভনা তোমায় তার গলার নেকলেশ তোমার তৃপ্তির জন্য খুলে দিলে—এ কথাটা ত তুমি বুঝ্‌লে না—আমার কাছে ভাল-বাসা খোঁজ—কিন্তু এত গুলা যে বিয়ে করলে কার জন্যে? তুমি ত আমার এখানেই পড়ে থাক—যখন টাকার দরকার হয় তখন একবার ওঠ, নইলে ত আর কোন সাড়াই মেলে না। আমি ভালবাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে গেছি—তাই কেমন জান্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল—ঘরের বউরা কেমন ভালবাসে—মেয়ে মানুষের কাছে গয়না বড় আপনার,—তাতে মেয়ের কাছে মার গয়না আরো আপনার...তা যখন সে ত্যাগ করে হাতে তুলে দিয়েছে—তখন তাকে যে তুমি কেন বুঝ্‌লে না—এ দুঃখে যে আমি মরি···আমার জন্যে ইন্দিরা গেছে—আমার জন্যে প্রফুল্ল গেছে—আমার জন্যে ··আবার কি...মনে করছ খুব বকছি—তা নয়। দেখ, তোমার এ সব ওই মদের নেশার মত···আমি জানি কাকে ভালবাসা বলে—আমি ভালবাসি কিন্তু তোমাকে নয়—আমি ভালবাসার আগুনে জ্বলে মরছি রমেন! রমেন! আমি আর তোমার রমণী নই···আজ আমার ভেতর ঝগড়া আসছে···আমি সত্যি বলছি—আমি তোমায় ভালবাসিনি—নারীর

লেখা মুছিনি—ভালবাসতেই হবে, ভালবাসি, কিন্তু তোমায় নয়। মেয়ে মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই গেছে...তবু আমি মেয়ে মানুষ···আমার নিজের মনের মত রূপ বুঝি আজও মেলেনি, তাই তোমায় ভালবাসতে পারিনি...

র। আঙুর! আঙুর! ইচ্ছে হচ্ছে···তোর বুকের ভেতর থেকে হৃদ্‌-পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিই!

আ। (হাসিতে হাসিতে) ··তা আমি জানি, কিন্তু নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ত ছিঁড়ে দিতে পার না ··আমরা পারি—যাও, যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও...কিসের আশায় ভালবাস...কিসের জন্যে আঙুর, আঙুর করে এস ··আমি ত তোমায় ভালবাসিনি··· তোমার টাকা চেয়েছি···তোমায় চাইনি···যাও যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও, অনেক...আজ অনেক বছরের ভুল ভেঙ্গেছে।

র। হ্যাঁ যাচ্ছি...যাচ্ছি...টাকা! টাকা! টাকা! আঙুর! আঙুর! যাচ্ছি...ওঃ! স্বপ্ন! স্বপ্ন...পায়ের তেল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, স্বপ্ন! স্বপ্ন!

আ। নেকলেশটা নিয়ে যাও.........পাঁচ বছর পরে এ কথা বল্‌তে তোমার কষ্ট হ'ল—কিন্তু সে দুঃখ আর নেই...আমার আজ হাসি করেছে, হাসি করেছে, হাসি চাইনি হাসি পাইনি, তবু হাসি করেছে...এ হাসি ত তুমি বুঝ্‌বে না...দেখ পাথর বসান রাস্তার পাথরের খোঁচার চেয়ে এ ভালবাসার রাস্তায় আরো খোঁচা ..তাই হাসি করেছে ..

র। স্বপ্ন! স্বপ্ন! ওই...ওই...বেশ ভেসে গেল—

আ। হ্যাঁ বেশ ভেসে গেল ..হ্যাঁ আমার, সে একদিনের সুর ভেসে গেছে—কিন্তু তার সেই রেশ এখনও বাতাসে গুমরে গুমরে মরছে...সেই সুরে আমার প্রাণের বঁধু একদিন গেয়েছিল—আর আমি তাঁতির মেয়ে সেই মাকুর বঁ-বঁ ডাকের

সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে দিব্যি করেছিলুম যে আমার এই বুকের ঘর, আমার এই মুখের চুমু মৃত্যু পর্য্যন্ত সে ছাড়া আর কার' জন্যে ধরে রাখ্‌ব না...কিন্তু ওঃ...আজও সেই তোমার বুকে তোমার মুখে তার স্পর্শ মনে করে চোখ বুজে থাকতুম, চোখ খুলতাম্‌ না...পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তোমায় বুকে জড়িয়ে মনে করতাম তাকেই বুকে করে রয়েছি—কিন্তু এমন করে দুটো হওয়া আর চলে না। যাও যাও আর নয়...আমি তাঁতির মেয়ে পদি একটা, আর এখন এই পদ্মিনী আড়ুর আর একটা...ওই শয্যা ওই যাতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে সব ঢেলে দিতাম সে কি—সে কি উঃ—বলা যায় না, আর বলা যায় না...

র। ওঃ! ওঃ! (বুকে হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল, তারপর সোজা হইয়া মুখ তুলিয়া চলিয়া গেল)

আ। আঃ...একটা যেন পাথর বুক থেকে নেবে গেল এতদিনে তবু একটা সত্যি বল্‌তে পেরেছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

[রাজপথ—একটা ফুলওয়ালা ফুল বেচিতে বেচিতে হাঁকিতেছে ...রাজপথ বাহিয়া দুই চারিজন লোক চলিতেছে...ফুলওয়ালা গান গাহিতেছে আর হাঁকিতেছে—"চাই বেলফুল, চাই বোঁটাকাটা বেলফুল"—]

এনেছি চাঁপা-কলি ফোটেনি যা
ফুটবে ব'লে
ও মুখের সোহাগ পেলে আপ্‌নি দেবে
হৃদয় খুলে
..."চাই বেলফুল"..
আকুল করে এ ফুল আমার
মন ভুলে ছায়

মালা না পর্‌লে গলে প্রাণ
করবে হায় হায়
...ফুল শুখিয়ে যে লো যায়...
কিনে নাও এখনও ফুল
দেব ফেলে বাসি হলে,
আজের সোহাগ রাখ্‌লে তুলে
বল...কাল কি হবে ঝরে গেলে
...."চাই বেলফুল"...

[রমেন্দ্রের প্রবেশ। রমেন্দ্রের চাদর পথের ধূলায় লুটাইতেছে। রমেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে উৰ্দ্ধে তাকাইতে তাকাইতে চলিতেছে...পায়ের ঠিক নাই, টলিতেছে...]

ফু—মশায়। ফুল নেবেন ? চাঁপা চাঁপা কলি, এখনও ফোটেনি, বাতাসে ফোটার মত নিশ্বাস পেলে ফুটবে—নিন্ না...

র—অ্যাঁ...অ্যাঁ...ফুলের গাছ-শুদ্ধ জ্বলে গেছে, জ্বলে গেছে...যা যা...এক গেলাস মদ খাস্ ত বল্...ফুল কি হবে বল্...

ফু—কাল সকালে যে খেতে পাব না মশায়...এ মালা ক'ছড়া যদি বিকোয় তবেই কাল খেতে পাব—মদ কোথা থেকে খাব ? ফুল আর কি হবে—আমাদের সবই পেটের জন্যে।

র। না.. না...ও সব বুঝিনি, তুই মদ খাস্ত বল ক বোতল খাবি ...শোন্ না, শোন্ না, যাচ্ছিস কেন ? পেটের জন্যেই ত—পেটের জন্যেই ত—বল্‌না আমি ও খুব বুঝি। মদ খাবি ? মদ খেলেই পেট ঠাণ্ডা হবে।

ফু। না মশায়, আমার পরিবার মর-মর। এই ফুলের মালা ক'ছড়া বিকোয় ত কাল সকালে তার পথ্য হবে...আপনাদের ফুর্ত্তির প্রাণ...যান্ মশায়...চাই বেলফুল...মদ খেলে পেট ঠাণ্ডা হবে ! বেশ বলেছেন মশায়...

এ মালা পর্‌লে গলে,
পায়ে নাগর পড়ে ভুলে ;
চাই বেলফুল...

র। আচ্ছা তোর ও মালার দাম কত...পায়ে পড়ার দাম ত আমি খুব জানি...

ফু। আপনি ত নেবেন না ? কেন আর আমায় ? এদিকে রাত ঢের হয়ে গেছে মশায়, সন্ধ্যাবেলা বেরুতে পারিনে। সন্ধ্যাবেলায় মাগী বের হতে দ্যায়নি—তার বুকে বড় ব্যথা ধরেছিল...

র। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁরে তোর পরিবার তোকে খুব ভালবাসে—এ্যাঁ হ্যাঁরে ..

ফু। পরিবার ? বলেন কি মশায় ! পরিবার ভালবাস্‌বে না—সকলের পরিবারই ভালবাসে...

র। হ্যাঁরে, আচ্ছা ফুলওয়ালা, শুধু শুধু কি ভালবাসা হয়, টাকা না হলে ··

ফু। টাকায় কি ভালবাসা হয় মশায় ? সে কি কেন্‌বার জিনিষ ? কি জানি মশায় আমরা গরিব লোক।

র। তবে কি রে, হ্যাঁরে ফুলওয়ালা—ভালবাসা কা'কে বলে রে ? ভালবাসা এ্যাঁ...বল্‌না এ্যাঁ।

ফু। (স্বগতঃ) লোকটা পাগল নাকি...(প্রকাশ্যে) কি জানি মশায়, আমরা গরিব লোক, দিন আনি দিন খাই, ভালবাসার আমরা কি ধার ধারি...ভালবাসা—ভালবাসা ! ভালবাসা ভালবাসাকেই বলে...যান্‌ মশায়—

এ মালা পর্‌লে গলে,
আপনি নাগর পায়ে ঢলে ;
...চাই বেলফুল...

র। শোন্ না, শোন্ না, এই নে, এই নে, এই তুই পাঁচটা টাকা নে।

ফু। মশায়! শুধু শুধু আপ্‌নার ঠেঙে টাকা নেব কেন? আর আমার এ মালার দাম ত অত নয়।

র। তা হোক্, শোন্ তুই এই টাকা নে, কাল ছাথ্ আবার যখন টাকার দরকার হবে, তবে আমার ওই বাড়ী, ওখানে যাস্, তোর যত টাকার দরকার হয় নিয়ে যাস্...আর ছাথ্ তোর ওই মালা তোর পরিবারকে দিস্—বুঝ্‌লি? যাঃ তুই ত মদ খাবিনি...যাঃ।

ফু। সে কি মশায়, অত টাকা আমি অম্‌নি কেন নিতে যাব?

র। অম্‌নি কি রে শালা, তোর কথার দাম নেই...মদের দাম লাগে, পাণের দাম লাগে, ভালবাসার দাম লাগে, শালা কথার দাম নেই? তোর কথা কিনে নিলুম,—যাঃ।

ফু। যে আজ্ঞে, কিন্তু আমি ফুলই বেচি, কথা ত বেচিনি...

র। আমি অম্‌নি কথাও কিনিনি—যাঃ শালা...

ফু। লোকটা মানুষ না...দেবতা......যে আজ্ঞে নমস্কার।

(ফুলওয়ালা তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান করিল।)

র। মদের নেশা ছুটে গেছে...মগজের অন্দর মহালে কে যেন ডাঙশ্ মাচ্ছে ..কিন্তু সে নেশা ত ছুট্‌ল না—ভালবাসা! ভালবাসা! সে নেশা ত ছুট্‌ল না...(ঊর্দ্ধে তাকাইয়া) এত ত তারা আকাশে জ্বল্‌ছ, চাঁদও ত দিব্যি হাস্‌ছ, এত পাথর কাঁকর দেওয়া রাস্তা মাড়িয়ে চলেছি, কেউ বল্‌তে পার কোথায়—কোথায়—ভালবাসা কোথায় পাওয়া যায়? কেউ বল্‌তে পার ভালবাসা কা'কে বলে? তুমি গ্যাসের আলো, তুমি যে দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছ ...অম্‌নি জ্বল্‌ছ...ভালবাসা...ভালবাসা...হাহা-হাহা—প্রাণটা কেবল হাহা করেই গেল ..দুনিয়াটা কেবল পোড়া আগ্নেয়গিরির হাহায় ভরে উঠেছে...মদের রসে কল্‌জে জ্বলে, ভালবাসার রসেও কি কল্‌জে জ্বলে যায়? ওঃ কল্‌জে পোড়ার গন্ধ যেন বাতাসে

ভেসে আস্‌ছে, হায় ! হায় ! মদের নেশা আর ভালবাসা...বলি প্রাণ এতদিন তবে কিসে চতুরঙ্ হয়ে আছ, নেশা না ভালবাসা মিথ্যে না সত্যি...নেশা আর ভালবাসা ! মিথ্যা না সত্যি ?

চতুর্থ দৃশ্য ।

[রমেন্দ্রের বসিবার ঘর...ঘরটা আবর্জ্জনায় ভরা, ধূলায় মলিন, জানালার ধারে মাকড়সা জাল বুনিতেছে, গৃহের দেয়ালের চিত্রগুলিও ধূলিক্লিন্ন। কোন ছবিখানার পেরেকের দড়ী একদিক ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কোন ছবিখানা উল্টাইয়া রহিয়াছে। জানালার পর্দ্দাগুলা মলিন ও ছিন্ন ; তাহার মধ্যদিয়া সন্ধ্যাসূর্য্যের আলো গৃহমধ্যে আসিতেছে। খড়্‌খড়ির উপর একটা দাঁড়কাক বসিয়া ক-ক কোয়া ক-কা করিতেছে...রমেন্দ্র ধূলায় ধূসরিত...মাথার চুলগুলি রুক্ষ, নাসিকা রক্তবর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে মদের বোতল ও গেলাস, মদ ঢালিতেছে আর পান করিতেছে।]

র। (মদ ঢালিতে ঢালিতে)—ঢাল্—ঢাল্, খুব ঢাল্, নেশা জম্‌ছে না। সব যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে নেশা জম্‌ছে না... বরফের মত, বাঃ বাঃ—বাবা যেখান দিয়ে যায়—শালা জানান্ দিয়ে যায়...ঢাল্...ঢাল্...(দেয়ালের ছবির দিকে তাকাইতে তাকাইতে)...আচ্ছা ব্যাধ তুই যে হরিণ তাড়া কর্‌লি, ও শালার হরিণ ত দিব্যি পালাল বাবা, ও তোমার তাড়াই সার। ছোট্, ছোট্, ছোট্,...আমি শালাও অমনি ছোট্...ছোট্ ছোট্...ওঃ আঙুর ! আঙুর ! না না ডোবাও। সব ডোবাও সব...আঙুর ! আঙুর ! সব ডোবাও—ওঃ সেই রাতের পর আর দেখা হয়নি—উঃ দিনটা যেন পাহাড়ের মত, নড়্‌তে আর চায় না—ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্...ওঃ আঙুর ! আঙুর ! নাঃ এতক্ষণে কি আর তার রাগ পড়েনি, রাগ পড়েনি...না না বলেছে ভালবাসিনি ভালবাসিনি...ওঃ না বাস্‌লে ত বয়ে গেল ...ঢাল্ ঢাল্ বয়ে গেল . রাতও বুঝি বয়ে গেল ..না যাই

একটা চোখের দেখা...না না...সে যে পর্দ্দা ফেলে দিয়েছে, ওঃ ওঃ...ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্...আঙুর! আঙুর! বাঃ মাকড়া তুই যে খুব জাল বুনছিস্...

[ধীরে ধীরে দরজার সম্মুখ দিয়া শোভনা প্রবেশ করিল...]

র। এই যে তুমিও কি জাল বুনতে এলে নাকি...

শো। জাল বোনা ত আমার কাজ নয়? কি করছ আর মদ খেয়ো না। বুঝ্‌তে পারছ না তোমার পায়ে পড়ি আর মদ খেয়ো না... আচ্ছা কি কর্‌লে তুমি শান্তি পাও বল আমি তাই করি... আমার ত সবই আছে, কি তুমি চাও?

র। শান্তি...শান্তি...শান্তি নয়, শ্রান্তি—শ্রান্তিও ভ্রান্তিতে দাঁড়িয়েছে ...এখন কল্‌জে যাতে ঠাণ্ডা হয় তাই করছি তাই ঢাল্‌ছি...ঢাল্ ঢাল্—বকিয়ো না—যাও আঙুর বলেছে আমায় ভালবাসে না। পাঁচ বছর পরে আঙুর বলেছে আমায় ভালবাসে না ..ওঃ ওঃ ভুল...ভুল...ভুল...সব ভুল—জীবনটাই ভুল...যাও যাও... শ্রান্তি শ্রান্তি—বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি...ক্লান্ত—আঃ ঢাল্ ঢাল্ তবু নেশা জমেনা, কল্‌জে জ্বলে যায়...তবু নেশা জমেনা...ওঃ ওঃ ভালবাসা না সবই নেশা...নেশা...জীবনটাই একটা নেশা...ছুটেছি...কিসের জন্যে, কার জন্যে...আঙুর আঙুর ! বল্‌লে ভালবাসিনি...ওহো...

শো। আমি ত তোমায় ভালবাসি...আমি ত তোমায় ভালবাসি... আমার এই রূপ, এই যৌবন, এই প্রাণের বুকভরা আশার সোহাগ তোমার তরেই ত ধরে রেখেছি প্রিয়তম, এতে কি তোমার ভালবাসা মেটে না? এতে কি তোমার তৃষা মেটাতে পারে না? আমি যে ফুট্‌তে ফুট্‌তে ফুটে উঠ্‌ছি, এ যৌবন বনে পিক কলকণ্ঠের স্বরে আমি যে তোমায়ই খুঁজছি ...জীবন হতে জীবনে, স্বপ্ন হতে স্বপনে, আমি যে তোমারি, তোমায় ভালবাসি—আমি যে তোমারই নারী...

র। ঢাল্, ঢাল্, ঢাল্, কল্‌জে জ্বলে গেল, যাও যাও; কে তোমার ভাল-বাসা চায়? কে...কে তুমি ভালবাসার কি জানি? কিছু না...

শো। ছাখ, ফিরে ছাখ, তোমার জন্যে এমন করে সেজেছি, তবু ফিরে দেখ্‌বে না। ছাখ, ছাখ, সেই ত আমি ফিরে দেখি আমার পায়ের নখেও চাঁদ সূর্য্যি লুটিয়ে যায়—ছাখ, ছাখ, আমি পা পাতি—তার ছায়ায় কমল ফুটে ওঠে...বিধি রূপ দিয়েছে, প্রাণে ভাব দিয়েছে, সেই ভাব দিয়ে এ রূপকে আরো ফুলের কেয়ারিতে তৈরী করে ভাবে ভাবে গড়ন গড়িয়ে তুল্‌ছি। পাপড়িতে পাপড়িতে ঢেউ তুলে ফোটাচ্ছি—এতেও তোমার শান্তি হবে না? এই ত রূপ—রূপ...কি চাও সব দেব, কত ভোগ কর্‌বে বল সবই দেব; তবু—তবু—ভালবাস্‌তে পার্‌বে না—ভাল যে বেসেছি আমি...তুমি কি চাও, কত ভালবাসা চাও—এ অন্তরে যে ভাব সমুদ্র হয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে রূপের আঁকর দিয়ে তান তুল্‌ছে। এ রূপের গান তোমার ভাল লাগে না প্রিয়তম?—প্রিয়তম...ভাব দিয়ে রূপ সৃষ্টি কর্‌ছি ... রূপ—রূপ—তোমারই জন্যে, তুমি ভালবাস্‌বে বলে তাই আমার এত ভাবন...তাই ত আমার এত শোভা, তাই ত আমি শোভনা...

র। চোখে ফোটে ফোটে না, চোখে ভাসে ভাসে না, কানে পশে পশে না—কোথাকার কবেকার কেমন যেন কোন ...কোন...জীবনের সাদৃশ কার রূপের ভাবনা সেই—সেই তোমার ভাবন...না!—না—কল্‌জে জ্বলে যায়—আঙুর! আঙুর! যাও যাও, কে তোমায় চায়...যাও...যাও কে তোমায় চায়...চাই আঙুর...চাই রস...চাই সুখের সেই—আহো কল্‌জে জ্বলে গেল...যাও...যাও...আমি আঙুর চাই...যাও—সরে যাও...যাও...

শোভা। রস, রস, রস, চাও, রস ? অফুরন্ত ভাণ্ডার ভরা কত রস …কত বিচিত্র সুবাসে ভরা অহর্নিশি তোমার তরে আহরণ করিছি। নিশিদিন ভাবসমুদ্রে চন্দ্রসূর্য্য নিঙড়ে নিঙড়ে সুধার আকর—ভাণ্ডার পূর্ণ করে রেখেছি। কত রস চাও প্রিয়তম…দেহের শিরায় শিরায়…বর্ণের লাবণ্যপ্রভায়, অঙ্গের ললিত তারল্যে, স্পর্শের শিহরণে, মুখের মলয় মারুতসম অন্তরের সুবাসে, আঁখির দীপ্তিতে, বায়ুর তরঙ্গ মন্থন করে সপ্ত স্বরের মিলনে যে কণ্ঠের স্বর তুলেছি, তাতে রস আছে,…আরো রস আরো…আরো…বল কি চাও…যৌবন-তরঙ্গ তুলিয়া অকুটন্তকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে মালার মত তোমার সর্ব্বাঙ্গে বেড়ে দেব। বল বল প্রিয়তম…আরো রস…কত বিচিত্রসুধা চাও…বল…বল হে তৃষাতুর! কোন্ সুধা চাও বল। দ্যাখ দ্যাখ কি মধুচক্র এদেহে রচনা হয়েছে… পিও, পিও, প্রাণভরে পিও, তাই দানের জন্যই আমি রচিত হয়েছি… দেহ প্রাণ মন জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব ত তোমারি প্রিয়তম!

রমেন্দ্র। ঝিম্ ঝিম্ মস্তিষ্ক আমার, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত ধায়, কি রোমাঞ্চ উঠে কুতূহলে, পল পল অনুপল কোন জ্ঞান নাই, দেশ কাল সব ডুবে গেছে। ওহো তবু অগ্নি জ্বলে উঠে বুকে, কলজে পুড়ে যায়…আঙুর! আঙুর!… যাও যাও…সরে যাও…তোমারে আমি ত চাই না…যাও… ও রূপে মন বুঝে ওতে ডুবতে পারি না…যাও যাও… কলজে জ্বলে যায়…ঢাল্…ঢাল্…ঢাল্…ওঃ তবু নেশা জমল না…তবু নেশা জমল না।

শোভা। প্রিয়তম, প্রিয়তম, আমি নিজকে জানিয়ে, নিজেকে এমন করে গড়ে তোমার কাছে ধরা দিলাম, সব দেওয়া নেওয়ার পথ খুলে দাঁড়ালাম…তবু…তবু…জীবনে কত ঝড় তুলেছ… সেই ঝড়ের শেষে যে শান্তির মাধুরী—তোমার জন্যে বুকের

লজ্জাবাস খুলে ফেলে এলাম...সর্ব্বকান্তি নগ্ন করে দিলাম, বাতাসের পর্দ্দা পর্য্যন্ত রাখ্‌লাম না...যে রামধনু-আঁকা প্রাণের পাখা খুলে দিয়ে মহাস্বপ্নের জাগরণের মত জীবন সৃষ্টি করে তুল্‌লাম তাতে তোমার শান্তি এল না...তবে... কিসে বল—রূপে নয়, রসে নয়, শব্দে নয়, স্পর্শে নয়, গন্ধে নয়...প্রাণে নয়, মনে নয়, তবে...তবে, কিসে, কিসে অফু-রন্ত ভাণ্ডারও যে আমার ফুরিয়ে এল, তবে...তবে...তবে... প্রিয়তম ! হায় ! বিধি একি দানবের সৃষ্টি...এ নয়নে অন্তরের সে দৃষ্টি কি নাই ..নয়ন ! নয়ন ! তুমি কি বিফলে যাবে...

[শোভনা রমেন্দ্রের মুখের পানে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ...তাহার মাথার বেণী খুলিয়া পায়ে লুটাইতে লাগিল ।]

রমেন্দ্র । (রমেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল) না বুঝি না ধরি ছবি একি কোন গান, যেন স্বপ্ন জীবনের পাতে, খুলে দাও রুদ্ধ দ্বার । তোমার সকল ছবি পাই না যে দেখা—কত রূপ, কই...কই ..ধরি ধরি...না না...না না ; যবনিকা পড়েছে নয়নে...রূপ ! রূপ ! আগুন ! আগুন ! ওহো কল্‌জে জ্বলে গেল...

[দূরে পূর্ব্বাকাশে তখন চন্দ্র উঠিল...জানালার ধারে একটা চাঁপা গাছের ডাল হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, আর তাহার সেই মাদকতাভরা সুবাস ভাসিয়া আসিতে লাগিল...]

শো । হে পিয়াসি ! মিটল না কোন তৃষা তোমার ? কিসের পিয়াস... কিসের পিয়াস...বিশ্বগ্রাসী কোন ক্ষুধা—এই...তবে...তবে... বৃথা এই স্বর্গের গড়া রক্ত মাংস, বৃথা তবে এই দেহের কান্তি এই লাবণ্যের বর্ণভঙ্গিমা ! তবে যাক্, সবই যাক্...এই প্রাণময় স্বর্গের এ অনুপম সৌন্দর্য্যও সে তৃষ্ণা মিটাতে পারলে না...হা বিধাতা ! ধিক্ নারীর এ উচ্ছল যৌবন, ধিক্ তোমার এ সৃষ্টিকে, ধিক্ তবে প্রাণের এ খেলায়...জীবন তবে কোথায়... কোথায়...

রমেন্দ্র। কে জানে কোথায়...ছাখ কোথায়...আমি খুঁজে দেখ্‌লাম —নেশা...তুমি খুঁজে ছাখ...নেশা কি ভালবাসা কে জানে কোথায়...ঢাল্ ঢাল্...নেশা...নেশা ..জ্বালা জ্বালা ..

শো। জ্বালা! জ্বালা! তুমি এক পথে জ্বালা সঞ্চয় করেছ, আমি অন্যপথে জ্বালা সঞ্চয় করেছি ..পর্দ্দায় পর্দ্দায় সে বাজ্‌না বেজে উঠেছিল যে বাজ্‌না বেসুর হয়ে গেছে...একটা পর্দ্দায় বেসুর বেজেছে...জীবনের সমস্ত গানটাই বিফল হয়ে গেল...সংসার, আচার, সকল দিক ফেলে দিয়ে তোমার পথের আলোর দিকে তাকিয়েছিলাম; পথের আলো কুয়াসায় ছেয়ে দিলে; এখন যে হাঁতড়ে মরি...তোমার আলোয় তোমায় দেখিনি... তাই কি সব এমন হ'ল...জ্বালা...জ্বালা...আমার আমি নিয়েই এত ব্যস্ত, তাই কি তোমায় পেলাম না...তাই তুমি ও সব ভাসিয়ে দিলে...

রমেন্দ্র। যদি বা সুর নেশা জমে আস্‌ছিল, তুমি আবার তাকে বেসুর করে তুল্‌লে...নেশা...নেশা...কেন চটাও...ওঃ আঙুর! আঙুর!

[রমেন্দ্রের চাকর সুদর্শন নেপথ্যে গান করিতে করিতে আসিতেছিল "কাঁই কি রাবু রে পিক"। তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল...কি বলিতে গিয়া সাম্‌লাইয়া লইল...]

সুদর্শন। মনিম! মনিম! সোহি...ইয়াড়ি পরহু পরুষত্তম!...মুই কি কইছন্তি...বাবু! বাবু! সোহি আঙুর বাবু আইছন্তি পরা ...সোহি আঙুর বাবু...

রমেন্দ্র। সুদর্শন! সুদর্শন! না...না...বল্‌গে দেখা হবে না...না না... শোন্...কে কে আঙুর!

শোভনা। কে—কে—ওঃ...

[শোভনা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল]...

সুদর্শন ভয়ে জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া যেন কত অপরাধ করিয়াছে...
"সোম্মু অপরাধ ভঞ্জন কর মনিমা !"
রমেন্দ্র। (উঠিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল)...আঙুর ! আঙুর !

পঞ্চম দৃশ্য।

[রমেন্দ্রের বাড়ী...দালান। দালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আঙুর... একখানী মলিন কাপড়পরা, মুখখানা শুখাইয়া লম্বা হইয়া গেছে...চক্ষু ছল ছল...আর একদিকে শোভনার পিতা হরিশচন্দ্র আসিতেছিলেন। হরিশবাবু বৃদ্ধ, পঞ্চাশ বৎসর পার হইয়া গেছে।]

আ। (মাথার অবগুণ্ঠন টানিয়া...হরিশবাবুর দিকে তাকাইয়া)
(স্বগত) কতক্ষণ আর দাঁড়াব, (প্রকাশ্যে) সুদর্শন! ডাক্ না তোর বাবুকে...

হরি। কেগো ওখানে দাঁড়িয়ে...কে...অন্ধকারে...
[আঙুর নিরুত্তরে চুপ করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল]

হরি। সুদর্শন! সুদর্শন!
[রমেন্দ্র টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল]

র। কই...কই...এঃ (শ্বশুরকে দেখিয়া)...

হরি। ওঃ বুঝেছি...বাঃ বাঃ...এরি জন্যে তোমার হাতে আমার একমাত্র কন্যাকে তার জীবন মরণ ইহকাল পরকালের ভার দিয়েছিলাম...বাঃ বাঃ...বাবাজী আমায় চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করালে—দেশবিখ্যাত বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান বলে মহাকৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলাম...বাঃ বারে আমার শালগ্রামশীলা! রমেন্দ্র! তোমার লজ্জা বোধ হ'ল না...সুদর্শন! সুদর্শন! পা ধোবার জল দে...কৌলিন্য! কৌলিন্য...বল্লাল! তুমি দানসাগর বটে...বাঙ্লার মাটি কি বল্লালই গড়েছিল, আর তুমি বল্লাল এই মাটিকে কি মুকুটই পরিয়েছিলে...তবু বাঙ্লা, তোমায় আজ ...বুঝতে পারে না...তোমার বীজ কি চমৎকার ফলি-ফলি-

য়েছে...গৌরব কর, বাঙ্‌লা ইতিহাসের গৌরব কর...তবু বাঙ্‌লা তোমায় আজ বুঝ্‌তে পারেনা তার চৌদ্দপুরুষের ভুল... গলায় পাথর বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিইনি কেন...

[বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন]

আ। তোমার নেকলেশ ফিরিয়ে নাও...তোমার নেকলেশ ফিরিয়ে দেবার জন্যে এসেছি...

র। আঙুর! আঙুর!

আ। না, তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা কইবার অবসর নেই...

র। আঙুর! আঙুর! ঠিক্...ঠিক্...কার কোন অবসর নেই... ওহো ঠিক্...পাঁচ বছর পরে আমার কিন্তু খুব অবসর হয়েছে...

আ। আমি চল্লুম আর তোমায় কি বল্‌ব...আমি যে তোমায় ভাল-বাসতে পারিনি সেজন্যে আমিই দুঃখী...পার্‌লে বুঝি...

[আঙুর অগ্রসর হইল—রমেন্দ্র উন্মত্তের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল। আঙুর অঞ্চল ছাড়াইয়া চলিয়া গেল .রমেন্দ্র সেইখানে বসিয়া পড়িল...]

সুদ। সো হি মনিম মুত কছু না জানি পরা...সোহি মনিম অবধাড় মুত কইছিলা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শোভনার ঘর...শোভনা দূরে সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া... গৃহকোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে, শোভনা সেই পোড়া বাগানের দিকে তাকাইয়া...তাহার চক্ষু জলে ভরা...হরিশচন্দ্রের প্রবেশ...]

হরি। তুইও মর্ আমিও মরি...শোভনা সেই ঠিক্...আর এ সব দেখ্‌তে পারিনে...শোভনা, তোর মা অনেকদিন এগিয়ে গেছে, আমাকে যে বামনী খাড়ু হাতে দিয়ে কেন এখন ডাকে না তাই ভেবে উঠ্‌তে পারিনি...কুলের মাথায় মারি ঝাড়ু...

[শোভনা পিতার মুখের পানে একবার চাহিয়া আঁখি নত করিল —তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল।]

শোভনা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) বাবা...কখন এলে...

হরিশ। এই আসছি...আমি কাল বৃন্দাবন যাব। আর কি করব ? যা ছিল সবই তোকে দিয়েছি...সবই তোর...কিন্তু বুড়া বয়সে বড় অশান্তি শোভনা ! আজ যদি তোর মা থাকত...এসব আর দেখ্‌তে পারিনি। গলায় পাথর বেঁধে তোকে গঙ্গায় দিই নি কেন তাই ভাবছি...যাই...একবার বেয়ানের সঙ্গে দেখা করিগে...

(হরিশের প্রস্থান)

শোভনা। রূপ মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা, রস মিথ্যা, আমার ভাণ্ডারে কিছু নেই তবে—কিসে এ হবে...ওইত আরসিতে দেখ্‌ছি তরঙ্গে তরঙ্গে কাণায় কাণায় রূপ চল্‌কে পড়্‌ছে, এ রূপেতে জয় হল না তবে কিসে হবে ! আরসিতে রাত্রে দেখ্‌তে নাই, শেষ দেখিনি। আমিও ত আর রাত দেখ্‌ব না। রূপ ত তবে কিছু নয়—চাই জীবন চাই—প্রাণ—এই রূপের পেছনে যে প্রাণ আছে তা দিলে কি হয় না ? এরূপের শেষ ত মৃত্যু...মৃত্যু...মৃত্যু—এ মরার পেছনে দেখ্‌ছি জীবন। ওই গোলাপ পুড়ে যাওয়ার পিছনে দেখ্‌ছি আর একটা জীবন...জীবন দিলে জীবন পায়। তবে স্বামিন্ প্রিয়তম, সব দিতে পারিনি তাই তোমায় পেলাম না। সব দিলেই তবে তোমায় পাব...পাবার জন্যে দেব কি ? না, দেবার জন্যেই দেব...রূপ মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা, রস মিথ্যা, এ মৃত্যুও মিথ্যা। মিথ্যা তবে এই জীবন...এ জীবন দিলে তবে জীবন পাওয়া যায়...তবে...তবে...জীবনের তবে জয় নয়...জয় তবে মৃত্যুতে, না মৃত্যুর পরে...কিন্তু...কিন্তু...বাঃ এইত ঠিক্। ভাবনা কি ! একটা গলায় দড়ী দিয়ে, একটা শুকিয়ে, আর একটা অবে পুড়ে...দিক্ হারাতে বসলাম নাকি—না না ঠিক্—ঠিক্

এই ত উপায় রয়েছে...(এক বোতল কেরোসিন তৈল ঘরের কোণ হইতে লইয়া) দিতে হবে—দিতে হবে—দিলেই তবে পাব। তবে এই নাও তোমার সকল ভোগের অগ্নিতে নিজেকে দিলাম তোমারই জন্যে...স্বামিন্...আমাকে দিতে হলে আমাকে দিতে হবে। তবে তাই নাও, তোমার সকল ভোগের জ্বালা যেন আমার দাহনে শেষ হয়। নাও অগ্নি, শুদ্ধি কর—স্বামীর ভোগের অগ্নিতে ইন্ধন করে দিয়েছি...ভোগের শেষ কর...শুদ্ধি কর...জীবন নাও...তাঁর জীবন দাও।

[শোভনা এক বোতল কেরোসিন সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিয়া...ঠিক্ বুকে অগ্নি লাগাইয়া দিল]

শোভনা। আঃ কল্‌জে ঠাণ্ডা হয়ে গেল...কল্‌জে জ্বলে যায়...কল্‌জের আগুন আমি নিলাম। স্বামিন্ তোমার হৃদয়ে শান্তি আসুক। মরণ! জয় তোমার নয়, জয় আমার, জয় জীবনের ...মরণ! মরণের—তোমার জন্য মরিনি...জীবনের জন্য—জীবন দিলাম জয় মরণে...(শোভনা স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল) বাবা! আর তোমার শোভনার ভাবনা ভা‌‌বতে হবে না। [শোভনার পিতা...দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—]

হরি। শোভনা! শোভনা! কি কর্‌লি...কি কর্‌লি...আর সাম্‌লাতে পারলিনি? বাঃ বাঃ...

(শোভনার কাপড় ছাড়াইতে গিয়া তাঁহার কাপড়ে অগ্নি লাগিয়া গেল...শোভনাও পড়িয়া গেল...শোভনার পিতাও জ্বলিতে জ্বলিতে...পড়িয়া গিয়া...)

তবে আয় আয় বাপে ঝীয়ে এক সঙ্গে যাই...আয় মা...মা...বেশ বৃন্দাবন যাত্রা হ'ল...সে কোন নব বৃন্দাবন!

[হরিশচন্দ্রও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন...এদিকে...সুদর্শন...ছুটিতে ছুটিতে আসিল।]

সু। কি হইল পরা...হায়! পরভু পরুষত্তম হায় পরভু পরুষত্তম... সো মুই কি করিলা...অপরাধ ভঞ্জন করু হা পরভু পরুষত্তম ...সোহি মনিমা এমর্ত্তি হইলা পর্রী...

[রমেন্দ্রের মাতা ও রমেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।]

রমে-মা। ওরে আমার সব ঘরদোর সব জ্বালিয়ে দিলে। আরে আঁটকুড়ির ব্যাটাবেটী! এমন করলি, ওরে আমার অমন ঘর জ্বলে গেল রে...ওমা এমন হাড়ে নাড়ে জ্বলন—

র। চুপ চুপ—চারিদিকে হাহা করছে, চুপ, দেখ্‌ছ না—মা সেই গোলাপ পুড়ে গেছে, চুপ...চুপ...চারিদিকে হাহা হাহা... হাহা হাহা হাহা...ফুট্‌তে চেয়েছিল, ফুট্‌তে চেয়েছিল, ফুট্‌তে পেলে না, পুড়ে গেল...ছাখ ছাখ কেমন আলো...আমার আমার তাপে...হাহা ভালবাসা...হাহা...ঘর জ্বলে আলো হয়ে গেছে। মা, মা...নেশা ছুটেছে, নেশা ছুটেছে...ও পোড়াই ভালবাসা...ওই পোড়াই তিনটে জীবন দিয়ে একটা জীবন চিনে নিলে। বাঃ বাঃ বারে নেশা আর ভালবাসা...

সু। হা! পরভু পরুষত্তম অবধাড় সোহি অপরাধ ভঞ্জন করুন।

(যবনিকা পতন)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৫]

তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা।

কোনও বিষয় বা ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে চাহিলে, চলিত কথাতেও আমরা তার "তত্ত্ব" লইয়া থাকি। যাহা জানিতে চাহি তাহা জানিতে না পারিলে, "তত্ত্ব" পাইলাম না বলি। অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমাদের কোনও বিশেষ জ্ঞানলাভেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, চলিত ভাষাতেও তাহাকেই "তত্ত্ব" বলে। আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষাতেও "তত্ত্ব" শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার দ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানলাভেচ্ছার নিবৃত্তি হয়, যাহা জানিলে ধর্ম্ম কি আর ধর্ম্ম কি নহে, এ বিষয়ে আর কোনও কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্ব। সেইরূপ যাহা জানিলে ব্রহ্মসম্বন্ধে আর কোনও কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানলাভেচ্ছা যাহার দ্বারা নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়, তাহাই কৃষ্ণতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের একটা ইতিহাস আছে; ধর্ম্মতত্ত্বের আছে, ব্রহ্মতত্ত্বেরও আছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যাগযজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্মকেই লোকে ধর্ম্ম বলিত। এই ধর্ম্মশব্দ এখন আমরা যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, একদিন তাহার এ ব্যবহার ছিল না। আমরা এখন ইংরাজি পড়িয়া, ইংরাজের রিলিজিয়ানের কথা শুনিয়া, এই রিলিজিয়ানের প্রতিশব্দরূপেই আমাদের পুরাতন ধর্ম্মশব্দকে নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম আর বিলাতী রিলিজিয়ান একই ভাবদ্যোতক বা একই বস্তু-জ্ঞাপক শব্দ নহে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশের রিলিজিয়ানের দুইটি বিভাগ

ছিল। এক কর্ম্মকাণ্ড, অপর জ্ঞানকাণ্ড। আর এই কর্ম্মকাণ্ডের রিলিজিয়ানকেই মুখ্যভাবে আমরা ধর্ম্ম বলিতাম। এই কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বিহিত কর্ম্ম কি; আর অবিহিত কি; কোন্ যাগযজ্ঞাদি কি ভাবে করা উচিত, আর কি ভাবে করা উচিত নয়;—লোকের মনে যখন এই সন্দেহের উদয় হইল, তখনই এই ধর্ম্মবস্তু সম্বন্ধে সত্য ও প্রামাণ্য জ্ঞানলাভেচ্ছাও তাঁহাদের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। এই জ্ঞান-লাভেচ্ছাকে আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'জিজ্ঞাসা' কহে। ধর্ম্মসম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসার উদয় হইলে, জৈমিনি মুনি পূর্ব্ব-মীমাংসায় ইহার নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। এই মীমাংসার প্রথম সূত্র—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"। অথ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়: এক মঙ্গলাচরণ স্বরূপ, অপর সাধারণ 'অনন্তর' অর্থে। ভাষ্যকারেরা বলেন, এখানে ইহা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'অথ শব্দ' মঙ্গলাচরণার্থে এবং আনন্তর্য্যার্থে, এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আনন্তর্য্যের তাৎপর্য্য কি? 'অনন্তর' বলিলেই একটা কিছুর পরে বুঝায়। সেই বস্তু বা ঘটনা কি যাহার পরে এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে? এই বস্তুটি ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা সাধারণ অথচ সন্দেহ-বহুল জ্ঞান। যার কোনও জ্ঞান নাই, তার সত্যাসত্যাদি বিষয়ে মনে কোনও প্রশ্নের উদয়ও সম্ভব নহে। অজ্ঞাতের জিজ্ঞাসা অসম্ভব। জিজ্ঞাসা অর্থ জানিবার ইচ্ছা। আর জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের কোনও ইচ্ছার উদয় হয় না, হইতেই পারে না। সর্ব্বথাই "জ্ঞানাজ্জন্ম ভবেৎ ইচ্ছা"—জ্ঞান হইতেই ইচ্ছার জন্ম হয়। যেমন একান্ত অজ্ঞাত বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা জাগিতেই পারে না; সেইরূপ যাহাকে নিঃশেষে জানিয়া ফেলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধেও কোনও জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যে বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানমাত্র আছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান নাই; যাহার সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাহা হইতেই যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, তার নিঃশেষ উত্তর পাইবার মতন জ্ঞানলাভ এখনও হয় নাই, কেবল তাহারই সম্বন্ধে সত্য জিজ্ঞা-

সার উদয় হইতে পারে। বেদোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের একটা সাধারণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু বেদে যাহাকে বিহিত কর্ম্ম বলিয়াছে, সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, তাহার দ্বারা কোন্ কর্ম্ম কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা স্থির জানা যায় না; এই ভাবটি যখন সমাজের লোকের মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল, তখনই প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই "ধর্ম্মজিজ্ঞাসার" উদয় হয়। জৈমিনি মুনি এই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্যই পূর্ব্বমীমাংসা রচনা করেন। উত্তর-মীমাংসা বা বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রেরও প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। এখানেও 'অথ' শব্দ মঙ্গলাচরণরূপে ও আনন্তর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানেও ব্রহ্মবস্তু কি আর কি নয়, এ বিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞান; সেই জ্ঞান হইতেই বিবিধ সন্দেহের উদয়; সে সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য যতটুকু জানা আছে, তাহা যথেষ্ট নহে এই ধারণা; এই 'অথ' শব্দের দ্বারা এই গুলিই সূচিত হইতেছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, অথচ জৈমিনি যাহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়াছেন, তাহার উদয় হইল, ইহা অসম্ভব। এই কর্ম্মকাণ্ডের যতটুকু জানা আছে তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা, বিহিত-অবিহিত, প্রভৃতি বিষয়ে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই, অথচ এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল, ইহাও অসম্ভব। জৈমিনি স্বয়ংই এসকল স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মীমাংসার প্রথম কথাই "শাস্ত্র"—অর্থাৎ বেদের অস্তিত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং বেদ কি বলে, আর কি বলে না, তার সাধারণ জ্ঞান। জৈমিনি মীমাংসার দ্বিতীয় কথা—"সন্দেহ"। অর্থাৎ বেদবাক্যের অর্থসম্বন্ধে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য, এই দ্বিধা। বেদ যে মানেনা, বেদের সত্যাসত্য লইয়া সে মাথা ঘামাইবে কেন? বেদ যে পড়ে নাই, বেদের মধ্যে যে নানার্থদ্যোতক পরস্পর-বিরোধী উপদেশ আছে, ইহাই বা সে জানিবে কিসে? এই জ্ঞান যার নাই, বেদসম্বন্ধে তাহার অন্তরে কোনও সন্দেহেরই বা উদয় হইবে কেন? এইরূপ সন্দেহ না জাগিলে, তার নিবৃত্তির জন্য

বেদোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছাই বা জন্মিবে কিরূপে ? জৈমিনি যাহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে এতগুলি বিষয় রহিয়াছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পশ্চাতেও আমাদের দেশের উপনিষদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চার এইরূপ একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া আছে। উপনিষদে ব্রহ্মের কথা আছে। উপনিষদ বেদের অঙ্গ বলিয়া বেদেরই মতন প্রামাণ্য। এই উপনিষদে ব্রহ্মসম্বন্ধে নানা উপদেশ আছে। এই সকল উপদেশের মধ্যে আপাততঃ বিস্তর অনৈক্য এবং বিরোধও দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা উপনিষদ আত্মার, কোথাও বা প্রাণের, কোথাও বা ইন্দ্রের উপাসনা পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও বা ব্রহ্মকে অদ্বৈত, কোথাও বা দ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এসকল পরস্পর বিরোধী কথা হইতে উপনিষদ সত্য সত্য কি উপদেশ দেন, এই বিষয়ে লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহের মুখেই বাদরায়ণোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল। সকল জিজ্ঞাসার পশ্চাতেই এইরূপ একটা পূর্ব্ব-ইতিহাস থাকে। সেই ইতিহাসটি ধরিয়াই তত্তৎ জিজ্ঞাসার আলোচনা করিতে হয়।

আমাদের পুরাতন শাস্ত্রসাহিত্যে যেমন এই জানিবার ইচ্ছাকে 'জিজ্ঞাসা' বলে, সেইরূপ যাহার দ্বারা এই ইচ্ছার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, তাহাকেই 'তত্ত্ব' বলে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহাই ধর্ম্মতত্ত্ব। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। সেইরূপ কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহাকেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব বলা যায়। এই কৃষ্ণতত্ত্বের পশ্চাতে একটা কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা থাকা চাই। এই জিজ্ঞাসা হইতেই এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর এই কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার পশ্চাতেও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস অবশ্যই আছে। খামাখা জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। জিজ্ঞাসা না জাগিলে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না। অনুসন্ধান ব্যতীত তত্ত্বের প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠাও হইতে পারে না।

পুরাতন শাস্ত্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা দেখিতে পাই ; কিন্তু কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার ত কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মতন প্রকাশ্যভাবে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা নামে কোনও বিশিষ্ট তত্ত্বজিজ্ঞাসার উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না, ইহা সত্য ; কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে বহুদিন হইতেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে। এই কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা পুরাতন ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই অন্তর্ভূত হইয়া আছে। এদেশের বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই অতি নিগূঢ়ভাবে কৃষ্ণতত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছে। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র, ভারতের প্রাচীন দর্শনসকলের মধ্যে যাহা উত্তরমীমাংসা নামে পরিচিত, এবং ভগবদ্গীতা, এই তিনই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণ্য শাস্ত্র। এই প্রস্থান-ত্রয়ের আশ্রয়েই আমাদের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ সাধন ও উচ্চতর সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিনখানাই ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র। এই ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের মুক্তির একমাত্র পথ—"নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।"

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥

শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন যে মানুষ যদি কখনও এই আকাশকে চামড়ার মত গুটাইয়া আপনার মুষ্টিবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ এমন অঘটন যদি কদাপি ঘটে, তবে তখন দেবতাকে—অর্থাৎ অন্তরের শ্রেষ্ঠ আকাশে—পরম-ব্যোমে—যিনি দীপ্তি পাইতেছেন, সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে না জানিয়া জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে, তার আগে নহে। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা এই তিনখানিই ভারতের এই মুক্তিশাস্ত্রের ভিত্তি। ভারতের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত ও সাধনই এই প্রস্থানত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই তিনখানাই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল ও আদি

শাস্ত্র। আর এই তিনখানাই কৃষ্ণজিজ্ঞাসারও মূল। উপনিষদ হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল। বেদান্তসূত্র উপনিষদের বিবিধ উপদেশের সমন্বয় করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপনিষদ হইতে যেমন প্রথমে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা হইতেই মূল কৃষ্ণজিজ্ঞাসার উদয় হয়। মূল বলিতেছি এই জন্য যে শ্রীকৃষ্ণের নামের সঙ্গে সেখানে এই জিজ্ঞাসা জড়িত হয় নাই। বেদান্তসূত্র, সর্ব্বোপনিষদের সমন্বয় করিয়া, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে জগতের জন্ম-আদির মূলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভগবান্ ভাষ্যকরের কথায়,—"সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেন এতস্য অর্থস্য সমনুগতানি।" সকল বেদান্তে (অর্থাৎ উপনিষদে) বাক্যসকল তাৎপর্য্যের দ্বারা একবাক্য হইয়া এই অর্থেরই অনুগমন করে। "এই অর্থ"—এখানে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মের জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতেছে। বুঝিলাম বা মানিলাম যে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ মাত্র পাইলাম। স্বরূপের সন্ধান ত পাইলাম না। আর তটস্থলক্ষণার দ্বারা যতটুকু বুঝিলাম, তাহাতেও ত সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইল না। ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা; কিন্তু এই সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কিরূপ? তিনি জগৎ-কারণ। কিন্তু কারণ বলিতে আমরা দুইটি ভাব বুঝি। বস্তুর উৎপত্তির কারণ দুই, এক উপাদান, অপর নিমিত্ত। ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। কুণ্ডলবলয়াদির উপাদান কারণ সোনা, নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকার। ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কারণ? বেদান্ত হইতেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দু'ই। কিন্তু এখানে সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর এবং জটিল জিজ্ঞাসারই উদয় হয়। এই জগতে দুইটি বস্তু দেখিতে পাই। আমাদের

অভিজ্ঞতার অগণ্য বিষয়সমূহ এই দুই বস্তুতে নিঃশেষে বিভক্ত হইতে পারে। এক জড়, অপর চৈতন্য। জড়-চেতনের সমষ্টিকেই আমরা জগৎ বলিয়া জানি। আর এই জগতে জড়কেই সচরাচর আমরা বস্তুর উপাদানকারণ, আর চৈতন্যকে তার নিমিত্তকারণ রূপে প্রত্যক্ষ করি। ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, দু'ই হন, তাহা হইলে, তিনিও জড়-চেতনময় হইয়া পড়েন না কি? সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করি কিরূপে? ব্রহ্ম-সূত্র বা উত্তরমীমাংসা যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল প্রশ্ন উঠে। আর এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই-য়াই এই ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যও রচিত হইয়া, নানা তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় আজিকালি আমরা কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধানে চলিয়াছি, এই সকল জিজ্ঞাসার মধ্যেই তাহা প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়া আছে।

উপনিষদ্‌ যে ব্রহ্মের উপদেশ করেন, বেদান্তসূত্র বা উত্তর-মীমাংসা যে ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? সাধন কি? সেই ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের ও জীবের সম্বন্ধ কি রূপ? সেই ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? বেদান্ত এবং বেদান্তসূত্র দু'য়েতেই এ সকল জিজ্ঞাসার উদয় হয়। বেদান্তসূত্রে যে ব্রহ্মমীমাংসা হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় না। হইলে ভগবদ্গীতায় আবার এই সকল তত্ত্বের সমন্বয়ের চেষ্টা হইত না, তার কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। আর বেদান্তসূত্রেরও বহুবিধ সাম্প্রদায়িক ভাষ্য রচিত হইত না। অন্যদিকে গীতা এই সকল প্রশ্নের সমন্বয় করিতে যাইয়াই, আবার একটা অতি বিরাট 'জিজ্ঞাসা' জাগাইয়াছেন। গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ কে? গীতাই এই প্রশ্ন জাগাইয়া দেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।

আমিই, হে গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতান্তর্যামী আত্মবস্তু; আমিই ভূত সকলের আদি, মধ্য এবং অন্ত। উপনিষদ "যতোবা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—"যাহা হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়" বলিয়া যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই সেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থাপন করিতেছেন। উপনিষদে বিশেষভাবে ব্রহ্মকে অব্যক্ত, অক্ষর, বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য আবার এই উপনিষদেই এই ব্রহ্মকে "আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং"—জীবের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় আত্মবস্তুও বলিয়াছেন। "শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যে জীবের অহংপ্রত্যয়বাচক আত্মবস্তুকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। উপনিষদে ব্রহ্মের জগদাতীত ও জগদ্ব্যাপ্ত দুই ভাবই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একদিকে যেমন উপনিষদের কতকগুলি উপদেশ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেইরূপ আবার অন্য শ্রুতিসকল এই ব্রহ্মকেই সগুণও বলিয়াছেন। এসকলই সত্য। আর এইরূপ নানা সিদ্ধান্তের ও নানা মতবাদের কথা উপনিষদে আছে বলিয়াই, এসকলের যথাযোগ্য সমন্বয় ও সঙ্গতি করিয়া, উপনিষদ্ কোন্ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ঠিক করিবার জন্য উত্তরমীমাংসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু গীতাতে এমন কিছু কিছু পাওয়া যায়, যাহা ঠিক উপনিষদে বা ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টতঃ পাওয়া যায় না। প্রথম কথা অবতারবাদ। এই অবতারবাদ গীতার নিজস্ব বস্তু। উপনিষদেও ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন সংবাদে ইন্দ্র আপনাকেই পরম-উপাস্য ও পরমগতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সত্য। বেদান্তসূত্র—"শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশ বামদেববৎ" —বেদে বামদেব ঋষি যেমন ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মনু ছিলাম", "আমি সূর্য্য হইয়াছি", এখানে কৈষিতকী-

ব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন সংবাদে, ইন্দ্রও সেইরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন—"মামেব বিজানিহি", "মামুপাস্ব"—'আমাকেই জানিতে চেষ্টা কর,' 'আমারই উপাসনা কর,'—এ সকল কথা কহিয়াছেন ;—এই বলিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই নিজেকে ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেখানে কেহ কেহ এই ভাবেই তাঁর উক্তির অর্থ গ্রহণ করিতে বলেন, ইহাও জানি। কিন্তু "শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশ বামদেববৎ" সূত্র অবলম্বনে গীতার সকল কথার মীমাংসা হয় না। আর গীতার মূল কথা এই কৃষ্ণ-কথা। একটু তলাইয়া দেখিলেই, গীতাতেই যে সত্যভাবে কৃষ্ণজিজ্ঞাসার সূচনা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণতত্ত্বকে ছাড়িয়া, গীতার জ্ঞানযোগই বলি, কর্ম্মযোগই বলি, আর ভক্তিযোগই বলি, এ সকলের কিছুরই সন্তোষকর মীমাংসা হয় না। এই তত্ত্ব উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের বিরোধী নহে, একান্ত অতিরিক্তও নহে। কেবল উপনিষদে যাহা বীজরূপে আছে এখানে তাহাই অঙ্কুরিত।

কৃষ্ণজিজ্ঞাসার ইতিহাস খুঁজিতে যাইয়া সকলের আগে, এইজন্য, আমাদিগকে ভগবদ্গীতার আলোচনা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অন্তর্যামী

১।

তুমি হাসিতেছ বঁধু! তাই মনে হয়
সেই পথখানি মোর কাছে অতিশয়!
এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মত,
মন-উপবনে মোর ঘুরিছি সতত!
তবু পথ নাহি মিলে দিশাহারা মন,
রূপ-রস-গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন!
সব গীতি থেমে গেছে ছিন্ন ফুলহার—
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার।
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত!

২।

পথের লাগিয়া মন মন-পথবাসী
আমি ত আমাতে নাই শুধু কাঁদি হাসি।
গৃহহীন একা যেন স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথে পুনঃ স্বপ্ন যায় টুটি!
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে
আকুল নয়নে, কার অশ্রুজল ঝরে!
সে যে আমি সে যে আমি, আমি সে পাগল।
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল!
মন-মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই!

৩।

সব তার ছিঁড়ে গেছে, একখানি তার
প্রাণ-মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে একটি আশায়,
ভূলুণ্ঠিত প্রাণ-লতা আকাশে দোলায়!—
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার,
এক সুরে প্রাণ-মাঝে কাঁদে বার বার!
সব কর্ম্মশেষে আজ মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথবাসী
সেই পথ খানি মোর গয়া-গঙ্গা-কাশী!

৪।

সে পথের হইতাম ধূলি-কণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি!
বুকে বুকে থাকিতাম
কভু নাহি ছাড়িতাম
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি।
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি
মিশে মিশে হইতাম পদরজ-রাজি,—
আঁকড়িয়া থাকিতাম
মিশে মিশে হইতাম
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি!

৫।

ধূলায় ধূসর তার চরণ তলায়
ধূলি হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায়!

কিছুতে না ছাড়িতাম
জেগে লেগে রহিতাম
সেই পথ-পথিকের চরণ তলায়!
এক দিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির-সোপানে!
কি গান যে গাহিতাম
হাসিতাম কাঁদিতাম
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির-সোপানে!

৬।

কি আর কহিব বঁধু! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল:
আমি মত্ত দিশাহারা
দীন কাঙ্গালের পারা
একটি আশার আশে পথের পাগল!
নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল,
সব অঙ্গ স্বর স্বর শিথিল বিকল,
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি!—
বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগালেরে আর তুমি কর'না পাগল!

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩২১—বৈশাখ ১৩২২

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নারায়ণের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩॥০ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য সাধারণতঃ ।৵০ আনা এবং ডাক মাশুল ৴০ আনা। সচিত্র বিশেষ সংখ্যার মূল্য ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ ১৩২১—বৈশাখ ১৩২২

প্রথম খণ্ডের

সূচীপত্র।

[বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক।]

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্তর্যামী	৪,১২৯,৪৫৬
অর্জ্জুনা পুষ্করিণী	৫২৮
আমার কথা	৩৯৯
আমার শিল্প	১০৯
আরো কিছু আমার কথা	৪৬৮
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র	৫৬৩
ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র	৫৯৭
কবিতার কথা	৩০৩
কল্যাণী (গল্প)	২৫৯
চরিত্ত-চিত্র (বঙ্কিমচন্দ্র)	৬৪৮
চার্ব্বাক-দর্শন	৩৩১
চির-কিশোর (কবিতা)	২৩২
জীবন-পথে (কথা-নাট্য)	৪৩৭
ডালিম (গল্প)	১৫৯
দান (কবিতা)	২৪৯
দুঃখী দাদা (গল্প)	৩৬৯
ধোঁয়া	৩৪৬
নিবেদন (কবিতা)	৪১০
নূতনে পুরাতনে	৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পৌরাণিকী কথা	৮৫,২৩৩,৪১১
পল্লী-মাঠে (কবিতা)	৫৬১
প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক	২৮৩ ✓
ফাঁকা	১১৯
ভল্লুকের বুদ্ধি	৩২৫
ভাষার কথা	১৪৬, ২২৬
মাঝে থাকা	২৫০
মৃণালের কথা (গল্প)	২০
রজনী (সমালোচনা)	৫৭২
রাসলীলা (কবিতা)	২১২
বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের দেববাদ	৩৬২
বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়	৫১৬
বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ঘারবান "পাঠক"	৬৩৫
বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী	৫৩০
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা	৫৫২
বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি	বৈশাখ সংখ্যা, পরিশিষ্ট।
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—"গীতার" কথা	৬২১
বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিতা	৬০৬
বঙ্কিমবাবু	৫৮৮
বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত	৬০৯
বঙ্কিম-স্মৃতি	৬১৮
বাঙ্গালার আদি নাটক	৪২১
বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের পূর্ব্বকথা	২০১
বিরহে (কবিতা)	২৯২
বিবসনা (কবিতা)	৩৪৪
বিশ্ব-দর্পণে (কবিতা)	২১২
বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	৫৭, ১৩৩, ২৪৪, ৩৮৯, ৪৫৯
বৃন্দাবন (ভ্রমণ)	৯৭, ৪২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বংশী-ধ্বনি (কবিতা)	৪৮৮
শক ও শকাব্দ	১৭২
শান্তি-স্বপ্ন (কবিতা	৩২৪
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	১৮৫, ২৯৩, ৩১৭, ৫০৫
সেকালের স্মৃতি (বঙ্কিমচন্দ্র) ...	২১৫, ৩৩৭, ৪৭৭, ৫৪৫
স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ...	৬৬৩
স্তব	১
হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব	৭১০

সূচীপত্র।

[লেখক ও লেখিকাগণের নামানুসারে]

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
দুঃখী-দাদা ...	শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ...	৩৬৯
চির-কিশোর (কবিতা) ...	শ্রীকালীদাস রায় ...	২৩২
পল্লী-মাঠে (কবিতা) ...	শ্রীগণেশচন্দ্র রায় ...	৩৬১
দান (কবিতা) ...	শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী	২৪৯
বিশ্ব-দর্পণে (কবিতা) ...	„ ...	২১২
বঙ্কিম-স্মৃতি ...	শ্রীচণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬২৮
আমার কথা	শ্রীমতী জগদম্বা দেবী ...	৩৯৯
আরো কিছু আমার কথা ...	„ ...	৪৬৮
বৃন্দাবন (ভ্রমণ) ...	শ্রীজলধর সেন	৯৭, ৪২৫
রজনী (সমালোচনা) ...	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল ..	৫৭২
বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান "পাঠক"	শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৩৫
স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৬৩৩

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
পৌরাণিকী কথা ...	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫, ২৩৩, ৪১১
শান্তি-স্বপ্ন (কবিতা) ...	শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ...	৩২৪
অর্জ্জুনা পুষ্করিণী ...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	৫২৮
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা ...	" ..	৫৫২
বিবসনা (কবিতা) ...	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ...	৩৪৪
বংশী-ধ্বনি (কবিতা) ...	" ...	৪৮৮
রাসলীলা (কবিতা) ...	" ...	২১২
ভাষার কথা ...	শ্রীমন্মথনাথ বসু ...	২২৬
শক ও শকাব্দ ...	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ...	১৭২
ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২৭
ভল্লুকের বুদ্ধি ...	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩২৫
বঙ্কিমবাবু ...	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র ...	৫৮৮
চরিত-চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ...	৬৪৮
নূতনে পুরাতনে ...	" ...	৫
ভাষার কথা ..	" ...	১৪৬
মৃণালের কথা ...	" ...	২০
বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের দেববাদ	" ...	৩৬২
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ...	" ১৮৫, ২৯৩, ৩১৭, ৫০৫	
বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিতা)	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ...	৬০৬
হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব ...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল ...	৭১
প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ...	২৮৩
বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের পূর্ব্বকথা	" ...	২০১
বাঙ্গালার আদি নাটক ...	" ..	৪৯১
নিবেদন (কবিতা ...	সম্পাদক ...	৪১০
স্তব ...	" ...	১
কবিতার কথা ...	" ..	৬০৩
ডালিম (গল্প) ...	" ...	১৫৯

বিষয়	লেখক বা লেখিকা	পৃষ্ঠা
অন্তর্যামী (কবিতা)	সম্পাদক	৪,১২৯,৪৫৬
আমার শিল্প	শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা,	... ১০৯
ফাঁকা ...	„	... ১১৯
মাঝে থাকা ...	„	... ২৫০
ধোঁয়া ...	„	... ৩৪৬
জীবন-পথে (কথা-নাট্য)	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	... ৪৩৭
বিরহ (কবিতা) ...	শ্রীসুধীরঞ্জন দাস	... ২৯২
সেকালের স্মৃতি (বঙ্কিমচন্দ্র) ...	শ্রীসুরেশ সমাজপতি	২১৫, ৩৭৭, ৪৭৭, ৫৪৫
বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫১৩
বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত	„	... ৬০৯
বৌদ্ধ-ধর্ম ..	„	৫৭, ১৩৩, ২৪৪, ৩৮৯, ৪৫৯
কল্যাণী (গল্প) ...	শ্রীহরিদাস ভারতী	... ২৫৯
চার্ব্বাক-দর্শন ...	শ্রীহরিপদ কাব্যস্মৃতি	... ৩১১
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—'গীতার' কথা	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	... ৬২১
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ...	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	... ৫৬৩

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা :

আষাঢ়, ১৩২২ সাল।

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	গান ...	... ...	৭৮১
২।	কীর্ত্তন ...	... ..	৭৮৩
৩।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৭৮৬
৪।	কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ...	শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ	৭৯৭
৫।	ভাষার কথা (সমালোচনা)...	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ	৮১৬
৬।	"যদি" ও "কিন্তু" ...	শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ	৮৩৩
৭।	অনুরাগিণী (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৮৩৯
৮।	কথা-সাহিত্য	শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায়	৮৪১
৯।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	৮৫১
১০।	অণিমা (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন	৮৬৪
১১।	থেকো সাথে (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত অন্নদাভূষণ সেন	৮৬৫
১২।	আঁধার ঘরে (কথা-নাট্য) ...	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৮৬৮

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা ও ডাকমাশুল /০ এক আনা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন,
বিজয়া প্রেসে,—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২২

গান

কেন ডাকো এমন করে
ওগো আমার প্রাণের হরি,
কেমন করে যাবো বল,
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি !
প্রথম ডাক বিহান বেলা
শয়ন ছেড়ে চমকে উঠি,
সারা রাতের শিশির ধোওয়া
ফুলের মত থাকি ফুটি।
আবার ডাকো দুপুর বেলা
বিজন আমার আঁধার ঘরে,
পেতে পেতে পাইনা তাই—
হৃদয় ছাপি নয়ন ঝরে।
আবার ডাকো সাঁঝের বেলা
করুণ তব গগনতলে,
পরাণ বেয়ে কি জানি গো
চোখের কোণে জল জলে !

আবার ডাকো আবার ডাকো
গভীর ঘন আঁধার রাতে,
হৃদয়-ভরা করুণ ব্যথা
উছলে উঠে আঁখির পাতে।
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার পাগল-করা !
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার সকল-হরা !
আবার ডাকো আবার ডাকো
ওগো আমার পাগল হরি !
কেমন করে যাবো বল
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি !

কীর্ত্তন

ওগো আমার উজল-বরণ!
কেন লুকাও মেঘের মাঝে?
আমার মেঘ কাটে না হে!
মনের মাঝে ওই সেজেছে,
কাটে না হে, কাটে না হে!
আমি চেয়ে আছি, তোমার পানে
সারা বেলা সকল কাজে!
তবু মেঘ কাটে না হে!
চোখের জলে, চেয়ে আছি,
তবু দেখ্‌তে পাই না হে!
ওগো আমার উজল-বরণ!
কেন লুকাও মেঘের মাঝে?
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!
আমার কানের কাছে বাজে হে!
আমার প্রাণের মাঝে বাজে হে!
সকল কাজে সারা বেলা
মনের মাঝে বাজে হে!
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!
ওগো আমার সোহাগ-রতন!
ওই যে তব নূপুর বাজে!
আমি দেখ্‌তে নারি শুনতে পাই
ওই যে তব নূপুর বাজে!

ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!
ওগো আমার সোহাগ-রতন!
কেন লুকাও মেঘের মাঝে?
ওগো আমার উজল-বরণ!
একবার তবে দেখা দাও!
আমার মনের মেঘ থাক্‌বে না হে!
ভেসে যাবে, থাক্‌বে না হে!
ওগো আমার সোহাগ-রতন!
একবার তবে দেখা দাও!—
আমি সোহাগভরে ডাক্‌ছি কত,
একবার তবে দেখা দাও!
একবার তবে বঁধু বঁধু হে!—
দাঁড়াও এসে চোখের কাছে।
বঁধু বঁধু হে, বঁধু বঁধু হে!
একবার এস চোখের কাছে।
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে নূপুর বাজে!
একবার তবে বঁধু বঁধু হে!
দাঁড়াও তুমি চোখের কাছে।
ওই যে তোমার গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল বনের মাঝে!—
আমার মনের মাঝে হে!
আমার মন-বনের মাঝে।
বঁধু বঁধু হে! বঁধু বঁধু হে!
ওই যে তব গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল মনের মাঝে।

একবার দেখি বঁধু বঁধু হে!
একবার এস চোখের কাছে।
ওই যে তব গায়ের গন্ধ
ছড়িয়ে গেল মনের মাঝে।
ওই যে তুমি কাছেই আছ,
ওই যে তব নূপুর বাজে!

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[৬]

হীনযান ও মহাযান।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কি? হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে? কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলে, আর মহাযানকে 'মহা' বলে? আগে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাৎ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া সেই তফাৎই দেখাইব।

হীনযান বলিয়া কোন যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোট। আগে কিন্তু দুটি যান ছিল,—(১) প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর (২) শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোন বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার কোন সুবিধা নাই, তখনও লোকে আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে; তাহাদের যে যান তাহার নাম প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। বুদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেকদিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন, 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান। ইঁহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইহাঁদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকযান'। বুদ্ধ নির্ব্বাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্ম্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর পর জন্মে ধার্ম্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইলেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। আপনার উদ্ধার হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথা ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানেরা ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'অবলোকিতেশ্বর' উদ্ধার হন হন,—মহাশূন্যে বিলীন হন হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্ব্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ত্ব পাইলেই খুসী, মহাযান তাহাতে খুসী নয়,—

তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাৎ কি? অর্হৎও নির্ব্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্ব্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন? বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থগাছের তলায় সম্যক সম্বোধি লাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্ব্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কি হইবে? মগধ যে অধর্ম্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাই তিনি কাহারও মতে পঁয়তাল্লিশ, কাহারও মতে একচল্লিশ বৎসর-ধর্ম্মপ্রচার করেন ও আশী বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাই তিনি 'বুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন—তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, একি? বুদ্ধ ত এধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। পালিতে তাঁহার যে সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও ত এসকল কথা বলে না। এ একটা নূতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তোমরা বুঝ নাই। বুদ্ধদেব নিজে কি করিয়াছিলেন? তিনি ত মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা ত তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে করিয়া লইয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাই তিনি পরের উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমরা আপনার উদ্ধারের পথ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি

কখনও হয়,—'পরার্থে' কি উপদেশ হয় ? উপদেশটা "স্বার্থে"ই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল ? আমি ত তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ' হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই ত 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কি জাঁক করিতেছ ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থোপদেশই' হইল। তুমি ত আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না ? তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার আপনার পথ দেখ। তুমি ত আর তাহাকে বলিয়া দিতেছ না, বাপু জগৎ উদ্ধার কর। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসম্বোধি' তুমি কি করিয়া পাইলে ? যাহার চেয়ে আর বড় সম্বোধি নাই, সেই সর্ব্বোচ্চ সম্বোধি তুমি পাইলে কই ?

আর এক কথা ;—তুমি ত বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত ; তোমার শিষ্যেরাও আপনার লইয়া ব্যস্ত ; তাহার শিষ্যেরাও আপন লইয়াই ব্যস্ত। তোমরা ত সকলেই অর্হৎ হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর বুদ্ধ হইবে কে ? তোমাদের শ্রাবকযান ত কিছুতেই বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না। কারণ তোমরা চাহ অর্হৎ হইতে ; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না ; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গরুর বাঁট চেন না। শুনিয়াছ গরু দুহিলেই দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া টানিতেছ,—তাহাতে দুধ পাইবে কিরূপে ? তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' দিতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না,—কেমন করিয়া বুদ্ধ হইবে ? তোমরা মহাযানের মর্ম্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধিসত্ব হইতে চাও না। বোধিসত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না, পড় না, হয় ত কেয়ারও কর না। কিন্তু বোধিসত্ব হইবার উপদেশও ত বুদ্ধদেব দিয়া গিয়াছেন। কারণ বোধিসত্ব না হইলে ত একেবারে বুদ্ধ হইবার যো নাই। একথা ত তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। সে উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ; তাহার উপদেশও অতি উচ্চ; তাহার জন্য শিক্ষা অতি উচ্চ; তাহার জন্য সাধনা অতি উচ্চ; তাহার জন্য যে সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্লভ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের কি? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। আর কালের কথা বলিতে চাও,—তোমরা ত তিন জন্মেই আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। এখন বুঝিয়া দেখ দেখি, তোমরা 'হীন' কি না? আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়, আমরা বুদ্ধ হইব; আমাদের উপদেশ কত বড়,—আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই; আমাদের সাধনা কত উচ্চ,—আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব,—এই আমাদের সাধনা; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না,—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে কিছুতেই বিরত হইব না। দেখ দেখি, আমাদের যান মহাযান কি না? দেখ দেখি, তোমাতে আমাতে কত তফাৎ?

শ্রাবকযান বলিতেছেন;—তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়ই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' ত থাকা চাই, 'বিনয়ে' ত থাকা চাই, 'অভিধর্ম্মে'ও ত থাকা চাই। এই লইয়াই ত 'ত্রিপিটক'।

ত্রিপিটকের বাহিরে ত বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায়? তোমরা ত বলিয়া বেড়াও কোন ধর্ম্মেরই 'সত্তা' নাই,—'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে ত সবই অভাব,—সবই শূন্য। এ সকল বুদ্ধবচন হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন;—কেন আমাদের ত শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই ত সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরও কত সূত্র আছে। বিনয়ের কথা বলিতে চাও,—বোধিসত্ত্বের বিনয়—সে অতি বড়। বিনয়ের উদ্দেশ্য ত ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ। এই যা কিছু চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি,—সমস্তই 'বিকল্প'। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্ব্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটখাট কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্ম্মের কথা বলিতেছ,—অভিধর্ম্ম ত ধর্ম্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম্ম 'অনুত্তর-সম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম্ম'ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিশরণ'গমন, তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ। এ দুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্টশীল'গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরও তিন,—স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ। অর্থাৎ ফুলের মালা গলায় দিবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখিবে না, মোটামুটি, বিলাসদ্রব্য সব ত্যাগ করিবে। কাহাকেও রূঢ় কথা কহিবে না, কাহাকেও গালাগালি দিবে না, অর্থাৎ জিহ্বা সংযম করিবে এবং গান বাজনা প্রভৃতি করিয়া সময়ক্ষেপ করিবে না। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ অঙ্গের গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ অর্থাৎ পয়সা কড়ি

হাতে করিবে না। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর একটা বড় জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোষ করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দ্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্থায় উপোষ করিয়া কেবল ধর্ম্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড় একটা পাই না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড় বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম আর একরূপ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন,—ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ'। 'বোধিচিত্তোৎপাদের' পর আর দুইটি কথা শুনিতে পাই,—'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা', অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড় গোলযোগ আছে; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ থাকে না। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু 'পারমিতা'ও স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রজ্ঞা'ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু 'শীল-পারমিতা' কি করিয়া হইবে? 'শীল' ক্লীবলিঙ্গ, 'পারমিতা' স্ত্রীলিঙ্গ। শীলপারমিতা শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট হইল। যদি বল বৌদ্ধপণ্ডিতেরা ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহেন না, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কিন্তু আর এক ব্যাখ্যাও আছে,—মিশ্র-ভাষায় পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়,—পরমের ভাব,—সর্ব্বোৎ-

কৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা শীলপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ হয়,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানের ভাব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদি। ইহাতেও একটু দোষ হয়, উপরি উপরি দুবার ভাব প্রত্যয় হয়,—তাহা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ দু'চারটা দেখা যায়। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড় ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়ই তফাৎ দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব"। বোধিসত্ত্বেরা যেন আপনাআপনিই তাহাতে বিরত ছিলেন—তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম, —নাই বলিলেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না,— চুপ করিয়া থাক। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড় বেশী। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশী কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে আর একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে আর একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন'

'সকৃত্তাগামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃত্তাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এসকল শব্দ মহাযানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশবোধি সত্বভূমি' অর্থাৎ বোধিসত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে, কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্ব্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। যে করুণার নাম পর্য্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতাই' আসল পারমিতা। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারমিতা সকল পারমিতানামই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মোট কথা এই যে সত্য দুই প্রকার,—সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য,—ব্যবহারিক সত্য। আমরা চারিদিকে যেসকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যে তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ

সত্য কখনই অন্যথা হয় না, সে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমনের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নহে, ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। বুদ্ধকে প্রথম স্থান হইতে নামাইয়া দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে মহাযান বুদ্ধ হইতে ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু শোচনীয়,—তিনি একটি 'মানুষী' বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে। এখনকার মহাযানেরা বলেন যে হিন্দুদের ব্যাস যেমন সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শাক্যসিংহও তেমনি মাত্রকলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত, আমাদের ধর্ম্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর একজন বড় 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে স্বয়ম্ভুচৈত্যের চারিদিকে এই পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। সেখানে শাক্যসিংহের স্থান নাই দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়"? আমার সঙ্গে যে বজ্রাচার্য্য ছিলেন তিনি আমাকে চৈত্য হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বে নীচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্যসিংহের প্রতিমা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইখানে আছেন, তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। আমরা তাঁহাকে মানি, যেহেতু তিনি আমাদের সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া দিয়াছেন।"

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম্ম মহাযানে বড়। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধের

কি সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সঙ্ঘ বলিতে গেলে একবিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহাদিগকে বুঝায় ; কিন্তু উহারা বলে সঙ্ঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ত্ব। ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝান কঠিন নহে। কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। ধর্ম্ম যদি জ্ঞান হইলেন, তবে বুদ্ধ কি হইলেন ? তিনি হইলেন,—উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম্ম ও বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা ত আর সঙ্ঘ হইতে পারেন না, তখন সঙ্ঘ আর একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই। তখন সঙ্ঘ হইলেন,—বোধিসত্ত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোন উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড় হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্ব্বময় সর্ব্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড় বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোট মনে করিতেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

কবি সুরেন্দ্রনাথের নাম এখনকার সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত কি না, তাহা সংশয়ের কথা। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার 'মহিলা' পড়িয়াছেন, তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তি যে কেমন ও কতটা ছিল, তাহা অবগত আছেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁর কাব্য আছে। আমি সেই কাব্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের জীবন-কথার আলোচনা করিব এবং দেখাইতে চেষ্টা করিব তিনি কিরূপ দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে, কি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠাসহকারে বাণীর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরবনদের তটবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৪৪ বঙ্গাব্দে, ভট্টনারায়ণের বংশে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাই অতি শৈশবে তাঁর শিক্ষার কোনওরূপ সুব্যবস্থা হয় নাই। পরে জনৈক আত্মীয়ের অনুকম্পায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ্চ ইনিষ্টিটিউষণে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং পরে সেখান হইতে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বেশী দিন তিনি এখানে পড়াশুনা করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, ১২৬৩ সালে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার উনিশ মাত্র। এরূপ শুনা যায় তাঁর একমাত্র প্রতিপালক জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের মৃত্যুই ইহার কারণ। কিন্তু কোনও দিনই বোধ হয় স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকাদি পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইত না। তিনি সর্ব্বদাই আপনার রুচিমত যখন যে বই পাইতেন তাহাই পড়িতেন। এই ভাবেই তিনি নিজে স্বাধীনভাবেই আপনার জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি-সকলকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা স্ফুরিত হইতে আরম্ভ করে। সেকালে যশোহরের আর একজন "মজুমদার"-কবির যশোভাতি বাঙ্গলা সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 'সদ্ভাবশতক' মোহম্মদীয় আদর্শের ভক্তিগ্রন্থ। ইহার অনেকগুলি কবিতাই হাফেজের কবিতা অবলম্বনে রচিত। স্বভাব-বর্ণনা ও ভগবদ্-মহিমাকীর্ত্তনই সেকালের বাঙ্গলা কবিতার বিশেষত্ব ছিল। সুরেন্দ্রনাথও বাল্য-জীবনে এই আদর্শেরই অনুকরণ করেন। ইহাই তাঁর 'ষড়-ঋতু-বর্ণন' নামক গ্রন্থে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই সময়ে 'উষা' এবং 'স্বপ্ন' নামে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হয়। এগুলিতেও নবীন কবির মার্জ্জিত রুচি ও গভীর রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

স্কুল ছাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বিদেশে চলিয়া যান। এই সময়ে "মঙ্গল উষা" নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কবিতা ও গদ্য সন্দর্ভ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর যে সকল কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার প্রতিভার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই লেখার মধ্যে তাঁর "কবি-প্রশংসা" একটি অতি সুন্দর রচনা। ইহা হইতে কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত হইল ;—

"সুন্দর এ সৃষ্টি বিধি করি সম্পাদন,
ভাবিলেন শোভাবোধ করে কোন্ জন।
যেমন এ চিন্তা তাঁর মানসে উঠিল,
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল।
বাগ্‌বাণী সযতনে অঙ্কেতে তুলিয়া
পালিলেন সে সন্তানে স্তনসুধা দিয়া।

কল্পনা দর্পণ দেবী দান দেন তায়,
সমুদয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব যায়।
স্থাপিলেন আনি পুত্র সংসার ভিতর
নরকুল গুরু যিনি, কবি নাম-ধর।
যাহার কোমল গীত লোলস্বরভরে
বাণীস্তন পীত সুধা বাক্যসহ ঝরে।
* * * *
কবি বিনা কে করিত মহত্ত্বস্থাপন
কাব্যকল্পতরু কেবা করিত রোপণ?
* * * *
যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়,
আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরায়,
গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোরস্বরে,
যাবৎ না হবে পাত উন্মাদ সাগরে,
যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে
কবি-যশে রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে।”

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ও বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাইয়া, প্রখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে নিজের জমীদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত করেন। জমীদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম কিরূপ তাহা সকলেই জানেন। এরূপ কাজের মধ্যে থাকিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা বা জ্ঞানানুশীলন করা যে কত কঠিন, ইহাও আমরা বুঝি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই অবস্থাতেও সাহিত্য-সেবাতে শিথিলযত্ন হয়েন নাই। এই সময়ে তিনি ভারবীর “কিরাতার্জ্জুনীয়ের”, ইংরাজ-কবি গোল্ড্স্মিথের “ট্র্যাভেলারের” এবং আইরিশ কবি মুইরের “আইরিশ মেলডিকার” অনেকগুলি স্তবক হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গলা ছন্দে ভাষান্তরিত করেন।

মধ্যবয়সে কবির কিঞ্চিৎ পানদোষ ঘটিয়াছিল, এইজন্য অনেকে বলেন, তিনি পুনঃ পুনঃ অপস্মার-রোগে আক্রান্ত হইতেছিলেন, কবিও এই পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া "মাদকমঙ্গল" শীর্ষক কাব্য লিখিয়া আপনার অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়াছেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি 'সবিতাসুদর্শন' ও 'ফুল্লরা' নামে দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত এই দুইখানি কাব্য মুদ্রিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ যশঃপ্রার্থী ছিলেন না। কেবল আপনার তৃপ্তির জন্যই হৃদয়নিহিত কবিত্ব-শক্তির প্রেরণায় কাব্য লিখিতেন; যশের পথ মুক্ত করিবার জন্য নহে, কেবল "শিবেতর ক্ষতয়ে"। কিন্তু তাঁহার জনৈক আত্মীয় "সবিতাসুদর্শনের" অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া লুকাইয়া উহা মুদ্রিত করেন; কিন্তু ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিরক্তিপ্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, সুরেন্দ্রনাথের আদেশমত "জনৈক অজ্ঞাত মৃত কবি" কর্ত্তৃক রচিত এই নামে প্রকাশিত হয়।

কোনও কোনও সমালোচক বলেন,—সুরেন্দ্রনাথের "ফুল্লরা" কাব্যে ভাবগাম্ভীর্য্য থাকিলেও ভাষালালিত্য নাই, এইজন্য ইহা উচ্চশ্রেণীর কাব্য হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার "সবিতাসুদর্শন" সম্বন্ধে এ কথা একেবারেই প্রযোজ্য নহে। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে ভাষার ঝঙ্কারের সহিত গভীর ভাবের সমাবেশ হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার যাথার্থ্য বিচারের জন্য এই গ্রন্থখানির বিশদ আলোচনা করিব।

একদিন যখন সন্ধ্যার ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, যখন পশ্চিম আকাশে ঈষৎ রক্ত আভা রাখিয়া দিবাকর অস্তাচলে প্রস্থানপর হইয়াছেন, তখন পুণ্য বারাণসী ধামের গঙ্গাতীরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজানিরত রহিয়াছেন—

"বৃদ্ধ বয়ঃ, হেমন্তের তুষার পতনে
ধবলিত বটে তার শির;

তবু যেন জ্যোতিভরে জ্বলে দু'নয়নে
যৌবনের নিদাঘ মিহির।

* * * * *

"গভীর বদন—নয় গর্ব্বের আধার—
কোমল করুণা তায় বসি ;
গত মোহ-ঘন, ক্ষণ-হর্ষ চপলার
মুক্ত মুখ—সন্তোষের শশী।"

এই দুই ছত্র হইতে আমরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সমগ্র চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারি—পুণ্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ তাঁহার সমস্ত অবয়ব যৌবনের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আর তাঁহার হৃদয়ের কারুণ্য তাঁহার প্রশস্ত বদনে একটা কমনীয়তা আনিয়া দিয়াছে। পবিত্র মণিকর্ণিকার অবতরণিকার উপর উপবেশন করিয়া ধীর অস্তগামী ভানুর উদ্দেশে বলিতেছেন—

"যাও অস্তলোকে গিয়া জাগাও জীবন,
হাসাও সলিলে নলিনীরে।

* * * * *

"হেসে হৈমবতী উষা ডাকিছে তোমায়,
হেসে তুমি চলিতেছ তায়,
আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়,
ছায়া-সতী সপত্নী ঈর্ষায়।
"অসীম আকাশক্ষেত্রে বালক-ক্রীড়ায়
সদা তব মণ্ডল-ভ্রমণ ;
রাশি হতে রাশি পরে ললিত লীলায়
পরশিত কাঞ্চন চরণ।

"এলো চুলে, হেলে দুলে মিলে করে করে
আগে আগে নাচে হোরাগণ ;
একচক্র রথ চলে, চলে তার পরে—
পরে পরে ঋতু ছয় জন।"

কবি কেমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ছন্দে প্রাকৃতিক তথ্যগুলি বর্ণন করিয়াছেন ; তারপর অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি ব্রাহ্মণের সেই আবেগময়ী জিজ্ঞাসা কি মর্ম্মস্পৃক্—

"ক্ষীণ—ক্ষীণতর ভানু ! বিলীন এখন !—
বুঝালে কি ভ্রান্তমতি নরে ?
তেজস্বী হলেও চিরপ্রভাব কখন
কারুই না রয় ধরা পরে !"

যখন তিনি এইরূপ কবিতাস্রোতে নিমগ্ন, তখন এক তরুণ যুবা আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিল। সেই যুবকের মাতৃপিতৃহীনতার কথা শুনিয়া তাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত উন্নত ললাট চিন্তারেখাক্লিষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া পড়িলেন—"সুকোমল দ্বিজবর-হৃদয়-কমলে করুণার মধু উপজিল" ; তখন যুবক সুদর্শন ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যা সবিতার সোদরস্থান অধিকার করিল। অপূর্ব্ব মেধাবী সুদর্শন গুরুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে সকল বিদ্যায় সাফল্য লাভ করিতে লাগিল, অবসর সময়ে বালিকা সবিতার সহিত কুসুমচয়ন, মাল্যগ্রথন, সুখাদ্যরন্ধন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এইরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়াসমূহের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া কিশোরী সবিতা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিল। এই স্থলে কবি সৌন্দর্য্যের যে মধুর বর্ণন করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক সুরটুকু চিত্তগ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী, বাহুল্য-ভয়ে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম না। কবির বর্ণনা-কৌশল উপভোগ করিতে করিতে আমরা কবির একটি কৃতিত্বের পরিচয় পাই

—কবি দেখাইয়াছেন, যুবক সুদর্শন সবিতার হৃদয়ভরা প্রেম পাইয়াও বিষণ্ণ, নিঃস্পৃহ ; তাঁহার বদনের কান্তিময় আভার উপর একটা ঘনচ্ছায়া পড়িয়াছে, আর সকল সময়েই সে ক্লিষ্টমনে কেবলই চিন্তারত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে যুবকের আত্ম-পরিচয়ে সত্যের কিছু অপলাপ ঘটিয়াছে। তারপর যখন সুদর্শন আচার্য্যের নিকট নিজের কথা বিবৃত করিল, যখন শুনিলাম সে অনাথ ব্রাহ্মণকুমার নহে, সে দিল্লীর বাদশাহ আক্‌বর সাহার লিপিকার আবুলফাজলের ভ্রাতা ফৈজী, তখন বুঝিলাম আমাদিগকে প্রকৃত তথ্যে উপনীত করিবার জন্যই কবি আমাদিগের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিলেন। যুবকের এই পরিচয় শুনিয়া সবিতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। ব্রাহ্মণ ফৈজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তুষানলে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ক্ষুদ্র বিবরণটির মধ্যে কবি বর্ণনা-পারিপাট্যের সহিত মনোজ্ঞ চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ব্রাহ্মণের দয়া, তিতিক্ষা, সকল রকম দুঃখশোকে উপেক্ষা ; আর দেখাইয়াছেন—প্রণয় কোনও জাতিবিচার মানে না, প্রণয়ীর সহিত মিলন সম্ভবপর না হইলে প্রেমিকার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে ; সর্ব্বশেষে দেখাইলেন দয়া এবং প্রেমের পুণ্য আলোকের মাঝে আসিয়া মুসলমান যুবকের অহঙ্কার-তিমিরও দূর হইল, সে সত্য গোপন করিতে পারিল না, তাহারও সঙ্কীর্ণ বক্ষে একটা স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল।

'সবিতাসুদর্শন' প্রকাশিত হইবার পর হইতে কবির চিত্ত ধর্ম্মের বিমল আলোকে আকৃষ্ট হয় ; পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্রে যে দুই একটি ক্ষুদ্র কলঙ্ক লক্ষিত হইত, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের মধুর কিরণপাতে অপসারিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে যে ভগবৎপ্রেমের রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিত, তাহাতে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন, কবি গম্ভীর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন। অনেকেই জানেন যে, সুরেন্দ্রনাথ শেষজীবনে কবি ও সাধক হইয়াছিলেন। বিষয়

কর্ম্ম তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইল, তিনি নির্জ্জনতা উপভোগ করিবার জন্য মুঙ্গের যাত্রা করেন। এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশই তাঁহার সর্ব্বসমাদৃত 'মহিলা'-কাব্যের জন্মভূমি। সুরেন্দ্রনাথের প্রায় সকল কবিতাই প্রেমমাখা, কিন্তু এই সময়ে শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি তাঁহার প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, "মহিলা"র ইহার পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। কবির হৃদয়ে যে প্রেমভক্তির তটিনী বহিতেছিল, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন বর্ষার আবেগময়ী তটিনীর ন্যায় 'মহিলা'-কাব্যে দুই কূল উপ্চাইয়া ছুটিয়াছে। কবির 'মহিলা'-কাব্যই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে যশস্বী করিয়া রাখিয়াছে, সেই নিমিত্তই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কথা বিবৃত করিবার পূর্ব্বেই উহার সম্যক্ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

'মহিলা'-কাব্যের অবতরণিকায় কবি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়াছেন,—নীলকোকনদশোভিত সরোবর তাঁহার বর্ণনার বস্তু নহে, সুরভি-কুসুমবাসিত কলতানও তিনি শুনাইতে আসেন নাই; তাঁহার আখ্যান বস্তু একেবারে সতন্ত্র, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

আবার কোনও বিশেষ বরবর্ণিনী নায়িকার চাটুস্তুতি রচিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই; মাতা, জায়া, ভগিনীর চির উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদের গীত গানই কবির উদ্দেশ্য।—জগতে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া মানব ধরার শ্যামকান্তি নিরীক্ষণ করিল, চরাচর বিমল আলোকে পুলকিত দেখিল, মৃদুল সমীরে আন্দোলিত পুষ্পনিচয়ে ভৃঙ্গের মধুর গুঞ্জন শুনিল, তথাপি তাঁহার অন্তরে সুখ নাই; কিসের দুঃখ তাহা সে বুঝিতে পারে না, তথাপি শোভাময় জগৎ তাঁহার নয়নে শূন্য, যেন চিরদুঃখের বেষ্টনী দিয়া আবৃত; মানবের এই ক্লিষ্ট ভাব দেখিয়া বিধাতা ভূলোক পুলকপূর্ণ করিয়া ললনার সৃষ্টি করিলেন। এক নারী নানারূপে সংসারের সমুদয় সুখ বিরচিত করে,—জননীর

পুষ্টি, ভগিনীর প্রিয়চিন্তা, কন্যার সেবা, জায়ার প্রেম, সকলই নরের সুখকর ও কল্যাণদায়ক। রমণীই পুরুষের চিত্তে স্বদেশ-প্রেম জাগাইয়া দেয়, নারীই পুরুষের হৃদয়ে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আনিয়া দেয়, আর ললনাই মর্ত্ত্যনিবাস স্বর্গে পরিণত করে। তাই কবি 'মহিলা' প্রস্তাবে গাহিতেছেন—

"নারীমুখ সংসারের সুষমার সার,
শ্রেষ্ঠগতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন।
নারী বাক্য গীত জানি,
নারী কার্য্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার!
মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গে ললনার!"

কবি এই আত্মনিবেদনের পর প্রথমে মাতৃমূর্ত্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছেন—কবি প্রথমেই বলিয়াছেন যে মাতার মহিমা অবর্ণনীয়—

"নিজ অঙ্গ-অংশ দিয়া
এই তনু নিরমিয়া,
চিত্তে হতে দিয়া চিত, দীপে দীপপ্রায়
আমায় সৃজেন যিনি
ধাতার স্বরূপ তিনি।"

এই ধাতার স্বরূপ কখনও বর্ণনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে না, কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায় জননী "সৃজিবার, পালিবার প্রতিনিধি বিধাতার"; সন্তানের জন্য জননীর ক্লেশ অবর্ণনীয়—

"কে বুঝে, কে বুঝাইবে প্রসব-বেদন!
সুত কান্দে কানে যায়,
নয়ন মেলিয়া চায়,
করুণায় করে সব দুঃখ আবরণ!—
নব তনু লভি' মৃত পাশরে জীবন।"

এইস্থলে সমাজের অন্ধ কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে কবি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণ হৃদয় সূতিকাগৃহের অপকৃষ্টতায় বেদনা অনুভব করিয়াছে—ধাতার প্রতিনিধি মাতা যেস্থানে বিদ্যমান, যেস্থানে সৃষ্টির পুণ্যতম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সেস্থলকে অশুচি মনে করিয়া ভ্রান্ত নর গৃহের নিকৃষ্ট ভাগে সূতিকাগার নির্দ্দিষ্ট করে—

"রবিকর বায়ুহীন
আর্দ্রতল, শয্যাদীন,
প্রসূতি সন্ততি দোঁহে নিপতিত তায়!—
নিত্য নব নব পীড়া
কালের কৌতুক ক্রীড়া
হয় ত বা ফুলকলি ছিঁড়ে নিয়ে যায়!—
রেখে মাত্র চিরস্মৃতি শোকের কাঁটায়!!"

কিন্তু সুখের বিষয় যে করুণহৃদয় কর্ম্মবীরগণের একান্ত চেষ্টায় এক্ষণে বঙ্গসমাজ হইতে এই কুসংস্কার অপসারিত হইয়াছে; কেবল নগরে নহে, সুদূর পল্লীগ্রামেও এক্ষণে স্বাস্থ্যকর স্থানে সূতিকাগৃহ সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

যে অস্পৃশ্য নীচাচার জাতি শরীর-চিকিৎসায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞ নহে, সেই প্রসূতির একমাত্র সেবিকা; তাই কবি এই ভীষণ ভ্রান্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"তিনি ধাত্রী ষষ্ঠী দেবী, এ কোন্ বিধান!" যে শিশুর জন্মোপলক্ষে নানা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম

পদার্পণ পুন্নরক হইতে পরিত্রাণ সূচিত করে, পশুর অপ্রিয় স্থলে তাহার আবাস, আর সেই রত্নপ্রসূ জননীর তৃণশয্যা, অরুচিকর কটু দ্রব্যমাত্র ভক্ষ্য; কবির হৃদয়ে ইহাতে আঘাত লাগিয়াছে, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালী সমাজকে বলিতেছেন—

"হেন তুমি বাঙ্গালী নির্ম্মম শিলাকায়!—
'ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা' প্রমাণ তোমায়!"

এইস্থলে কবি সূতিকাগৃহের যে বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সত্যই মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, ক্ষোভের উদ্রেক হয়, লজ্জার উদ্রেক হয়। এই কঠোর ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; তাই আমরাও বুঝিতেছি এবং কবিও বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালী বলিষ্ঠ নও, হেতু এক তার
বলবান্ জেনো নিজ সূতিকা ব্যাপার।"

ধনীদিগের ধাত্রী রাখা পদ্ধতির বিরুদ্ধে কবি কটাক্ষপাত করিয়াছেন,—

"কেমন নির্ম্মম তারা,
জননী থাকিতে যারা,
জননী বঞ্চিয়া রাখে সন্তান আপন!—
উদাসিনী নারী আনি,
অতি হেয় কার্য্য মানি,
তারে সমর্পণ করে সন্তান পালন!—
নিজে সুতে পরিহরে,
সুতে সঁপে তার পরে;—
কিংবা সুতমৃতা বিষঘট স্তন যার;—
অথবা মমতাহীনা
চির কুক্রীড়ায় লীনা
বারাঙ্গণা—অঙ্গ যার আময় আধার!—
মানি, কাল কংসদূতী পূতনা প্রকার!"

সন্তান যাহার স্তন পান করে, যাহার সহিত বাল্যে অবস্থান করে, তাহারই প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কবি নিদর্শন স্বরূপ সুসভ্য ইংরাজ ও মিশ্র ফিরিঙ্গীর মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিচারের সূক্ষ্মজাল ছিন্ন করিয়া একেবারেই বলিতেছেন—"সুশীল কি হবে হড্ডকিনী স্তনপানে ?" এইজন্যই মাতাপিতার বিচ্ছেদ তাহাদের সম্ভবপর—"ধাত্রীর পালিত যারা, কেন না কহিবে তারা কিসে আমি ঋণী আছি পিতার মাতার ?" তাহারা স্বর্গীয় মাতৃপ্রেমের আস্বাদ পায় না—

"সুত মাতা পরস্পরে,
প্রথমে যে প্রেম করে,
সংসারে কি আছে প্রেম কোথাও তেমন !
সদা ধ্যান এক মুখ,
একাধারে সব সুখ,
একের হইলে জ্বর, জ্বরে অন্যজন !
বিচ্ছেদে উভয় চিত
বিচলিত, বিকলিত
একের নয়ন, অন্যে ঝরে স্তনধার !
মিলনে কি সুখোদয়,
সব দুঃখ তাপ লয়,
স্বর্গসুধা ভোগ নয় সমতুল তার !
কার সনে হেন প্রেম কবে হয় আর !

এইস্থলে কবি স্নেহময়ী জননীর যে সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহার মাধুর্য্য অন্যকে প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, নিজে তাহা বুঝিয়া হৃদয়মন্দিরে ধারণ করিতে হয়।

তারপর সন্তানের শৈশবকালে তাহার চিত্ত বেলাস্থিত বেতসখণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক তটপ্লাবী তরঙ্গাঘাতেই নমিত হয়, তখন মাতার

শিক্ষাই শুভফলপ্রদ এবং সেই বাল্যের সংস্কার চিরজন্মে লুপ্ত হইবার নহে। মর্ত্ত্যের যমসভারূপ পাঠশালায় সরস্বতীকে রাক্ষসী সমান দেখিতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু মাতার শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র—

"এক বর্ষে শ্রম ভরে
যে কিছু শিখাবে পরে,
এক মাসে মাতৃবাক্যে হৃদয় তা ধরে;—
তুষিয়া শিখাবে মাতা, প্রহারিয়া পরে!"

সমাজের কল্যাণের জন্য, মানবের উন্নতির জন্য কবি স্ত্রীশিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার যদি আর কিছুমাত্র হেতু না থাকে, সন্তানের শিক্ষাই বলবান্ কারণ নহে কি? শিশু সকল সময়ে মাতার নিকট লালিত, মাতার প্রত্যেক বাক্যের সহিত সে পরিচিত। তাই জননীর স্তনপানের সহিত শিশু যে শিক্ষা পায়, তাহাই তাহাকে জীবনে মহৎ করিয়া তুলিতে সহায়তা করে; মাতার দোষগুণ সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাই সুশিক্ষার দ্বারা মাতার সে দোষ অপসারিত না হইলে, সন্তানের জ্ঞানোপার্জ্জনের পথে প্রথমেই অন্তরায় আসিয়া পড়ে। আবার হিন্দু পরিবার যে এক্ষণে এত কলহসঙ্কুল,—"কুণ্ঠিতা কমলা কাছে নাহি যান ডরে!"—তাহার কারণও শিক্ষার অভাব। কবি সেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"গৃহী পেয়ে পরিতাপ,
বলে নারী কিবা পাপ!
রে মূঢ়! কাতর কেন থাকিতে উপায়?—
মোহ ছাড়, যত্ন কর ললনা শিক্ষায়।"

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যাঁহারা যুক্তিতর্ক উত্থাপিত করেন, তাঁহাদের মতের অসারতা প্রমাণ করিতে করিতে এক স্থলে কবি বলিতেছেন যে, অনেকে বলেন—

"হলে নারী বিদ্যাবতী
আর না থাকিবে সতী
কামিনী কামাগ্নি, বিদ্যা হবিঃ হেন তায়!"

তাঁহারা শিক্ষাবলে অভিমানী হইয়া বাণীকেও গণিকাদলে গণ্য করেন। প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে কহে, তাহা তাঁহারা জানেন না, অথবা জানিতে চেষ্টা করেন না। নারী পিত্রালয়ে অল্পমাত্র বিদ্যালাভ করিয়া পতি-গৃহে আসিয়া কেবল বেশভূষায় রত থাকে, কারণ তথায় তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য কেহই লালায়িত নয়; সেই সময়ে দুষ্য গ্রন্থপাঠে কুপথ্য সেবনের ন্যায় কুশিক্ষা হইয়া থাকে। ইহা ত শিক্ষা নহে, শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষিতা রমণী স্বর্গের দেবী হইতে বিভিন্ন নয়; স্বভাবতঃ নারীজাতি বিবিধগুণে বিভূষিতা, ইহার উপর বিদ্যার সংযোগ ঘটিলে, অগ্নিতে কাঞ্চনের শ্যামিকা ভাগ দূর হইয়া কেবল বিশুদ্ধ ভাগ থাকিবে; সংসার স্বর্গ হইবে, শোকের আলয় শান্তি-নিকেতন হইবে, মর্ত্ত্যে নন্দনের শোভা সৃষ্ট হইবে।

বিশ্বজগতে মাতার স্তুতি গাহিয়া শেষ করা যায় না, বাণী স্বয়ং বর্ণন করিলেও সেই মহিমার সমাধান হয় না, তাই কবি গাহিতে-ছেন—

"যদি ফুল হয় তারাদল,
চন্দন সাগর জল,
শতকল্প বসি যদি পূজি তব পায়!—
সুধাকর সুধাগারে
পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন।
পারিজাত দল দিয়া
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন!
তবু না শুধিতে পারি তোমার যতন!!

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহ অপসারিত করিবার জন্য কর্ম্মবীর পুরুষগণের উত্থান হইয়াছিল, তখন কবি সুরেন্দ্রনাথ লেখনী ধারণ করেন। বিদ্যাসাগরপ্রমুখ মহাত্মাগণ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন কবি সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা'-কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন; তাই তিনি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির স্বভাবজাত কারুণ্যের সহিত শিক্ষা সংমিশ্রিত হইলে, সমাজ উন্নত হইবে, সংসার স্বর্গ হইবে, জীবনে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যাইবে।

অতঃপর কবি প্রেমময়ী জায়ামূর্ত্তির রচনা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, প্রথমেই স্তুতিচ্ছলে বলিতেছেন—

"তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা; মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক অণু পদার্থবিদ্যার;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতির সাংখ্যের তত্ত্বসার;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

* * * *

কুন্তলকলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকি চমকি চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়
তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দূর ললাটে জাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্র-পল্লব-ছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায়!"

জায়াই জীবনের সর্ব্বসুখনিয়ন্ত্রী, যৌবন নিকুঞ্জের মধুকণ্ঠ পিক; জায়ার প্রেমকটাক্ষ বিনা সকল উৎসবই নয়নে বিসদৃশ বোধ হয়, প্রেমিক যুবার নিকট "প্রেম ঢল ঢল", প্রিয়ার লোচনের কাছে হীরকও হীনপ্রভ, কাঞ্চনচ্ছটা অপেক্ষা তাঁহার কপোলাভা বাঞ্ছনীয়, আর তাঁহার মঞ্জীর ঝঙ্কারের নিকট শতমুদ্রার নিক্কণও কটু বোধ হয়। শারদ পূর্ণিমার কৌমুদীশোভা যুবতীর হৃদয়-সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজিত, বাসন্তী ঊষায় ফুল্ল সরসিজ প্রেমময়ী যুবতীর মাধুর্য্যের নিকট নতশির। আর উহার সহিত রূপের সংযোগ কিরূপ মনোহর—যেন

"সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত যোজন।"

রমণীর রূপসৌন্দর্য্য ক্ষণিকের তৃপ্তি আনিয়া দেয়, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-মাধুর্য্যসম্ভূত প্রেম অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়;—যেমন কুসুম শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু তাহার সৌরভ থাকে; যেমন সুখের দিন ফুরাইলেও তাহার স্মৃতি থাকে, সেইরূপ রূপের বাঁধন ভাঙ্গিয়া যাইলেও, বিশুদ্ধ প্রেম মানবহৃদয়ে একটা আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহাতেই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রকৃত মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই স্থলে কবি ঘটকালী বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; তাঁহার মতে রচনার পূর্ব্বে কবির কল্পনার ন্যায় প্রেমে পূর্ব্বরাগ রীতি আবশ্যক; আত্মার তৃপ্তির জন্য, প্রণয়ের পূর্ণতার জন্য, পূর্ব্বরাগ প্রয়োজনীয়। তাই কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বরাগ ব্যাকুলতা না জানে যে জন,
সে কি পায় প্রেমে পূর্ণ রস-আস্বাদন!
যত্ন-লভ্য রত্ন বিনা না হয় যতন!
চিতে চিতে দোলাদুলি,
শূন্যে শূন্যে কোলাকুলি,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ খেলা সুন্দর তেমন;
হায় তায় বঞ্চিত অভাগ্য হিন্দুগণ!"

কিছুমাত্র শিক্ষিত হইতে না হইতেই, কিছুমাত্র জ্ঞান বিকশিত হইতে না হইতেই, শিশু বালিকা পতিগৃহে গমন করে; অত শৈশবে প্রেমের পরিচয় হয় না, স্বামীকে একটা আতঙ্ক ও ভীতির আস্পদ বলিয়া মনে করে, তাই এইস্থলে কবি বাল্যবিবাহপ্রথা অপসারিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কবির এই পূর্ব্বরাগপক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমানকালে আমরা এই পূর্ব্বরাগপ্রথার অনুমোদন করিতে পারি না, কারণ এই ব্যাপারের বহুল আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, উহাতে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় পায়। তথাপি কবিকে ইহার জন্য দোষ দিতে পারি না; তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মের সম্মিলনে একটা বিসদৃশ ভাব সমুদ্ভূত হইয়াছিল। সেই কর্ম্মনাশার ভাবস্রোতে সেই যুগের প্রায় সকলেই ভাসিয়া গিয়াছিলেন, কবি সুরেন্দ্রনাথও পরিত্রাণ পান নাই; তাই প্রতীচ্য সমাজের দুই একটা প্রথা শেষজীবনেও তাঁহার নিকট কল্যাণপ্রদ বোধ হইয়াছিল, ইহাই কবির পূর্ব্বরাগপ্রথা-পক্ষপাতিত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষার গুণে পত্নী প্রেমময়ী ও সেবাপরায়ণা হয়, স্বামীর হৃদয়রঞ্জনে সচেষ্ট হয়। প্রেমময়ী পত্নীই জীবনমরুতে একমাত্র স্রোতস্বতী, জীবন-আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা; জায়ার উপকারিতা অবর্ণনীয়, তাই কবি সেই সর্ব্বসুষমাময়ী জায়ার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"হেন মতে যে কালে যে কিছু প্রাণ চায়,
পাই পূর্ণ পরিমাণে প্রেয়সী তোমায়;—
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,
বন্দনায় বন্দী তুমি গুণের বর্ণনে।"

এইরূপে কবি জায়াচিত্রের অঙ্কন সমাধা করিলেন। প্রথমে মাতার স্নেহ, মাতার পালন, পরে প্রেমময়ী পত্নীর সেবা মানবের জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই কবির প্রতিপাদ্য।

'মহিলা'-কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব, ইহাতে নারীচরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ হইয়াছে,—প্রথমে মাতৃরূপে, পরে জায়ারূপে; সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে রমণীচরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহারও উল্লেখ আছে; দ্বিতীয় বিশেষত্ব ইহার ভাবগভীরতা। আধুনিক গীতিকবিতার যুগে ইহার শব্দবিন্যাস ও ভাষালালিত্য উৎকৃষ্ট বোধ না হইলেও, এই কাব্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও উন্নতচিন্তা এমন একটা মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে পাঠকের হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়। মহিলাকাব্য পাঠ করিতে বসিলে প্রথমেই আমাদিগের চক্ষে পড়ে, যে, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য কবির একান্ত ইচ্ছা, ক্রমে তাঁহার করুণচিত্তের পরিচয় পাই এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রেমিক হৃদয়ের আভাস পাই; তখনই আমরা বুঝিতে পারি সুরেন্দ্রনাথ সহৃদয় ও সুহৃদয় কবি।

মহিলা-কাব্য প্রণয়নের পর হইতে সুরেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে, তথাপি তাঁহার শেষ রচনা 'হাজির' নাটকের 'পদ্মিনী' প্রভৃতি গীতগুলি বড়ই মনোজ্ঞ। এই সময়ে কয়েকজন বন্ধুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 'রাজস্থান ইতিবৃত্ত' অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই কালের মহারথ আসিয়া তাঁহাকে মোক্ষধামে লইয়া গেল।

সুরেন্দ্র যে কেবল কবি ছিলেন এমত নহে, তিনি পরোপকারী ও দরিদ্রপ্রতিপালকও ছিলেন; দীনের দুঃখমোচনে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, জ্ঞান দান করিয়া তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা দূর করিতেন, আর রোগে শোকে ভ্রাতার ন্যায় তাহাদিগের সেবা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে চলিল, কবি সুরেন্দ্রনাথ এই মরধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। এখনও তাঁহার মহিলা-কাব্য সাহিত্য-সমাজে আদরের বস্তু হইয়া আছে এবং বোধ হয়, বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে; তাই কবি বলিয়াছেন—

"তুমি আমি কালে লীন হব সব জন
রবে শুধু কার্য্যের ঘোষণ।"

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

ভাষার কথা

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ।

(সমালোচনা)

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মিঃ পি, চৌধুরীর অভিভাষণ তাঁহার "সবুজপত্রে"র গত ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অভিভাষণে অনেক সময়োপযোগী কথা আছে। সে জন্য ইহার সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমেই ভাষার কথা। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ "বীরবলী" ভাষায় রচনা করেন নাই, সবুজপত্রের ভাষায়ও নহে। তিনি নিজেই তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। "বিদূষকের আসন" হইতে "বীরবলী ঢং" চলে, কিন্তু তাহা "সভাপতির আসনের বহু নিম্নে" অবস্থিত। "সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজসম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত—ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের চিরপোষিত মত হইতে এক পদও হটিতে প্রস্তুত নহেন। তাই পরক্ষণেই তিনি বলেন, "আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।" অর্থাৎ 'এই সভাপতির আসন হইতে নামিয়াই আমি আবার আমার বীরবলী ভাষা আরম্ভ করিব, কারণ তাহাই আমার মতে গ্রন্থরচনার পক্ষে উৎকৃষ্ট ভাষা'। বীরবলী ভাষা কেন উৎকৃষ্ট হইল, তিনি তাহার দশপৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তাহাতে "তথাকথিত সাধু ভাষার" জন্ম কথাও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

তিনি বলেন সাধুভাষা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার এই ভাষার আদি লেখক। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে "অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে" তিনি সাধু ভাষায় প্রবোধচন্দ্রিকা রচনা করেন।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্রিকায় যেমন সাধুভাষা আছে তেমন তখনকার চলতি ভাষাও আছে। "পূর্ব্ববর্ত্তী" লেখকেরা যদি তাঁহার গৌড়ীয় রীতি অবলম্বন না করিয়া তাঁহার বঙ্গীয় রীতি অনুসরণ করিতেন তবে এই ভাষা সুসংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। এই দুই ভাষার মিলন-সূত্রে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছে এ কথা ভুল। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা পৃথক জাতীয়। একের পরিণতি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে, অন্যের পরিণতি তাঁহার হুতুম পেঁচার নক্‌সায়। এই দুই ভাষা যোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী ভাষা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই প্রকৃত সাধুভাষা। এই সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। ৺রামমোহন রায়ও এই মৌখিক ভাষার উপরে তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি-যুগের অবসান হইল এবং ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে আমরা বঙ্গ-সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য আবার ইংরাজী সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল। "আমরা তথাকথিত সাধুভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস বঙ্গভাষা ব্রাত্য সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরাজীও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই—কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।"

এখন কথা হইতেছে, বঙ্গসাহিত্যের যদি শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে তাহা কোন্ ভাষা দ্বারা হইয়াছে? প্রথমতঃ যাঁহারা গৌড়ীয় রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারা,—যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। চলতি ভাষায়ও যে তখন সুন্দর গ্রন্থ রচিত হয় নাই একথা বলা যায় না—যেমন "আলালের ঘরের দুলাল।" বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা পৃথক হইলেও

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ যাদুমন্ত্রদ্বারা এই দুই ভাষা মিলন করিয়া দিয়া এক অসাধ্য সাধন করিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার হাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই দুই ভাষার মিলনসূত্রে বর্ত্তমান বঙ্গভাষা জন্মলাভ করিয়াছে—একথা ভুল বলিব কি করিয়া ?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই যদি প্রকৃত সাধু ভাষা এবং সাহিত্য রচনার উপযোগী ভাষা হয়, তবে সে শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থে কাহাদিগকে বুঝিব ? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব কি ? নবদ্বীপ ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ত প্রায়ই কথোপকথনে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁহারা "কলম" না বলিয়া "লেখনী" বলেন, "দোয়াত" না বলিয়া "মস্যাধার" বলেন, "আদালত" না বলিয়া "বিচারালয়" বলেন, "গালগল্প" না বলিয়া "স্বকপোলকল্পিত" বলেন ইত্যাদি। আবার যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে হয়, তবে তাঁহাদের কথোপকথনের ভাষার নমুনা মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশন পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্ষ্টক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে হুইসিল্ দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাই কি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার উপযোগী সাধু-ভাষা ? অবশ্য মিঃ চৌধুরী বলেন, "বঙ্গভাষা ব্রাত্য সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরেজীও নহে"। কিন্তু যত দিন ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে ইংরেজী কথার বুকনী দেওয়া না ছাড়িবেন ততদিন কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে তাহা শাপভ্রষ্ট ইংরেজী ভাষাই হইবে।

তারপর আরও এক কথা। অনেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের কথোপকথনে প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক স্থানে শিক্ষিত লোকের মুখেও প্রাদেশিক ভাষা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

কলিকাতা—"আমি কোর্ত্তে পার্ব্বো না।"

যশোহর—"আমি কর্ত্তি পার্‌বো না।"

নদীয়া—"আমি কর্ত্তে পার্‌বো না।"

ঢাকা—"আমি কর্‌তে পার্‌মু না।"

ময়মনসিং—"আমি কর্ত্তাম্ পার্ত্তাম্ না।"

নোয়াখালী—"আমি হর্ত্তাম্ হার্ত্তাম্ না।"

এখন এই সকল "মাতৃভাষায়" গ্রন্থরচনা করা অপেক্ষা "আমি করিতে পারিব না" এই সাধুভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে তাহা যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকেরই বোধগম্য হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল লোক মুখে "আমি কর্ত্তাম্ পার্ত্তাম্ না" বলেন, তাঁহারাও লেখার সময় "আমি করিতে পারিব না" এইরূপই লিখিয়া থাকেন। সুতরাং এই সাধুভাষা পূর্ব্ব হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। এবং এই সাধুভাষা দ্বারাই সাহিত্যের ঐক্য সংসাধিত হইতে পারে। মিঃ চৌধুরীও সেই ঐক্যের কথাই বিশেষরূপে বলিয়াছেন—

"কোনও জাতির মনের ঐক্য সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক সংজ্ঞা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ—এক ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান সকলে আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধন অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়।"

কিন্তু যদি বাঙ্গালা দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে

"মাতৃভাষা" সকল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়া "সাধুভাষা"র সঙ্গে লড়াই করিতে আরম্ভ করেন, তবে সেই ভাষার বন্ধন কিরূপ দৃঢ় থাকিবে, আর আমাদের জাতীয় ঐক্যই বা কিরূপে সংঘটিত হইবে? অবশ্য ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দক্ষিণবঙ্গের (কলিকাতা, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া অঞ্চলের) প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এবং আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত সাধুভাষাও এই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষারই অনুরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অঞ্চলের ভাষাতেও যে প্রাদেশিকতা আছে তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও বঙ্গসাহিত্যে কথিত ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন,—"ভাষার তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার অধিকতর সংশ্রব রাখিতে হইবে।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার প্রাদেশিকতা চালাইবার সম্পূর্ণ বিরোধী। গত বৎসর কলিকাতার সাহিত্যসম্মিলনীতে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,—

"আমাদের এতদঞ্চলের কোনও কোনও খ্যাতনামা লেখক নাকি 'করচি', 'যাচ্চি' শব্দের এরূপ আকার চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই চেষ্টার প্রতিবাদ করি। Do not যোগ হইয়া অর্থাৎ শীঘ্র উচ্চারিত হইয়া don't এই আকৃতি ধারণ করে; কথা কহিবার সময় অনেক সাহেবসুবাই don't বলিয়া থাকেন; তাই বলিয়া কি কোনও গম্ভীর প্রবন্ধে কেহ don't এইরূপ পদ ব্যবহার করিবেন? তাহা কখনই করিবেন না—এখানে ভাষার পার্থক্যের কথা হইতেছে না, বরঞ্চ ধরিতে গেলে বানানের পার্থক্যের কথাই হইতেছে। ক্বচিৎ কখনও প্রাদেশিক সংক্ষেপ বিধান গ্রাহ্য হয় বটে, তাই বলিয়া কি লিখিত ভাষার উপর জবরদস্তি করিয়া কথিত ভাষার সংক্ষেপ বিধান চালাইতে হইবে? তাহা কখনই হইবে না।"

বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসম্মিলনীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও সাহিত্যে চল্‌তি কথা চালাইতে বলেন। তিনি বলেন, "এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে।" "আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক, চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়েকে' 'লৌহবর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু এই চল্‌তি কথা সাহিত্যে চালাইতে হইলে যে কলিকাতা অঞ্চলের অতি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের চল্‌তি ভাষা চালাইতে হইবে একথা শাস্ত্রীমহাশয়ও বোধ হয় অনুমোদন করিবেন না। তাঁহার নিজের লিখিত ভাষাই ইহার প্রমাণ। তিনি হচ্চে, চল্‌চে, করচি, যাচ্চি, এরূপ ভাষা কখনও ব্যবহার করেন নাই। অথচ তাঁহার ভাষা কেমন সরল, সুঠাম, সুস্পষ্ট এবং সুমিষ্ট।

ভাষার কথা এই পর্য্যন্ত। মিঃ চৌধুরী বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-কল্পে যে সকল কথা বলিয়াছেন এখন তাহার আলোচনা করিব। তিনি এ বিষয়ে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে সকলেই তাঁহার সহিত একমত হইবেন। তিনি বলেন,—

"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব! বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইবে। * * * বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে বল আছে তবে যে আমাদের সাধারণ সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। * * * সে শিক্ষার দৌলতে আমরা সঞ্চয় করিয়াছি শুধু কথা। আমরা concreteএর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাই শুধু abstraction * * * আমরা শিক্ষালব্ধ abstraction লইয়া সাহিত্যে

কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ—না আছে প্রাণ। * * * আমার বিশ্বাস আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ realityর প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমরা এই abstractionএর দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল এই সত্য সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। * * * * আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনী দরিদ্র আছে। এই সকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী।”

মিঃ চৌধুরী বাঙ্গালী লেখককে বঙ্গদেশের সহিত সাক্ষাৎ সুপরিচিত হইতে বলিতেছেন। সে পরিচয় হইবে কিসের দ্বারা? আমাদের দেশের নরনারী, ফুলফল, গাছপালা নিজের চোখে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া, প্রত্যক্ষজ্ঞানে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে বসিলে, তবে তাহা সার্থক হইবে। সেই সাহিত্যে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর বিশেষত্ব প্রতিফলিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও এই একই কথা তাঁহার অভিভাষণে অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিও বঙ্গসাহিত্যে যাহাতে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব রক্ষিত হয় তাহা অত্যন্ত জেদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

“ভারতের প্রাণ ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর প্রাণ—সেই ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত সাহিত্য সাধনা। চারি পাঁচ শত বর্ষের বাঙ্গালীর ইতিহাস আমরা ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি। এই চারি পাঁচ শত বৎসর বাঙ্গালী এইরূপেই কাটাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাধা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে অল্প কালের জন্য। যখন মোগল পাঠানের লড়ায়ে বাঙ্গলা বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী সাহিত্য সঙ্গীত সাধনায় বিরাম দেয় নাই। তবে যখন পশ্চিমে মারাট্টা, পূর্ব্বে ফিরিঙ্গী মহা দৌরাত্ম্য করিল, যখন পলাশী প্রাঙ্গণের প্রাণান্ত পরীক্ষায় রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, এগার শত

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশে কালের করাল ছায়া পড়িল, যখন লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের আদেশে দেশে মহতী বিভীষিকা দেখা দিল, তখন কিছু কালের জন্য সাহিত্য-সেবায় ব্যাঘাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটী হেলান দিয়া 'মুটকলসে' ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথী লেখা, এবং বৈকালে কোনও প্রকাশ্য স্থানে গ্রামস্থ সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ভদ্র অভদ্র লোক একত্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি শ্রবণ—এ সকলে কখনই সংসার বাধা দিতে পারে নাই।"

আমরা এখানে বাঙ্গালীর প্রাণ বস্তু কি তাহা পাইতেছি, আর পাইতেছি বাঙ্গালীর গত চারি পাঁচ শত বৎসরের সাহিত্য-সাধনার একটি নিখুঁত ঐতিহাসিক চিত্র। কিন্তু মিঃ চৌধুরী অক্ষয়বাবুর এই উক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"সরকার মহাশয় কোথা হইতে এই সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা আলস্যের স্বর্গ ছিল?" মিঃ চৌধুরীর খাপা হইবার কারণ এই, অক্ষয়বাবু বলেন—বাঙ্গালী তাহার সঙ্গীত সাহিত্য সাধনার বিশেষত্ব হারাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর সুকুমার সাহিত্য-সেবায় পূর্ব্বের মত প্রগাঢ়তা নাই।

"আমরা মস্তিষ্কের তীব্র চালনাগুণে পাইতেছি জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-দর্শন, পুরাবৃত্ত-ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব-জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছি দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য, আনুগত্য-শিষ্যত্ব। জানি না কিরূপে দুই দিকের জমা খরচ কাটিতে হয়। কিন্তু আমরা কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝিবা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি। * * * * হৃদয়ে কোমলতার culture বা কর্ষণ অথবা উৎকর্ষণ হয় সাহিত্য-সেবায়। বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপার বহি গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় বিষম বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে।"

ইহার উত্তরে মিঃ চৌধুরী বলেন,—"বাঙ্গালীর হৃদয়ের রক্ত যে

মাথায় চড়িয়া গিয়াছে এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙ্গালীর জীবন সংশয় হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এযুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না এ কথা নিশ্চিত।”

এযুগে কেন, কোন যুগেই সাহিত্যরচনা মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত সম্ভবপর নহে। অক্ষয়বাবু যে যুগের কথা বলিয়াছেন, সে যুগের কবিকঙ্কন কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র কি মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই? সে যুগের চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ কি গ্রন্থকারগণের আলস্যপ্রসূত? মিঃ চৌধুরী যাহাকে “আলস্যের স্বর্গ” বলেন, অক্ষয়বাবু তাহাকে “life of ease” বলেন। অবসরময় জীবন যে সাহিত্য-রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? সেই পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীর শরীরে স্বাস্থ্য ছিল, উদরে অন্ন ছিল, মনে স্ফূর্ত্তি ছিল, হৃদয়ে প্রীতি ছিল, তখন বিশেষ বিশেষ বাধা বিঘ্ন ভিন্ন বাঙ্গালীর জীবন মোটের উপর পরম সুখে অতিবাহিত হইত। এখনকার মত তখন কঠোর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। একথা প্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাস ঘাঁটিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাকে “আলস্যের স্বর্গ” বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক সময়ের দৈন্য দারিদ্র্য রোগশোকের নরক নহে।

অক্ষয়বাবুর বক্তব্য এই, বাঙ্গালীর এক সময়ে হৃদয়ের কোমলতার যেরূপ উৎকর্ষ (culture) হইত, যে উৎকর্ষের ছাপ বাঙ্গালীর প্রাচীন কাব্যাদিতে পরিস্ফুট, এখন তাহা সম্যক্‌রূপে হইতেছে না। কাব্যসাহিত্যের প্রাণ যে হৃদয়ের কোমলতা (emotional side of mind) তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংপ্রতি অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঝোঁক বিজ্ঞান ও ইতিহাসের দিকে পড়িয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন (intellectual culture) হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে কাব্য ও সঙ্গীত সাধনার ব্যাঘাত হইতেছে। মিঃ চৌধুরী বলেন,—“বেশ ত! সেই বা মন্দ কি? তবে বাঙ্গলা

সাহিত্যের প্রধান দোষ এই, উহার বৈচিত্র্যের অভাব। বাঙ্গালীর হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে বল আছে; বাঙ্গালীর নবশিক্ষার দোষে তাহার মন abstraction লইয়া ব্যস্ত, realityর দিকে যাইতেছে না।" অক্ষয়বাবু বলেন, "সেই reality কি? না বাঙ্গালীর প্রকৃত বিশেষত্ব—অর্থাৎ বাঙ্গালীর বহুযুগের সাধনার ফল—তাহার ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।"

তবে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে কি কাব্য সঙ্গীতাদি বাহির হইতেছে না? অজস্র বাহির হইতেছে। "বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা বই গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইতেছে।" সেগুলির সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—

"এখন মনে হয়, বেশী দিন ভাবিয়া বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানি কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটকদার দু'চারটা গান লিখিয়া চট্ করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধ করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইবে?" "চুট্‌কীর একটি দোষ আছে—যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না। একখানা বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব—এরকম ত চুট্‌কীতে হয় না। তাই চুট্‌কীর চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এত কথা বলিতেছি।"

এই সকল কাব্যে বাঙ্গালীর জীবনের প্রকৃত বিশেষত্ব ("reality") প্রতিবিম্বিত হইতেছে কি? বাঙ্গালীর হৃদয়ের "দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য, আনুগত্য-শিষ্যত্ব" প্রভৃতি ভাবের প্রকৃত ছবি ইহার কয়খানা কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে? অক্ষয়বাবু এবং মিঃ

চৌধুরী, উভয়েই এখানে একসঙ্গে বলিবেন, "কই, তা'ত বড় দেখি না।" তবে হইতেছে কি? ইহার উত্তরে মিঃ চৌধুরী বলিবেন—

"দেশে ইংরাজী সাহিত্য প্রবর্ত্তিত হইলে ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। * * * Milton না পড়িলে বাঙ্গালী মেঘনাদবধ লিখিত না, Scott না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না, এবং Byron না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরাজীসাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল, ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল।"

অক্ষয়বাবুও তাঁহার চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন,—"আর আমাদের সাহিত্য-সম্রাট, মাথার মণি, চূড়ার ময়ূরপাখা বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি কুক্ষণে ইংরাজী হইতে নায়ক নায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের নবীনচন্দ্র, তোমাদের নবীনচন্দ্র, তাহা সুন্দররূপে ধরাইয়া দিয়াছেন। * * তিনি লিখিয়াছেন * * * "বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।"

"আমাদের দুর্দ্দশাই এই, আমরা দূরে পশ্চিমদিকে নিয়তই নয়ন-নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখনও আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি না। ঐ সমালোচক নবীনচন্দ্র ও কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে তুলনা করিয়াই দেখুন না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-কালে কেমন আমাদের আদর্শের কথা তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যের সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা—এসকল কি? তাঁহারই কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট কি? * * * প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ-ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের

আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে শান্তি, যে প্রীতি, দয়ামায়া, আতিথ্য, দেবভক্তি, গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবে;—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব।"

এখানে দেখিলাম, মিঃ চৌধুরী এবং অক্ষয়বাবু উভয়েই বিলাতী আদর্শে বঙ্গসাহিত্য রচনার বিরোধী; অথচ মিঃ চৌধুরী এই সকল কথা লেখার জন্য অক্ষয়বাবুর প্রতি "বীরবলিক্ এসিড্" নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি অক্ষয়বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া অবশেষে বলিতেছেন, —"বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক না কেন, এরূপ আক্রমণে মারা যাইবে না।" অর্থাৎ মিঃ চৌধুরী বঙ্গসাহিত্য-শিশুর ধাত্রী, অক্ষয়-বাবু তাহার একজন আততায়ী। পাড়াগাঁয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে, মায়ের অধিক সন্তানকে যে ভালবাসিতে চায় তাহাকে বলে ডাইন। আজীবন সাহিত্য-সেবাব্রত অনন্যকর্ম্মা অক্ষয়চন্দ্র সরকার হইলেন কি না বঙ্গসাহিত্য-শিশুর আততায়ী! তিনি চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে নিজের সাহিত্যসেবার কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে পড়িতে এখনও চোখে জল আসে।

"কত লোকের কতশত ভোগের বিষয় আছে, আইন আছে, আদালত আছে, যুদ্ধ আছে, বিগ্রহ আছে, ধন-জন-ঐশ্বর্য্য আছে, মান-গণ-সৌন্দর্য্য আছে, গাজানী বাজিরাজি আছে, পদের গৌরব আছে, যশের পতাকা আছে, আমার—'আমার কেবল তুমি হে।' চিরদিন একমনে একধ্যানে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছি, অন্যের মুখের দিকে তাকাই নাই, যশ মান খ্যাতির প্রত্যাশা করি নাই। সাহিত্যসেবীর সুখ্যাতি যে মুখে শিরোধার্য্য করিয়াছি, সেই হাসি-মুখেই তাঁহাদের কৃত লাঞ্ছনা অঙ্গের আভরণ করিয়াছি। অতি শিশুকাল হইতে জননী বঙ্গভাষা আমার কাছে অতি আদরের সামগ্রী,

এখন ত পূজনীয় দেবতা। মায়ের অঙ্গে আঁচড় দেখিলে আমার চক্ষে জল আসে, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, কপালে করাঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্গভাষার সেবা আমার সখের সামগ্রী নহে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান নহে; আমি প্রাণের টানে, হয় ত রক্তের টানে ভাষার সেবক।”

যা’ক সে কথা। কেবল অক্ষয়বাবুকে নহে, আর এক শ্রেণীর লোককেও মিঃ চৌধুরী বঙ্গসাহিত্যের আততায়ী মনে করেন। অর্থাৎ যাঁহারা বেয়াদবি করিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার “কাম-লোক” ও “রূপলোক” হইতে নামাইয়া আনিয়া লোকশিক্ষকের আসনে বসাইতে চাহেন। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে তাঁহার চরম কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—(১) কোন দেশেই সাহিত্য স্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই! ২) তানসেন চাষার ছেলেদের জন্য মেঠোসুরে সঙ্গীত রচনা করিতে পারেন না।

মিঃ চৌধুরী তাঁহার অভিভাষণের শেষাংশে এই দুটি সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে দেশের লোকে যাহাই বলুক, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যে দুর্ব্বোধ্য একথা ত কেহ কোন কালে বলে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত চিরদিনই খুব popular—তাঁহার popularity দিন দিন বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। কিন্তু মিঃ চৌধুরী তাঁহার তর্কের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে এক ব্রাকেটের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন,—

“সাহিত্যচর্চ্চায় যে অধিকারী ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও লোকায়ত্ব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু আমাদের আলোচনা গবেষণা প্রবন্ধ নিবন্ধাদিই তাহাদের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। * * * * পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্ত্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যে গৌরব করিবার কিছু থাকে তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা

এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব।”

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্গসাহিত্যের এমন কি ভারতীয় সাহিত্যের গৌরবের বস্তু তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তবে দেশের লোকের অনুযোগ এই, বঙ্কিমের লেখা যেমন আবালবৃদ্ধ বনিতা জলের মত সরলভাবে বুঝিয়া তাহার রসাস্বাদ করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেরূপ বুঝিতে পারে না। ইহার কৈফিয়তে মিঃ চৌধুরী বলেন,—

“এযুগে সাহিত্য যে লৌকিক নহে, তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে গড়া সাহিত্য। * * * শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর, * * * শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই এই শ্রেণীর সাহিত্য।”

ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীরাও অনেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝিতে পারেন না, ইহার মানে কি? মিঃ চৌধুরী একথার জবাব দিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়া আছেন। তিনি বলেন,—

“কবি যাহা দান করেন তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক।” “প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন, তাহার কারণ তাঁহারা পৃথিবীর শিক্ষকদিগের শিক্ষক।”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া বাহির হইয়া থাকেন, তাঁহারা ত অনেকেই পৃথিবীর অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকদিগের লেখা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সেক্সপীয়ার বুঝিতে পারেন, মিল্‌টন বুঝিতে পারেন, সেলি, বাইরন্, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ বুঝিতে পারেন, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী বুঝিতে পারেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিবার উপযুক্ত শিক্ষা তাঁহাদের হয় না এ কথা কিরূপে বলা যায়? এই সকল কবি কি লোকশিক্ষক নহেন? কেবল কি শিক্ষকদিগের শিক্ষক অর্থাৎ মাষ্টারদিগের প্রফেসর? আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে, কাব্যরচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—'কান্তাসম্মিত তয়োপদেশ যুজে"—অর্থাৎ কান্তার ন্যায় মধুর ভাবে উপদেশ দান করা। আমাদের মহাকবিগণ চিরদিনই লোকশিক্ষাকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করিতেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে ত্রিলোকের গুরু বলা হয়। "একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ, তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবঃ" ইত্যাদি লোক-প্রসিদ্ধি আছে। অর্থাৎ—পদ্মযোনি ব্রহ্মা, নদীপুলিনে জাত ব্যাস এবং মহর্ষি বাল্মীকি ইঁহারা ত্রিলোকের গুরু আদিকবি। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্যই রচিত হইয়াছিল। তাঁহারা এই স্কুলমাষ্টারি করিতে অপমান বোধ করেন নাই। তানসেনের সঙ্গীতে যেমন ওস্তাদগণ মুগ্ধ হইতেন, তেমন আবার নিরক্ষর মূর্খ লোকেও মুগ্ধ হইত। এরূপ জনশ্রুতি আছে, একটি চাষাজাতীয় স্ত্রীলোক তাহার শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া লাউ কুটিতে কুটিতে তানসেনের সঙ্গীতে এতদূর আত্মহারা হইয়াছিল, যে লাউভ্রমে তাহার শিশুসন্তানের একটা পা কাটিয়া ফেলিয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ আকাশে ভূতলে, সাগরে শৈলে, যে সকল সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিতমূর্খ ভদ্রচাষা সকলেরই সমান অধিকার। বিকসিত কুসুম, স্নিগ্ধশ্যামল পল্লব, সুনীল আকাশ, উদীয়মান দিবাকর, পূর্ণিমার চন্দ্র, অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বুধি—এ সকলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। এমন কি বর্ব্বর কোল সাঁওতাল নরনারীগণও উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে নৃত্য করিতে ভালবাসে। ঈশ্বরের রাজ্যে এই সকল সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে সকলেই সমান অধিকারী, কারণ ঈশ্বর মানবমাত্রেরই হৃদয়ে সৌন্দর্য্যবোধস্পৃহা প্রদান করিয়াছেন। তবে সকলেই সকল

প্রকার সৌন্দর্য্য সমান ভাবে ভোগ করিতে পারে একথা বলা যায় না। জগতের বিখ্যাত কবিগণ কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই তাঁহাদের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য মনে করেন নাই। সেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অন্তরালে সমাজের উপকার হইবে এরূপ উদ্দেশ্যকেও তাঁহারা মনে স্থান দিয়াছেন। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা নহে, কিন্তু নীতিশিক্ষার যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বিবিধ প্রবন্ধ—ভবভূতি)।

কবিবর রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিতা শুধু শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। তিনিও সময় সময় সাধারণ লোকের শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার "সোনার বাংলার" গানটা সেই দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সাধারণ লোকের উদ্দেশ্যেই "মেঠো সুরে" রচিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের লোক সেটাকে গ্রহণ না করিয়া স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেনের রচিত সেই "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের" গানই ধরিয়া বসিল এবং পল্লীতে পল্লীতে তাহা গাইয়া বেড়াইত।

পরিশেষে ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলিতেছি: মিঃ চৌধুরী যাহাই বলুন না কেন; রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত লোকশিক্ষার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হইতেছে না, ইহা দেশের বিষম দুর্ভাগ্য। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার মনের গঠন এদেশের লোকের সহিত খাপ্ খায় না। একজন কলেজের প্রফেসর সেদিন বলিতেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ যত সহজে বুঝিতে পারি,

বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি তত সহজে বুঝি না কেন ?” ইহার উত্তরে আর একজন প্রফেসর বলিলেন,—“রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে চিন্তা করেন বলিয়া।” একথাটির মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য না থাকিলেও আংশিক সত্য যে নিহিত আছে তাহার কোন ভুল নাই। রবীন্দ্রনাথের “পুলক” যদি গাছে গাছে না নাচিয়া নরনারীর গাত্রে কদম্বকুসুমের ন্যায় বিকসিত হইত, তাঁহার “সঙ্গীত” যদি আকাশে না ঘুমাইয়া নরনারীর কণ্ঠে স্বরতান লয় যোগে মুখরিত হইত, তাঁহার “খুসী” যদি আকাশে না ফুটিয়া নরনারীর অধরে দীপ্তি পাইত, তাঁহার “ক্রন্দন” যদি কাহারও পিছে পিছে না ধাইয়া নরনারীর বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া অশ্রুধারারূপে বিগলিত হইত, তবে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত। একজন গৃহস্থ তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথিদিগের ভোজনের জন্য নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলেন। ভোজনের সময়ে দেখা গেল, ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে সবরকম মসলা যথোচিতরূপে দেওয়া হইয়াছে, অথচ সেগুলি সব বিস্বাদ হইয়াছে। তাহার কারণ, ভুলক্রমে একটা জিনিস তাহার কোনটার মধ্যেই পড়ে নাই—সেই জিনিসটার নাম লবণ। কবি রবীন্দ্রনাথও রাশি রাশি কাব্য রচনা করিয়া শুধু একটি বস্তুর অভাবে ইচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলিকে স্বদেশবাসীর উপভোগ্য করিতে পারিতেছেন না। সেই বস্তুটির নাম—প্রাণ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

"যদি" ও "কিন্তু"

বহুদিন পূর্ব্বে দেবাসুরকর্ত্তৃক সাগরমন্থনকালে সুধা ও বিষ উঠিয়াছিল। সেই সুধা ও বিষ লইয়া বিবাদের সময় কিছু সুধা ও বিষ পড়িয়া যায়;—এই দুইয়ের মিশ্রণে এক সুন্দরীর জন্ম হয়,—তাহার নাম 'কল্পনা'। ("সুন্দরী" বলিলাম লেখার খাতিরে। বাস্তবিক সে সুন্দরী কি কুৎসিতা, তাহা আমরা জানি না।) এই কল্পনার গর্ভে একটি কন্যা হয়,—তাহার নাম "যদি"। এই 'যদি' যখন শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন স্বভাবতঃ তাহার বহু প্রেমিক জুটিয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রেমিক—ঐ আমাদের বাস্তবের বেটা, 'কিন্তু'। যেখানে 'যদি', সেখানেই 'কিন্তু'। 'যদি' বহুবার 'কিন্তু'কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, 'কিন্তু' আজ পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িতে পারে নাই। এইরূপই চলিয়া আসিতেছিল; এখন 'যদি' প্রৌঢ়ার মধ্যে গণ্যা হইয়াছে,—'কিন্তু'র প্রেমেও কিছু ভাঁটি পড়িয়াছে,—তাই এখন মধ্যে মধ্যে 'কিন্তু' ছাড়া 'যদি' দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে আসক্তি এখনও বড় কম নহে। 'যদি'র গায় কল্পনার রক্ত আছে, তাই সে প্রায়ই উড়িবার জন্য পাখা খোলে; "কিন্তু"—বাস্তবের বেটা—তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে বাস্তবকে অবহেলা করিলে তাহার চলিবে না,—এখন উড়িতে গেলেই তাহাকে মরিতে হইবে। যখনই 'যদি' আকাশকুসুম রচনা করিতে থাকে,—'আহা, যদি এমন হইত, তেমন হইত, তবে ইহা হইলে হইতে পারিত!'—'কিন্তু' আসিয়া জানাইয়া দেয় যে এমন হয় নাই, তেমনও হয় নাই, কাজেকাজেই বর্ত্তমান লইয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনে, আশায়, উদ্যমে আমরা 'যদি' 'যদি' করিতেছি। শৈশব ও যৌবন খেলায় কাটাইয়া বৃদ্ধ শেষ বয়সে পরকালের চিন্তায় জর্জ্জরিত

হইয়া, সম্মুখের নিরাশার অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া, বলে,—'শৈশবে, যৌবনে যদি কাজ করিতাম!'

শৈশবে ও যৌবনে 'যদি'—আশাময়ী; বার্দ্ধক্যের 'যদি'—বেদনা ও অনুতাপে ভরা। চিরদিন সকল দেশেই শিশুর হৃদয় তুচ্ছ সামগ্রী লইয়াই তৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তবু নিয়ত সে একটি ছাড়িয়া আর একটির আশা করিয়াছে,—মনে করিয়াছে 'যদি ওটি পাইতাম!' যুবক নিজের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবিখানি নিয়ত চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিতেছে এবং মনে আশা করিতেছে—"মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে!" কিন্তু জগতে শৈশবের এবং যৌবনের সকল আকাঙ্ক্ষা কাহার পূর্ণ হইয়াছে? আমাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়ই আমরা যাহা চাই, তাহা পাই না, এবং যাহা পাই তাহা চাই না। 'যদি' আমাদের দেখায়—কি আমাদের চাই, কি আমরা হারাইয়াছি; 'কিন্তু' আমাদের দেখায়—কি আমাদের আছে এবং কি আমরা পাইতে পারি। 'যদি' আমাদের কল্পনা, আশা ও অনুতাপ, 'কিন্তু' —সত্য। আমরা চাই 'যদি', পাই 'কিন্তু'। আমরা বলি,—'যদি' তেমন হইত তবে 'স্বরগ হইত মরতধাম'। কিন্তু হায়, মর্ত্তধাম স্বর্গ হইল না, কেননা, তেমন হয় নাই,—কখনও হইবে কিনা কেহ জানে না।

কবি আপশোষ করিয়াছেন—'সে যদি গো শুধু আসিত!' ভক্ত প্রসাদ গাহিয়াছেন—'যদি ডাকের মত পারিতাম ডাকৃতে!' কিন্তু "নাম জানি না" বলিয়া ডাকের মত ডাকা হয় নাই—তাই ভক্তের বাসনা পূর্ণ হয় নাই। প্রেমময় শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি!' কিন্তু মানময়ীর অভিমান 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' না বলিলে দূর হইবে না! 'দুর্গেশনন্দিনী'তে রূপবর্ণনা করিতে গিয়া, বঙ্কিম বলিয়াছেন, 'যদি তুলি ধরিতে পারিতাম—তেমনি কটাক্ষ দিতে পারিতাম... তবে পাঠককে বুঝাইতে পারিতাম সে কেমন রূপ।' কমলাকান্ত বড় দুঃখে লিখিয়াছিল,—"কমলাকান্ত

অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—(কিন্তু) তাহার এত বন্ধন কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—(কিন্তু) আগুন নিভে না কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন?" এক প্রেমিক বলিতেছে—'নিমিষের দেখা যদি পাই হে তোমারি!' আবার,—"তোমায় যদি বাস্‌তেম্ ভাল জানতেম্ না ক তোমা' বই।" কিন্তু এ শুধু "লোক-দেখান ভালবাসা"—প্রকৃত দরদ্ নাই।

"যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দেই স'পিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ভয় সবই জেগে রয়
তব মহিমায়।"

কিন্তু তাঁহাকে 'সবই স'পিয়া' দিতে—তাঁহাতেই সর্ব্বদা সকল অবস্থায় শরণ নিতে, ক'জন পারে?

আবার দেখুন,—"যদি খাই যথা সাধ্য,
খেলেই যায় ফুরাইয়ে খাদ্য,
পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্ত।"
"দেখ হ'তে পারতেম্ নিশ্চয় একটা উঁচুদরের কবি,—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই!"

বিল্বমঙ্গল বলিতেছে,—"চিন্তামণি! যদি তুমি দেবী হ'তে—আমার প্রাণের কথা বুঝ্‌তে। তুমি রাক্ষসী। কিন্তু তুমি সুন্দর! অতি সুন্দর!"

ভবিষ্যতের আশায় ভক্তিমতী নারী বলিতেছে—

'বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ
আমারে আবার যেন রমণী জনম দিবে।'

কিন্তু শুনিয়াছি বিলাতের 'সফ্‌রেজিষ্ট্'দল পুরুষের মত চুল ছাঁটিয়া,

জামা পুরিয়া, মারামারি করিয়া নারী ও পুরুষের প্রভেদ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছে!

আর কত 'যদি' ও 'কিন্তু'র প্রণয়ের কথা বলিব? এখন একটু উভয়ের গুপ্ত প্রণয়টা দেখুন। 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ বলিতেছে,—"এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার ভালবাসা বুঝিবে?" অর্থাৎ যদি এ জগতে মনুষ্য থাকিত, তবে সে ভালবাসা বুঝিত,—বুঝিত যে সে "ভালবাসার নাম জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" কিন্তু এ জগতে মনুষ্য খুব বিরল, তাই কেহ প্রতাপের ভালবাসা বুঝিল না। আবার,—শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—"তুমি কি করিয়াছ? .. .(যদি) দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম, (কিন্তু) মরিলাম না কেন?" গঙ্গায় সাঁতার কাটিতে কাটিতে শৈবলিনী বলিল,—"তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে তবে আজ তার শোধ দিতাম। (কিন্তু) কেন ডাকিলে?"

'কৃষ্ণকান্তের উইল'—"মালীকে যদি মুনিব শালগ্রামশিলা চর্ব্বণ করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে সেই কট্‌কামুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল,—মু সে পারিবি না অবধড়।"

শিশু যখন নিশ্চিন্ত মনে মাতৃক্রোড়ে শুইয়া স্তন্যপান করিতে করিতে, ঐ চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়, বোধ হয় সে মনে ভাবে 'আহা, যদি ওটা ধরিতে পারিতাম!' (শিশুর সে ভাব থাকিতে পারে কিনা মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার বিচার করিবেন।) সে জানে না যে 'বামন হ'য়ে চাঁদে হাত' দিতে নাই। মেঘদূতের বিরহী যক্ষ চলমান মেঘখণ্ডের দিকে তাকাইয়া নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল—যদি মেঘের মত মুক্ত হইতাম, তবে বোধ হয় এই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' প্রিয়াবিরহে কাতর হইতে হইত না। আমরা গোপনে দেখিয়াছি, কোনও সুন্দরী তাহার বিদেশগত স্বামীকে লিখিতেছে,—'বিধি যদি পাখা দিতেন!'

কিন্তু ভগবানের অপার করুণা যে তিনি সুন্দরীর এই কামনাটুকু পূর্ণ করেন নাই।

বোধ হয় সৃষ্টির প্রথম হইতে মানুষ 'যদি'কে ধরিতে চাহিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহা পারে নাই। কাব্যে, শিল্পে মানুষ যতই তার কল্পনার ছবিটিকে ফুটাইয়া তুলিতে চায়, ততই সে বিফল হইয়া যায়। আমরা সত্য শিবসুন্দরকে ধ্যানে—কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে—ধরিতে চাই, কিন্তু ধরিতে পারি কি? কবি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় নাই, চিত্রকর তুলিতে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই, গায়কের সুর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঠিক পথ না পাইয়া বার বার ফিরিয়া আসিয়াছে। উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে পারেন নাই,—ভূমার আঁচ্ দিয়াছেন মাত্র। মনুষ্যের ভাষা শ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, চিত্রকরের রং নিঃশেষিত হইয়াছে, কিন্তু 'যদি'র রূপবর্ণনা করা হয় নাই। 'যদি'কে না পাইলে আমাদের শান্তি নাই, আমাদের অভাব ও দুঃখের শেষ নাই। কিন্তু মানুষ যতই হাত বাড়াইতেছে 'যদি' ততই দূরে সরিয়া যাইতেছে। মানবাত্মার সঙ্গীত সামগানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—দেশে দেশে কত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, কত মহাত্মা আত্মবিসর্জ্জনের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তবু বিশ্ব-মানব আনন্দ ও শান্তি পাইল না। তীব্র পিপাসার জ্বালায়, জানিয়াও মানুষ বিষাক্ত জল পান করিতেছে; শত শত ভুল করিতেছে, কাঁদিতেছে—আবার ভুল করিতেছে। ব্রজের বাঁশীর মত কল্পনার আহ্বান আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে নিয়ত চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে,—কিন্তু আমরা বলিতেছি 'এখনও তা'রে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি!' তবু আমরা ঐ দিকেই ছুটিতেছি।

'যদি'কে ধরিতে পারিলে বোধ হয় জগৎটা মরিয়া যাইত। যদি মানবের প্রাণে আশার বহ্নি নিয়ত না জ্বলিত, যদি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানবের হৃদয় নিরাশার বজ্রানলে দগ্ধ না হইত, যদি মানবের ভাগ্য-

কাশ নিত্য বিচিত্র রঙে রঞ্জিত না হইয়া উঠিত, তবে মর্ত্তধাম স্বর্গ হইলে হইতে পারিত, কিন্তু আমরা এই বসুন্ধরার বেদনা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতাম। জগতে কান্না আছে বলিয়াই হাসি এত সুন্দর, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ এত মধুর, বিরহ আছে বলিয়াই মিলন এত মধুময়। কে এমন মূর্খ আছে যে এই হাসিকান্নার বিচিত্র রাজ্য ছাড়িয়া চিরসুখপূর্ণ স্বর্গ কামনা করে? মা'র শাসন ও আদর ছাড়িয়া কে শুধু আদর পাইবার আশা করিবে? সংসারে যদি বিপদ না থাকিত, মৃত্যু না থাকিত, তবে কি আমরা 'মা'কে এমন ভাবে চিনিতাম? প্রেমে যদি যন্ত্রণা না থাকিত, তবে কি প্রেমের জন্য লোকে দেওয়ানা হইত? যদি ভ্রমর অনায়াসে ফুলে গিয়া বসিত, তবে কি ফুলে ফুলে এত সুন্দর রং দেখিতে পাইতাম? যদি নায়িকা অনায়াসে নায়ককে ভালবাসিত, তবে কি আমরা কবিকে পাইতাম,—কোকিলের মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইতাম, নায়কের ব্যথার ব্যথী হইতে পারিতাম? নাস্তিকের দল যতই দোষ ধরুন না কেন, আমরা এখনও বলিব—চিরদিনই বলিব—"এমন দেশটি কোথা'ও খুঁজে পাবে না'কো তুমি।" তবে আমাদের শেষ কথা —'যদি'কে ভালবাস,—কারণ না ভালবাসিয়া উপায় নাই,—'কিন্তু'র দিকেও কড়া নজর রাখিও, কি জানি ঈর্ষায় দগ্ধ হইয়া শেষটায় কি করিয়া বসে!

বোধ হয় আমার কথাটা ভাল করিয়া বলিতে পারিলাম না। তাই কমলাকান্তের মত বলিতেছি,—"কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা বলিতে পারিলাম না। যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই, অমানুষী ভাষা পাই, নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।" (কমলাকান্ত বোধ হয় সম্পাদকদিগকে ভয় করিত!)

যাহা হউক—আপনারা আমার কথাটা বুঝিলেন কি? যদি বুঝাইতে পারিতাম! কিন্তু—!

শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ।

অনুরাগিনী

কি তোর পিরীতি রাই !
তুহার পিরীতি স্মরণ করিতে
আপনা হারায়ে যাই !
নাহিক কামনা— নাহিক বাসনা—
আপনা বলিতে নাই ;
তুঁহু যে বঁধুর চরণ-নূপুর,
চলনে বাজিছ তাই ।
ফুটিয়াছ ধনি ! সূরজ-বদনী * !
বঁধুর বদনে চাই',
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বদন তুহার
বঁধুরে হেরিছ রাই !
বঁধুর কারণ জীবন ধারণ,
বঁধুর বিরহে তাই
নয়ন মুদিয়া রহ গো ডুবিয়া
মরম ভিতরে যাই' ।
শোণিতে শোণিতে বঁধুর মুরতি,
হৃদয়ে বঁধুর বাস ;
পিরীতি-বিবশ তনুর পরশ—
বঁধুর হরষ-পাশ !
রূপ-নিরঝর ঝরে ঝর ঝর—
বঁধুয়া সিনান করে ;
উথলে মরমে পিরীতি-অমিয়া
বঁধুর ভোগের তরে !

---

* সূরজ-বদনী—সূর্য্যমুখী ।

আদর সোহাগ— মানের বিরাগ
বঁধুর পূজার ডালি ;
বঁধুর মূরতি করিছ আরতি
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি’।
সরম ভরম— কুলের ধরম
স্বকরে করিয়া চুর
হোমের অনলে দিতেছ ছিটায়ে,—
গন্ধ ছুটিছে দূর !
স্ফীত পয়োধর করে থর থর—
তনুতে বসন নাই ;
বিভোর ধেয়ান হরল জ্ঞেয়ান,
টুটল কালহু ঁঠাই !
পূজা সমাপিয়া আপনারে দিয়া
বঁধুরে তুষিলি রাই !
তুহার পিরীতি না মিলে জগতে,—
গোলকে আছে কি নাই !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

কথা-সাহিত্য

পশু ও পরীগল্প।

মানবজাতির সর্ব্ববিধ সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে কাব্যই যে প্রাচীনতম এই মতটা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। তবু ইহার মধ্যে যে কিছুমাত্র ভাবিবার অবসর রহিয়া যায় নাই তাহা বলা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র এবং কোনপ্রকার লিপিযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে কবিতা তাহার তরল ছন্দোগতিতে সময়-স্রোতের উপর দিয়া মানবেতিহাসের আদিযুগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের দিকে বহিয়া আসিতে পারিয়াছে। কিন্তু গদ্য জিনিসটা ভারি; কাব্যের লঘু এবং হাল্কা নৃত্যতালটা তার অভ্যাস নাই; কাব্যের মত পরিমিত নূপুরশিঞ্জিত পদক্ষেপে মানবমনের মধ্যে অনন্তকালের জন্য প্রতিধ্বনির অনুরণন জাগাইয়া রাখা তার কর্ম্ম নয়; মানব-চিত্তের স্মৃতিধৃত ছন্দের ছাপ-টুকু বংশানুক্রমে পুত্রপৌত্রদের অর্পণ করিয়া যাইবার যে ক্ষমতা সেটা তার নাই। স্মৃতি এবং মানব মনের মত সূক্ষ্ম কালি-কাগজে এই অতিকায় জীবটিকে বাঁধিয়া রাখা যায় না, বহির্জ্জগতের লিপি ও মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ-নিগড় দিয়াও যে খুব বেশী দিনের জন্য পারা যায় তা'ও কি করিয়া বলিব। 'শ্রুতি' কিম্বা 'স্মৃতি' আখ্যা পদ্যই নিতে পারে, গদ্য নয়। সময়-স্রোতের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় লঘু চরণ ফেলিয়া বহিয়া আসিবার গতি যার ছিল না, সময়-স্রোতের অতলে তলাইয়া যাইবার গতি ছাড়া তার আর কি থাকিতে পারে?

সেই জন্যই মনে হয় প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি যেমন মন্ত্র আও-ড়াইয়াছে, গান গাহিয়াছে, তেমনি হয় ত অবসর-রঞ্জনের জন্য কথায়, আখ্যায়িকায়, কল্পকাহিনীতে আপনাদের কল্পনার আবাদ করিয়াছে। কিন্তু সেগুলি ধরিয়া রাখিবে কে? হয় ত সেগুলি অতি তুচ্ছই

বিবেচিত হইয়াছে। কথাসাহিত্যিক চেষ্টার সেই আদিমতম মৌখিক যুগের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া বৃথা।

ইংরাজী সাহিত্যে যে ধরণের গল্পগুলিকে Fables, Parables আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই বোধ হয় কথাসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। এই পশু-রূপক-গল্পের প্রথম ভারতবর্ষীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ "পঞ্চতন্ত্র" নামে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলিতে নীতিনিষ্ঠ ভারতবর্ষ ধর্ম্ম সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আপন অভিজ্ঞতা-লব্ধ নিত্য-ব্যবহার্য্য সত্যগুলিকে পশুর রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছে। মানবীয় সাহিত্য-চেষ্টাকে মোটামুটি সময়ক্রম অনুসারে যে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (Symbolic, Classic ও Romantic), তার মধ্যে আদিমতম যুগটি হইয়াছে রূপকের যুগ। বক্তব্য বিষয়টিকে খোলাখুলি না বলিয়া তার অনুরূপ ছদ্ম-ব্যাপারের সাহায্যে পাঠকের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলা, পাঠকের নিকট বক্তব্য বিষয়ের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া, এবং চেষ্টা-লভ্য সত্য-গ্রহণের যে আনন্দ সেটা দেওয়াই হইয়াছে এই যুগের সাহিত্য-লক্ষণ। অন্যায়কারী অথচ প্রতাপান্বিত রাজা, সমাজ, সম্প্রদায় কিম্বা ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গের চেষ্টা অনেক সময় এই রূপকের অন্তরাল খুঁজিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইলেও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি যে ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তার ঐতিহাসিক এবং আভ্যন্তরিণ প্রমাণের অভাব নাই। বাস্তবিক বহুদিন প্রচলিত বৌদ্ধজাতকগুলির এটা যে একটা কাঁটাছাঁটা ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ সে সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। বাইবেলের রূপক-গল্প এবং খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বের লোক ইশফের বিখ্যাত কথা-গ্রন্থের উপর এই ভারতবর্ষীয় গল্পগুলির প্রভাব-লক্ষণ বিদ্যমান। সংগৃহীত হইবার পর আরব ও পারস্যের মধ্য দিয়া গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালীয়ান, জার্ম্মাণ এবং ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে ইউরো-

পীয় মধ্যাব্দীয় যুগের সাহিত্যে এগুলি যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজ এবং সাহিত্যেতিহাসের নির্দ্ধারকেরা অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রাচীন এবং আধুনিক লেখকের মধ্যে যাঁরা এই ছাঁচের গল্প লেখার কিছুমাত্র মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন, এমনকি তাঁরাও এই ভারতবর্ষীয় পঞ্চতন্ত্র এবং পরবর্ত্তী সংগ্রহ-গ্রন্থ "হিতোপদেশে"র নিকট পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে ঋণী।

ইশপের পর গ্রীসদেশে ব্রিড্রাস্ ও এভিয়েনাস্ পদ্যে পশু-গল্প লিখিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে ফরাশী সাহিত্যে কবি লা ফন্‌টেন্ এবং ফেনিলন, ইংরাজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর গে এবং ডড্‌স্‌লি এবং জার্ম্মাণ সাহিত্যে লেসিং এই ধরণের গল্প লেখার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ফেনিলনের গল্পগুলিতে লা ফন্‌টেনের ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের ক্ষুরধার নাই, পরন্তু সেগুলি কল্পনা ও চিন্তার সৌন্দর্য্যে এবং একটি অনাবিল মানব-প্রেমের স্বচ্ছতায় মণ্ডিত। ইংরাজী সাহিত্যের গের গল্পগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দৈত্য ও পরীর গল্পগুলিই মানব-সাহিত্যের কথাসাহিত্যিক চেষ্টার দ্বিতীয় ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। মানবের আধুনিক এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরীসাহিত্যের সৃষ্টির ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীক পৌরাণিক কল্পনার কতটুকু হাত আছে, মোটেই আছে কি না তাহা পুরাতত্ত্ব-বিদের বিচার্য্য। তবু সাধারণ পাঠক এবং সাহিত্য-চিন্তকের দিক হইতে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

হিন্দু ধর্ম্মসাধনা সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বোদ্বেল একই প্রাণরসে ওতপ্রোত দেখিলেও, হিন্দু পৌরাণিক কল্পনার দেবদেবীরা যেন এই বিশ্বপ্রকৃতি এবং জগদ্ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াই মানবের ভক্তি-অর্ঘ্য আদায় করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুর প্রকৃতি-পূজা, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা কিম্বা অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রমূর্ত্ত দেবদেবী-পূজার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে সত্য;

কিন্তু আপেক্ষিক তারতম্যের দিক হইতে আমাদিগকে এই কথা বলিতে হয়—গ্রীসই যেন বিশেষভাবে সমস্ত প্রকৃতিকে, প্রকৃতির বিভিন্ন রাজ্য, আকাশ পাতাল জল ও অগ্নিকে, কত বিভিন্ন আকার এবং বিচিত্র সৌন্দর্য্যের দেবদেবীর লীলাস্থলরূপে পরিগণিত করিয়া আপনার পৌরাণিক অতিমানবীয় সৃষ্টিকল্পনা সার্থক করিয়াছে এবং আপন 'পেগান' ধর্ম্মের প্রকৃতি-লক্ষণ প্রতিভাত করিয়া দিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের পরী ও দৈত্যদের সহিত হিন্দু দেবদেবী অপেক্ষা যে এই গ্রীক দেবদেবীর বেশী সাদৃশ্য বর্ত্তমান তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করা যায় তাহা বুঝি না।

তবুও এ কথা ঠিক যে দৈত্য ও পরীনিসেবিত আধুনিক কথা-সাহিত্যিক শাখার আদিম ধারাটা প্রাচ্য; বর্ত্তমান ইউরোপ এই পরী-সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য যে প্রত্যক্ষভাবে প্রাচ্যের কাছেই ঋণী তাহা সে অস্বীকার করে না। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ decimal figures, চতুরঙ্গখেলা এবং পশু-রূপক ও দৈত্য-পরীর গল্পগুলা যে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে ধীরে ধীরে আমদানী হইয়াছে, ইউরোপীয়েরা তাহা মানিতে বাধ্য হন। অন্যত্র পরী-সাহিত্য সৃষ্টি হইবার বহুপূর্ব্বেই যে ভারতবর্ষ বেতাল, সিংহাসন এবং শুকের মুখে এই অতিপ্রাকৃত মনোরম সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে সে সম্বন্ধে এখন আর কোনও সন্দেহ থাকিবার কথা নয়।

ভারতবর্ষ এই অতিমানবীয় সাহিত্যের আদি-নিদর্শন দিলেও আরব ও পারস্যই এই পরী-সাহিত্যের প্রধান জন্ম ও পুষ্টিভূমি। স্পেন-প্রবাসী মূরেরা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোদ্ধারা প্রাচ্যদেশের সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে এই পরী-রাজ্যের ইন্দ্রজাল পাশ্চাত্য কল্পনায় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

ইউরোপীয় পরী-সাহিত্যে দুই রকম অতিমানবীয় জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার মধ্যে যেগুলি মানবের মানসকল্পনা-জাত শ্রেষ্ঠ সুষমার খনি, "জলে স্থলে" যারা "মায়াজাল গাঁথে", ফুলের মধু

খাইয়া এবং ফুলের ঘরে ঘুমাইয়া যারা ফুলের মত পেলব, রামধনুর বর্ণচ্ছটায় বাস করিয়া যারা বিচিত্র এবং শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মনোহর, যারা "হাওয়ার মতন, নেশার মতন, কুসুমগন্ধ-রাশির মতন" মানব-চিত্তে মাধুর্য্যের মাদকতা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ভাসিয়া বহিয়া যায়, যারা দুইটি মানব-হৃদয়কে মিলাইয়া দিবার জন্য নানারূপ কৌশল-জাল বিস্তার করে এবং সময় সময় কোনও সৌভাগ্য-শালীকে তাদের অপার্থিব এবং লোভনীয় প্রেমানুগ্রহ দান করে, যারা

"হেলে বটমূলে, বসে নদীকূলে
প্রমোদ-শিখরে বসি নিশি করে ভোর,"

যারা "কুমুদের কোলে" "জ্যোছনা-বিছানা পাতি" শয়ন করে, নিসর্গ-মাধুর্য্যের অশরীরী মূর্ত্তি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সেই কামচারীরা যে বিলাস-লীলায়িত প্রাচ্য কল্পনার নিজস্ব সামগ্রী তাহাতে কোনও ভুল নাই। আর এক প্রকার অতি-জীব যারা আছে, তারাও এদের মত অলৌকিক ক্ষমতা রাখে; কিন্তু তারা বিশেষ করিয়া শারীরিক শক্তিশালী, কুৎসিৎ, রক্তামোদী এবং মানবের অহিতসাধনে রত; প্রেম করার উপযুক্ততা তাদের চেহারায় এবং ব্যবহারে আদৌ নাই। 'স্যাগা' ও 'এড্ডা'র দেশ, ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্রোর্ম্মিপরিসেবিত হিমানী-শীতল স্কেণ্ডিনেভিয়া তাদের জন্মভূমি। প্রথমোক্তরা যেমন প্রকৃতির মাধুর্য্যের মূর্ত্তি, 'গথিক' কল্পনার এই অতি-জীবরা তেমনি প্রকৃতির বন্য উদ্দামতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ।

মধ্যযুগের ফরাসী Troveursদিগকে এই পরীরা কৃপা করিয়াছিলেন। আর কৃপা করিয়াছিলেন Signor Basileকে, যিনি নেপ্‌ল্‌সের কথ্যভাষায় পরীসাহিত্যকে Pentamerone উপহার দিয়াছেন। ইউরোপে শ্রেষ্ঠ পরীসাহিত্য ফরাসীদেশই দিয়াছে। পশু-গল্পে যেমন, পরী-গল্পেও তেমনি, ফরাসীরাই আধুনিক জগতের মান রাখিয়াছে। Perraultএর পরী-গল্প এবং Madame Lussanএর যাদু-গল্পগুলি তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। উচ্ছৃঙ্খল পরী-

সাহিত্যে Perraultএর গল্পগুলির সংযত কল্পনায় এবং ভাষার সহজ প্রবাহে একটা বিশেষত্বের ছাপ আছে। এই গল্পগুলিই ইংলণ্ডে "Stories of Mother Goose" নামে বিখ্যাত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরবদের সামরিক গৌরব যখন লুপ্ত হইয়া আসিল, যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহারা যখন গৃহে ফিরিয়া বিলাসে গা ঢালিয়া দিল এবং মরুস্থলীর প্রান্তদেশে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে কল্পনার রাজ্যে অসম্ভবের আবাদ আরম্ভ করিয়া দিল তখনকার সেই সুরা-সরাব গালিচা-কিংখাব এবং জরী-জহরতের যে আরবদেশ তার অতৃপ্ত বিলাস-লীলা অসম্ভবকে সম্ভবের মধ্যে বাঁধিয়া দিবার আশ্চর্য্য প্রয়াসে, উদ্দাম ও অদম্য কামচারী ও বহু-রূপী সৃষ্টি-কল্পনায়, বিচিত্রোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-মোহের ইন্দ্রজালে যে অমর আখ্যায়িকাগুলিতে সার্থক হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে সেগুলির পরিচয় এবং বিশ্ব-মনের উপর তাদের প্রভাবের কথাটা আর কাহা-কেও বলিয়া দিতে হইবে না।

দুঃসাহসিক কল্পনার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে পারস্য উপন্যাস আরব্য উপ-ন্যাসের চেয়ে হীন হইলেও সূক্ষ্ম কল্পনার সলীল বর্ণনাভঙ্গিতে উহার গৌরব বরং আরব্য উপন্যাসের চেয়ে বেশী।

মোস্‌লেম কল্পনার এই পরীরা মানব-সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবীতেই বাস করিতেন। মানব-সৃষ্টির পর তাঁরা দেব ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীব-রূপে জিনের দেশে প্রয়াণ করিয়াছেন; পাশ্চাত্য কল্পনায় এখন তাঁরা পাতালপুরে বাস করিতেছেন। সেখান হইতে মাঝে মাঝে শুধু আসিয়া এই মর্ত্তভূমিতে তাঁরা পায়ের ধূলা দিয়া যান। কিন্তু তাঁরা যে পথে চলিয়া যান সেখানে তাঁদের পাদক্ষেপের নীচে দিকে দিকে বসন্ত মুঞ্জরিয়া উঠে, দোয়েল-কোয়েলের কণ্ঠ-বীণার তার কাঁপে, রসাবেশের হিল্লোল ছুটে, মনে মনে মনোভবের পূজা সুরু হয়, আর পরী-মানবের গোপন সুমধুর রস-সম্পর্কের কত কাহিনী গজাইয়া উঠে, বিধাতা-প্রদত্ত আঁখি-যোড়া বিধাতার আলোকের

দিকে খুলিয়া রাখিয়া সেগুলিকে বিশ্বাস করা বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। বাস্তবিক এঁরাই বাহিরের এবং মানব-মনের বসন্তকে এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হইতে দেন নাই; এঁরাই জরামৃত্যুকে পিছু পিছু তাড়া করিয়া অক্ষয় শ্যামলতায় মানব-চিত্ত ও প্রকৃতিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই তাঁরা যে আমাদের নমস্য সে সম্বন্ধে ত কোন ভুলই নাই; তেত্রিশ কোটির মধ্যে তাঁদের নাম-ধামের পরিচয়টা কেন পাওয়া যায় না সেটাই আশ্চর্য্য।

অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে ডেনমার্কের এণ্ডারসন পরী-গল্প লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি বহুরকমের লেখক এদিকে হাত চালাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর এই সব গল্প কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠে না—দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং পুরাণেতিহাসকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-কল্পনার অভিব্যক্তিরূপেই এগুলি ফুটিয়া উঠে। কাগজ মলাট এবং ছাপার কালো অক্ষরের লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামের ছাপা লইয়া সমাজ-স্রোতের উপর বুদ্‌বুদের মত এগুলি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে সত্য—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এগুলির মধ্যে কোনও ব্যক্তিত্বের ছাপ নাই। সমাজের সম্মিলিত মূঢ় এবং আত্মগূঢ় কল্পনাশক্তি এদের পিছনে রহিয়াছে—সমাজের সর্ব্ববিধ এবং সর্ব্বকালের ব্যক্তির মন হইতে তিল তিল রস আহরণ করিয়া সমাজ-মন এই তিলোত্তমাদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে এবং লোকে-লোকে কালে-কালে পরিপার্শ্বের অনুরঞ্জন মাখিয়া অতি সূক্ষ্ম-ভাবে এবং মন্থর গতিতে সমাজ এবং কালোপযোগী বিশিষ্টতা এদের দান করিয়া চলিয়াছে। এইজন্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নানা দেশের পরী-সাহিত্যে নানা সৌসাদৃশ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বিচারে অনেক জায়গায় স্থানীয় বিশেষ চেহারাটি বাহির হইয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এটা সমাজ-বিশেষত্ব, ব্যক্তি-বিশেষত্ব নহে।

সমাজের সম্মিলিত কল্পনা-শক্তি ইহার রস যোগাইয়াছে বলিয়াই এই পরী-সাহিত্যের আনন্দ দিবার ক্ষমতা এমন সার্ব্বজনীন। তবে অবশ্য ব্যক্তি-সাহিত্যের আনন্দ দিবার ক্ষমতার সঙ্গে এই সমাজ-সাহিত্যের আনন্দ দিবার ক্ষমতার একটা মস্ত পার্থক্য আছে।

বহুদিন হইতে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে এই পরী-রঞ্জিত অকেজো কল্পনাকে কাজের পৃথিবী হইতে ঝেঁটাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আজও তার সেই কাজ শেষ হয় নাই। ফলে, পরীরা কর্ম্মমুখর দিবালোক এবং মানবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে সরিয়া পড়িয়া নির্জ্জন বনচ্ছায়ের ছায়ালোক এবং কৃষ্ণা নিশীথিনীর জ্যোৎস্না-কিরীট লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে পাগল বসন্ত হাওয়া যে এই পরী-রোগের বীজকে কোন্ অলোক হইতে উড়াইয়া আনিয়া কোন্ দুর্ব্বলতার ফাঁক দিয়া মানব-মনে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, কবিকুলের কাব্য-সাহিত্যের গায় গায় তার লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের জাগ্রত মানব-মনের যে তন্দ্রা-বিজড়িত কল্পনা-নিবিড় কোন্‌টির উপর এই অশরীরী হাওয়া-রাণীদের কোমল চরণ পড়ে তাহার ইতিহাস প্রকাশ্য দিবা-লোকে কীর্ত্তন করার মতন, অথবা একটু উল্টাইয়া বলিতে গেলে, নিশীথ-সমুদ্রের মত সুপ্ত মানব-চৈতন্যের কিনারায় চরণালোকিত চঞ্চল বীচিগুলার উপর পরীরাণীদের লঘু পাদক্ষেপের খবর পাওয়া এবং দেওয়ার মতন দুঃসাহস একমাত্র কবিদেরই আছে। কাজেই বর্ত্তমান যুগে ছাতিম-তলা এবং চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিদায় লইয়া সৃষ্টির অথবা অনাসৃষ্টির যত আজগুবি জীবেরা কবির কাব্যে তাদের অমর বাসস্থান খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এবং এইখানে বিভিন্ন কবির মনরূপ আতস কাচের ভিতর দিয়া সাহিত্যের এই অতিলৌকিক রস বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষত্ব লাভ করিতেছে। সমাজে যাহা শুভ্র এবং সনাতন, অথবা বর্ণগন্ধহীন এবং অচেতন ভাবে পড়িয়াছিল, আধুনিক কবির কাব্যে আসিয়া তাহা

বিচিত্র টুক্‌রা রঙে শতধা ফাটিয়া পড়িয়া নবীন জীবন-ধারায় হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ এই সম্বন্ধে কল্পনা করা ছাড়িয়া দিয়াছে, ব্যক্তি আসিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অতি-জীবরা এখন আর হাটে বাটে দেখা দেন না; পল্লীর প্রাচীন গাছগুলির কঙ্কাল বাহির করিয়া দিয়া বিলীয়মান যৌবনশ্রীর মত তাঁহারা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছেন। সমাজের চক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই এখন ব্যক্তির বক্ষে আসিয়া বাসা লইয়াছেন; বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞতার দিবালোক হইতে তাঁদের নির্ব্বাসন দিয়াছে, তখন মৌন-মূঢ় মনের আবছায়ায় লুকোচুরি খেলাই তাঁদের কাজ হইয়া উঠিল। বাহিরে যাঁদের আমল দেওয়া হইল না, তাঁরাই কোন সুযোগে সিঁদকাঠি চালাইয়া মনের অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং দিনে ডাকাতির পরিবর্ত্তে আড়ালে আবডালে মন-চুরির মোহে আধুনিক মানবকে অভিভূত করিয়া দিব্য আরামে মুচ্‌কে হাসিয়া আপনাদের নির্ব্বাসনের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন।

বাহিরের জিনিসকে মনের ভিতর দিয়া এই প্রকাশের রহস্যের মধ্যেই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ অতিলৌকিক সাহিত্য-চেষ্টার একটা মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

'থিয়োসোফিষ্ট' প্রমুখ আধুনিক যুগের সুইডেনবর্গের কবি-বৈজ্ঞানিক চেলারা আবার এই অতিজীবদিগকে বাহিরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হইলে সাহিত্যের অতিলৌকিকতা আবার পুরোণো ধারায় ফিরিয়া যাইবে, অথবা আরও সত্য করিয়া বলিতে গেলে, পুরোণো ধারার নূতনতর এবং উন্নততর মূর্ত্তিতে নবজীবন লাভ করিবে। তা' যতদিন না হইয়াছে ততদিন এই মানস-লুকোচুরিই চলুক।

এই পশু এবং পরীদের কথা আজ এখানে শেষ করিব। তাঁরা মানব বিশেষতঃ মানবকদিগকে যে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করিয়া

থাকেন তার জন্ত তাঁদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। রুসো যাহাই বলুন না কেন, এই গল্প-সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা চিরকাল বিজ্ঞদের গালি খাইয়া আসিলেও, ইহার শিক্ষা এবং আনন্দ দিবার ক্ষমতা কালের পরীক্ষায় টিকিয়া আসিয়াছে। যে প্রাণীরা মানবের মুখ হইতে ভাষা এবং মানব-চিত্ত হইতে সমস্ত বৃত্তি কাড়িয়া লইয়া এবং যে অতি-জীবরা মানবকে মাধুর্য্যের শিক্ষা দিয়া প্রত্যক্ষাতীতের প্রতি ঝাপ্সা অথচ প্রবল আকর্ষণ জন্মাইয়া দিয়া, মানবের কল্পনাকে জলে-স্থলে-আকাশে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন, সেই পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, সেই জিন-পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানা, তাল-বেতাল, আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ যতসব ব্রহ্মদৈত্য ও ডাইনি-পেঁচো-পূতনা প্রভৃতি মানব-নিম্ন এবং অতিমানবদের নমস্কার করিয়া আজ বিদায় হইলাম, ভবিষ্যতে মধ্যপথের মানবকে লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

[৬]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা।

উপনিষদ সকল যেমন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মূল আশ্রয়, সেইরূপ ভগবদ্গীতাকেই কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার আদি গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। উপনিষদ পড়িয়া ব্রহ্ম কে, ইহা জানিবার ইচ্ছা জাগে। সেইরূপ ভগবদ্গীতা পড়িতে যাইয়াই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ কে, এই প্রশ্ন উঠে। কৃষ্ণের নাম ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের এক কৃষ্ণ ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষির পিতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, এই কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদ সংহিতায় অনেকগুলি সূক্তের ঋষি এক কৃষ্ণ। সম্ভবতঃ ইনিই বিশ্বকায়ের পিতা। সে যাহাই হউক, ঋগ্বেদে কৃষ্ণকে ঋষিরূপেই দেখিতে পাই। পরবর্ত্তীকালেও কৃষ্ণের এই ঋষিত্বের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কারণ মহাভারতে যে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাই, যিনি নারায়ণরূপে পূজনীয় হইয়াছেন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ পূর্ব্বে একজন মহর্ষি ছিলেন, তিনি অর্জ্জুনের সঙ্গে নর-নারায়ণ নামে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া পরে ভারত-যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, মহাভারতেই এই কাহিনী পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিম্বদন্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে আর এক কৃষ্ণের নাম পাই। ইনি অনার্য্য রাজা ছিলেন। তার পর অথর্ব্ব সংহিতায় এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে; ইনি কৃষ্ণকেশী নামে একজন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। গীতা এবং ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণকে দু'একবার কেশীনিসূদন বলা হইয়াছে। ইহাও বোধ হয় অথর্ব্ব সংহিতার কথারই জের মাত্র। কিন্তু এসকল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে একজন ঋষি বা রাজা কিম্বা বীরপুরুষ

বলিয়াই জানিতে পারি; তাঁহার ঈশ্বরত্বের কোনও উল্লেখ এসকলে নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদেই প্রথমে এই ঈশ্বরত্বের অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায়।

"অথৈতদ্ঘোরআঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়, উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভুব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত— অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অর্থাৎ—অনন্তর আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামক ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন। তিনি অন্তকালে এই তিনটি আশ্রয় পাইলেন—'তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

পরবর্ত্তী শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুতাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শ্রুতিতে সম্ভবতঃ তাহার মূল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রবল কৃষ্ণজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। জিজ্ঞাসা প্রথমে সুস্পষ্টরূপে উঠিয়াছে ভগবদ্গীতায়।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই গীতা হিন্দুদিগের নিকটে মোক্ষপ্রতিপাদকশাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। আর এই জন্যই বেদান্ত-সূত্র যেমন উপনিষদের সত্য মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে বলিয়া প্রস্থানত্রয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ ভগবদ্গীতাও সকল উপনিষদের সার-নিষ্কাষিত করিয়াছে বলিয়া, এই প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্ভূত হইয়াছে। গীতামাহাত্ম্যে আছে—

সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

অর্থাৎ সকল উপনিষদ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, পার্থ বৎসস্বরূপ, আর গীতোপদেশের অমৃতবস্তু দুগ্ধস্বরূপ, সুধীজনে এই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে

ভগবদ্গীতাকে উপনিষদেরই সার বলিয়া লোকে গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য পণ্ডিতেরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়সম্মত বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় করিয়াই গীতাভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গীতাতে এমন সকল কথা আছে, যাহা উপনিষদে নিতান্ত বীজাকারে খুঁজিয়া পাইলেও, সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। এই জন্য প্রকৃত-পক্ষে উত্তরমীমাংসার বা বেদান্তসূত্রের দ্বারা এ সকল কথার সম্যক মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। এই সকল কথা হইতেই গীতার কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

উপনিষদের মূল কথা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই সকল উপনিষদ জগ-তের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ। এই ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু। এই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে—তিনি আছেন, এই মাত্রই বলা যায়, এই ব্রহ্মের এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনও প্রকারের উপলব্ধি সম্ভবে না।

অস্তীতি ব্রুবীতি কথং তদুপলভ্যতে।

এই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম কেবল ধ্যানগম্য।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

অর্থাৎ পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের দ্বারাও তাঁহাকে ধারণা করা যায় না, অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, অথবা তপস্যার কিম্বা যাগযজ্ঞের কিম্বা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা, বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, সাধক ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এই নিরবয়ব ও নির্গুণ ভাব ছাড়া ব্রহ্মের সগুণ ভাবের কথাও উপনিষদে বিস্তর আছে। এক-দিকে ব্রহ্ম যেমন জগদাতীত, সেইরূপ অন্যদিকে তিনিই জগৎরূপে পরিণত, জগতের অতীত হইয়াও তিনি জগতকে ব্যাপিয়া আছেন।

স্বরূপতঃ তাঁর কোনও অবয়ব বা রূপ নাই, অথচ তিনি সকল রূপে-তেই আছেন।

তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে

পৃথিব্যাদি সকল লোক তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও কিছু নাই ও থাকিতে পারে না। এই আশ্রয় আশ্রিত ভাবের জন্য নিরবয়ব ব্রহ্মবস্তু সকল অবয়বেতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ অবয়ব ধারণ করিয়া আছেন।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

যেমন একই অগ্নি ভূবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দাহ্য বস্তুর রূপ-ভেদে সেই সেই বস্তুর রূপ-ধারণ করিয়াছেন, তেমনি যিনি এক ও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তিনিও নানা বস্তুভেদে তত্তদ্‌বস্তুর রূপ হইয়াছেন, আর তৎসমুদায়ের বাহিরেও আছেন।

এইরূপে উপনিষদ একদিকে যেমন ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বা জগদাতীত, তুরীয় স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ আবার তাঁহার সগুণত্ব বা জগদ্ব্যাপিত্ব, বা জগদ্রূপত্বও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই নির্গুণ ও সগুণের অতীত যে আর কোনও তৃতীয় স্বরূপ বা রূপ তাঁর আছে, কি থাকিতে পারে, ইহার কোনও সুস্পষ্ট সন্ধান উপনিষদে আছে বলিয়া জানি না। যে বেদান্তসূত্র সকলপ্রামাণ্য উপনিষদের মীমাংসা ও সমন্বয় করিয়াছেন, তাহাতেও এই তৃতীয় স্বরূপের কোনও বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই না। তবে কোনও কোনও সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, সগুণত্ব বা জগদ্রূপত্ব, এই দুই ছাড়া আরও এক রূপের কথা বলিয়াছেন বটে—তাহা তাঁর জীব-রূপ। নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একদিকে জগদ্রূপে,

অন্যদিকে জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন ; সগুণ ব্রহ্মের জগদ্রূপত্ব ও জীবরূপত্ব এই দ্বিবিধ প্রকাশ বা পরিণতি আছে। এই দু'এর অতীত যে তত্ত্ব তাহাই নির্গুণতত্ত্ব বা তুরীয় তত্ত্ব। এতটুকু পর্য্যন্ত উপনিষদে বা বেদান্তসূত্রে বেশ সুস্পষ্টই পাওয়া যায়। কিন্তু গীতা পুরুষোত্তম বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা উপনিষদে ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকারেরা কেহ কেহ

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ (১ম অঃ ২য় পাদ ৯ম সূত্র)

এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া "অত্তা" শব্দের শ্রীপুরুষোত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই পুরুষোত্তম উপনিষদের ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ নহেন।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

কঠোপনিষদের এই শ্রুতির উপরেই এই সূত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শ্রুতির অর্থ এই,—

"ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন মাত্র—(অর্থাৎ ঘৃতাদি যাহা অন্নে মাখিয়া খাওয়া যায়) সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কি, এবং তাঁহার স্থিতি বা কোথায়, তাহা কে জানিতে পারে ?"

এই ভাষ্যকারেরা বলেন যে এই শ্রুতিতে যাঁহাকে অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলা হইয়াছে, তিনি পুরুষোত্তম, কিন্তু অত্তা শব্দে এই-খানে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কেননা, মৃত্যুকেও তাঁহার উপ-সেচন বলায় চরাচরবিশ্ব সমস্তই তিনি আত্মসাৎ করেন, ইহা বলা হইল। আর ব্রহ্মই "তজ্জ" ও "তল্ল"—অর্থাৎ তাঁহা হইতেই চরা-চরবিশ্বের জন্ম হয় (তজ্জ), আর তাঁহাতেই এই চরাচরবিশ্বের লয় হয় (তল্ল)। এইজন্য এই অত্তা বা ভক্ষক অপর কেহ নহেন, ব্রহ্মই স্বয়ং। এখানে ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলার সার্থকতা কি, ইহা বুঝা যায় না।

ফলতঃ উপনিষদ ও বেদান্তসূত্র পড়িয়া গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলেই এখানে ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার একটা নূতন স্তরে যাইয়া যেন উপস্থিত হই। গাছের সঙ্গে অঙ্কুরের যেমন প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নাই, গীতার এই সকল নূতন তত্ত্বের সঙ্গে সেইরূপ সম্ভবতঃ প্রকৃতপক্ষে উপনিষদেরও কোনও বিরোধ না থাকিতে পারে। অথচ গাছ একটা নিতান্ত নূতন বস্তু, অঙ্কুরেরই পরিণত অবস্থা হইলেও, অঙ্কুর হইতে ভিন্ন। সেইরূপ গীতার এইস্তরে যে সকল তত্ত্বের সন্ধান পাই, তাহা উপনিষদের তত্ত্বেরই বিকাশ হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন। উপনিষদ্ ব্যক্তকে ধরিয়া অব্যক্তে গিয়াছে, ক্ষরকে ধরিয়া অক্ষরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি"—শ্রুতি, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র, এ সকলই এই ব্যক্ত ও এই ক্ষরকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ভূতগ্রাম ব্যক্ত, প্রত্যক্ষ। এই ভূতগ্রাম একদিন ছিল না, তখন ইহাদের কথা কিছুই জানিতাম না। তখন তারা অব্যক্ত ছিল। ক্রমে একদিন তাহারা জন্মিল, ব্যক্ত হইল, তখনই আমরা বা অপর কোনও জ্ঞাতা তাহাদিগকে জানিলেন। এই ভূতগ্রাম এইরূপে জন্মিয়া বা ব্যক্ত হইয়া, কিছুদিন এই ব্যক্তভাবেই রহিয়া গেল। তারপর, ক্রমে আবার তাহারা অব্যক্তে অদৃশ্য বা মৃত হইয়া গেল। গীতায় পড়িলাম—

"অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব"—ইত্যাদি।

হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত থাকে, মাঝখানে ব্যক্ত হয়, আবার নিধনে বা লয়কালে অব্যক্ত হইয়া যায়। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই তত্ত্বের উপরেই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের মূল ও আদি প্রতিষ্ঠা। আর যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া কেবলই প্রবাহের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। পরিণতির পর পরিণতি, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, অপচয় ও উপচয়ের স্রোতে পড়িয়া ভূতগ্রাম

নিয়ত কম্পিত হইতেছে। এই প্রবাহই ক্ষর। শুদ্ধ সত্তার দিক্ দিয়া যাহাকে ব্যক্ত বলিতে পারা যায়, বিকাশের অভিব্যক্তির বা পরিণামের দিক্ দিয়া তাহাকেই ক্ষর বলিতে হয়। আর ব্যক্তের অন্তরালে যেমন অব্যক্ত, সেইরূপ যাহা ক্ষরিতেছে তারই অন্তরালে এই ক্ষরণের নিত্য সাক্ষী হইয়া, অক্ষর বিরাজ করেন। যাহা অব্যক্ত তাহাই অক্ষর। বস্তু এক, কেবল দুই দিক্ দিয়া এই একই বস্তুকে দেখিয়া, তাহার এই দুই নাম হইয়াছে। এই ব্যক্ত ও অব্যক্তকে, এই ক্ষর ও অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া আমাদের যে সকল অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। উপনিষদ এই দুইটি মুখ্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ উপনিষদে বা বেদান্তসূত্রে, বিশেষভাবে পরিষ্কাররূপে এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এই ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই তত্ত্বের বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু গীতাতে পড়িলাম—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫-১৬।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫-১৭।
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫-১৮

অর্থাৎ—এ লোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ :—এক ক্ষর-পুরুষ, অপর অক্ষর-পুরুষ। যাবতীয় ভূতসকল ক্ষর নামে অভিহিত হয়। আর কূটস্থ যিনি তাঁহাকেই অক্ষর বলা হয়। এই দু'এর অতিরিক্ত আর এক পুরুষ আছেন, তিনি উত্তম বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পরমাত্মা কহে। ইনি অব্যয় এবং নির্ব্বিকার ঈশ্বর হইয়াও, ত্রিলোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সকল লোককে প্রতিপালন করেন।

আমি এই উত্তম পুরুষ। আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরের অপেক্ষাও উত্তম, এই জন্যই লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি।

এই পুরুষোত্তম কে? এখানে এই প্রশ্ন উঠে। গীতা যাবতীয় ভূতগ্রামকে ক্ষর বলিতেছেন—"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি"; সুতরাং আমরাও এই ভূতগ্রামের অন্তর্ভূত, ক্ষর পুরুষের অন্তর্গত। উপনিষদ ব্রহ্মবস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, বলিয়াছেন, এই যাবতীয় ভূতগ্রামকেই এখানে সর্ব্বাণি ভূতানি বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই ক্ষরপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। আর কূটস্থ যে চিদ্‌বস্তু, যাঁহা হইতে এই ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং উৎপাদন করিয়া যাহার মধ্যে এই পরম চৈতন্য, এই সদ্বস্তু বা ব্রহ্মবস্তু অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেই সর্ব্বজীবাত্মান্তর্যামী পুরুষই অক্ষর-পুরুষ। এই অক্ষর-পুরুষ সাক্ষীচৈতন্য। জগতের নিত্য পরিবর্ত্তন-প্রবাহের সাক্ষী হইয়া তিনি রহিয়াছেন। তিনি কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মের সাক্ষী মাত্র। তিনি ভোক্তা নহেন, ভোগের সাক্ষী মাত্র। তিনি স্বয়ং অপরিণত থাকিয়া সকল পরিণামের সাক্ষ্যদান করেন। এই ক্ষর আর ঐ অক্ষর, ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হইয়া আছেন। এই পর্য্যন্ত বোঝা যায়। উপনিষদে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। কিন্তু তার পরেই শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ছাড়া আর একজন পুরুষ আছেন। তিনি উত্তম পুরুষ। কেহ কেহ তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়াও থাকে। তিনি এই ত্রিলোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অক্ষর বটেন, কিন্তু কূটস্থ অক্ষর পুরুষ যেমন নিষ্ক্রিয়, এই উত্তম পুরুষ সেরূপ নিষ্ক্রিয় নহেন। তিনি কেবল সাক্ষী নহেন, তিনি নিয়ন্তা, ঈশ্বরও বটেন। তিনি কর্ম্মের নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত সাক্ষীমাত্র নহেন, কিন্তু নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকিয়াই আবার সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, প্রেরয়িতা, কর্ম্মাধিপ তিনি। আর

এই জন্যই তিনি ক্ষর পুরুষের অতীত, আবার অন্যদিকে কেবল সাক্ষীমাত্র যে অক্ষর পুরুষ, তাঁহা হইতেও তিনি উত্তম। এই জন্যই লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে। তার পরেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত!

অর্থাৎ—হে ভারত! যে মোহাতীত হইয়া এইরূপে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সকল জানে, ত্রিলোকে তার আমার সম্বন্ধে আর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। আর আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিয়া এই সর্ববিদ্ সাধক সকল ভাবের দ্বারা আমার ভজনা করে।

উপনিষদের শেষ কথা ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ব্রহ্মকে জানিলেই জীব মুক্তি লাভ করে, উপনিষদের এই প্রতিজ্ঞা। এই ব্রহ্মই বিশ্বের পরম তত্ত্ব। উপনিষদ এই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়াছেন। উপনিষদের ভাবে গীতার অর্থ করিলে, এখানে এই অক্ষর পুরুষ, এই কূটস্থ পুরুষকে ব্রহ্ম অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। গীতাতেও (অষ্টম অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোক) ভগবান্ পরমব্রহ্মকেই অক্ষর বলিয়াছেন,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্ম মুচ্যতে।

সুতরাং গীতার নিজের অভিধানেও পঞ্চদশ অধ্যায়ের

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ"

এই শ্লোকের অক্ষর শব্দে পরমব্রহ্মকেই বোঝা সঙ্গত। উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে উপনিষদের সঙ্গতি ও সমন্বয় রাখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র না হইয়া, গীতাতে এমন কিছু কিছু তত্ত্বের উপদেশ আছে, যাহা উপনিষদে নাই, এটি স্বীকার করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত না হইলে, গীতা যে ব্রহ্মতত্ত্বের অতীত ও তদপেক্ষা উত্তম ভগবদ্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা অতি স্পষ্টরূপেই ধরিতে পারা যায়। আর

সে অবস্থায় এখানে অক্ষর বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায় না, এটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য অযথা পরিশ্রমও করিতে হয় না। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া গীতাপাঠ করিলে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়োবীতরাগাঃ
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১।

যে অক্ষর পুরুষের কথা বেদবিদেরা বলেন, যতিগণ বীতরাগ হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, যাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, সংক্ষেপে আমি সেই ব্রহ্মপদ বলিতেছি।

গীতার এই শ্লোকে কঠোপনিষদের একটি শ্রুতির প্রতিধ্বনি সুস্পষ্টভাবেই জাগিয়াছে। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১ম-১৫।

অর্থাৎ সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, সমুদায় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থীগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি—তিনি এই ওঁ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্যতৎ ॥ ১ম-১৬।

অর্থাৎ—এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহার হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বন পরম
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১ম-১৭।

গীতা এই অক্ষর ব্রহ্মকেই যে এখানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। "তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে"—সেই ব্রহ্মকে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, বলিয়া তিনি ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন,—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৮-১৩।

উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক ওঁ-কারকেই ব্রহ্মলাভের অনন্য প্রতি-যোগী, শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়াছেন। ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়। জ্ঞান হইতেই মুক্তি। আর

স্বদেহং অরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।

আপনার দেহকে অরণি আর প্রণব অর্থাৎ ওঁকারকে উত্তরারণি করিয়া, ধ্যানসহকারে নির্ম্মন্থন করিলে নিগূঢ় ভাবে আত্মাতে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। প্রণবের আবৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্ম লাভের জন্য অন্য কোনও উপায়ান্তর অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও স্মরণ করিতে বলিতেছেন। যে ওঁ এই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দের আবৃত্তি করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কেবল ওমিত্যে-কাক্ষরং ব্রহ্মের আবৃত্তি দ্বারা পরম গতিলাভ হয় না, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বা স্মরণ আবশ্যক। অথচ উপনিষদ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ওঁকার প্রতিপাদক ব্রহ্মই জীবের শ্রেষ্ঠ আলম্বন, এই ব্রহ্মবস্তুকে জানিয়া জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মলোক অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন !
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮-১৬ ।

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত লোক আছে তৎসকল লোকবাসীগণই সংসারবর্ত্মে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কেবল আমাকে পাইলেই জীবের আর পুনরায় জন্মলাভ হয় না।

ব্রহ্মকে যেমন অক্ষর বলা হয়, সেইরূপ অব্যক্তও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে যেমন অক্ষর-পুরুষ অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন, সেইরূপ এই অব্যক্ত অপেক্ষাও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতেই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, আর প্রলয়কালে এই অব্যক্তসংজ্ঞক তত্ত্বতেই বিলীন হইয়া যায়। বারম্বার এইরূপ ভূতগ্রাম সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আবার প্রলয়কালে তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। এখানেও "যতো বা ইমানি" শ্রুতি এবং "জন্মাদ্যস্যযতঃ সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্রহ্ম বা অব্যক্ত হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়, শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে আপনাকে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮-২০ ।
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮-২১ ।

ব্যক্ত এবং অব্যক্ত লইয়াই জগৎ। ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই তত্ত্বই সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর এক সনাতন ভাব আছে। সমুদায় ভূতগ্রাম নষ্ট হইলেও এই বস্তু নষ্ট হয় না। যাহাকে অব্যক্ত-অক্ষর বলা হয়, তাহাই পরম গতি বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা পাইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠধাম।

গীতার এই সকল শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের পরেও যে আর একটা তত্ত্ব আছে, সর্ব্বপ্রথমে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ভাবেই গীতায় একটা নূতন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দেয়। এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই কৃষ্ণজিজ্ঞাসার মূল।

গীতাতে আরও অনেক নূতন কথা উঠিয়াছে। কৃষ্ণজিজ্ঞাসার ও কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সে সকল কথা তুলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অণিমা

অন্তহীন, অস্তহীন আকাশের নীলিমা-সাগরে,
বৃন্তহীন নীলশতদলোপরি, অনিন্দ্যসুন্দরি,
নৃত্য করি লীলাভরে, নীলাম্বরী সাড়িখানি পরি,
হেলায় এলায়ে কৃষ্ণকেশরাশি দিগন্ত উপরে,
মহিমা গরিমা পুনঃ সঙ্কোচিয়া অণুর ভিতরে
অণিমা প্রকাশ কর অকস্মাৎ! মুক্তারূপ ধরি
শুক্তিমাঝে যাও প্রবেশিয়া! ত্রিলোক-ঈশ্বরি!
কোটীনামে, কোটীরূপে দেখা দাও বিশ্ব-চরাচরে।
হে বিরাট মহাকালি, অনন্তের খুলিয়া কপাট,
কোটী রবি, কোটী শশী করে ল'য়ে, কন্দুক-লীলায়
মহাহাস্যে থাক রত! লোফালুফি বালিকার প্রায়।
সদ্য-স্ফুট গোলাপে আবার প্রবেশ করি ঝাট,
হও তুমি নিশির শিশির! গুপ্ত করি আপন গরিমা,
আমারি মাঝারে আছ!—জীবরূপে অপূর্ব্ব অণিমা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

থেকো সাথে

[কোন ইংরাজী কবিতা হইতে অনুবাদিত।]

(১)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
যখন নামিবে সন্ধ্যা চঞ্চল চরণে
আঁধার ঘনাবে আপনার মনে
(তখন) থেকো নাথ, থেকো সাথে ;
যখন সকল উপায় যাবে ঘুচি'
শেষ সুখ-আশা যাবে মুছি'
হে অশরণ-শরণ
(তুমি) আসিও তখন।

(২)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
যবে মম জীবনের ক'টি দিন
আরো' হইয়া আসিবে ক্ষীণ ;
ধরণীর সুখ, ধরণীর আলো
কিছুই যখন লাগিবে না ভালো
সে ধ্বংস মরণ মাঝে,
হে চিরন্তন, আসি দাঁড়া'য়ো কাছে।

(৩)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
ওগো, মোরে ক্ষণিকের দেখা নাহি দিও
ক্ষণিকের কথা নাহি ক'য়ো
(তাতে আরো যে বেদনা)

হে অন্তরতম তুমি অন্তরে মম রহিও,
—ক্ষণিকের দেখা নাহি দিও
(না চাহি ক্ষণিকেরি চেতনা)

(৪)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
নাহি আসিও রাজাধিরাজ রূপে,
তোমার ও রূপে পরাণ যে কাঁপে,
শান্ত সুন্দর রূপে যেন আসিও ;
(আমার) হৃদয়ে বাহিরে যত অমঙ্গল
তুমি মঙ্গল রূপে নাশিও
শোক তাপ দুঃখ দৈন্য যত
আমার চোখের জলে সব হরিও
পাতকীতারণ রূপে আমারে ধন্য করিও।
হে চিরসাথি মম, সাথে সাথে তুমি থাকিও।

(৫)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
তোমাতে যে মোর অনুক্ষণ কাজ ;
তোমা বিনা প্রলোভনে
কেমনে দিব হে লাজ ?
যেন শত বিপদের মাঝে,
তোমারি মঙ্গল কর মোরে রাখে,
তোমারি শুভ-ইচ্ছা
আমার হীনতা ঢাকে।
আমার হৃদয়ে, তোমার মূরতি
ওগো, যেন চির জাগে।

(৬)

থেকো নাথ—থেকো সাথে ;
ডরি না কাহারে—থেকো সাথে তুমি
শত অপমান ?
বেদন না মানি।
অশ্রু জল ?
তাহাতে কি হানি ?
হে মরণ! আজি যে হারিলে ভাই!
বিশ্বপতি সাথে মোর,
তব পরাজয় তাই।

(৭)

যখন নয়ন মম আসিবে মুদিয়া
চির বিরামের তরে,
তখন আঁধার উজলিয়া
হয়ো হে প্রকাশ ;
দেখা'য়ো তব আলোক-লোক
ধরণীর দুঃখ শোক
সকলি যাইবে দূরে।
নবীন দেশে নবীন প্রভাতে
আবার জাগিব আমি
জীবনে মরণে কাছে থেকো
ওগো স্বামি!

শ্রীঅন্নদাভূষণ সেন

আঁধার ঘরে

[কথা-নাট্য]

প্রথম দৃশ্য।

[পল্লীগ্রামের পথের এক প্রান্তে উলুখড়ে ছাওয়া দোকান-ঘর ও চটী-ঘরের ঝাঁপ বন্ধ...ঘরের ভিতর মেঝেতে পিঁড়ী পাতিয়া বসিয়া কাদম্বিনী চরকা ঘুরাইয়া সূতা কাটিতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। ভরা ভাদ্র মাস, রাত্রির অন্ধকারে ভীষণ ঝড়ে বাহিরের গাছের ডাল মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিতেছে, মেঘ ঘোর অন্ধকারে অবিরাম বারি-বর্ষণ করিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোক ও বজ্রপতনের শব্দ, দূরে দূরে পেচক ও শৃগাল উচ্চ তীব্র বিকৃত স্বরে ডাকিতেছে। ঘরের সম্মুখে ও পার্শ্বে চূর্ণী নদীর জলে ডাক উঠিয়াছে—নদী ফেনময়। কাদম্বিনীর বয়স বাইশ বৎসর, দেখিতে খুব সুন্দরী, পরিধানে আধ-ময়লা লাল পাড় সাড়ী, হাতে শাঁখা ও খাড়ু, চরকা ঘুরাইতে ঘুরা-ইতে সূতা টানিয়া গান গাহিতেছে,—]

লবডং সবডং গাম্‌নী গুম্‌নি
চরকা আমার ডাকে রে
লবডং সবডং ...

চরকা আমার ভাতার পুত,
চরকা আমার হিয়া,
চরকার দৌলতে আমার সাত বেটার বিয়া রে
লবডং সবডং...

চরকা আমার সোনার দোত,
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী রে
লবডং সবডং...

ছয়মেসে তূলা আমার
নয়মেসে পাঁজ,
সেই সূতো কাটে যেন আস্ত কলার মাজ রে
লবডং সবডং...

মাগী কাটে সরু সূতো
মিন্‌সে ধরে ছাতি
(আমার) চরকায় যদি রোদ লাগে ত মুয়ে মার্‌ব নাতি রে
লবডং সবডং...

হ্যাঁ, আর তোর চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগে না, দূর তোর...প্রাণটা যেন খাবি খেয়ে উঠ্‌ছে, আর পারিনে, আজ ছ ছটা বছর, মিন্‌সে কোন্ চুলোয় গেল, তার খই খবর হ'ল না, দূর—আর মিন্‌সেই বা কোথায় যে মুখে দুটো নাতি কসাব...

(আবার চরকায় নূতন সূতা ও পাঁজ জড়াইতে জড়াইতে)

পোড়া পেট...পোড়া পেটে চুলোর ছাই দুটো ছেঁচ্‌কিপোড়া না গুজ্‌লে ত নয়, এ বাকড় ত ঠাণ্ডা হবে না—দিন রাত্তিরই ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে, কবে যে নিভ্‌বে...

(বাহিরে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিল ও কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়িল, দরজার ফাঁক দিয়া ও চালের ফাঁক দিয়া আলো চম্‌কাইয়া উঠিল)

মাগো, কি ছ্যাওর ঝিল্‌কীই দিচ্ছে, কক্কড়্ কড়্ ডাক্ ডাক্, খুব ডাক্, আকাশ মাটি ফাটিয়ে ডাক্...কাদি পোড়ারমুখীর আটচালায় পড়ে মর্‌ণা—তাত পারে না, কেবল আকাশের গায় চক্‌মকি ঠুক্‌ছে, আর ডেকে মর্‌ছে,...আমি একলা ঘরে থাকি রে মুখপোড়া, একলা ঘরে থাকি, আমার এ ভাঙা ঘরে তোর ও আলোর ঝিল্‌কী কেন বল্ ত ; আমার ভয়ও নেই, ভরসাও নেই ; সুখও নেই, স্বস্তিও নেই। আমার ও ভাঙা ঘরে তোর ও আলোর চম্‌কানি কেন বল্...যাদের আশা ভরসা থাকে তাদের সব চলে লো সব চলে ; আমার কি, আমার

কি, মিনসে ছিল, কোন চুলোয় যে গেল তার ঠিক নেই, আজ ছটা বছর ঘুরে গেল, বেঁচে আছে কি মরেছে তারও খই খবর নেই, একটা গাঙ্‌শালিক ছিল, তাও মরে গেল, দু'একবার মা বলে ডাকত, তাও আর শুনতে হবে না...তা এ সব কেন বল্‌,—

(দূরে শৃগালেরা ঘোর রবে ডাকিয়া উঠিল···)

বলি এ রাত্তিরে কাদিরই ঘুম নেই, পোড়া শেয়ালগুলোর কি মরণ, ঘুম নেই গা। এই দুর্যোগ, মর্‌ছে মড়ারা মড়া খেয়ে,...হুয়া, হুয়া হুয়া, যেন দেয়ালা কর্‌ছে, মর...

(বাহিরে গাছের ডাল মড়্‌ মড়্‌ শব্দে ঝড়ে ভাঙিতে লাগিল... বাতাস আটচালার কাণায় কাণায় গোঁ গোঁ, চড়্‌ চড়্‌ শব্দে ঘুরিতে লাগিল)

ভাঙ্‌, ভাঙ্‌, নেনা নে, কাদির আটচালাখানা উড়িয়ে নে যা না...মর্‌, আকাশ যেন কেঁদে কেঁদেই মল,...আর কেঁদে কি কর্‌বি বল্‌, কাঁদ্‌লে কেউ শোনে না লো, কেউ শোনে না, পোড়ারমুখি, কেঁদে কি কর্‌বি বল্‌, কাঁদলে কেউ শোনে না লো, কেউ শোনে না, পোড়ারমুখি, কেঁদে কি কর্‌বি বল্‌...অনেক কেঁদেছি কই কেউ শোনে না—ওই মাঠের পানে চেয়ে আলের ধারে বসে অনেক কেঁদেছি, গুমরে কেঁদেছি, ফুঁপিয়ে কেঁদেছি, চেঁচিয়ে কেঁদেছি, মাটিতে মুখ গুঁজড়ে নিশ্বাস চেপে চেপে কেঁদেছি, কেউ শোনে না...ওই নদীর ধারে বসে চূর্ণীর জলে কত চোখের জল পড়েছে, আকাশের তারারা শুনেছে...না লো আর কাঁদিস্‌ নি। (উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল...) উঃ নদী যেন ক্ষেপে উঠেছে...(জোর হাওয়ায় প্রদীপটা নিভিয়া গেল—দরজা বন্ধ করিতে করিতে)...যাক্‌, বেশ হয়েছে, সত্যিই ত, আমার আবার পিদীম জ্বালা কেন, অন্ধকারে আছিস্‌ অন্ধকারেই থাক্‌—আঃ জ্বালাতন, আজ তিন দিন চটীতে লোক নেই, কাল যে কি খাব তার ঠিক নেই। চক্‌মকিটা আবার গেল কোথা...

দূর ছাই, ইচ্ছে করে মাথায় পাথর মেরে মরি, আঃ মিন্‌সেকে একবার পাই ত খোড়্‌কুচি করি—আর পারিনে।

(প্রদীপ জ্বলিল—চরকাটা সরাইয়া রাখিয়া, মাথার চুল গুটাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে) ···মরণ্, চুলগুলোও বাদ সাধে—এ থাকাই বা কেন, কার জন্যে থাকা ? (এমন সময়ে নেপথ্যে বাহিরের দরজার কাছে, একজন 'কাদি', 'কাদি', 'কাদম্বিনী' বলিয়া কে ডাকিল)...কে নাম ধরে ডাকে, ওঃ মরন্ আর কি, সেই শেখর পোড়ারমুখো বুঝি...না পোড়ারমুখোর জ্বালায় আমায় এবার দেশ ছাড়্‌তে হ'ল...আর যাই বা কোন্ চুলোয়, পোড়া বয়স যে সঙ্গে যাবে গা...

(নেপথ্যে..."কাদি—কাদু—কাদম্বিনী—তোর পায়ে পড়ি ভিজে মলুম, একবার খোল্")

না খুল্‌ব না, তুমি কেমনতর মানুষ গা ? না মিন্‌সে বড় বজ্জাত বাপু। কিন্তু তাই ত ..আচ্ছা আমি একলা বুকে হাত দিয়ে শুয়ে থাকি, তায় তোর মাথার টনক্ নড়ে কেন ?

শে। কাদু ! তোর পায়ে পড়ি কাদু...

কা। না বাপু, আমায় তিষ্ঠুতে দিলে না, [illegible] কোথা যাব মা, মুখপোড়া যেন চাঁদখানা, উঁকি মারে, প্রাণটা যেন ছাঁত করে ওঠে...নাগো না আমি এখন খুল্‌তে পারব না, আমি খুল্‌ব না—যাও...

শে। তোর পায়ে পড়ি, কাদি লো, তোর পায়ে পড়ি, আমি ভিজে মরে গেলুম্ লো। কাদু লক্ষ্মী, বড় ঝড়্, কাদি চূর্ণী সাঁত্‌রে পার হয়ে তোর কাছে এসেছি, কাদি আমার হাত পা এলিয়ে পড়েছে...

কা। আমার এখানেও বড় ঝড়, আটচালা টেঁকা ভার, যাও, যাও, কেন অমন কর্‌ছ, যাও আমি একলা ঘরে, একলা, খালি বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে থাকি, তোমার কি এই উচিত ? (দরজার ফাঁক দিয়া দেখিয়া) আহা ! সত্যি ভিজে গেছে,

কাঁপ্‌ছে, আহা! এ্যাঁ, চূর্ণী সাঁতারে পার হ'ল...তবে কি করি, অ্যাঁ কি সোন্দর, আমার ভাঙা ঘরে...আমার এ ভাঙা ঘরে...ওঃ ওঃ).. দাঁড়াও বাপু হ্যাঁ...

(কাদম্বিনী সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শেখর গৃহপ্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল...সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, মাথা হইতে জল ঝরিতেছে...পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন)

শে। কাদু! কাদু!

কা। (কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা শুখ্‌নো কাপড় লইয়া পরিতে দিল) শেখর! তোমার কি এই উচিৎ...আমি গরিব, সূতো কেটে পেটের জ্বালা নিবুই, চটীতে লোক আসে, চাল ডাল বেচে খাই! তোমার কি এই উচিত...শেখর! শেখর! এতদিন পরে—একি শেখর!

শে। কাদু! আমি যে আর পারিনে, সত্যি বল্‌ছি, কাদি! তোর জন্যে যেন প্রাণটা কর্‌ কর্‌ করে ওঠে, থাক্‌তে পারিনে। খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, দু'দণ্ড কাজে মন দিতে পারিনে...কাদি! আমায় বাঁচা, কাদি! আমি আর পারিনে কাদু! আমি নিশ্চয় মরব, কাদি! কাদি! উঃ কাদি! কাদি! আর কতদিন কাদি! কেঁদে কেঁদে জীবন যাবে বল, কাদি! তোর পায়ে ধরি......

কা। কি কর, কি কর, অ্যাঁ! দেখ, দেখ, আমার শেষ কি হবে তা বুঝ্‌তে পারছ না, আমার শেষ কি হবে বুঝ্‌তে পারছ না...

শে। কাদি! যতদিন বাঁচ্‌ব মাথার মণি, বুকের হার, উঃ কাদি! আমি মরব কাদি আমি মরব, কাদু! কাদম্বিনি! কাদু! কাদু! আর যে পারিনে কাদু!

(শেখর কাদম্বিনীকে বাহু প্রসারণে বাঁধিতে গেল—কাদম্বিনী দূরে সরিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল)...

কা। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার পায়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও। (শেখর অঞ্চল ধরিল) ওগো! কি কর! কি কর! উঃ তুমি যে বড্ড সোন্দর, বড্ড সোন্দর, ওগো! তুমি যাও, যাও, যাও, আমার মাথা কেমন করছে, আমি কি করব, আমি কি করব, শেখর! তোমার পায়ে পড়ি চলে যাও ...ছেড়ে দাও...

শে। কাদু! আমি যে তোকে বড় ভালবাসি...

কা। ভালবাস! কেন, গরিব বলে, অ্যাঁ—না—না—আমায় ভালবেস না, আমায় ভালবাস্‌তে নেই, ছিঃ আমায় ভালবাস্‌তে নেই, দেখ্‌ছ না (হাতের নোয়া দেখাইয়া) অ্যাঁ...না—না—না—তুমি বড্ড সোন্দর, শেখর! না—না—যাও, যাও, তোমার পায়ে পড়্‌ছি, কি করছ শেখর, কি করছ, উঃ শেখর! কেন ভালবাস, উঃ আমার মাথা কেমন করছে! এ সুখ না জ্বালা শেখর! না—না—আমায় যে ভালবাস্‌তে নেই শেখর!

শে। কাদু! কাদু! প্রাণের কাদু! না—না—ভালবাসি, ভালবাসি...জীবন নিয়ে আর এ খেলা খেল্‌তে পারিনে কাদু! কাদু!

(শেখর কাদম্বিনীকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল—কাদম্বিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া পড়িয়া গেল.. খোঁপা খুলিয়া নিবিড় কাল কেশের রাশি শেখরকে ছাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল)।

কা। শেখর! ছাড়, ছাড়, শেখর! কি কর! কি কর! তোমার পায়ে ধরি, উঃ তোমার নিশ্বাসে যেন আগুন জ্বল্‌ছে শেখর! ছাড় শেখর, আমার সর্ব্বনাশ কর না—উঃ, উঃ, শেখর কেন তুমি এত সোন্দর শেখর! শেখর! উঃ—

শে। কাদু! কাদু! প্রাণের কাদু!

কা। শেখর! শেখর! ওই বিদ্যুতের ভেতর থেকে কে বারণ করছে, ওই দেখ শেখর! শেখর! (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) প্রদীপটা নাচ্‌ছে কেন?......

(কাদম্বিনী অঞ্চলে প্রদীপ নিভাইয়া দিল...গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল...বাহিরে তখন বিদ্যুৎ ও বজ্রের কড়্ কড়্ শব্দের সঙ্গে চারিদিক হইতে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল ও ঘরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল)...

কা। শেখর! শেখর! মাটিতে পা পড়্ছে, না—পা—গা—মাটি যেন কাঁপছে, অন্ধকার, অন্ধ...

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[চূর্ণীনদীর তীরে ..কাদম্বিনী গ্রামের পথ দিয়া নদীর দিকে কলসী কক্ষে লইয়া চলিয়াছে ..তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে ..নদীর অপর প্রান্তে সূর্য্য ডুবিতেছে, জলের হিল্লোলে রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে...দূরে জলের রেখা ও আকাশ ধোঁয়ার মত মিলাইতেছে, নদীর তীরে চকাচকিরা ডাকিতেছে, একটা বেনেবউ পাখী 'খোকা হোক্', 'খোকা হোক্' বলিয়া ডাকিতেছে।]

কা। লজ্জা করে গো, লজ্জা করে, কেমন যেন লজ্জা করে, এমন ত ছিল না, শেখর! শেখর! আমার আঁধার ঘরে পিদীম জ্বাল্লি কেন শেখর, একি হ'ল শেখর! আমি যে লজ্জায় মরে গেলুম, লজ্জায় যে আর বাঁচিনে, মরে গেলুম, শেখর লজ্জার সুখে মরে গেলুম, লজ্জায় আর বাঁচিনে, শেখর আর যে সুখ ধরে না লো! না শেখর! বুকের ভেতর যেন ফুলের মত কি ফুটে উঠ্ছে...ওরে পোড়ারমুখো, এ আকাশের চাঁদ হাতে ধরে এনে দিলি কেন,

আমি ত জান্তাম না লো সই
আমার দেখনহাসি ওই,
আমার আঁধার ঘরে মাণিক
তোমার আড়ালে দেখি ক্ষণিক,
আমার বুকের মাঝের মাঝ

তোমায় রাখি বুকের মাঝ,
তোমার ঠোঁটের একটু হাসি
আমি কেবলই ভালবাসি,
আমার পিরীত-ফুলের মধু
আমার কত রসের বঁধু,
আমার রসিক নাগর রায়
রসে আপনি গলে যায়,
তোমায় হিয়ার পাতে রাখি
আমি নয়ন মুদে দেখি।

ইচ্ছে করে চোখ বুজে চোখের ভেতর রেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুকের কাছে জেগে থাকি। শেখর! শেখর! প্রাণ যেন কেমন কেমন করে, পোড়া লোকের মুখের পানে আর চাইতে পারিনি কেন? যেই কেউ তাকায়, অমনি যেন চোখের পাতা নুইয়ে পড়ে, যেন লজ্জাবতী লতা ছুঁলেই নুইয়ে নেতিয়ে পড়ে, এ যেন কিসের কি হ'ল, শেখর! শেখর! কি হ'ল, বড় লজ্জা করে, আর যে পারিনে...

(পূর্ব্বদিকে ঘন পত্রের আড়াল হইতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইতেছে) ওরে পোড়ারমুখো চাঁদ! সেদিন তুই কোথায় ছিলি, সে রাত্তিরে কেন তোকে দেখিনি, আজ আমুক তোকে দেখে নেব, সে আমার কত সোন্দর দেখ্‌ব, একবার মিলিয়ে নেব, তুই আলো কি সে আমার আলো! আর মিলিয়েই বা কি নেব, তোর চেয়ে সে আমার সোন্দর! শেখর! শেখর! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠেছে, ওই চাঁদের রোশনি পড়্‌ছে, আর আমার সব যেন ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ছে। চকাচকিরা কেমন ডাক্‌ছে...চকা-চকি-চকা-চকি শুধুই তোদের ডাকা-ডাকি। ডাক্‌, ডাক্‌, ডাক্‌লে প্রাণের লোক মেলে লো মেলে, ডাক্‌...ডাক্‌লেই মেলে...

(কাদম্বিনী কলসী লইয়া জলে অবতরণ করিল—কলসীর গলায় কাপড় বাঁধিয়া কলসী ভাসাইয়া দিয়া জলে ঢেউ দিতে লাগিল।)

কল্ কল্ কল্ কল্, তোর কেন এত ছল্ বল্, তুই চলেছিস চল্—তুইও এ সব কথায় কেন বল্—

সাঁঝের বেলা একলা ঘাটে,
তোর কেন লো বুক ফাটে... তুই কেন এত কথা কস্,—

তুই ত অনেক কথাই জানিস্, মিন্‌সে যখন পাড়ি জমিয়ে ওপারে যায়, তখন তুই কোথায়? শেখর যখন ঝড়ের রাতে সাঁতরায়, তুই ত বুক পেতে দিয়েছিলি, এখন কেন...যাক সে ভেসে গেছে, এ ভেসে এসেছে, যাক্ ভেসে গেছে ত ভেসেই যাক্, চলেছিস্ ত চলেই যা—তখন বুক পেতেছিলি কেন, এখন আবার বল্‌ছিস কেন, তুইও ভেসেছিস্ ভেসেই যা, সেও ভেসে গেছে ভেসেই যাক্,......আমি ভাস্‌তে ভাস্‌তে বুঝি চড়ায় ঠেকে গেলুম। কে জানে চূর্ণীর ঘুরণ পাকে যদি সবই যায়...যায় যাক্, সেত ফেলে দিয়েই গেছে। মাঝি যখন ফেলে গেছে, নৌকা ত তখন বানচাল হবেই চূর্ণী লো তোর ঘুর্ণী রেখে দে, আমার প্রাণের মাঝে সে, তোর ঘুরণে আর আমি চোবানি খাচ্ছি নি, আমি আর কাউকে ডরাই নি—আর কাউকে ডরাই নি! কিসের ভয়, কিসের লজ্জা, এ লজ্জাই আমার সুখ, চল্ তবে চল্,...চাঁদও আবার জলে ঢেউ দিতেছিস্, দে, দে, রূপের ঢেউ ত আমার কানায় কানায় চল্‌কে উঠেছে, তুই আরো ঢেউ তোল্, আমি ত দুলে দুলে উঠি...

রূপের ঢেউ লেগেছে গায়
মন আমার রূপ-সাগরে, ভাসিয়ে নিয়ে যায়...

দে ঢেউ, দে ঢেউ, খুব ঢেউ তোল্...কল্ কল্ কল্ কল্...ভেসেই চল্...

(দূরে শেখর গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতে মারিতে অগ্রসর হইল)

ওই যে আকাশের চাঁদ, আর আমার গগনচাঁদ, আজ চাঁদ ধর্‌তে চূর্ণীও বুঝি ফাঁদ পেতেছিস্‌...চূর্ণি! চূর্ণি! আমিও আমার রূপের আলোয় তোর বুকে ঢেউ তুলেছি, তার বুকেও তাই লো তাই! ... মরণ আর কি, গা খুলে কাপড় কাচ্ছি, আর যে বড় লুকিয়ে লুকিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখা হচ্ছে...লজ্জা সরম নেই বুঝি ...চল্‌না তখন—দেখাব এখন...

শে। স্রোতের জলে একরাশ পদ্ম ফুটে দুল্‌ছে তাই দেখ্‌ছিলুম্‌। আড়াল থেকে না দেখ্‌লে দেখার আশা মিটে না...ওলো চূর্ণী ভুলে যাবে লো, চূর্ণীতে আর আসিস্‌ নি, অত রূপ চূর্ণী আগ্‌লে রাখ্‌তে পার্‌বে না লো...পার্‌বে না...

(জল হইতে উঠিতে লাগিল)

কা। যাও, যাও...মরণ আর কি...আর অত রস পাড়িয়ে কাজ নেই, কাজ নেই সর, এখন যাবে, না এই অন্ধকারে (শেখর চুম্বন করিতে গেল) আঃ কি কর...যাও... ..

শে। অন্ধকার ত অনেকক্ষণ কোন্‌ অন্ধকারে লুকিয়ে গেছে কাদি! দেখ্‌না তুই চলেছিস, চাঁদ তোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ছে দেখ্‌না তোর পায়ের পাতায় জল ঝর্‌ছে, তায় চাঁদ লুটিয়ে চুমু খাচ্ছে...

কা। আঃ কি কর যাও...পথের মাঝে...সর সর...

শে। কাদি! আমি পথ হচ্ছি, তুই মাড়িয়ে চলে যা—কাদি, ইচ্ছা করে তোর পায়ের নূপুর হই...তুই পা নাড়্‌বি আর আমি ঝুন্‌ ঝুন্‌ বেজে উঠ্‌ব।

(দূরে জনৈক লোক ক্লান্ত দেহে নগ্ন পদে তাহাদের দিকে আসিতে লাগিল...এক হাতে এক গাছা লাঠি, অন্য হাতে জুতা, এক পা ধূলা ও কাদা, পায়ের হাঁটু অবধি ধূলায়মাখা, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, মুখ গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে ভরা...পৃষ্ঠে বোঝার ভারে ঈষৎ নত...মুখে শীস্‌ দিতে দিতে আসিতেছিল)

কা। ওই পথে কে আস্‌ছে চল, চল, কি কর আঃ...

জ। হ্যাঁ গা এখানে কোথায় চটী আছে বল্‌তে পার, আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি (স্বগতঃ) হ্যাঁ এত সেই, এত সেই, এই ত...

শে। হ্যাঁ আছে...একটু আগে। (স্বগতঃ) রাজচন্দ্রের মত গলা, সেই নয় ত। সে ত অনেক দিন মরেছে শুনেছিলুম। (প্রকাশ্যে) তুমি কোথা হতে আস্‌ছ গা...

জ। আমি বিশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে আস্‌ছি, এখানে কোথাও চটী কি দোকানঘর পাওয়া যায় বল্‌তে পার...(স্বগতঃ) এত সেই...শেখর ছোঁড়া, এই শেখর আমার ছেলেবেলার এত বন্ধু ছিল...আধখানা খাবার কামড়ে মুখ থেকে খেতে দিত। তাই বুঝি প্রাণ স্বপ্নে থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছে...

শে। হ্যাঁ আছে। আমাদের সঙ্গে এস, ওই যে বটগাছটা দেখ্‌ছ, ওই যে হে, যার খুব ঝুরি নেবেছে, ওই বুড় বট, ওইটে ছাড়িয়েই একটু ঘুরে গেলেই চটী, সেখানে সব খাবার দাবার পাওয়া যায়। (স্বগতঃ) রাজচন্দ্র ! রাজচন্দ্র ! নিশ্চয় সেই...আমি, আমি, তাই ত, তাই ত,...বিদ্যুতের মত সব চম্‌কে দিলে অ্যাঁ...

(জনৈক লোকটি চলিতে চলিতে তাহার কোমর হইতে টাকার থলিটা আল্‌গা হইয়া পড়িয়া গেল...টাকা ও মোহর মাটিতে ঝন্ ঝন্ করিয়া ছড়াইয়া গেল...লোকটি ধীরে ধীরে কুড়াইতে কুড়াইতে—)

জ। কাদম্বিনী—বাঃ বেশ ! নিশ্চয় সেই শেখর, অ্যাঁ আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল, কেন মর্‌তে, হায় ! হায় ! এই দেখ্‌বার জন্যে কি ফোঁটা ফোঁটা করে মাথার ঘাম পায়ে ফলে, এই করে, এই দেখ্‌তে এলুম ? কে জানে...না—না—বেশ, বেশ, বাঃ রূপ ! রূপ ! কে...কে ! সেই রূপ !...

কা। (স্বগতঃ) তাই ত, এ মিন্‌সে কে গো, এত টাকা, ডাকাতি

টাকাতি করে আসেনি ত? শেষ কি আমি ফাঁসাদে পড়্‌ব নাকি ...শেখর যে কি করে...

(কাদম্বিনী শেখরকে চোখের কোণে ঠারিয়া ইসারা করিল)

শে। তবে চল, এই এস আমাদের সঙ্গে—

কা। আঃ...দেখ (চাপা গলায়)...

জ। হ্যাঁ তোমরা, আহা তোমরা বড় ভাল লোক গো...আমার বড় উপকার করলে। (স্বগতঃ) ঠিক নিশ্চয়ই শেখর আমায় কিন্তু চিনতে একেবারেই পারেনি...ভালই হয়েছে...একি! একি! (প্রকাশ্যে)...এদিকেও দেখ্‌ছি একটা বড় ঝট্‌কা হয়ে গেছে...(কথা কহিতে কহিতে সকলে প্রস্থান করিল)...

(দূরে চূর্ণী নদীতে তখন একখানা নৌকায় মাঝিরা ডাঁড় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিতেছিল)...

ওই জলের ওপর ঢেউ চলেছে
রগ্‌রগে চাঁদ ভাসে,
ঠিক সে যেন বুড়া নানি
ফোক্‌লা দাঁতে হাসে।
হেঁইয়ো হিস্‌—হেঁইয়ো হিস্‌...হা—হা...
হ্যাদে ওরে স্বমুন্দির ভাই
মামীর পুত হালা
সামাল্‌ সামাল্‌ কইয়ো রে ভাই
ঝাঁকি দিবার পালা...
হেঁইয়ো হিস্‌—হেঁইয়ো হিস্‌...হো—হো হা...

তৃতীয় দৃশ্য।

[ঘরের ভিতর কাদম্বিনী বসিয়া একটি পা আর একটি পায়ের উপরে স্থাপিত, জানুর উপর কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে—]

কা। কি আশ্চর্য্য, অত টাকা, অবাক করেছে, এ যেন আলাদীনের পিদ্দীম্। ওঃ অত টাকা যদি আমার থাক্‌ত, তা হ'লে কি হ'ত! কি আর হ'ত, ঢাল্‌তাম আর গুণতাম্, ঢাল্‌তাম আর গুণতাম, কুড়ি কুড়ি ক'রে থোকা দিতাম—তা হ'লে শেখরে আর আমাতে কি সুখই হ'ত—কি সুখেই থাক্‌তাম্...না না দূর, টাকায় কি সুখ হয়, টাকায় আবার সুখ কি...শেখরের মত অমন সোন্দর ..সোন্দর! আঃ...শেখর! আমার শেখর!

(শেখরের প্রবেশ, মুখখানা একবার লাল একবার পীত রক্ত-শূন্য হইয়া যাইতেছে)

শে। লোকটা খেয়ে দেয়ে বুঝি ঘুমল...ঘুমল...বেশ ঘুমল, ঘুমুতে পার্‌লে—তুই! তুই! তুই! কাদি না? কত টাকা আছে জানিস, অনেক, অনেক, অনেক টাকা মোহর, অনেক! কাদি! কাদি! জানিস্ ও কে?...চুলোয় যাক টাকা, চিন্‌তে পার্‌লি নি বুঝি? এঁ্যা...এঁ্যা...চিন্‌তে পার্‌লি নি,—চিন্‌তে পার্‌লি নি?

কা। শেখর, রাত যে অনেক হ'ল। শেখর! অমন করে কথা কইছ কেন, শেখর! শেখর! আমার ভয় করছে, বড় ভয় কর্‌ছে, কে কাকে চিন্‌ব, কি করে চিন্‌ব...এঁ্যা...

শে। কাদি! তুই আমায় ভালবাসিস্ না?

কা। শেখর, আজ কেন ফিরে সে কথা, ভালবাসি কি না তাও আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? শেখর, এই অন্ধকার রাত্রে সে...হা শেখর! সে রাত্রি কি ভোলা যায়!

শে। চুপ্, শুন্‌তে পাবে, শুন্‌তে পাবে। দেয়াল ফঁুড়ে ভালবাসার আওয়াজ তার বুকে গিয়ে ধাক্কা দেবে...কাদি! তুই আমায় ভালবাসিস্ কাদি! কই? আর কা'র মুখ মনে পড়ছে না? না? আর কা'র মুখ? কাদি?

কা। কি বল্‌ছ, মনে আর মুখ ধর্‌বার যে একটুও ফাঁক নেই শেখর,

সে ভরে আছে। তোমায় ভালবাসিনি? আর কি কর্‌লে ভালবাসা জানান যায় বল, তাই করি, তুমি কি বল্‌ছ? তুমি কি এততেও সে কথা বোঝনি—

শে। না না সত্যি করে বল্‌, ভালবাসিস্‌? বল্‌ বল্‌!

কা। হাঁ শেখর! ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে খেলেছি, মাঠে মাঠে প্রজাপতি ধরে বেড়িয়েছি, বটগাছের কোটর থেকে শালিক পাখীর ছানা পেড়েছি, চূর্ণীতে হাঁসের মত দু'জনে সাঁত্‌রেছি, ফল্‌সা পেড়ে খেয়েছি, যখন যা বলেছ তাই করেছি। বড় হয়ে, জ্ঞান হয়ে, দেখলুম, আমার সে খেলার জুটী আমায় ছুটী দিলে। তারপর একরাত্রি অন্ধকারে আমার ...আমার...আমার সর্ব্বস্ব শেখর! তবু বল্‌ছ, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, ভালবাসিস্‌, কা'র মুখ বল...শেখর! কা'র মুখ মনে পড়্‌বে শেখর বল...সব মুখের দাগ যে আমার কাছে মুছে গেছে শেখর! শেখর! শুধু...শুধু...

(শেখরকে দুই বাহুদ্বারা লতার মত জড়াইয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল...শেখর তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল)

শে। সর্‌! শোন্‌ তুই সত্যি আমায় ভালবাসিস্‌ তবে, তবে, যা বল্‌ব তা পার্‌বি বল্‌ সত্যি ভালবাসিস্‌? পার্‌বি বল্‌...

কা। বল কি কর্‌তে হবে বল শেখর, কি কর্‌লে বল শেখর! হা শেখর! এতদিন পরে তুমি উঃ...

শে। হ্যাঁ! এতদিন পরে ওকে চিন্‌তে পেরেছিস—পারিস্‌নি—মরে ভূত হয়ে যখের টাকা মাথায় করে এসেছে, চিন্‌তে পারিস্‌নি ...ও তোর—ওকে খুন কর্‌তে হবে...ও তোর সেই বর রাজচন্দ্র...

কা। (চমকিত হইয়া লাফাইয়া) ওঃ...(দুই হাত বক্ষে চাপিয়া) শেখর! উঃ...না-না-না শেখর! তুমি কি মানুষ—না-না

এত সোন্দর তুমি, শেখর, না-না তুমি মানুষ! না-না-না শেখর, তুমি আমায় ভালবাস না শেখর! না-না-না সে নয়...

শে। হ্যাঁ সেই! তুই খুন করবি কিনা বল্—

ক। শেখর! তুমি আমায় মেরে ফেল, শেখর তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় মেরে ফেল—তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই ...উঃ শেখর! তুমি আমায় মেরে ফেল...

শে। এই তুই আমায় ভালবাসিস্ না? এখন বল্ খুন কর্‌বি কি না, ভালবাসিস্ এই তোর ভালবাসা—বল্ বল্ বল্ তোকে কর্‌তেই হবে...ভালবাসিস্ তার প্রমাণ দে...

কা। শেখর! শেখর! আমি মেয়ে মানুষ, তবু তবু, শেখর এতেও তোমার আশা মিট্‌ল না, শেখর, আচ্ছা বল—কি? খুন খুন খুন হাহা হাহা...আচ্ছা কর্‌ব, কর্‌ব, শেখর, আমায় ত্যাগ কর্‌বে না...এঁ্যা ত্যাগ কর্‌বে না এঁ্যা...

শে। নে এই ছোরা ধর—সে ঘুমুচ্ছে...এই সুযোগে...মার্‌তেই হবে ...নইলে আমি ভালবাস্‌ব না, কাদি! সেই...সেই...ওঃ সেই ...ধর্...

কা। দাও...দাও...শেখর! আমায় ত্যাগ কর না, ত্যাগ কর না—

(কাঁপিতে কাঁপিতে ছোরা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল—)

শে। রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! তুমি থাক্‌তে আমার সুখ নেই, কাদিকে বিয়ে করে বড় দাগা দিয়েছিলে, সে ঘা শুধতে দিতে তোমার বুক করকরিয়ে উঠেছে না? আবার মরে দানা পেয়ে এসেছ...রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র!

(কাদম্বিনী কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল—)

কা। শেখর! শেখর! না-না-না ওই চাঁদের আলোয় কে হাত-ছানি দিচ্ছে, না-না চল আমরা চলে যাই...শেখর! চল তোমাতে আমাতে একযোড়া পায়রার মত ওই চাঁদের আলোয়

উড়ে যাই...শেখর! আমার হাত কাঁপ্‌ছে, শেখর আমার পা কাঁপ্‌ছে...শেখর! সে যে রোগের সময় আমাকে বুকে করে সেবা করেছে, শেখর! না-না-না আমি যে মেয়েমানুষ ...শেখর! না-না-না তুমি বড় সোন্দর—শেখর! চল আমরা ...চল আমার কোথাও চলে যাই...

শে। চুপ্‌...তোকে বুকে করে, হ্যাঁ! হ্যাঁ! সেই বুকে ছোরা বসাবি কি না বল্‌, বল্‌ বল্‌ এখন বল্‌ কাদি! কাদি!

কা। শেখর! শেখর! যাব...হ্যাঁ হ্যাঁ যাব, যাব শেখর, আমায় ত্যাগ কর না...আমায় ত্যাগ করবে না শেখর?

(কাদম্বিনী কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে নিজেকে সামলাইয়া চলিয়া গেল...(নেপথ্যে "শেখর আমায় ত্যাগ কর না...আমায় ত্যাগ কর না")...

শে। হাহা—হাহা—রাজচন্দ্র! রাজচন্দ্র! ওই! ওই! ওই! ছোরার ঘা পড়্‌ল, ওই ছোরার ঘা পড়্‌ল, ওই! ওই! ওই! রক্ত! রক্ত! রক্ত! বড় কাদিকে বিয়ে করেছিলে—বড় কাদিকে বিয়ে করেছিলে...ওই ঝলকে! ঝলকে! ঝলকে! হাহা হাহা...

(নেপথ্যে..."শেখর! আমায় ত্যাগ কর না"... শেখর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য।

[চটীর ঘর...এক কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে...ঘরের তিন ভাগ অন্ধকার, একভাগে আলোক...একটা বাদলা পোকা সেই প্রদীপের আলোয় উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে...রাজচন্দ্র শয্যায় শায়িত]

রাজ। আমি ভুল করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, শেখর কাদম্বিনীর মিলন হয়েছে, আমিই ভুল করেছি, এক বোঁটায় দুটো ফুল ফুট্‌তে যাচ্ছিল, আমি ভুলে ছিঁড়ে ফেলেছি—আমি ত

তাদের কাছে মৃত...মৃত...মৃত, তবে কেন তাদের এ সুখের পথে কণ্টক হয়ে রই...কাদম্বিনী সুন্দরী, শেখরও সুন্দর। সুন্দরে সুন্দরে মিলন সেই ত বেশ...আমার মত ত এমন কুৎসিত নয়, আমি কুৎসিত! কুৎসিত! তাই ফুল না ফুটতে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম—আমি কেন তাদের মধ্যে আবার এমন করে এলুম, ভুল হয়ে গেছে, না আমার ভুল হয়ে গেছে...এ পথে আর না আসাই ভাল ছিল—কটা বছর ত কাটিয়েছি, আর কটা দিন না হয় কটা বছরই, তাও বেশ কেটে যেত—না এ পথে আর না আসাই ছিল ভাল, ছিল ভাল আর যদি এদের সঙ্গে দেখা না হ'ত। ছিল ভাল যদি আমাকে আজ সংসারে না থাকতে হত...উঃ এত দূর! কিন্তু আজ যে এত টাকা রোজগার করলাম, কার জন্যে, কার জন্যে—এ ত সবই কাদম্বিনীর জন্যে—তবে সেইগুলো গুণে দিয়ে চলে যাই না কেন—দিলেই ত পিপাসা মিটে যায়,...দেওয়াই সুখ, দেবার জন্যেই ত এত কষ্ট করেছি, তাকে দেবার জন্যেই ত এই ছটা বছর এত কষ্ট করে, না খেয়ে, এই টাকার সংগ্রহ...টাকার জন্য সে কেঁদেছিল, সে চিনতে পারলে না, নাই পারুক, আমি ত তাকে ভালবাসি... তবে কাদম্বিনী যদি শেখরকে নিয়ে থাকলে ভাল থাকে, তার তাই ভাল, আমার মাঝে থেকে এ কেন তবে...তাই করি। দিলেই যদি পিপাসা মেটে...তবে আমারও পিপাসা মিটুক, তাদেরও পিপাসা মিটুক...তাই করি, না জানিয়ে চলে যাই, টাকাগুলো এইখানে রেখেই চলে যাই, আর আমার টাকায় কি কাজ, কিছু না—পিপাসা মিটেছে, টাকার পিপাসা মিটেছে, প্রাণের পিপাসাও ত মেটবার রস এসেছে, তবে আর কেন, আমি এখন বেশ বুঝছি, এই দেওয়াই সুখ এরই জন্যই আমার আসা...অশান্ত মন শান্ত হও...দুর্ব্বল হয়ো না, তুমি পুরুষ, পুরুষের মত, আকাশের মত উদার হও—তারা যে

দুর্ব্বল, তারা যে নিজেদের ভাল করে বোঝেনি, তাদের সুখের পথে তবে কণ্টক কেন হও, কেন, কেন, বিছিন্ন করবে—বেশ ফুটেছে, বেশ ফুটেছে, বাঃ রূপে রূপ মিশেছে বাঃ ..বাঃ...তবে ..ওকি কাদম্বিনী অমন করে আস্‌ছে কেন? ...আমি চুপ করে শুয়ে থাকি...আমায় কি চিন্‌তে পেরেছে, তাই আস্‌ছে, তাই বোধ হয় তাই...

(ছুরিকা হস্তে কাদম্বিনীর প্রবেশ...বুকের বসন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, মাথার কেশ ধূলায় লুটাইতেছে—)

কা। শেখর! শেখর! তুমি আমায় ত্যাগ কর না, আমি করব, করব, খুন করব...ওই যে গাঢ় নিদ্রায়...সেই-ই ত ঠিক...তবু তবু—না না—আমি যে মেয়েমানুষ—বিশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছে, বড় ক্লান্ত, ঘুমুচ্ছে—ঘুম ভাঙ্‌তে আর দেব না, নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না—নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না—অ্যাঁ নইলে শেখর বুকে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলে, উঃ শেখর! না খুন না করলে ভালবাস্‌বে না। ও আমায় বিয়ে করেছিল, খেতে দিতে কষ্ট হ'ত। না খেয়ে লুকিয়ে লোকের বাড়ী খেয়েছি বলে আমায় সব ভাত খাওয়াত...আর আমি? শেখর! শেখর! শেখর! না আমায় ত্যাগ কর না। শেখর আমি কি করব ...করব...বেশ ঘুমুচ্ছে...শুধু নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে—শুধু নিশ্বাস...আঃ পিদীমটা যে সাক্ষী হবে। অ্যাঁ বিয়ের সময় অমনি একটা পিদীম সাক্ষী ছিল...দূর ছাই...পিদীমটা নিবুলেই হয় ...তারপর...তারপর...

ওকি! বুকের ওপর সেই লেখা...কি কি—সে বুকে কাদির নাম লিখে, বুক খুলে, বুক পেতে শুয়ে রয়েছে, আর আমি...অ্যাঁ...অ্যাঁ ...আমিই না—আমিই না ওই...ওই যে বিয়ে করেছিল গো...ওই লেখা, ওই আমিই ত তার বুকে—এখন নয়? না-না-না, আমি তার বুকে কেন ওইখানে, ওইখানে, নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না...

শেখর! শেখর! আমি করব, খুন করব, নিশ্চয় খুন করব। তোমার জন্যে—তোমার ভালবাসার জন্যে—না শেখর ভুল, তুমি না হলে আমার চল্‌বে না…ও রূপ না হলে জীবন বৃথা—আমার জন্যেই খুন করব,… আমার জন্যেই খুন করব…ওই যে শুধু নিশ্বাস—পিদীমটা নিবুলেই হয়…পিদীমটা ত নিবুলেই হয়—তবে—তবে…

(অঞ্চলে প্রদীপ নিভাইয়া ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল… একবার এগিয়ে আসে, নিশ্বাস ফেলে, একবার পিছনে ফিরে…)

(প্রদীপের সলিতাপোড়া উগ্রগন্ধে রাজচন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল—)

রা। আমায় খুন করবে, করুক্, জীবন পাবার সময়ও নিজের হাত ছিলনা, মৃত্যুর সময়ও বা বুঝি হাত থাকেনা, তবে কেন? আমার জীবন পেলে যদি কাদম্বিনীর সুখ হয় হোক্…এ জীবনের মূল্য কি—কিছু না, একটা নিশ্বাস, একটু রক্তের রাঙা, আর ত কিছু নয়? তবে? শুধু চেয়ে চেয়ে দিয়ে ভুলে যাওয়া, তারপর আঃ এ ত বেশ…

কা। না—না মার্‌তে পার্‌ব না, মায়া হচ্ছে, কিসের মায়া, কার মায়া, আমার পায়ে একদিন কাঁটা ফুটেছিল, ও আমার পায়ের সেই কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে দিয়েছিল…না—না—না মার্‌তে পার্‌ব না—না—পার্‌ব না—ওই যা ভুলে যাচ্ছি—না পার্‌ব, নইলে শেখর ভালবাস্‌বে না…শেখরকে বুকে পাব না, অ্যাঁ—না, আমি পার্‌ব পার্‌ব…

(ভয়ানক জোরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল…একটা পাপিয়াও দূরে ডাকিয়া উঠিল…ঠিক সেই সময়ে চাঁদ ঘুরিয়া জানালার ভিতর দিয়া রাজচন্দ্রের শয্যা প্লাবিত করিয়া দিল। রক্তবর্ণ চন্দ্র দিক্‌-প্রান্তে মাঠের শেষে ডুবিতেছে)…

কা। ওই যে, ওই…লেখা, কাদি ওইখানেই…তবে…তোমার জন্যে শেখর ওই…ওই…

(রাজচন্দ্রের বুকে ছুরিকা আঘাত)

রা। আঃ...নাও—নাও—প্রাণ নাও—আমার পিপাসা মিটেছে, তোমরা জন্ম জন্ম সুখে থাক...

কা। অ্যাঁ! আঁ! আমার জন্যে সুখ—সুখ—শেখর! শেখর!

(শেখরের প্রবেশ)

শে। আমি শুধু এই ঘোর ঘোর আলোয় একবার দেখ্‌ব—একবার দেখ্‌ব, হয়েছে, হয়ে গেছে অ্যাঁ...

কা। শেখর! একটা চুমু দাও, শেখর! একটা চুমু দাও।

শে। হাহা...হা হা...কাদি! কাদি! কাদি! বাঃ রাজচন্দ্র বাঃ...

(ছুরিকা হস্তে কাদম্বিনী—তাহার হাত রক্তে প্লাবিত...শেখরকে আলিঙ্গন করিল, শেখরের গাত্রে রক্ত লাগিল) ..

কা। শেখর...শেখর...আমার খোঁপাটা বেঁধে দাও, চুল্‌টা খুলে গেছে। শেখর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমার ভালবাসার মুকুট আমায় পরিয়ে দাও !

(শেখর, কাদম্বিনীর চুল চূড়ার মত করিয়া বাঁধিয়া দিল...তখন পূর্ব্বদিক দিয়া প্রভাতের রক্তাভা মাঠের উপর দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল...)

শে। একি! একি! সর্...সর্...সর্ তুই রাক্ষুসী...সরে যা, সরে যা...উঃ...উঃ ..সরে যা... হাহা হাহা রক্ত...রক্ত...রক্ত... রক্তের আবার ভালবাসা কি, সে বড় গরম...না—না—সরে যা, সরে যা...(ঠেলিয়া দিল)

কা। শেখর! শেখর!

শে। সরে যা—সরে যা—শুন্‌তে পাচ্ছিস্ নি...ওই চূর্ণী কি বল্‌ছে? ওই শোন্ শোন্ শোন্ রাক্ষসী কান পেতে শোন...হাহা... হাহা...

(দূরে মাঝিরা তখন সারি গাহিতেছিল—)

ওই কাল জলে ঘূর্ণী ওঠে
আগুন জলে যায়,

ওই রাঙা সূরয রাঙা আঁখি
নয়ান মেলি চায়

হেঁইয়ো হিস্ হেঁইয়ো হিস্ হো...হো...হা...

ওই শোন নয়ন মেলে কি চায়...কে ?...কে কে...দেখ্‌ছিস্ নি, কার চোখ...ওই দেখ, কার চোখ, কার চোখ, ওই চূর্ণীর জলে—কাল জলে—কার চোখের আলোয় আলো করা চোখ! ওই! ওই!

কা। শেখর! একটা চুমু দাও, শেখর! একটা চুমু দাও।

শে। সরে যা, সরে যা, চিন্‌তে পেরেছি—আলোয়...আলোয়...চিন্‌তে পেরেছি—ওই চূর্ণী ডাক্‌ছে—আলোয় চিন্‌তে পেরেছি, আমি চূর্ণী সাঁত্‌রে তোকে নিয়েছিলুম—চূর্ণী ফির্‌তে বলেছে—ওই! ওই! বুঝেছি বুঝেছি সেই রাত্তির, সেই রাত্তির, সেই অন্ধকারে সেই স্পর্শের কাঁটা এখনও ফুটে রয়েছে...হো হো সরে যা,...সরে যা...কার নয়ন—সাড়া পড়েছে—কার ডাক্ ...হো হো!

কা। শেখর! শেখর! আমি যে তোমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসি...

শে। ছাই ছাই...ছাইয়ের আবার ভালবাসা..ওই বুকে ছোরার ঘা ...ছোরার আবার ভালবাসা! সরে যা...সরে যা...

কা। শেখর! তুমি বড় সোন্দর, শেখর! শেখর! বড় সোন্দর আমার শেখর, ভালবাসি, বড় ভালবাসি, শেখর, একটা চুমু দাও...শেখর, একটা চুমু দাও।

শে। না—না—না, সরে যা, সরে যা, ওই চূর্ণী ডাক্‌ছে, সরে যা, আমি সাঁত্‌রে এসেছি, সাঁত্‌রে বাড়ী যাব—সরে যা, সরে যা..

কা। শেখর! প্রাণের শেখর! তবে যাও, তবে যাও...শেখর ভালবাসা চেয়ে চেয়ে, পেয়ে পেলাম না, তবু তুমি মন বুঝ্‌লে না—তবে যাও শেখর, তবে যাও শেখর, আমি কি

করলুম শেখর, আমি কি করলুম...না তবে যাও, না একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—একটা চুমু—শেখর! একটা চুমু!

(কাদম্বিনী নিজের বুকে অস্ত্রাঘাত করিয়া পড়িয়া গেল... কাদম্বিনীর বুকের রক্ত ফিনকি দিয়া শেখরের চোখে মুখে লাগিল... শেখর তাহার দুই হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধে তাকাইল। চূর্ণী নদীতে তখন মাঝিরা সারি দিয়াছে...)

ওই খাজুর বনে রোদ উঠেছে
কিঙা ডাকে পারে,
ওই বনের ফাঁকে আঁধরি কাটে
চা না ঘাটের ধারে—
ঘোমটা সরে গেছে নানির
নোলক দোলে নাকে,
তায় বাঁকা আড়ে নজরা মারে
দেখনা ডাকে তোকে।
ওই জলের ভেতর ডাক্ দিয়েছে
শোন্‌রে মাঝির পোলা...
সামাল, সামাল, কইয়ো রে ভাই
ঝাঁকি দিবার পালা—
হেঁইয়ো হিস্...হেঁইয়ো হিস্...হেঁইয়ো হিস্—হা।

(যবনিকা পতন)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা।

শ্রাবণ, ১৩২২ সাল।

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কিশোর-কিশোরী (কবিতা)	... ...	৮৯১
২।	বঙ্কিমবাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গ ...	শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	৮৯৭
৩।	মেঘনাদবধকাব্যে সীতা ও সরমা	শ্রীযুক্ত দিননাথ সান্যাল	৯০৮
৪।	গতি ও স্থিতি ...	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৯২৮
৫।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৯৪৫
৬।	হাসির দাম (কথা-নাট্য) ...	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৯৫৪
৭।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	৯৮৭

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা ও ডাকমাশুল /৹ এক আনা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন,
বিজয়া প্রেসে,—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২২

কিশোর-কিশোরী

(১)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে !
ধূসর গগন-তলে,
নব-শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে !

সেই সে প্রথম বার দেখিনু তোমারে !
অধরে অমল হাস,
আঁখি-কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গে'নু সাঁঝের আঁধারে !
সে কোন কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে !
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে !
ওগো ফুল ! ওগো মিষ্ট !
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট !

কা'র ডাকে ছুটে এ'সু ?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথমবার সাঁঝের আঁধারে।

(২)

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশ তলে,
সে কোন দেবতা ?
কে শুনিল কাণ পাতি শ্যাম দুর্ব্বাদলে
কাহার বারতা ?—
তুমি দেখেছিলে কিছু ?—আমি দেখি নাই!
তুমি শুনেছিলে কিছু ?—আমি শুনি নাই!

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কা'র লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম দুর্ব্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ মূরতি ?
ধ্বনিয়া উঠিল কিগো মেঘমন্দ্র রবে,
সন্ধ্যার আরতি ?
আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই,—
তবে কা'র ডাকে তুমি চলে এসেছিলে ?
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন্ মহাপরাণের নীরব-নির্জ্জনে,
বল কোন্ কাজে ?
জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কা'র বাঁশী বাজে ?—
নির্ব্বাক নয়নে সেই অন্ধকার তলে,
কোন্ মহিমায়,

শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম দুর্ব্বাদলে—
কোন্ গীতি গায় ?
তুমি কি অবাক হয়ে শুনেছিলে তাই ?
আমি ত' শুনিনি কিছু—কিছু বুঝি নাই।
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের ?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের ?
তাই ছুটাছুটি করে, চলে এসেছিলে,
আকুল সন্ধ্যায়,
সেই সে প্রথম দিন!—আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়,—
আনন্দ মুরতি তব! কাহার লাগিয়া,
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া ?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কে'বা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা !

(৩)

আমি কেন ছুটে এ'নু ? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি !
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমাতেছিল—সে যেন জাগিল !
আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে ?—তুমি কি বোঝনা,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা ?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হ'তে ?—আমি জেনে শুনে এসেছিনু,

মোহিনী মূরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল-পরবশ বাসনার ভরে ?
সামান্য তস্কর সম চুরি করি নিতে ?
সৌন্দর্য্য সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে ?
চাও মোর আঁখি পানে ও কথা ভেবনা,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা।

কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা ?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে ? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁপিত সেই যে চির-সুন্দর :—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হয়ে বাজাইত বাঁশী।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি বসন্তের রাতে,

আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত !
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত !—
সে ফুল তরঙ্গে ;—কোন্ অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে ?—
আঘাতি হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে !
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে !
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায় !

চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরাণ মুকুল রাশি ! ছুটিতাম তাই,—
হৃদয় মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।

যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত !—
তাহারি কল্পিত বুকে মোরে পরশিত।

আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারই লাবণ্যের কুসুম চয়ন
করিতাম মনে মনে ; মূরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরাণ ভরিয়া।
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,
সেই মালা তারি অঙ্গে জড়ায়ে দিতাম
মনে মনে। ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম আসিবে সে, ধরিব তাহারে :—

সে চির সুন্দর মোর, নাই আর নাই !
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই !
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষমাঝে রক্তধারা ছুটেনা তেমন,—
উত্তাল উন্মাদ হয়ে ! কাঁপেনা অন্তরে,
নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্ম্মরে,
পুষ্পের পরশে ! সৌন্দর্য্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হয়না হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।

তবু কেহ আনে নাই তোমার বারতা,
আমার কানের কাছে ;—ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের।
বাজে নাই কোন তন্ত্রী মোর মরমের,

তোমা দেখিবার আগে! তোমার লাগিয়া
ছিলনা পরাণ মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া!
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগন তলে,—সাঁঝের মাঝার।—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,—কোথা তব ধাম!
অই যে অধর তব সরলতা মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা
সুখসূর্য্য-কর-স্নাত কুসুম সমান;
করুণায় ভরাভরা অই যে নয়ান!—
তার কথা শুনি নাই;—ওগো মর্ম্ম-লতা!
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা!

তবে কেন ছুটে গে'নু দেখিতে তোমারে?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে।
সুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল!
জ্বলন্ত প্রদীপ হ'তে যেমনে জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখাপরে জ্বলিনু তখনি!

কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে;—এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব্ব প্রাণে, সর্ব্ব মনে ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে।
এ আলো কাহার তরে?—কেবা জ্বালাইল?

কা'র পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল ?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরের গায়,
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতেছি দিবস নিশায় ?
(রেয়ংশঃ)

বঙ্কিমবাবুর পিতৃ-প্রসঙ্গ

বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিগত বৈশাখের "নারায়ণে" বঙ্কিমবাবুর রথের বাজারের একটা জমকাল চিত্র দিয়াছেন। আমি কখনও সেই রথের বাজারে যাই নাই, এ পর্য্যন্ত আমার সে সৌভাগ্য হয় নাই ; কিন্তু আজ যে নারায়ণ-ক্ষেত্রে বঙ্কিমের রথযাত্রার ক্ষেত্র জুড়িয়া একমাসব্যাপী প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে, যাহাতে বড় বড় সাহিত্যিক, বড় বড় মার্চেণ্ট বিলাত হইতে আনীত কলকারখানায় প্রস্তুত স্বদেশী জিনিসে বিলাতি ধরণে বড় বড় দোকান সাজাইয়া বেসাতি বসাইয়া বসিয়াছেন, অন্ততঃ ফেরতারথের দিনে সে বাজারে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ক্রয় করিবার জন্য এ ধরণের বাজারে প্রবেশ করিতে হয় না। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া বাজারের মালিক মহাত্মারা দয়া করিয়া বাজারে যাহা উঠে, সে সমস্ত একটি চুপ্ড়ীতে ভরিয়া চিরদিনই পার্শেলে পাঠাইয়া থাকেন। আজ বিক্রয়ের জন্য বড় সাধ হইয়াছে ; কিন্তু চাকচিক্য জিনিসের সংগ্রহ একেবারে আমার নাই, আছে কিছু খৈ। খৈ আমাদিগের সেকালের খাদ্য—বিশুদ্ধ, মুড়িতে লবণ মিশায় সুতরাং অশুদ্ধ। ইহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিবার জন্য বিলাতে যাইতেও হয় না, বিলাত হইতে কলকারখানাও আনিতে হয় না। উপাদান স্বদেশে উৎপন্ন বিশুদ্ধ ধান্য। দেখিতেও সুন্দর শুভ্র, দেব-

ভোগ্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও ভোজ্য। তাই এই কিঞ্চিৎ খৈ লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ক্রমে এক একখানি করিয়া পুস্তক লিখিতেছেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে এক এক ধাপ করিয়া যশঃশুভ্র সাহিত্য-হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছেন, রাজকার্য্যে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে, বঙ্গদর্শন-বিদ্যামন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন অধ্যাপক সাজিয়া লেখক বালকদিগের লেখা দেখিয়া কাহারও কাহারও পৃষ্ঠে জোরে বেত বসাইতেছেন, আবার কাহারও কাহারও ভাগ্যে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার লাভ হইতেছে; এই প্রবন্ধ-লেখক অকিঞ্চনও সে সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অপরোক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দিন আলাপ পরিচয় হয় নাই। এমন-কি চিত্র ভিন্ন কোন দিন তাঁহার চলন্ত মূর্ত্তিও দেখিতে পাই নাই। ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতাম না,—বলিতে পারি না; কিন্তু কোন দিন সেরূপ ইচ্ছা হয় নাই। ইচ্ছা না হইবার কারণ ক্রমে খুলিয়া বলিতেছি।

"গ্রীক ও হিন্দু"র লেখক ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারাল স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি কয়েকদিন রঙ্গপুর টাউনে উপস্থিত ছিলাম না, আমার জন্মভূমি গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলাম। তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রিটায়ার্ড সবজজ্ শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনচন্দ্র রায় ডি, এল, মহাশয়ের সহিত একদিন হঠাৎ আমার সেই কুটীরে উপস্থিত হইয়া আমাকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার রঙ্গপুরের বাসায় তাঁহাদিগের বসিবার একটা আড্ডা ছিল। বাদ্‌লার দিন হইলে তিনি চিঁড়ে-ভাজা, ছোলাভাজা ও কাঁটালের বীচিভাজার ফরমাইস্ করিতেন ও বন্ধুগণের সহিত একত্র বসিয়া আনন্দের সহিত তাহা চিবাইতেন। তাঁহার অনুরোধে তাঁহার নারায়ণপুরের বাড়ীতেও সস্ত্রীক আমায় যাইতে হইয়াছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, সহৃদয় ছিলেন,

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, বন্ধুবৎসল ছিলেন, সাহসী ছিলেন, আর উচ্চদরের সুলেখক ছিলেন। তাঁহার তুল্য মেধাবী আমি কখনও দেখি নাই। সংস্কৃতে তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও মাঘ বলুন, ভারবী বলুন, নৈষধ বলুন, গীতগোবিন্দ বলুন, এমন কি গদ্যকাব্য কাদম্বরী ও সংস্কৃত নাটকগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ ছিল।* এত-গুলি গুণ সত্ত্বেও সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার একটি বৃহৎ দোষ ছিল—ঘোর অহঙ্কার। এমন অহঙ্কারী পুরুষ আমি আর কখনও দেখি নাই। পূর্ব্বে লোকপরম্পরায় শুনিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র অহঙ্কারী বলিয়া আমার একটা সংস্কার ছিল। তাঁহার প্রিয়শিষ্য, তাঁহার পত্রিকার লেখক প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখিয়া সেই সংস্কার আরও বদ্ধমূল হয়। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা সাহসে কুলায় নাই। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির সহিত হয় ত তিনি কথাই কহিবেন না, কথা কহিলেও হয় ত দুই একটি হাঁ না করিয়াই শেষ করিবেন। সেজন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে পয়সা খরচ করিয়া যাওয়াও উচিত নয়, পরিশ্রম করিয়া যাইয়া তাঁহার জন্য আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া অপেক্ষা করাও উচিত নয়। এই হইতেছে—প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-শ্রেণীর উপরে তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা। সুবিধা পাইলেই, কোনরূপ প্রসঙ্গ পাইলেই তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপরে একহাত চালাইতেন, একচোট বসাইতেন। সাক্ষী মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়, সাক্ষ্য

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি বাল্যজীবনে ইংরাজী স্কুলের ফোর্থক্লাসে উঠিয়া ফোর্থক্লাসের পাঠ্যপুস্তক মাত্র পড়িয়াই বাহির হয়েন, পরে আর কখনও বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, কলে-জের বালক তাঁহার নিকটে পড়িতে তাঁহার বাসায় আসিত। গ্রেজুয়েট মুন্-সেফ ডেপুটীগণ তাঁহার নিকটে ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিতে আসিতেন। তিনি বন্ধুদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় এনুয়াল রিপোর্ট লিখিতেন, কখনও এক কলম কাটিতেন না। বাঙ্গালা লেখাতেও তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

তাঁহার ৬ষ্ঠ সংখ্যক নারায়ণে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র "কাটাল পাড়ায়" নামক প্রবন্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভেক ধরিয়া কি করিয়া আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা যায় ?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া আত্মহারা হইলেও রসে ভরপূর হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে ও উপন্যাসে মধুর লেখনীমুখে যে মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পানে উন্মাদনা আসিলেও কোন কোন বিষয়ে আমি তাঁহার উপরে বিরক্ত ছিলাম। সেইটি হইতেছে,—তৃতীয় কারণ। ক্রমে সেই বিরক্তির কারণগুলি যথাক্রমে বলিতেছি।—প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু স্কুল কলেজে কোনদিন যাহার শিক্ষা দীক্ষা হয় নাই, পাশ্চাত্য ভাবের সংস্পর্শে যাহার চিত্ত গঠিত ও উন্মেষিত হয় নাই, বাল্যে আনুষ্ঠানিক হিন্দু পিতামাতার সংসর্গে, কৈশোরে চতুস্পাঠীতে গুরুর সংসর্গে যাহার হৃদয়ে ঋষিভক্তি প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত, "ঋষিদিগের সকল কথা গ্রাহ্য নয়"—এই মর্ম্মের কথা শুনিলে তাহার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা হয়,—ইহা স্বভাবসিদ্ধ। যিনি সেইরূপ কথা বলিবেন, তাঁহার উপরে তাহার ভক্তি হওয়া অসম্ভব, বিতৃষ্ণা হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে এই ভাবের কথা বলিয়াছেন, সেইটি হইতেছে বিরক্তির প্রথম কারণ। পূজনীয় প্রতিষ্ঠাবান্ মহাত্মার মতবাদের সমালোচনায় দোষ হয় না, যুক্তি তর্ক দেখাইয়া তাঁহার মতের তীব্র প্রতিবাদ করাও যাইতে পারে; কিন্তু মহিমান্বিতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন অত্যন্ত দোষাবহ। প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র যে পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতবাদের সমালোচনায় সুতীব্র ভাষায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। অদ্যাপি লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে তাঁহাদিগের লেখনীদণ্ডের তীক্ষ্ণ মুখ মর্য্যাদাশালীকে বিদ্ধ করিবার জন্য নিয়ত শাণিত করিতেছেন।

যাঁহার প্রতিভাবলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নীলগিরির উপরে উৎকল প্রাগ্ জ্যোতিষে নিজের বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন; গঙ্গা

যমুনা সঙ্গমের পবিত্র তীরভূমি তীর্থরাজ প্রয়াগে নিজের জয়স্তম্ভ ও যজ্ঞযূপ প্রোথিত করিয়াছিলেন, "মৃণালিনী"তে সে মহামতি মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যের অবতার গ্রন্থকার পশুপতি আচার্য্যের বীভৎস চিত্র প্রদর্শন হইতেছে—তৃতীয় কারণ। তোমার কাব্যে তুমি তোমার কল্পিত নায়ককে কামুক সাজাইতে পার, লোভী সাজাইতে পার, স্বার্থপর স্বার্থান্ধ দুরাত্মা সাজাইতে পার, এ অধিকার তোমার আছে; ইতি-হাস-প্রসিদ্ধ মহাত্মাকে কলুষিত করিতে পার,—এ অধিকার তোমার নাই। পশুপতি আচার্য্য যে-সে লোক নহেন; তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, ভারতভূমীকে ধন্য করিয়াছেন; এই মহাপুরুষেরই ভ্রাতা হলায়ুধ, এই মহাপুরুষেরই ভ্রাতা ঈশান, এই মহাপুরুষেরই পুত্র তর্কাচার্য্য গোপীনাথ।

চতুর্থ কারণ হইতেছে,—কামজয়ী যোগীন্দ্র ধূর্জ্জটির শাসিত ভারত-ভূমিতে স্থানে অস্থানে অনুরাগের সৃষ্টি ও প্রশান্ত ভারতভূমিতে আত্মহত্যা ও হত্যাকাণ্ডের অভিনয়ে অশান্তির বীজ বপন। অনেক দিনের কথা—এজন্য আমি অনেকবার বক্তৃতা দিয়াছি, নাম না দিয়া পুস্তিকা লিখিয়াছি, ছাত্র ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, "আশাকাব্যে"র প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারকে প্রণোদিত করিয়া প্যাম্‌ফ্লেট্ লিখাইয়াছি।

মানুষ অনেক সময়ে না বুঝিয়া অনেক কাজ করে, বা না বুঝিয়া অনেক ভাল কাজে অগ্রসর হয় না, শেষে অনুতপ্ত হয়। আমার ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছে; সুবিধা সত্ত্বেও সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সংসর্গে না যাইয়া এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ছিল, তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহা-শয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় ছিল। পূর্ণবাবু কিছুদিন রঙ্গপুরে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। সে সময়ে ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ (কৃষ্ণধন ঘোষ) রঙ্গপুরের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি ছিলেন,—ইংরেজ

বাঙ্গালীর 'সুয়েজ যোজক'। তাঁহার বাড়াটি ছিল,—ইংরেজ বাঙ্গালীর সম্মিলনক্ষেত্র। প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতে বাঙ্গালীদিগের একটি বিশেষ আড্ডা বসিত। প্রত্যহ পূর্ণবাবু সেই আড্ডায় আসিতেন, আমিও যোগ দিতাম। দেখা হইলেই বঙ্কিম-প্রসঙ্গ উঠিত, তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের অনেক কথা শুনিতে পাইতাম। তাঁহার মুখে ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সবজজ শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, আর তাহা আমি বলিতে চাই না। যে কল্পবৃক্ষের শাখায় এই অভূতপূর্ব্ব মধুর ফলটি উৎপন্ন হইয়া শুকাইলেও তাহার মধুর অমৃত ধারায় সমস্ত বঙ্গের নরনারীকে সিক্ত ও আপ্লাবিত করিতেছে, সেই দেবতরু কল্পবৃক্ষের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া ধন্য হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

এই জড়বিজ্ঞানের দিনে, সভ্যতার যুগে সত্য হইলেও কোন অলৌকিক ব্যাপারের কীর্ত্তন করিলে পাঠক পাঠিকা যে হাসিয়া উঠিবে, গুলির আড্ডায় যাইবার উপদেশ দিবে, আরব্যোপন্যাসের গল্পের সহিত তুলনা করিবে, তাহা আমি জানি। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি, চোখ কান বুজিয়া একনিঃশ্বাসে তাহা বলিয়া ফেলিব, কাহারও কথায় হটিব না। পাঠক পাঠিকা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করুন বা না করুন, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন। তিনি যোগজ-অলৌকিক জ্ঞানে সিদ্ধ পুরুষের অলৌকিক শক্তিতে শ্রদ্ধালু ছিলেন, তিনি ফলিত জ্যোতিষে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন; তাঁহার উপন্যাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি,—তাঁহার পিতৃদেবের কোষ্ঠীর লিখিত প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের ফল ফলিয়াছে,—তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে মাসের যে দিনে যে মুহূর্ত্তে তাঁহার পরলোকগমন হইবে,—কোষ্ঠীতে লিখিত ছিল,—তাহাও ফলিয়াছে। তৎপূর্ব্বেই পুত্রগণ কাঁটাল-পাড়ার বাড়ীতে সমবেত

হইয়াছিলেন। সুস্থশরীর পুণ্যশ্লোক যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বৃহৎ সামিয়ানা প্রস্তুত করাইতেছিলেন ও বাড়ীর আটচালা মেরামত করাইতেছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"অচিরে পুত্রগণ একটি বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবে; সেইজন্য আমি এই সমস্ত করিতেছি।"

যাদবচন্দ্রের কত বয়স স্মরণ নাই, তিনি সেই সময়ে একদিন আকাছা কাপড়ে ঠাকুরদালানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাঁহার পিতৃব্যদেব তাহাকে অত্যন্ত বকিয়াছিলেন। তাহাতে যাদবচন্দ্র বাড়ীর উপরে ও স্বজনের উপরে বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ একখানি চাদর, একটি ছাতি ও কয়েক গণ্ডা পয়সা মাত্র লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হয়েন। সে সময়ে রেলগাড়া ছিল না, তিনি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। যাইতে যাইতে একদিন প্রভাতে চাদরখানি ও ছাতিটি রাস্তার উপরে রাখিয়া শৌচ ক্রিয়ার জন্য রাস্তার কিনারে নদীতে নাবেন। সেই চাদরের মুড়িতে পয়সাগুলি বাঁধা ছিল। হাতমুখ ধুইয়া উপরে উঠিয়া দেখেন,—তাঁহার চাদরখানি ও ছাতিটি নাই; বলা বাহুল্য, চাদরখানির সঙ্গে পয়সা কয়েক গণ্ডাও অপহৃত হইয়াছে। যাদবচন্দ্র নিরুপায় হইয়া নগ্নগাত্রে অনাবৃত মস্তকে প্রখর সূর্য্যকিরণ মাথায় করিয়া পথ চলিতে থাকেন। নাম স্মরণ নাই, যাদবচন্দ্রের সহিত কি সম্বন্ধ তাহাও স্মরণ নাই, উড়িষ্যা বিভাগের তাৎকালিক দেওয়ান একখানি পাল্কীতে চড়িয়া সেই সময়ে সেই পথে আসিতেছিলেন। হঠাৎ যাদবচন্দ্রের দিকে তাঁহার চক্ষু নিপতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া পড়েন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি এভাবে ছাতি নাই, চাদর নাই, একলা কোথায় যাইতেছ—? বাড়ী হইতে একলা বাহির হইবারই বা কারণ কি? এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছ যে, বাড়ীর লোকেরাও তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না যে?" যাদবচন্দ্র যখন প্রণাম করিয়া কোন কথা না

বলিয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তখন যাদবচন্দ্র যে কোনরূপ কারণে বৈরাগ্যে বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেওয়ানজির আর বাকী রহিল না। পাল্কীর একদিকে যাদবচন্দ্রকেও উঠাইয়া কর্ম্মস্থলে না যাইয়া জাজপুরের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দুই তিন দিন ধরিয়া বুঝাইয়াও যখন যাদবচন্দ্রকে কাঁটাল পাড়ার বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাইতে পারিলেন না, তখন তিনি যাদবচন্দ্রের ফারসি শিক্ষার জন্য একজন মৌলবি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে সময়েও রাজ-কার্য্যে প্রবেশের দ্বার ফারসি ভাষাই ছিল। আমিও যৌবনে ফারসি ভাষাভিজ্ঞ সবজজ্, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ ও কালেক্টরের সেরেস্তাদার দেখিয়াছি।

তিন চারি বৎসরের মধ্যে প্রতিভাবান্ যাদবচন্দ্র ফারসিতে ব্যুৎপন্ন হইলেন। দেওয়ানজির দেশে যাইবার প্রয়োজন হইল, যাদবচন্দ্রকে সঙ্গে লইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, যাদবচন্দ্র কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা যাদবচন্দ্রের জন্য তাঁহার ও যাদবচন্দ্রের একটি আত্মীয়কে রাখিয়া পাচক ও চাকরের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সপরিবারে দেওয়ানজি দেশে চলিয়া গেলেন। দেওয়ানজি যাইবার কয়েকদিন পরে যাদবচন্দ্রের জ্বর হয়। প্রথমে আত্মীয়টি জ্বর-না-জ্বর, সামান্য জ্বর, দুই এক দিনের লঙ্ঘনেই সারিয়া যাইবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; ক্রমে তাহা সান্নিপাতিক বিকারে (টাইফয়েড ফিবারে) পরিণত হয়। সে সময়ে ডাক্তারি চিকিৎসার সেরূপ প্রচলন হয় নাই। বাঙ্গালী কবিরাজবৃন্দও পেটের দায়ে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীতে এভাবে ব্যাপ্ত হয়েন নাই। যাদবচন্দ্রের মত, কোন কবিরাজ কুমারেরও কোন কারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় নাই; কাজে কাজেই উড়িয়া বৈদ্যরাজের হস্তেই যাদবচন্দ্র অর্পিত হইয়াছিলেন। যখন বৈদ্যরাজ মুখ গম্ভীর করিয়া "নাড়ী তো মু ন পাউছি" বলিয়া উঠিলেন, তখন আত্মীয়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অবশেষে যাহা হইবার হইল। যাঁহার গৃহ আত্মীয় স্বজনে, দাস

দাসীতে পূর্ণ, সেই যাদবচন্দ্র আজ আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতে একটি মাত্র লোককে কাঁদাইয়া বিদেশে যাজপুরে একটি ব্রাহ্মণ ও একটি ভৌতিক দেহকে রাখিয়া অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেলেন; তাঁহার দেহের সৎকার করিবারও আজ ব্রাহ্মণ জুটে না! উড়েরা জটলা করিয়া বলিল, "কে জানে বাঙ্গলী-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কি না, উহারা পৈতা খুলিয়া মাজে, সর্ব্বদা কপাল ও নাক চিতায় না।" পরে আত্মীয়টির অনেক সাধ্যসাধনায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দেওয়ানজির ভয়ে কয়েকটি উড়ে ব্রাহ্মণ জুটিল। তাহারা শববহন করিয়া বৈতরণীর সৈকতে রাখিয়া চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিয়া পড়িল। আত্মীয়টি গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—হায়! হায়!! কি হইল! আমি কি করিয়া দেশে গিয়া মুখ দেখাইব? দেওয়ানজিকেই বা কি বলিব? ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া নিঃস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতিকে যেন প্রতিধ্বনি দ্বারা কাঁদাইয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে জটাজুটধারী সৌম্যাকৃতি একটি সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমার কি হইয়াছে?" আত্মীয়টি বিনীতভাবে আমূল বৃত্তান্ত বলিয়া যাদবচন্দ্রের শব দেখাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "না, না, মরে নাই, আত্মীয়েরা অনেক সময়ে ভুল করিয়া জীবিত আত্মীয়কে মৃত-মনে করিয়া পোড়াইয়া ফেলে, তোমরাও তাহা করিতেছ। তুমি ইহার আবরণবস্ত্র উঠাইয়া ফেল ও বৈতরণী হইতে এক ঘটী জল লইয়া আইস।" সন্ন্যাসীর কথায় আত্মীয় তাহাই করিলেন। সন্ন্যাসী শবের শিয়রে বসিয়া সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া শবের দেহে ছিটাইতে লাগিলেন। একটু পরেই যাদবচন্দ্র চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—"একটু জল, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে।" সন্ন্যাসী তাহার মুখে একটু জল দিলেন। যাদবচন্দ্র একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমি কোথায়?" সন্ন্যাসী আত্মীয়টির দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"আর কেন? ইহাকে বাড়ীতে লইয়া যাও। আত্মীয়ের মুখ প্রফুল্ল, তাহার হৃদয়ে ও মুখে আনন্দ ধরে না। তিনি তখনই

সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন, "দেব, আপনি কে জানি না, যিনিই হউন, আপনার চরণে আর্ত্তের প্রাণের ক্রন্দন পৌঁছিয়াছিল। তাই আপনি দয়া করিয়া অঘটন ঘটাইলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন, মৃতকে জীবিত করিলেন, যাহা কখনও হয় নাই, আজ তাহা হইল। যখন এত দয়া করিয়াছেন, তখন আর একটু দয়া করিতে হইবে। এই দাসের অনুরোধে এই দাসানুদাসদিগের বাসায় যাইতে হইবে। দুই এক দিন থাকিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া অন্নপথ্য দিয়া তবে আপনি যাইতে পারিবেন, শ্রীচরণে দাসের এই প্রার্থনা।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে।"

যাহারা হরিধ্বনি করিয়া পথপার্শ্বস্থ নগরবাসীকে আতঙ্কিত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মরণের বিভীষিকা দেখাইয়া শববহন করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল, তাহারাই আবার হাস্যমুখে আনন্দে "জয় জগন্নাথ" বলিয়া যাদবচন্দ্রকে বাসায় লইয়া চলিল, সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সন্ন্যাসী দুই তিন দিন থাকিয়া যাদবচন্দ্রকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া অন্নপথ্য দিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। শুনিয়াছি, ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর নিকটে যাদবচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ হয়। যাদবচন্দ্রের ভাবী উন্নতির কথা, পুত্র জন্মিবার কথা, পুত্রদিগের মধ্যে একজন জগদ্‌বিখ্যাত হইবেন, একথা, এবং যাদবচন্দ্রের অনুরোধে যাদবচন্দ্রকে সন্ন্যাসী আর একবার দেখা দিবেন, কিন্তু তাহা তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ;—এই সকল কথা বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করেন।

দেওয়ান মহাশয়ের ছুটীতে দুই একবার তাঁহার 'অফিসিয়েটু, করিয়াছিলেন, পরে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে যাদবচন্দ্রই "নিমকে"র পাকা দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত রাজাপ্রজা উভয়েরই তুষ্টি-সাধন করেন—এ সমস্ত কথা সকলেই অবগত আছেন। ফেনাইয়া ফেনাইয়া সেই সকল কথা বলিয়া আর বাড়াইতে চাই না। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে মহর্ষির বা মহাপুরুষের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, জন্ম জন্মা-

শ্বরের কঠোর তপস্যার ফলে যিনি মরিয়াও বাঁচিয়াছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র সেই পুণ্যকীর্ত্তি মহাপুরুষের পুত্র। হিমালয় হইতেই গঙ্গাপ্রবাহের উদ্ভব,—নেংড়া আম্রবৃক্ষেই নেংড়া আম্রফলের উৎপত্তি,—"আকরে-পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।" বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সত্যই বলিয়াছেন, "কাঁটাল গাছে কাঁকুড় ফলে না।"

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গদোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ব-জীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও পরে তাহা সংশোধিত হইয়াছিল। যিনি সুকৃতিবলে সেইরূপ পুণ্যশ্লোক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ চিরদিনের জন্য কখনই থাকিতে পারে না; ভগবান্ স্বয়ং পা দিয়া ঘষিয়া তাঁহার চিত্তের ময়লা উঠাইবেন। সৌভাগ্যবশতঃ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার শ্রোতা ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ, আজন্ম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনিষীগণ। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপকার হয়, পিতৃপিতামহের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে। সত্য মিথ্যা জানি না, স্বর্গীয় ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি,—শেষজীবনে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র জপের মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমী কথা আছে, চিরদিন থাকিবে, বঙ্কিমচন্দ্র নাই; শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র টানিয়া লইয়াছেন,—ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ মহাজ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছে, নদীপ্রবাহ মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। প্রবাহের খাত আছে, থাকিবে; কিন্তু তাহাতে আর প্রবাহ আসিবে কি না, জানি না, আসিলেও তেমনটি হইবে কি না তাহাই ভাবিতেছি।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

মেঘনাদবধকাব্যে সীতা ও সরমা

[পাবনা সাহিত্য-সভার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।]

কর্ষিত কাব্যভূমির অলৌকিক কন্যারত্ন, পবিত্রতার আদর্শ-স্বরূপিণী, রামৈকপ্রাণা, সীতাদেবীর নামে জয় উচ্চারণ করিয়া, আমি সবিনয়ে সমবেত সজ্জন সুধীমণ্ডলকে অভিবাদন করিতেছি।

সীতা একদিকে যেমন বসুন্ধরার অযোনি-সম্ভবা কন্যারত্ন, অন্যদিকে তেমনই কবিগুরু বাল্মীকির অপূর্ব্ব মানসী-সৃষ্টি। রামায়ণের পুরুষ-চরিত্রগুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, কাব্যজগতে তদ্রূপ চরিত্র কল্পনার অতীত নাও হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রীচরিত্রে কল্পনা সীতাকে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না। রামায়ণ-কাব্যে তিনি মানবীরূপে বর্ণিতা হইলেও, লোকহৃদয়ে তিনি দেবীরূপেই প্রতিষ্ঠিতা ও পূজিতা। কবিকল্পনায় আদর্শ নারীজনোচিত গুণগুলি যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, সীতাচরিত্রে সে সমস্তই তত উচ্চে,—বুঝি-বা ততোধিক উচ্চে উঠিয়াছে। মনে হয় যেন, ঐ সকল গুণগুলির সমষ্টি করিয়া নারীর আকারে কবিগুরু মানবের চক্ষে ধরিয়াছেন!

এমন-যে বাল্মীকির সীতা, মেঘনাদবধকাব্যে কবিকে সেই সীতার অবতারণা করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া নহে,—কবিত্ব-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে;—কাব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই, তাঁহাকে সীতাচরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। যে সীতার প্রেম-প্রবাহ কৈকেয়ীর নিদারুণ বাধা না মানিয়া, পঞ্চবটীবনে পরম পবিত্র শ্রীধারণ করিয়াছিল; পরে, ধূর্ত্ত মায়াবী রাবণের মায়াকৌশলে যে সীতার প্রেমপ্রবাহে পর্ব্বতসম বাধা সমুপস্থিত; যে সীতার উদ্ধারের জন্য বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয় কিষ্কিন্ধ্যার বানরের সহিত সখ্য করিয়া, বানরের সহায়তায় অলঙ্ঘ্য সাগরকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন এবং লঙ্কার প্রবলপ্রতাপান্বিত রাবণ-রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—তখনও

যে সীতা অশোকবনে রামবিরহে নিরন্তর রোরুদ্যমানা ও রাবণের উপদ্রবে উৎপীড়িতা ;—সে সীতাকে উপেক্ষা করিলে, ইহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হইত না। শুধু যুদ্ধবর্ণনায় কাব্য হয় না ; তাহা হইলে আজকালকার সংবাদপত্রগুলি এক-একখানি অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত ! সুতরাং কাব্যের অনুরোধেই কবিকে অশোকবনে সীতার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই অশোকবনেই সীতাচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। এই অশোকবনে লোকনয়নের অন্তরালে রাবণের সহিত একাকিনী সীতার যে দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক সমর চলিয়াছিল, তাহার কাছে অসংখ্য বানরসেনার সহায়তায় রামলক্ষ্মণের লঙ্কাযুদ্ধ তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। এই অশোকবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সীতা আজ যশস্বিনী,—রামলক্ষ্মণের অপেক্ষাও সমধিক যশস্বিনী। এই অশোকবনেই রাবণের কামানলে সীতার প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা ! এই অনল যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহার পক্ষে, পরে চিতানল শীতলতা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? এই অশোকবনের করুণ দৃশ্যের প্রভাবই লঙ্কাযুদ্ধের ফলাফলের জন্য পাঠকের হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। সুতরাং কাব্যাংশে এই অশোকবনের চিত্রই লঙ্কাকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। তাই বলিতেছিলাম যে, অশোকবনে সীতার চিত্র প্রদর্শন করা মেঘনাদবধকাব্যে ইচ্ছাকৃত নহে ;—নিতান্তই অপরিহার্য্য। কিন্তু বাল্মীকি যে সীতাকে সমগ্র রামায়ণ ব্যাপিয়া রেখায় রেখায়, বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিন দিনের ঘটনা ~~অবলম্বনে~~ যে কাব্য, তাহার মধ্যে সেই সীতাচরিত্র চিত্রণ করিতে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিকেই চিন্তাকুল হইতে হয়। মধুসূদনও চিন্তাকুল হইয়াছেন এবং কাব্যকলায় সেই চিন্তা ব্যক্ত করিয়া, পাঠককে মহচ্চরিত্র শ্রবণের জন্য উৎসুক করিয়াছেন। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গারম্ভে যে সুন্দর বাল্মীকিবন্দনা আছে, তাহা কাব্যের একটা নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলী বন্দনা নহে ;—তাহা

সীতাচরিত্র চিত্রণের গুরুত্ব কাব্যকলায় অভিব্যক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম সর্গারম্ভে সরস্বতীবন্দনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন;—পরে আর কোন সর্গারম্ভেই বন্দনা নাই; —গ্রন্থমধ্যে কেবলমাত্র অশোকবন নামক এই চতুর্থ সর্গারম্ভে কবি শঙ্কিতহৃদয়ে বাল্মীকিবন্দনা করিয়াছেন। ইহা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের গুরুত্বব্যঞ্জক বন্দনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি যখন বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া বলেন;—

"তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

তখন তিনি "দীন", "দূর" ও "তীর্থ" এই তিনটি শব্দে বর্ণনীয় বিষয়ের পবিত্রতা ও আয়াসসাধ্যতা এবং তৎপক্ষে নিজের দৈন্যের প্রতি সুন্দররূপেই ইঙ্গিত করিলেন। বন্দনাশেষে বলিয়াছেন;— "কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।" কৃপা প্রার্থনা কেন? কেন না, কবি অশোকবনে সীতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত! দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন লোকে দুর্গানাম করে; দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন লোকে দ্বারদেশে নমস্কার করে; তেমনই অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে কবির এই বন্দনা, এই কৃপাপ্রার্থনা। এই বন্দনাটিতেই পাঠকের মনে একটা অসাধারণ দৃশ্যের জন্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলে। ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যকলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠককে অশোকবন দেখাইবার পূর্ব্বে কবি আর একটু কাব্য-কলা-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম সর্গের শেষে দিবাবসানে মেঘনাদের সামরিক অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এই অভিষেকে ম্রিয়মাণ লঙ্কাবাসীর মনে বিজয়াশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং লঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় মহা আনন্দোৎসব। অশোকবনের চিত্র উদ্ঘা-টনের পূর্ব্বে কবি এই আনন্দোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন;—দেখা-ইয়াছেন—

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,—
"সুবর্ণদীপমালিনী—রাজেন্দ্রাণী যথা রত্নহারা ;"—

গৃহে গৃহে আলোকমালা, গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি, এবং সর্ব্বত্র বিজয়াশার উল্লাস-সঙ্গীত। ইহার পরেই কবি অশোকবনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিলেন,—যেখানে আলোক নাই, আশা নাই, আনন্দধ্বনি নাই,—সেই আঁধার ও নীরব অশোকবনের শোকাবহ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। বৈপরীত্যের সমাবেশ (contrast) যেমন চিত্রকলার, তেমনি কাব্যকলারও একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। লঙ্কার এই আনন্দোৎসবের দৃশ্যের পরেই কবি যেই বলিলেন ;—

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে কাঁদেন
রাঘববাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে নীরবে"—

তখন পাঠকের মনে সেই অশোককাননের আঁধার ও নীরবতা যেন দ্বিগুণ গাঢ় হইয়া উঠিল। তারপরে কবি অশোককাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাল্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে পাওয়া যায় না। শোকে সমগ্র কাননটি যেন সীতাময় হইয়া উঠিয়াছে! তরুরাজি পুষ্পাভরণ ফেলিয়া দিয়াছে ; পবন রহিয়া রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ;—পক্ষীকুল অরবে শাখায় বসিয়া আছে ;—প্রবাহিনী উচ্চ বীচিরবে সীতার শোকবার্ত্তা বহন করিতেছে ;—সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী! মাত্র একুশটি ছত্রে এই অশোকবনের চিত্রে সীতাহৃদয়ের দুঃখচ্ছবি পাঠককে যেন আকুল করিয়া তুলে।

কাব্যকলার অনুরোধে কবিরা পাত্র-পাত্রীদের প্রতি কখনও নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হন, আবার কখনও বা সহৃদয় ও সদয়ও হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ অবস্থায় নির্দ্দয় হওয়া আবশ্যক, আর কোন্ অবস্থাতেই-বা সদয় হওয়া আবশ্যক, ইহাই উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্যকলার বিষয়। বহুকাল ধরিয়া সীতা এই অশোকবনে রাবণকর্ত্তৃক উৎপীড়িতা ও নিগৃহীতা হইয়াছেন। এখন লঙ্কাযুদ্ধ অবসানপ্রায়। বীর-

যোনি লঙ্কায় আজ মেঘনাদ ও স্বয়ং রাবণ ছাড়া, আর বীর নাই। রাবণ নিজেই বুঝিয়াছেন যে, লঙ্কার রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি সীতাকে আর লোভের চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। রাবণ সীতাকে এখন কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতে করিতে, রাবণ স্বয়ংই বলিয়াছেন ;—

> "কি কুক্ষণে পাবকশিখা-রূপিণী জানকীরে
> আমি আনিনু এ হৈম গেহে !"

রাবণের চক্ষে সীতা আজ "পাবকশিখা-রূপিণী !" এখানে রূপের "রূপিণী" নহে,—রূপকের "রূপিণী" ;—পাবকশিখা-স্বরূপিণী—প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ! যাহার গৃহদাহ উপস্থিত, সে অগ্নিকে যে চক্ষে দেখে, রাবণ সীতাকে সেই চক্ষে দেখিতেছেন ! "আনিনু" বলায় বিলাপের গাঢ়তা হইয়াছে। লোকের গৃহে আগুন লাগে ; দৈবাৎ বলিয়া মনে একটা প্রবোধ থাকে। কিন্তু রাবণের সে প্রবোধটুকুও নাই ;—দৈবাৎ নহে ;—তিনি নিজেই এই আগুন আনিয়াছেন ! এখন রাবণের মনের অবস্থা এইরূপ। এখন আর রাবণকর্ত্তৃক সীতার উৎপীড়ন কাব্যকলার হিসাবে সাজে না। তবু চেড়ীবৃন্দ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপীড়ন না হইতেছে এমন নহে ;—সরমার কাছে সীতার কথাতেই তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু উৎকট উৎপীড়নের সময় আর নাই ; কারণ লঙ্কার এখন শোচনীয় অবস্থা। এদিকে সীতার মনের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। রাবণের যে বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সেই মেঘনাদ আজ যুদ্ধে ব্রতী ! লক্ষ্মণ একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন ! ইহাতে দুর্ভাগিনী সীতার মনে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরা-ঘটিত ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের স্বভাবই এই। উপস্থিত এই বিপদ ;—তারপরে, এখনও স্বয়ং রাবণ বাকী। সুতরাং সীতার মনের আঁধার এখন ক্রমশই ঘনীভূত। এ অবস্থায় সীতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, ঐ শোকতপ্ত ও নিরাশ হৃদয়ে

সান্ত্বনাবারি সেচন করিয়া আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সহৃদয় কবি তাহাই করিয়াছেন।

"দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া ফেরে দূরে
মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—হীনপ্রাণা
হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী, নির্ভয় হৃদয়ে
যথা ফেরে দূরবনে।"

সান্ত্বনার প্রতিকূল, উৎপীড়নকারী চেড়ীবৃন্দকে লঙ্কার উৎসব দেখাইতে পাঠাইয়া দিয়া, কবি সেই গাঢ়-আঁধার অশোকবনে ক্ষণেকের জন্য একটা শান্ত নীরবতা সৃষ্টি করিলেন;—

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন!

ভীষণ আঁধার, যেন প্রেতপুরের ন্যায়! ভীষণ নীরবতা,—জনপ্রাণী নাই,—সীতা একাকিনী! এমন সময়ে,—সান্ত্বনার এই সুন্দর অবসরে—

"সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে!"

সমবেদনা ও সান্ত্বনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, চক্ষে অশ্রুভার এবং হস্তে সিন্দূর লইয়া, "পা দুখানি" পূজা করিতে আসিয়াছেন। অশ্রুর সহিত অশ্রু,—ইহাই ত প্রকৃত সমবেদনা; আর, সতী নারীর এমন বিপদে সিন্দূরই ত সুন্দর সান্ত্বনা। তাই সরমা সমবেদনা ও সান্ত্বনার এই দুইটি উপাদান লইয়া আসিয়াছেন। সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরে এই দুইটি জিনিষই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য;—সমবেদনায় অশ্রুমোচন করে, সীতার পক্ষে লঙ্কায় আর কে আছে? এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া এমন বিপদের দিনে মনে আশা জাগাইয়া দেয়, এমনই বা আর কে আছে? "অনুমতি" লইয়া সরমা সযত্নে সীতার সীমন্তে সিঁদূরের কৌটা দিয়া "পদধূলি" লইলেন! রেখায় রেখায় সীতার দেবীভাব

পাঠকের মনে অঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। তারপর যখন পদধূলি লইয়া সরমা বলিলেন—

> "ক্ষম লক্ষি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
> তনু ;"—

তখন বোধ হইল, যেন অধম মানবী দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে!

> "এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
> পদতলে ;"

সরমা সীতার পদতলে বসিলেন ;—পার্শ্বে নহে, "পদতলে"! সীতার দেবীভাব ফুটাইবার জন্য কবির কি যত্ন! কিন্তু ইহাতেও কবির মনতৃপ্তি হইল না ;—তাই কবি উপমা দিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

> "আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
> তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
> দশ দিশ!"

এতক্ষণ রেখায়-রেখায়, বর্ণে-বর্ণে যে দেবীচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই উপমা দ্বারা যেন সেই চিত্রে finishing touch দেওয়া হইল! হিন্দুর হৃদয়ে দেবীভাব ফুটাইতে এ তুলনার আর তুলনা নাই। তুলসী হিন্দু গৃহস্থের অন্তর্প্রাঙ্গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলেও হয় ; আর তুলসীমূলে দীপদান, হিন্দুগৃহের প্রাত্যহিক সান্ধ্য উৎসব ;— কারণ, তুলসী "দেবী", তুলসী "বিষ্ণুপ্রিয়া"।

সুবর্ণ প্রদীপের সহিত উপমায় সরমার রাজৈশ্বর্য্য ও উজ্জ্বল রূপ সুন্দর সুব্যক্ত হইয়াছে। সেই সুবর্ণ প্রদীপ আজ তুলসীর মূলে জ্বলিয়া সার্থক হইল। ধনীর গৃহে সুবর্ণ প্রদীপ থাকে, কিন্তু তাহা সংসারের কোন কাজেই লাগান হয় না ;—রন্ধন-গৃহে নয়, শয়ন-গৃহে নয়, বৈঠক-খানাতেও নয় ;—সে সোনার প্রদীপ কাজে লাগে কেবল দেবদেবীর পীঠতলে ; আর তাহাতেই সেই সুবর্ণ প্রদীপের সার্থকতা। আজ সরমাও সেইরূপ সীতার পদতলে বসিয়া সার্থক হইলেন। রূপ

ও ঐশ্বর্য্যকে পবিত্রতার পদতলে বসাইয়া পবিত্রতার মাহাত্ম্য যেন চিত্রিত করা হইল! এই একটি উপমায় কবি সীতাকে কত উচ্চ আসনে বসাইলেন! অশোকবনে সীতা পাঠকের চক্ষে যেন মূর্ত্তি-মতী পবিত্রতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন!

তারপর, যখন সরমার অনুরোধে সীতা তাঁহার হরণ-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি বলিতেছেন;—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী;"—

হিন্দুর মনে গঙ্গার পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ, তাহা না বলিলেও চলে। সেই গঙ্গার উৎপত্তিস্থান "গোমুখী" এবং সেই জন্যই উহা এক পবিত্র তীর্থস্থান। এমন পবিত্র তীর্থ গোমুখী-গুহার সহিত সীতামুখের এবং ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ স্বরে তন্নিঃসৃত গঙ্গার পবিত্র বারিধারার সহিত সীতাকথিত স্বীয় পূর্ব্বকথা-পরম্পরার উপমায়, সীতা ও তাঁহার জীবন-কাহিনীর পবিত্রতা চরমরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এখন দেখুন, হিন্দুর দুটি মহা পবিত্র জিনিসের সহিত উপমা দিয়া, কবি কেমন সহজে ও সুন্দররূপে সীতার ও তৎকথিত কাহি-নীর পবিত্রতার ভাব হিন্দু পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন;— তুলসী ও গঙ্গার বারিধারা! ঐ দুইটি জিনিসই হিন্দুর মনে পবিত্রতা ভাবের Symbols স্বরূপ। সরমা প্রথমে সেই তুলসীমূলে সুবর্ণ-প্রদীপরূপে সার্থক হইয়াছেন;—এখন আবার গঙ্গার পবিত্র বারি-ধারা পান করিয়া মনপ্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। দুটি মাত্র উপমায় সীতার পবিত্রতার ছবি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! কাব্যকলার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

তারপর, কবি সীতার পঞ্চবটীবাসের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশে বড়ই সুমধুর ও সুন্দর। আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের রীতিই এই যে, সর্ব্বাবস্থাতেই তাহাতে প্রসন্নতা বিরাজ করে। তাই সীতা বলিতেছেন;—

"দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ?"

রাজার নন্দিনী, রঘুকুলবধূ হইয়াও, তিনি এই দাম্পত্য-প্রেমের প্রভাবেই পূর্ব্বের রাজসুখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে;—ক্রমে এই বনবাসের সুখের তুলনায় পূর্ব্বের রাজসুখ তাঁহার কাছে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে কুটীরের চারিদিকে নিত্য প্রস্ফুটিত ফুলকুল! প্রভাতে কোকিলের পঞ্চম স্বরে জাগরণ! কুটীরদ্বারে শিখীসহ সুখিনী শিখিনীর নর্ত্তন! করভ করভী মৃগশিশু, বিহঙ্গাদি অহিংসক জীবসকল সদাব্রত ফলাহারী অতিথি! নির্ম্মল ও স্বচ্ছ সরসীকে আরসী করিয়া, যখন সীতা কুবলয় দিয়া কেশসজ্জা ও নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অঙ্গসজ্জা করিতেন; তখন রাম তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া কৌতুক-সম্ভাষণ করিতেন! রামের পক্ষে ইহা কৌতুক-সম্ভাষণ হইতে পারে; কিন্তু পাঠকের চক্ষে তখন সীতা বাস্তবিকই "বনদেবী";—রাজরাণী কোথায় ইহার কাছে লাগে? বনবাসের এই সুখের কথা শুনিতে শুনিতে, সরমার মত, পাঠকেরও বলিতে ইচ্ছা করে;—

"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজসুখে।"

এই বনবাস-চিত্রে, সীতার দাম্পত্য প্রেমিকতার সঙ্গে তাঁহার জীব-প্রেমিকতা, আর তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমিকতাও পূর্ণ প্রকটিত। সীতা-চরিত্রের এই মনোহর অংশ রামায়ণের বিশাল অরণ্যকাণ্ডে বিক্ষিপ্ত। মধুসূদন যেন তাহারই সার-সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত ভবভূতির সীতার ও কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া মিলাইয়া, বনবাসিনী সীতাচিত্রের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিয়াছেন। দুইটি মাত্র পৃষ্ঠায় শান্ত ও মাধুর্য্য-রসের এমন একটি সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করা যে কোন উৎকৃষ্ট কবিরই গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার, অশোকবনবাসিনী সীতার মুখে তাঁহারই পূর্ব্ব সুখ-

স্মৃতির কাহিনী! সুতরাং সেই সুখ-স্মৃতিকে যেন দুঃখের রসে পাক করিয়া, এক অপূর্ব্ব করুণ-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে! দুঃখের অশ্রু-জল দিয়া সুখের কথা লিখিলে যেমন হয়; করুণরসের নিবিড় ছায়ায় শান্ত ও মাধুর্য্যরসের ছবি আঁকিলে যেমন দেখায়;—অশোকবনে সীতার মুখে তাঁহার পঞ্চবটীবাসের সুখ-স্মৃতিও তেমনই হইয়াছে। পঞ্চ-বটীর এই সুখ-শান্তির কথা বলিতে বলিতে, যেই রামের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, অমনি সীতার শোকোচ্ছ্বাস সেই সুখের কথাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।—

"সাজিতাম ফুলসাজে, হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।"—

বলিয়াই, সীতার শোকতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল;—

"হায় সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"

তখন, সরমার সান্ত্বনায় আবার শোক সম্বরণ করিয়া সীতা পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে আবার যেই রামের কথা আসিল,—

"শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা!"—

অমনি শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—

"এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—

বলিয়া সীতা নীরব হইলেন। পরে সরমার সান্ত্বনায় আবার পূর্ব্ব-কথা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে শোকোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়া সীতার কাহিনী-প্রবাহ এক অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে! এরূপ একটি চিত্র রামায়ণে নাই। রামায়ণে সরমার উল্লেখ আছে বটে, এবং সরমা সীতার কাছে আসিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু মধুসূদন যেমন অশোকবনে সীতা ও সরমার কথোপকথনচ্ছলে, এক অপূর্ব্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, এমন চিত্রটি রামায়ণে নাই। এই একটি চিত্রে সমগ্র রামায়ণের সীতা যেন মুর্ত্তিমতী এবং সেই সঙ্গে সরমাও যেন সান্ত্বনার মূর্ত্তি ধরিয়া, পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশোকবনে সীতার কথা মনে হইলেই সেই সঙ্গে সরমার কথাও মনে পড়ে;—শোক ও সান্ত্বনা একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব রসে পাঠকের মনকে আপ্লুত করিয়া ফেলে! মেঘনাদবধকাব্যে এই সীতা ও সরমা মধুসূদনের এক মহতী কীর্ত্তি এবং ইহার চিত্রণে তাঁহার কাব্যকলার অসাধারণ স্ফুর্ত্তি!

সীতাহৃদয়ের উদারতা কবি কেমন কৌশলে একটি কথায় দেখাইয়াছেন শুমুন;—

সীতাকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া, সরমা মনের দুঃখে রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন;—

"নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"

রাবণ "দুষ্ট" হইলেও তিনি এ দোষে দোষী নহেন। সুতরাং সীতা

রাবণের প্রতি-আরোপিত এই দোষের ক্ষালন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন ;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন হেতু।"

রাবণের প্রতিও সীতার এমন উদারতা (charity) মধুসূদনের কীর্ত্তি।

আর একটি বিষয়েও মধুসূদন সীতাচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মায়া-মৃগের পশ্চাতে রাম ধাবমান হইয়া দূরবনে গিয়া পড়িয়াছেন ;—কুটীরে সীতা এবং প্রহরী লক্ষ্মণ। সীতা সহসা দূরাগত আর্ত্তনাদ শুনিলেন ;—

"কোথারে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি কালে?"—

সীতা বিচলিত হইয়া লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ রামের বাহুবল অবগত ছিলেন ; সুতরাং তিনি রামের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, বরং সীতাকে সেই ভয়-সঙ্কুল বিজন-বনে একাকিনী রাখিয়া যাইতেই আশঙ্কিত হইয়া, সীতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। তখন রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা লক্ষ্মণকে অকথ্য ও অশ্রাব্য কথায় গালি দিয়াছিলেন। সে কথা উচ্চারণ করিতেও আমাদের কুণ্ঠা হয়। মনে হয়, যেন সেই পাপেই সীতাকে সুদীর্ঘকাল লঙ্কার অশোকবনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল! মানবচরিত্র এবং ঘটনা-পরম্পরার বিচার করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই কটূক্তি সম্বন্ধে বাল্মীকিকে সমর্থন করিতে পারা গেলেও, আমরা যখন সমগ্র রামায়ণের সীতা ও লক্ষ্মণকে চিনিয়াছি, তখন আমাদের কানে ঐরূপ কটূক্তি বেজায় বাজে। মধুসূদনেরও বাজিয়াছিল। তাই, তিনি সীতার মুখে অশ্রাব্য

কটূক্তি না দিয়া, তীব্র তিরস্কারে লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে বাধ্য করিলেন।

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূরবনে !"

লক্ষ্মণের ন্যায় বীরের প্রতি "রে ভীরু," "রে বীরকুলগ্লানি," বড় সামান্য গালি নয় এবং রমণীর মুখে "যাব আমি," বীর লক্ষ্মণের পক্ষে বড় কম গঞ্জনার কথা নহে! কিন্তু তাহা হইলেও, এমন অবস্থায় এমন তীব্র তিরস্কার ও গঞ্জনা সীতার মুখে অসঙ্গত হয় নাই ;—তীক্ষ্ণ হইলেও, ইহা মর্ম্মঘাতী নহে ;—ইহাতে অকথ্যতা বা অশ্রাব্যতা নাই। রামায়ণের সীতা-চরিত্রের এই কালিমারেখাটুকু মধুসূদন ক্ষালন করিয়া উৎকর্ষ সাধনই করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সীতাচিত্রে মধুসূদন নানাবিধ কাব্যকলার প্রয়োগ করিয়াছেন। হরণকালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহার অন্যতম। তখন সীতার চক্ষে জগৎ অন্ধকার ; কোথায় যাইতেছেন, তার ঠিক নাই ;—রামলক্ষ্মণের কেহই জানিলেন না ;—বিজন বন, কেহই দেখিল না ;—ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার! তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ;—কিন্তু শুনিবার লোক কই ? নিরুপায় হইয়া, তিনি অঙ্গের অলঙ্কাররাজি খুলিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন ;—কিন্তু তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। তিনি মনের আবেগে আকাশকে ডাকিলেন, সমীরণকে ডাকিলেন, মেঘকে ডাকিলেন ;—কিন্তু সে ত মনের আবেগ মাত্র! তবে কি সীতা, এ বিপদে নিতান্তই অকূল সমুদ্রে

ভেলা? সীতার ভবিষ্যৎ কি একান্তই নৈরাশ্যময়? মানবমনের পক্ষে এরূপ অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! এইরূপ স্থলই করুণ কাব্যকলার উপযুক্ত অবসর; এবং মধুসূদন তাহা প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই;—অতি সুন্দররূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। নিরুপায় হইয়া, সীতা জননীর আরাধনা করিলেন;—

"এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি!"—

তখন রাবণ ও জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে;—

"কাঁপিলা বসুধা, দেশ পূরিল আরাবে!"

সীতা অচেতন হইলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, সীতা সরমাকে বলিতেছেন;—

"শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী!
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী,
মা আমার! দাসী পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি সুপ্রসন্ন বিধি
এতদিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি মৈথিলী!
ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ্ চেয়ে।"

অকুল সমুদ্রে ভাসমান ভেলার পক্ষে সুদূর প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোক যেমন, স্বপ্নে জননীর এই বাণীও তেমনই সীতার নৈরাশ্যময় হৃদয়ে ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার করিল। তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট ঠিক Bioscopeএর মত করিয়া স্বপ্নময়ী সীতার চক্ষে এক এক করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে ঋষ্যমুক পর্ব্বতে রামের সহিত সুগ্রীবাদি পঞ্চবীরের মিলন হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই সীতা দেখিলেন। রাবণবধের পরে সুরবালাগণ সীতাকে রামের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া, সীতাকে লইয়া যাইতেছেন ;—তখন যাহা ঘটিল, সীতার কথাতেই শুনুন ;—

"হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি
কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!"

ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথহারা পথিকের মনে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে যে ভাব হয়, স্বপ্নে এই সুদীর্ঘব্যাপী ঘটনা-পরম্পরার অবসানে রামকে দেখিয়া, সীতার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছিল। এমন সময়ে সীতার মোহভঙ্গ হইল ;—সুখের স্বপ্নও বিলীন হইল! জাগিয়া সীতা দেখিলেন,—যে রাবণ, সেই রাবণ! আর জটায়ু,—

"ভূতলে, হায়, সে বীরকেশরী
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!"

আবার যে নৈরাশ্য, সেই নৈরাশ্য!—যে অকুল সমুদ্র, সেই অকুল সমুদ্র! কিন্তু তবু এই স্বপ্নে একটা আশার বাণী দিয়া গেল। এতগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য ; তাহাও আবার জননী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত! —ইহা স্বপ্ন হইলেও, মিথ্যা হইবার নহে। নৈরাশ্যময় হৃদয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এই দীর্ঘকাল অশোকবনে সীতা, বোধ হয়, এই আশার স্বপ্ন অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছেন। সীতার কাছে এ স্বপ্ন

অমূল্য। তাই এই স্বপ্নকাহিনী শুনাইতে গিয়া, সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন ;—

"শুন লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্বকাহিনী !"

সরমা মন দিয়া সবই শুনিলেন। এপর্য্যন্ত স্বপ্নের সকল ঘটনাই ফলিয়াছে ; সুতরাং আর যাহা বাকী, তাহাও ফলিবে ;—এইরূপ সান্ত্বনাও দিলেন। শেষে বলিলেন ;—

"আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব ! ফলিবে কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরীদল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি, আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুল না দাসীরে সাধ্বি ! যতদিন বাঁচি
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা !"

বিদায়কালে সরমার এই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন যেন বাস্তবিকই দেবী-প্রতিমার পদে অধম মানবীর নিবেদন বলিয়াই মনে হয়। সীতাও সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত ! যেন সরমার ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াই, সীতা-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল ;—

"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কিলো আছে এজগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !

এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন!"—

"কাঙ্গালিনী" সীতা সরমাকে এই কৃতজ্ঞতা-উপহার সজল নয়নেই দিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে পাঠকের সজল নয়ন আর অনুমান করিতে হয় না! তখন, চেড়ীবৃন্দের আগমন-আশঙ্কায়,—

"আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি!"

অশোকবনের দৃশ্যারম্ভে আমরা সীতাকে "একাকিনী" দেখিয়াছিলাম;—এখন আবার যে একাকিনী, সেই একাকিনী হইলেও, আমরা নিজের মন দিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, "হিতৈষিণী"র কাছে দুঃখের কাহিনী কহিয়া হৃদয়ের দুঃখভার-লাঘব, এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, তাহা সীতার হইয়াছে;—আর সমবেদনা ও সান্ত্বনায় সীতার মনে এ অবস্থায় যতটুকু শান্তি দেওয়া সম্ভব, সরমা তাহা দিয়া গেলেন। সীতার ন্যায়, পাঠকের মনও অজ্ঞাতসারে সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তারপর, এই সীতাচিত্রে মধুসূদনের চরম কৃতিত্ব সীতার রক্ষো-দুঃখ-কাতরতায়। রামায়ণে আমরা অত্যাচার-কারিণী চেড়ীদিগের প্রতি সীতার ক্ষমা-গুণের উদাহরণ পাই। যুদ্ধের শেষে, হনূমান্ ঐ সকল চেড়ীদিগকে প্রাণে মারিবার অনুমতি চাহিলে, সীতা বারণ করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন যে, উহারা রাবণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র, উহাদের দোষ নাই। ইহা আদর্শ গুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘনাদবধের কবির সে সুযোগ হয় নাই। কিন্তু

রক্ষোদুঃখে কাতরতা উহা অপেক্ষাও উচ্চাদর্শ, এবং মধুসূদনই তাহা দেখাইয়াছেন। হরণকালে যখন মূর্চ্ছাগতা সীতা স্বপ্নে ভবিতব্য ঘটনার পট দেখিতেছেন, তখন লঙ্কাযুদ্ধে লঙ্কার হাহাকার রব শুনিয়া, স্বপ্নেই সীতা চঞ্চল হইয়া বসুন্ধরাকে বলিয়াছিলেন ;—

"রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে, মা আমার !"—

ইহাতে সীতাহৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার রক্ষোদুঃখ-কাতরতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহা স্বপ্নের আবেগ মাত্র। কবির মন এইটুকু আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না ; আর চিত্রও তাহাতে উজ্জ্বল হয় না। তাই কবি নবম সর্গে আর-একবার অশোকবনের করুণ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

লক্ষ্মণকর্ত্তৃক মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন ;—রাবণ রামের কাছে সাতদিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করিয়া আজ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন ;—প্রমীলা মৃত পতির সহানুগমন করিবে। সুতরাং লঙ্কায় আজ নিরন্তর হাহাকার রব ! কিন্তু সীতা কিছুই জানিতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিলে, চেড়ীরা মারিতে আসে ! সীতার দুঃখে দুঃখিনী সরমা ইন্দ্রজিৎবধের সুসংবাদ লইয়া, অশোকবনে উপস্থিত ;—

"যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলাসতী, আইলা সরমা—
রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে।"

সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের বধবার্ত্তা শুনিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে ধন্যবাদ করিতেছেন ;—কিন্তু কান তাঁহার, লঙ্কার হাহাকারের দিকে ;—

"কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি !"—

তারপর যখন শুনিলেন,—

"প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি!"—

তখন "ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া" সীতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরমার সহিত তিনিও কাঁদিয়া কহিলেন;—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ পক্ষে ভীম-ভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা,
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!"—

সরমা সান্ত্বনা দিলেন;—

"দোষ তব কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস দেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।"

রক্ষোদুঃখে সরমা কাঁদিতে লাগিলেন ; আর সেই সঙ্গে—

"রক্ষঃকুল-শোকে সে অশোকবনে
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে !"

এই ক্রন্দনেই মধুসূদনের অশোকবনের চিত্র শেষ হইল ! ক্রন্দনে ইহার আরম্ভ হইয়াছে,—মধ্যেও নিরন্তর ক্রন্দন !—সীতার শোকের ক্রন্দনের সহিত সরমার সমবেদনার ক্রন্দন মিশিয়া এক অপূর্ব্ব অশ্রু-প্রবাহ, এই সীতা-সরমার সম্মিলন !

মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যে অশোকবনে সীতা ও সরমার এই চিত্রপটখানি সুচারু কাব্যকলার সাহায্যে কি সুন্দর করিয়াই আঁকিয়াছেন ! ইহা সমবেদনা ও সান্ত্বনার শীতল ছায়ায় শোকের কি সুকরুণ চিত্র ! করুণরসের সহিত পূর্ব্বস্মৃতির মাধুর্য্যরস মিশা-ইয়া, কি অপূর্ব্ব রসেরই সৃষ্টি করা হইয়াছে ! ইহাতে উৎকট উৎ-পীড়নের নিদারুণ দৃশ্য নাই ; অথচ ইহার মাধুর্য্যরসেও যেন পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়।

বাল্মীকির সীতাকে যেন crystallise করিয়া, মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যে দেখাইয়াছেন ; এবং তাহার উপরেও বর্ণপাত করিয়া, তাহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন। রামায়ণে সীতার আদর্শ খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাঁহার অসাধারণ কাব্যকলার গুণে যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর সরমা,—যিনি রামায়ণে রেখাঙ্কিতা মাত্র,—সেই সরমা মধুসূদনের কৃপায় ভক্তিমতী সান্ত্বনা ও সমবেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, সীতার পদতলে ও পাঠকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহাও মধুসূদনের অসাধারণ কৃতিত্ব। মধুসূদন যদি আর কিছু না করিয়া, কেবল এই সীতা-সরমার চিত্রটি মাত্র দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত !

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

গতি ও স্থিতি

ইউরোপে এখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। ইউরোপের প্রায় সকল সভ্য এবং উন্নত জাতি রণমদে মত্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ, ফরাসী রুষ এবং ইতালীয় জাতি এক দিকে, জর্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়াণ এবং তুর্কী জাতি অন্যদিকে থাকিয়া সভ্যতার আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষার পরিণতির ক্রম লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। ইহা রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ; একপক্ষে গণতন্ত্রতা, খৃষ্টান সভ্যতার আদর্শ, অন্য পক্ষে শক্তিতন্ত্রতা এবং প্রভুবাদের আদর্শ। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে আদর্শের জয়-পরাজয় ঘটিবে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা যেন স্বীয় শীলতার আবরণ উন্মোচন করিয়া ভিতরের ভাবটা আমাদের খুলিয়া দেখাইতেছেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনায় সমালোচনা করার ইহাই শুভ অবসর; এইবার ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার এবং ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার আদর্শ বিচার করিবার সময় হইয়াছে। তাই উভয় পক্ষের চিন্তার ক্রম ও গতি আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই পাঠকগণের গোচর করিব। কারণ আমার এই বোধ অনুসারেই আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির বিশ্লেষণ আমি করিয়া থাকি।

আমার মনে হয় ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার আদর্শ এবং সাধ্য হইল গতি বা Progress; আর আমাদের এই ভারতবর্ষের শেষযুগের সভ্যতার আদর্শ এবং সাধ্য বিষয় হইল স্থিতি বা Conservation। কেবল ভারতবর্ষ কেন, এশিয়ার প্রায় সকল দেশের সকল পুরাতন জাতির সভ্যতার সাধ্য স্থিতি। কিসে জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, জাতির পিতৃপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব, এশিয়ার প্রায় সকল জাতিরই ইহাই চেষ্টা, ইহাই জীবনের সাধনা। এশিয়ায় দুইটি সভ্যতা প্রবল; এক ইসলাম সভ্যতা, দ্বিতীয় বৌদ্ধ বা হিন্দু সভ্যতা। দেশভেদে, প্রতিবেশ প্রভাবের

অনুসারে ইস্‌লাম সভ্যতার কিছু কিছু পার্থক্য বা বৈষম্য থাকিলেও এখন সকল দেশের ইস্‌লাম সভ্যতার উদ্দেশ্য ও সাধ্য যে স্থিতি, সে পক্ষে কোন সংশয় নাই। বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতা ভারতবর্ষে এক আকারে প্রকট, চীন জাপানে অন্য আকারে প্রকট; কিন্তু স্থিতি উভয় আকারের সভ্যতারই সাধ্য বিষয়। জাপান অধুনা ইউরোপের অনুচিকীর্ষু হইলেও, ইউরোপীয় ভঙ্গীতে জাতির মতি-গতি পরিবর্ত্তিত করিলেও, জাপজাতির মজ্জাগত স্থিতির সংস্কার উহাকে আত্মরক্ষার দিকে, আত্মসংবরণের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবেই। এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হইবার পূর্ব্বেই জাপান তাহার স্থিতি-সংকল্পের পরিচয় দিতে বাধ্য হইবেই। ভারতবর্ষের স্থিতির বুদ্ধি, অনেকটা উৎকট রোগীর রোগকে জাপ্য করিয়া রাখিবার প্রকরণের মতন; ঘরপোড়ার কাঠ যে কয়টা বাঁচাইতে পারা যায়, সেই কয়টা বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র। ভারতবর্ষের অঙ্গে, যেন স্তরে স্তরে, যবন, গ্রীক, হূণ, শবর, পাঠান, মোগল প্রভৃতির দংশন-ক্ষত লুকান আছে। ভারতবর্ষ যেন সে সকল ঢাকিয়া রাখিয়া, সে সব স্থানে মাছিমশা বসিতে না দিয়া আরোগ্যের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। যদি বাঁচি তবে ত সুখ-ঐশ্বর্য্য—বিলাসব্যসন! জাতিগত বিশিষ্টতা-সমেত জীবন-মরণের নির্ণয় যখন এখনও ভারতবর্ষের ভাগ্যে হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে সুখ-বিলাসের সময় এখনও আসে নাই। জীর্ণ রোগী নির্দ্দিষ্ট কঠোর পথ্য অবলম্বন করিয়া যদি বাঁচিতে পারে ত বাঁচুক; পরে সমাজ-শরীরে বলসঞ্চয় হইলে তখন কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তাহা স্থির করা যাইবে। ইহাই হইল ভারতীয় স্থিতির মূলমন্ত্র।

ইউরোপ নূতন ভাবে, নবশক্তিতে সঞ্জীবিত; ইউরোপের ভাগ্যে এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা ইউরোপের খৃষ্টানজাতিসকলের পক্ষে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এবং নূতন। তাই ইউরোপ স্বীয় অভ্যুদয়কে উন্নতি মনে করিতেছে, জাতির বিস্তৃতি এবং সংহতি-বৃদ্ধিকে গতি বা Progress ঠাওরাইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে এ খেলা

নূতন নহে। এ খেলা আমরা খেলিয়া শেষ করিয়াছি। ছিল এক-দিন, যখন অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমগ্র এশিয়ায় এবং এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সদ্ধর্ম্মের প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ছিল একদিন, যখন ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ছিল একদিন, যখন ভারতবর্ষের বিহারে, আশ্রমে, সংঘারামে—মন্দিরে বিজ্ঞার হোমাগ্নি নিত্য প্রজ্বলিত থাকিত; ভারতের নাগার্জ্জুন, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, হারীত জ্ঞানবিজ্ঞানের আবিষ্কারক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা ও খেলা খেলিয়াছি; উহার পর্য্যবসানের তিক্ত ও তীব্র আস্বাদনে ব্যথাও পাইয়াছি। সুতরাং এমন ক্ষণিক—দুইশত, তিনশত বর্ষব্যাপী অভ্যুদয়কে, পদার্থতত্ত্বে সিদ্ধিলাভজনিত সামর্থ্যের বিদ্যুদ্বিকাশকে আমরা উন্নতিও বলি না, অবনতিও বলি না। ইউরোপ কিন্তু এখনও সে কথা বলে; এখনও উহার সভ্যতাকে উন্নতির এবং গতির সভ্যতা বলিয়া শ্লাঘা করে। পঞ্চাশ বৎসর পরে এমন শ্লাঘা করিবে কিনা জানি না। বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম সভ্যতার পর্য্যবসান দেখিয়া, উহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্ত্তনের ভঙ্গী বুঝিয়া মনে ত হয় না খৃষ্টান ইউরোপ আর পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বীয় সভ্যতার জন্য এমন বাস্ফোট করিতে পারিবে। যে যখন বড় হয়, জগতের অন্য সকল জাতির মাথার উপর পা দিয়া চলিতে থাকে, সে তখনই নিজের সভ্যতার, নিজের বৈশিষ্ট্যের শ্লাঘা করিয়া থাকে; গ্রীক, রোমক, বৌদ্ধ, মুসলমান, সবাই দর্পদম্ভ করিয়া শেষ করিয়াছেন; এখন খৃষ্টান ইউরোপের পালা পড়িয়াছে; তাই খৃষ্টান সভ্যতা উন্নতির সভ্যতা, গতির সভ্যতা বলিয়া জগন্ময় বিঘোষিত হইতেছে। উন্নতি-গতি কেবলই নবীনতার পরিচায়ক; স্থিতি প্রৌঢ়তার পরিচায়ক। যখন মরণভয় থাকে না, নবজীবনের নবোদ্ধতায় প্রমত্ত থাকা যায়, তখনই উন্নতি এবং গতি ভাল লাগে, নিত্য নূতন বিলাসের আস্বাদন বড়ই মধুর বোধ হয়। পরন্তু একবার মরণের সাক্ষাৎকার হইলে,

একবার মরিতে-মরিতে বাঁচিয়া উঠিলে, একবার রোগের ও দৌর্ব্বল্যের দুঃখভোগ করিলে আর গতি-উন্নতি ভাল লাগে না। তখন কেবল বাঁচিবার সাধ হয়; আমার যাহা, আমি যাহাদের, সে সব, আমার মতন করিয়া—আমার সাধের মতন করিয়া, বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা হয়। তখনই স্থিতির মাহাত্ম্য, conservationএর মহিমা বুঝিতে পারি। ইউরোপের সেই দিন যেন সন্নিকট হইয়াছে। এই ভীষণ যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, ইহার পরিণাম যে কেমন ও কোন রকমে হইবে, তাহা কেহ জানে না; তবুও এখন হইতেই সুর উঠিয়াছে রক্ষা কর—রক্ষা কর; ইউরোপের গণতন্ত্রতা, ইউরোপের খৃষ্টান সভ্যতা, ইউরোপের দয়া-মায়া-করুণা, ইউরোপের বিশিষ্টতা রক্ষা কর—রক্ষা কর। ইংলণ্ড স্বীয় মনস্বী-প্রধান মন্ত্রীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের রক্ষানীতি,—শতাব্দীর পর শতাব্দীর চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিব। স্থিতির ইহাই প্রথম সুর; পরে যত আঘাত পাইবে, যত আত্মরক্ষায় বিব্রত হইবে ততই এই সুর জমাট বাঁধিবে; শেষে জর্ম্মণী ছাড়া ইউরোপের সর্ব্বত্র স্থিতিশীলতার ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে।

ফরাসী মনীষী মসিয়ে রেণান্ বলেন, যে জাতির ধর্ম্মে পরকালের চিন্তা অধিক, যে জাতি মরণের পরপারের ভাবনা লইয়া অত্যন্ত বিব্রত, সে জাতি স্থিতিশীল না হইয়া পারে না। খৃষ্টান ধর্ম্মে পারলৌকিক চিন্তা যথেষ্ট আছে; খাঁটি খৃষ্টান ইহকাল অপেক্ষা পরকালের ভাবনা অধিক চিন্তা করে। কিন্তু ইতালীর মনীষী গালিমানী ফেরেরো বলেন যে, যে দিন হইতে ইউরোপ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছে, ভারতবর্ষে ও চীনে যাইবার জলপথ বাহির করিয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রমত্ত হইয়াছে, অর্থাকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা হইয়াছে, সেই দিন হইতে খৃষ্টান ইউরোপ অল্পে অল্পে পরকালের ভাবনা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের যত অভ্যুদয় হইয়াছে, যত বিস্তৃতি, যত পুষ্টি হইয়াছে ততই ইউরোপ পরকাল ভুলিয়াছে। শেষে

পদার্থবিত্তার বিষম আলোচনায়, সায়ান্সের অতি চর্চ্চায় অপরাজেয় শক্তিধর হইয়া ইউরোপ আত্মাকে—ভগবান্‌কে একেবারেই ভুলিয়াছে। ফেরেরো বলেন যে, গত তিন শত বৎসরকাল ইউরোপ পরকাল এবং পরমাত্মাকে ভুলিয়া, দেহের তুষ্টি পুষ্টির জন্য বিব্রত হইয়া কেবল উন্নতির চিন্তাই করিয়াছে,—ইউরোপের অতীতের সহিত বর্ত্তমান কালের তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে ইদানীং ইউরোপ কেবল গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই গতি বা Progressএর অগ্নি-পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। আগামী শতবর্ষকাল এ পরীক্ষা চলিবে। সে পরীক্ষায় ইউরোপ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, ইউরোপের গতির বা উন্নতির জয় হইবে; এশিয়ার স্থিতিকে চিরপরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে, তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ; তাহা অতীত কালে কখনই হয় নাই, অতএব ভবিষ্যতেও হইবার নহে। ইহাই ফেরেরোর সিদ্ধান্ত।

সমাজতত্ত্বের ইহা মূল সূত্র যে, ব্যষ্টির যেমন পরিণাম হইবে, যে ক্রম অনুসারে সকল ব্যষ্টির পর্য্যবসান হইবে, সমষ্টিরও সেই পরিণতি এবং সেই ক্রম অনুসারে পর্যবসান সাধিত হইবে। বহু দেহের সমষ্টিতে সমাজ-শরীর নির্ম্মিত; সুতরাং সমাজ-শরীর একটা organism, দেহীর গুণোপেত। সুস্থ, সংযত, সাধু দেহের পরিমাণ শতবর্ষ; সুস্থ, সংযত সাধু সমাজ-শরীরের পরিমাণ সহস্র বৎসর। দেহীর যেমন পাপ করিলে অকাল-মৃত্যু ঘটে; সমাজ-শরীরেরও তেমনি পাপ করিলে অকাল-মৃত্যু ঘটে। দেহীর যেমন জীবনের দশ দশা আছে, সমাজ-শরীরের তেমনি দশ দশা আছে, সুদিন-কুদিন, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য্য, রোগ-শোক আছে। তবে সাধু পিতার যেমন সৎপুত্র থাকিলে পিতার বংশের ধারা এবং বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত হয়; সে ধারা অব্যাহত ভাবে দীর্ঘকাল কালপ্রবাহের সঙ্গে চলিতে পারে; তেমনি সাধু-সংযমী সমাজে সাধু পুত্রের বা ব্যষ্টির উদ্ভব হইলে সুদিন-কুদিন নির্ব্বিশেষে সমাজ চিরকাল স্বীয় বিশিষ্টতা

রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তিব্বতের লামাগণ বলেন, কেবল কি তাই! সমাজ-শরীর জীর্ণ হইলে, যেমন জীর্ণ মন্দির পুরাতন বুনিয়াদের উপর গড়িয়া লইতে হয়, তেমনই সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হয়। যেমন লামা মরে না, যুগে যুগে নূতন দেহ ধারণ করে; তেমনি সদ্ধর্ম্মের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মরে না, মাঝে মাঝে তাহাকে নূতন দেহ দিয়া নবীন ভাবে গড়িয়া লইতে হয়। পুরাতন মন্দিরে যেমন পূজা আরতি হইত, নূতন মন্দিরেও ঠিক সেই পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে পূজা আরতি চলিবে, ক্রমের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না; কেবল মন্দিরটা নূতন করিয়া, নবীন দৃঢ়তা সংযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। যুগে যুগে এক একজন ধর্ম্মপ্রচারক, এক একজন সিদ্ধ অর্হৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সমাজকে নূতন আকার দিয়া যান। কিন্তু এ নবীনতা স্থিতির হেতু, অমরতার সাধক; পরিবর্ত্তন বা উন্নতির, গতির বা চাঞ্চল্যের বিধায়ক নহে। পিতার যোগ্য পুত্র পিতৃপদই অনুসরণ করিবে, নূতন মানুষ হইলেও পিতৃ-পিতামহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

এই সঙ্গে তন্ত্র একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। তন্ত্র বলেন কর্ম্মী সাধকের পক্ষে প্রতিবেশ প্রভাব (environment) অতি তুচ্ছ ব্যাপার। জলবায়ুর দোহাই দিয়া তুমি যে বিগড়াইবে, তাহা তন্ত্র শুনেন না। তন্ত্র বলেন, আত্মবান্ মানুষ, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকিলে, জলবায়ুর প্রভাবকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারে। ইংরেজ যে ভাবে শীতপ্রধান দেশের আচারব্যবহার, রীতিপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শীতপ্রধানদেশের উপযোগী স্বীয় বিশিষ্টতাকে অব্যাহত রাখিয়া এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি নরনারীকে সেইভাবে শাসনে রাখিয়াছেন; তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে তন্ত্রের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। যস্মিন দেশে যদাচারঃ বলিয়া ইংরেজ ত ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসী সাজেন নাই! এখানকার ঘোর গ্রীষ্মে অধীর হইয়া ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার,

আহার-আচ্ছাদন গ্রহণ করেন নাই ! তেমন করিলে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত, বিশিষ্টতা থাকিত না।

এইবার জর্ম্মণীর গতি বা Progressএর প্রকরণটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, জর্ম্মণজাতি অধুনা ইহার যতটা আলোচনা করিয়াছে, এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া ও সাধনার বিষয়ীভূত করিয়া দেখাইয়াছে, ততটা ইউরোপের অন্য কোন জাতিই করে নাই। এই গতি বা শক্তিবাদ জর্ম্মণ পণ্ডিত নিজ্‌শ্‌ (Friedrich Nietzsche) যেমন সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার উক্তি অবলম্বনে আমাদিগকে গতি-তত্ত্ব বা শক্তিবাদ বুঝিতে হইবে। নিজ্‌শ্‌ বলিতেছেন,—

What is good? All that increases the feeling of power,—the will to power—power itself—in man.

সৎ পদার্থ কি? যাহা শক্তিসাধক, যাহা শক্তি, শক্তির অনুভূতি, শক্তি প্রয়োগের অভিলাষ তাহাই সৎ, সাধু ও সুন্দর। যাহার দ্বারা শক্তির বৃদ্ধি হয়, শক্তিপ্রয়োগের বাঞ্ছা প্রকট হয়, মনুষ্যের মধ্যে তাহাই সৎ, তাহাই ভাল।

What is bad? All that comes from weakness. অসৎ কি? মন্দ কি? যাহা দৌর্ব্বল্যজাত, যাহা শক্তিহীনতার পরিচায়ক, যাহা শক্তিহীনতা হইতে সঞ্জাত তাহাই মন্দ, তাহাই অসৎ।

What is happiness? The feeling that power increases—that resistance is being overcome!

আনন্দ কিসে? সুখ কি? আমাতে শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে এই অনুভূতিই আনন্দ। আমি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিতেছি সেই চিন্তাই সুখদায়ক।

Let us have, not contentedness, but more power—not peace at any price, but warfare—not virtue, but efficiency.

The weak must perish! That is the first principle of our charity. And we must help them to do so.

আমরা কেবল তুষ্টিতৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিব না, পরন্তু অধিক ক্ষমতা, অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সাধনা করিব; যে কোন উপায়ে শান্তিলাভ করিতে চাহিব না, পরন্তু যুদ্ধের জন্য, কেবল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধনা করিব; আমরা সাধুতা লাভ করিলে তৃপ্ত হইব না, পরন্তু যোগ্যতার জন্য প্রয়াস করিব। দুর্ব্বল শক্তিহীনকে মরিতেই হইবে। ইহাই আমাদের দয়াধর্ম্মের মূলতত্ব। যাহাতে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন মরিতে পারে, সে পক্ষে আমাদের সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

নিজ্‌শ্‌ এমন উপদেশ দিলেন কেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

Life is essentially the appropriation, the injury, the vanquishing of the unadapted and weak. Its object is to obtrude its own forms and insure its unobstructed functioning. Even an organisation whose individuals forbear in their dealings with one another (a healthy aristocracy for instance) must, if it would live and not die, act hostilely toward all other organisations. It must endeavour to gain ground, to obtain advantages, to acquire ascendancy. And this is not because it is immoral, but because it lives and all life is will to power.

জীবন মানে কি? বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে? যাহা আমার পক্ষে অনুপযোগী, যাহা আমা অপেক্ষা দুর্ব্বল বা শক্তিহীন, সেই সকলকে নষ্ট করিয়া বা আত্মসাৎ করিয়া বিরাজ করার নামই জীবন। যে দুর্ব্বলকে, অনুপযোগীকে নষ্ট বা আত্মসাৎ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই বাঁচিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে; জীবনের আর

একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে, জীবন নিজের বৈশিষ্ট্যযুক্ত আকার, ভাব ও প্রকৃতিকে ফুটাইয়া, তাহার অব্যাহত ভাবে ক্রিয়ার সুব্যবস্থা করিতে প্রয়াস পায়। মনে কর যদি কোন সুস্থ ও সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায় (যেমন অভিজাতবর্গ) এমন ভাব ধারণ করে যে তাহার ব্যষ্টি আপোষের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি করিতে উদ্যত না হয়, তাহা হইলে, সেই সমবায় যদি সজীব থাকিতে চাহে, তাহা হইলে, অন্য সকল গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবেই। এমন যদি না করে ত তেমন সমবায় অচিরে শিথিল হইবে—মরিয়া যাইবে। কারণ সজীব থাকিতে হইলে সদাসর্ব্বদা অধিক লাভ, অধিক বিস্তৃতি, অধিক প্রাধান্য-বৃদ্ধি উপার্জ্জন করিতে হইবেই। যেহেতু স্থবিরতা মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। এমন সকল কাজ করিলে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা নহে; উহাই জীবনের ধর্ম্ম; কেন না জীবন বা সজীবতা শক্তি প্রয়োগের—শক্তি অর্জ্জনের এবং সঞ্চয়ের নামান্তর মাত্র।

এই সিদ্ধান্তটা নিজ্‌শ্‌ জীবতত্ত্বের (biology) দিক দিয়া আর একটু ফুটাইয়া বলিয়াছেন,—

In itself an act of injury, violation, exploitation or annihilation cannot be wrong, for life operates essentially and fundamentally by injuring, violating, exploiting and annihilating and cannot even be conceived of as existing otherwise. One must admit indeed, that from the highest biological standpoint, conditions under which the so-called rights of others are recognized must be ever regarded as exceptional conditions—that is to say, as partial restrictions of the instinctive power-seeking will to live of the individual, made to satisfy the more powerful will to live of the mass. Thus small units of power are sacrificed to create large

units. To regard the rights of others as being inherent in them, and not as mere compromises for the benefit of the mass-unit, is to enunciate a principle hostile to life itself.

প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি, বলাৎকার, (পারিভাষিক অর্থে নহে) লুণ্ঠন বা শোষণ অথবা সর্ব্বোচ্ছেদে পাপ নাই—অধর্ম্ম নাই; কারণ মূলতঃ জীবন অর্থেই ত ঐ সকল ক্রিয়া বুঝায়। বাঁচিতে হইলে অন্যের ক্ষতি করিতেই হইবে, অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে, অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন বা শোষণ করিয়া লইতেই হইবে,—যদি এ সকল কার্য্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, তবে তেমন ব্যাঘাতকে সমূলে উন্মূলিত করিতেই হইবে। কারণ এই সকল কার্য্য ছাড়া জীবনের পরিস্ফুরণ—সজীবতার বিকাশ, অন্য কোন পদ্ধতিক্রমে সম্ভবপর নহে। জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিতে হইলে, বলিতে বাধ্য হইব যে, যে সকল অবস্থায় জীবকে অন্যের কোন অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, সে সকল অবস্থা অস্বাভাবিক বা উদ্ভট। কারণ ব্যষ্টি বা ব্যক্তির শক্তিসঞ্চয়ের বা শক্তিপ্রয়োগের যে লিপ্সা প্রকৃতিগত—মজ্জাগত, তাহা যখন ব্যাহত হয়, বা বাধা পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যাঘাত সংহতির প্রবলতর শক্তির দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে; একের প্রভাব সমষ্টির প্রভাবের দ্বারা পরাজিত বা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই হেতু শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলি বিরাট সংহতি সৃষ্টির জন্য নষ্ট করিতে হয়। সুতরাং অন্যের অধিকার, যাহা অবস্থাগতিকে বাধা বলিয়া মান্য হইয়াছে, তাহা তাহার সহজাত বা নিত্যকালের বলিয়া মনে করা ঠিক নহে, জীবতত্ত্বের অনুকূল নহে। তোমার ক্ষমতা বা অধিকারকে আপাততঃ আঁটিয়া উঠিতে পারি না বলিয়াই আপোষের হিসাবে কিছুদিনের জন্য তাহাকে মানিয়া চলি। চিরকাল যে মানিয়া চলিব, এমন কোন কথা নাই। আমি যখন বুঝিব যে, আমি তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী

হইয়াছি, তখন তোমার অধিকার মান্য করিব না, প্রয়োজন হয় ত তোমাকে আমার অধীন করিয়া লইব। ইহাই জীবতত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত, ইহাই প্রাণী-জগতের সার সত্য। যে এই সত্য সিদ্ধান্তের অনুকূল সাধনা করিয়া শক্তিশালী হইতে পারিবে সেই বাঁচিবে. যে ইহার বিপরীত আচরণ করিবে সেই মরিবে।

নীজ্‌শ্‌ খৃষ্টান ধর্ম্মের সন্নীতিসকলকে slave-morality বা গোলামের ধর্ম্ম বলেন। ক্ষমা দুর্ব্বলতার নাম মাত্র। তিনি বলেন কার্য্যের কেবল ফলাফল দেখিয়া তাহার ভালমন্দের বিচার করিতে হয়। কার্য্যের সূচনা দেখিয়া তাহাকে পাপজ কি পুণ্যাত্মক বলা, নানা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পরে, গত দশ হাজার বৎসর সংসারে প্রচলিত হইয়াছে। ইহা জীবতত্ত্বের বিরোধী। স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহাও নিজ্‌শ্‌ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"What is Freedom? The will to be responsible for oneself. The will to keep one's distance. The will to become indifferent to hardship, severity, privation, to life itself. The will to sacrifice men to one's cause—and oneself too. Freedom implies that the manly instincts which delight in war and victory, have domain over all other instincts—including the instinct to be "happy" * * * * The free man is a warrior! How is freedom to be measured in individuals, as well as in nations? By the resistance which has to be overcome, by the effort which it costs to preserve autonomy."

স্বাধীনতা কাহাকে বলে? নিজের কাছে নিজের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার মানস-চেষ্টা; অর্থাৎ আমি যাহা করিব তাহার জন্য অন্য কাহারও কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, এমন অবস্থা! স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস, অর্থাৎ আমি গাদার মানুষ নহি, ভেড়ার পালের একজন নহি, আমি স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্ত। কষ্ট, দুঃখ, অভাব

কাঠিন্য—এমন কি জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা ; অর্থাৎ যে কষ্টে টলে না, দুঃখে বিচলিত হয় না, অভাবে অস্থির হয় না, কঠোর দুর্দ্দশায় আত্মহারা হয় না—এমন কি মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখিলে বিভ্রান্ত হয় না, সেই স্বাধীন। যে হেলায় উদ্দেশ্যসাধন জন্য শত শত মনুষ্যকে বলিদান করিতে পারে, সেই সঙ্গে নিজের জীবনকেও বিলাইয়া দিতে পারে সেই স্বাধীন। যে পুরুষকারের সংস্কার যুদ্ধে এবং জিগীষায় উন্মেষ লাভ করে, সেই সংস্কার যখন অন্য সকল দেহগত সংস্কারের উপর প্রাধান্য লাভ করে, এমন কি সুখী হইবার—আনন্দ উপভোগের বৃত্তিকেও প্রশমিত রাখিতে পারে, সেই পুরুষকারই স্বাধীনতার দ্যোতক। স্বাধীন পুরুষ সদাই যোদ্ধা—অহরহই যুযুৎসু। ব্যক্তিবিশেষে এবং জাতিবিশেষের মধ্যে কতটা স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে তাহার যাচাই করিবে কেমন করিয়া ? ব্যষ্টি এবং সমষ্টির স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য, স্বায়ত্ত শাসনের অবাধ গতি প্রশস্ত রাখিবার জন্য যে যতটা বাধা উত্তীর্ণ হইতে পারে, যে যতটা প্রয়াস প্রয়োগ করিতে পারে, সে ততটা স্বাধীন।

ইহাই স্থূলতঃ নিজ্‌শের মূল সূত্র। নিজ্‌শ্‌ জীবতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনটাই মিথ্যা নহে। কিন্তু নিজ্‌শ্‌ আত্মশক্তির কোন বিচার করেন নাই। যে সকল শক্তির দ্বারা জীবদেহের উত্তরোত্তর উন্মেষ ঘটে, নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, সে সকল স্থূলশক্তির আলোচনা নিজ্‌শ্‌ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থূলশক্তির অন্তরালে যে আত্মশক্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, বামনে চাঁদ ধরিতে পারে, পথের ভিখারী সম্রাট্‌ হইতে পারে, সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী আত্মাশক্তির কোন হিসাব, কোন খবর নিজ্‌শ্‌ লইতে পারেন নাই। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির হিসাব-নিকাশের অতীত আর একটা সর্ব্বব্যাপিনী ধী-বুদ্ধি-মেধা-মনীষা-প্রতিভা যে নিত্য বিরাজ করিতেছে তাহা নিজ্‌শ্‌ ধরিতে পারেন নাই। মুরারেস্তৃতীয়ঃ

পন্থা—তোমার-আমার বুদ্ধিবিবেচনার অতীত আর একটা যে তৃতীয় পন্থা আছে বা থাকিতে পারে, তাহা নিজ্‌শ্‌ ভাবিতে পারেন নাই। মানুষ ত কেবল বুদ্ধিজীবী নহে, কেবল সায়ান্সের গণ্ডীর ভিতরে মানুষের মনুষ্যত্ব মাপিয়া পাওয়া যায় না। ধী-বুদ্ধি-মেধা-মনীষা ছাড়া মানুষের আসক্তি-অনুভূতি-প্রবৃত্তি সকল আছে, মানুষের মধ্যে কত লুপ্ত, কত সম্মূঢ়শক্তি সমাহৃত রহিয়াছে। কখন্ যে কোন্‌টা ফুটিয়া উঠে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই হিসাবে নিজ্‌শ্‌ যে ফিলজফি (Philosophy) বা শক্তিবাদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নাস্তিকের শক্তিবাদ, জড়শক্তির ফিলজফি। কিন্তু এই শক্তিবাদের উপর বর্ত্তমান ইউরোপের গতি-তত্ত্ব বা Progress প্রতিষ্ঠাপিত। এই শক্তিবাদের প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা ইউরোপের বর্ত্তমান অতিভীষণ মহারণে আরব্ধ হইয়াছে। মনে হয়, এই অগ্নি-পরীক্ষায় ইউরোপের গতিতত্ত্ব বা শক্তিবাদ টিকিবে না। কারণ, আমাদের পুরাণ কার্ত্ত্য-বীর্য্যার্জ্জুনের সময় হইতে, পরশুরামের উদ্ভবের কাল হইতে বৌদ্ধ-যুগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে দেখাইয়াছেন, এবং যুগে-যুগে শক্তি-তান্ত্রিকদিগের উত্থান-পতনের ইতিহাস কথা শুনাইয়া, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্য-কশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, যাদব—কৌরবগণের নাশের সমাচার শুনাইয়া বুঝাইয়াছেন যে, এমন জড়শক্তির উন্মেষ, এমন অহমিকার বিকাশ চূর্ণ হয়ই,—একেবারে সঙ্কোচ লাভ করেই। কেবল ক্ষমতায়, কেবল ঐশ্বর্য্যে, কেবল অপরাজেয় শক্তির বাহ্বাস্ফোটে মানুষ চিরদিন তুষ্ট থাকিতে পারেনা। বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য-ক্ষমতা-বৈভব-অহমিকা-দর্প-দম্ভ ছাড়া মানুষ আরও কিছু চায়। সে পিপাসা ধন-দৌলতে মিটে না, সে পিপাসা জগৎকে লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিলে পরিতৃপ্ত হয় না, সে পিপাসা জগতের—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবীকে রাক্ষসের মত গ্রাস করিলে উপশান্ত হয় না। কেবল ইহাই নহে; বিধাতার বিধানে সে পিপাসা অব্যাহত থাকিতে পারে না। অতিক্ষুদ্রের ভিতর হইতে এমন শক্তির উদ্ভব হয় যে,

তাহার প্রভাবে পিপাসার্ত্ত প্রবল শক্তিশালীকেও ধূলায় লুটাইতে হয়। একা জামদগ্ন্য পরশুরাম একবিংশতি বার ধরাধামকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিল; জীর্ণ-শীর্ণ দধীচির অস্থি হইতে বজ্রের নির্ম্মাণ হইয়াছিল; নরবানরে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল;—সামান্য, ক্ষুদ্র বেলজিয়মের বীরত্বে জর্ম্মণজাতির অব্যাহত গতি ব্যাহত হইয়াছে; ক্ষুদ্র সর্বিয়া অষ্ট্রীয়াকে চূর্ণ করিয়াছে। ইতিহাসের পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে এই নিত্যসত্যই বিঘোষিত হইতেছে—"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং; যৎকৃপাত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

আমাদের শাস্ত্র বলেন, বিশেষতঃ পুরাণ একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, জগতের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমনই জড়শক্তি সাধকের উদ্ভব হইবেই—এমনই যাদব, কৌরব, জর্ম্মণ জাতির প্রাবল্য ঘটিবেই। তখন যাহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিব, তাহাই স্থিতি—তাহাই Conservation। কেবল ইহাই নহে; আস্তিক জাতিসকলও শক্তি ও সামর্থ্যের আস্বাদ পাইলে ধীরে ধীরে বিলাসের পঙ্কেতে ডুবিতে থাকে, তখন তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে স্থিতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মসিয়ে রেণান্ ইহুদীজাতির ইতিহাস লিখিতে যাইয়া এই স্থিতির আলোচনা ভাল রকমে করিয়াছেন। নিজ্‌শ্ ইহুদীদের কথায় বলিয়াছেন—

The Jews will either become the masters of Europe or lose Europe as they once lost Egypt. And it seems to be improbable that they will lose again. * * * * The Jews have hid their bravery under the cloak of submissiveness; their heroism in facing contempt surpasses that of the saints.

অর্থাৎ ইহুদীগণ হয় পরে ইউরোপের রাজা হইবে, নহিলে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইবে, যেমন পূর্ব্বে মিশরদেশ হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মতিগতি দেখিয়া

মনে হয় যে এবার আর তাহারা হারিবে না। গত দুই হাজার বৎসরকাল তাহারা যে অপমান, যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে—স্বীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে; তাহাতে ত মনে হয় না তাহারা আর পতিত ও পদদলিত হইবে। তাহারা তাহাদের মজ্জাগত সাহস ও তেজস্বিতা আনুগত্যের ও গোলামীর আবরণে বেশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অন্যের ঘৃণা এবং উপেক্ষাকে তাহারা যেরূপ বীরত্বের সহিত সহ্য করিতে পারে, তেমন বীরত্বব্যঞ্জক সহিষ্ণুতা বুঝিবা সিদ্ধসাধকে—সাধু-সন্তে নাই।

এই সহিষ্ণুতাই স্থিতির নামান্তর। রেণান্ এই অপূর্ব্ব এবং অদ্বিতীয় সহিষ্ণুতার বিশ্লেষণ করিয়া স্থিতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল অবস্থাতে বাঁচিয়া থাকাই—স্বীয় বিশিষ্টতাসমেত হইয়া বাঁচিয়া থাকাই একটা বড় পুরুষকার। যে বাঁচিতে জানে সে বড় হইতেও জানে। ইহুদী বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকিবে, সুতরাং পরে আবার বড় হইবে। নিজ্‌শ্‌ এ সিদ্ধান্তটা অস্বীকার করেন না। তাই তিনি বলেন, মানুষ তুমি বাঁচিতে শিখ; তুমি বাঁচিয়া থাকিলে অতিমানুষের (super-man) উদ্ভব সম্ভবপর হইবে। এই জন্য তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

Man is a rope connecting animal and super-man—a rope over a precipice.

The greatness of man lies in this : that he is a bridge and not a goal. The thing that can be loved in man is this : that he is a transition and an exit.

অর্থাৎ পশু এবং অতিমানুষের মধ্যে মানুষ যেন একটা দড়া—সে দড়া যেন একটা কাছাড়ের উপর টানিয়া বাঁধা আছে।

মানুষের মহত্ব ইহাতেই—সে সাঁকো মাত্র—উপায় মাত্র সিদ্ধি নহে, সাধনার ধন নহে। মানুষের মধ্যে ভালবাসিবার এইটুকুই আছে যে সে একটা বিবর্ত্তন মাত্র—একটা নিষ্ক্রমণ—পরিণতি নহে।

স্থিতি-তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, অতিমানুষ বা অবতারের সম্ভাবনার বিচার করিতে যাইয়া, নিজ্‌শ্‌ এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন। ইহার বাড়া কিছু বলিতে পারেন নাই। তিনি আর একপদ অগ্রসর হইলে নাস্তিকতা বর্জ্জন করিয়া আস্তিক-পরমাত্মাবাদী হইতে পারিতেন। মনে হয়, খৃষ্টান ধর্ম্মের জমীর উপর তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদের আস্তিকতা ঠিকমত ফুটিয়া উঠে না। এই যুদ্ধে জর্ম্মণী বা জর্ম্মণ জাতি পরাজিত হইলে হয় ত বা জর্ম্মণ শক্তিবাদের মধ্যে আস্তিকতা ফুটিয়া উঠিবে। কথায় আছে—শিখেছ কোথায়? না—ঠেকেছি—ঠকেছি যথায়! না ঠেকিলে, না ঠকিলে আস্তিক্য শিক্ষা মজ্জাগত হয় না। পড়া পাখীর বোল ত শিক্ষা নহে।

গতি ও স্থিতির যতদূর সম্ভব বিশদ ব্যাখ্যা বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে আমি চেষ্টা পাইয়াছি। গতি স্থিতির বিপরীত ব্যাপার; স্থিতিও গতির বিরোধী। সুতরাং ভারতবর্ষের স্থিতির আদর্শ, ইউরোপের গতির আদর্শের পূর্ণ বিরোধী; উভয়ের মধ্যে আপোষ হয় না, একটা সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করা যায় না। কারণ আদর্শের বিরোধ থাকিলে, একপক্ষকে আদর্শ পরিহার করিতেই হইবে, নহিলে অপর পক্ষের সহিত মিশিতে-মিলিতে পারা যাইবে না। গতির চূড়ান্ত করিয়া নিজ্‌শ্‌ যে ফিলজফি বা দর্শনসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার সাধনায় জর্ম্মণজাতি গত চল্লিশ বৎসরকাল একনিষ্ঠ হইয়া কাটাইয়াছেন, সেই গতি-তত্ত্বের ও শক্তিবাদের পরীক্ষা চলিতেছে। এ পরীক্ষার কাল শেষ না হইলে এখনও বলা যায় না কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। মনে হয় দুইটাই সত্য ও স্বাভাবিক; জাতির অবস্থাবিশেষে যেটা যখন উপযোগী হয়, তখন সেই আদর্শটাকেই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়। যে জাতি নূতন উঠিতেছে, নূতন ঘর-সংসার পাতাইয়া, দশজনের একজন হইয়া বসিতেছে, সে জাতির পক্ষে গতি বা Progress, development অথবা evolution উপযোগী। যে জাতির সমাজ-শরীরে প্রৌঢ়তার

ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, সে জাতি স্বতঃএব স্থিতির দিকে অগ্রসর হইবে। কারণ, সেই জাতিই বুঝিতে পারে যে, লীলাময়ী প্রকৃতির নিত্য পরিবর্ত্তনের ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে একটা স্থিতির ভাব, একটা অপরিবর্ত্তনীয় সত্বার ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে। এইটুকু বুঝিলেই স্থিতির দিকে প্রাণ টানিবেই, অনিত্য ছাড়িয়া নিত্য পদার্থের অন্বেষণে সাধ হইবে।

তন্ত্র কিন্তু এক হিসাবে কথাটাকে ঠিক বলেন না। মানুষ অমর হইতে চাহে, নিজে না পারে পুত্রপৌত্রাদির সাহায্যে স্বীয় বিশিষ্টতাকে অমর করিয়া রাখিতে চাহে। এই লিপ্সা হইতেই স্থিতিশীলতার উদ্ভব। সুতরাং স্থিতি স্বাভাবিক এবং সকলের সেব্য। যে বালক বা উদ্ধত যুবক মরণভয় জানে না, মৃত্যুর সম্মুখীন হয় নাই, সেই গতি ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে, নিত্য নূতন রসাস্বাদনে ভরপূর থাকিতে চাহে। উহা স্বাভাবিক নহে, সহজ নহে, ক্ষণেকের উন্মত্ততা মাত্র। জীবসৃষ্টির মধ্যে স্থিতিশীলতাই প্রবল, স্থিতিই সর্ব্বব্যাপী; গতি বা উন্নতি ক্ষণেকের চটক্ মাত্র। স্থিতির পেষণে গতি টিকিতেই পারে না, গতি বা উন্নতিকে পরাজিত হইতেই হয়।

এই সকল সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া শেষে বুঝিতে হইবে যে, আমরা ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসী ভারতবর্ষের স্থিতির আদর্শকে পরিহার করিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি। এই মূল আদর্শ পরিহারের হেতু আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতার কতটা অপচিত হইয়াছে, সেজন্য আমাদের সংহতি-শক্তির হ্রাসই বা কতটুকু হইয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও ভাবিতে হইবে যে Nation-building বা জাতিসৃষ্টি কতকটা স্বভাবের নিয়মবলে হয়। অথবা মানুষ কি স্বীয় মনীষাপ্রভাবে একটা নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে পারে? এই সকল প্রশ্নের বিচার, গোড়ায় গোটাকয়েক সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধির ন্যায় গ্রাহ্য না করিলে, সম্ভবপর নহে বলিয়াই, গতি এবং স্থিতির সম্বন্ধে এত কথা কহিতে হইল। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধ-ধর্ম

[৭]

মহাযান কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জ্জুনই মহাযানমত চালাইয়া দেন। তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। তিনিই পাতাল হইতে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্য্যদেব এই মত চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীনেরা বলে "আর্য্যদেব অধ্যাত্ম-বিদ্যার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন"। এই দুইজনই মহাযানের আদি-গুরু। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ব হইতেই মহাযানমত চলিতেছিল। নাগার্জ্জুনের দুই পুরুষ পূর্ব্বে অশ্বঘোষ 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযানমতে ভরপূর। 'শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' তর্জ্জমা করিতে করিতে জাপানী পণ্ডিত সুজুকী বলিয়াছেন অশ্বঘোষেরও পূর্ব্বে মহাযানমত চলিত। 'লঙ্কা-বতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন।

বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা, বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাৎ হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল। বারটার পর কেহ আহার করিবে না। তাহারা বলিত এক আধ ঘণ্টা পরে খাইলে দোষ কি? বুদ্ধদেব ভিক্ষু-দিগকে কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না। তাহারা বলিত শিংএর

ভিতর যদি একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে। এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবিরের দল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুইদল হইল,—স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। একে ত মহাসাঙ্ঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল। অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কি হইল? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশী কড়া হইতে লাগিল। দুইদলে যে আর কখনও মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজার সময়ে পাটলিপুত্রে যে মহাসভা হয়, তাহাতে মহাসাঙ্ঘিকেরা কেহই স্থান পায় নাই। সকল বৌদ্ধেরা সে সভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে। মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানদিগের মতে সে সভার কোন অস্তিত্বই নাই। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকপরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ

চলিয়া যায় ও এখনও চলিতেছে। মগধ ও বাঙ্গালায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পঞ্জাবে মহাসাঙ্ঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানতঃ দুই শাখা হয়,—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুইভাগ হয়,—'সর্ব্বত্থবাদী' ও 'ধর্ম্মগুপ্তিক'। সর্ব্বত্থবাদ ক্রমে কশ্যপীয়, সংকান্তিক, ও সুত্তবাদ হইয়া যায়। 'বজ্জিপুত্তকদের চারি শাখা হয়,—'ধম্মত্থানীয়' 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও সম্মতীয়।

মহাসাঙ্ঘিকদিগের দুই দল হয়,—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়,—'পণ্ণত্থিবাদ', 'বাহুলিক' ও চেতিয়বাদ। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়,—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধত্থক', 'পূর্ব্বশেলিয়' 'অপরশেলিয়', 'বাজিরীয়'। কিন্তু কি লইয়া যে এই সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

এইসকল ভিন্নশাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ছিল। বিবাদ বিসম্বাদ হইলেই লোকে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেই সামবেদী শুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহারা বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তিন চারিবার বৌদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও অনেক বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। অশোকরাজা ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের রাগ যে বেশী ছিল, তাহা

অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলেই বুঝা যায় স্থবিরবাদীরাই পুষ্যমিত্রের কোপে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদেরই উপর তাঁহার অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যমিত্রের রাজধানীর নিকট বাস করিতেন। মহাসাঙ্ঘিকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে পঞ্জাব প্রভৃতি যবনদিগের রাজ্যে পড়িয়াছিলেন। একে ত নানাশাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা-আপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—পুষ্যমিত্রের নির্যাতনে তাহাদের দুর্ব্বলতা আরও বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাঙ্ঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য্য হইতে প্রায় দুইশত বৎসর লাগিয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাঙ্ঘিকেরা কণিষ্ক রাজার সময় জলন্ধরে একটি মহাসভা করে। সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড় স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্ম্মমত স্থির করিয়া লন। অনেকে বলেন এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহারা বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কণিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই মহাযানমতের পোষক ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সভারই মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাঙ্ঘিকেরাও বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। মহাসাঙ্ঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাঙ্ঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক মতের পক্ষ-

পাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই,—করুণাবাদের ত নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু 'মহাসাঙ্ঘিক' হইতে মহাযানমতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিবার যো নাই, কারণ মহাসাঙ্ঘিকদিগের একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে;—সেখানি "মহাবস্তু অবদান"। বইখানিতে লেখা আছে "আর্য্য-মহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন" অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাঙ্ঘিকদিগের এই পুস্তক। এইখানি যে কি ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে ভাষায় 'ললিতবিস্তারের' অধ্যায়ের শেষের গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের' গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্ন-সঞ্চয় গাথা' লেখা, এও সেই ভাষায়। মথুরার ছোট ছোট শিলা-লেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় নাসিক, কার্লি, প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন 'গাথাভাষা'। সিনার সাহেব এ ভাষার নাম দিয়াছেন (mixed Sanskrit) মিক্সড্ সংস্কৃত। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারইজড্ সংস্কৃত (vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যান্স্ক্রি-টাইজড্ ভারনাকুলার (Sanskritized vernacular),—যেমন আমাদের পণ্ডিতী বাঙ্গলা। কাব্যাদর্শকার ভারতবর্ষে চারিভাষার উল্লেখ করিয়াছেন,—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র, কিন্তু তিনি মিশ্র-ভাষার উদাহরণ দিয়াছেন "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং"। তাঁহার এ উদা-

হরণটি ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়া সাহিত্যের উদাহরণ দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন একটি প্রাচীন কারিকায় ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় মিশ্র ভাষা চলিত না, তাই 'মিশ্রস্তু নাটকাদিকং' বলিয়া একটা যা তা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা বাস্তবিকই মিশ্রভাষা। এ ভাষায় 'বাস্তু' 'বস্তু' হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' 'কপিলবস্তু' লেখা আছে। এরূপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়া ফেলা বাঙ্গলায় বিরল নহে,—যেমন আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় 'সমভিব্যাহার' শব্দ 'সমিভ্যার' হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

মহাসাঙ্ঘিক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহা জানার এই একখানি বই আর পুস্তক নাই। কণিষ্কের সময় যে সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনও পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। শুনিয়াছি সক্‌ডিয়ানায় মহাসাঙ্ঘিকদিগের এক শাখা চলিত,—শুনিয়াছি মধ্য এসিয়ায় মহাসাঙ্ঘিকদিগের আর এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারও কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। 'মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। মহাবস্তু অবদানে দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও কথা আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ত্ববাদ সামান্যভাবে আছে। অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দে আছে, তোমার নিজের উদ্ধার হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিও না, পরকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার কর ইত্যাদি। এ সকলেই আমরা মহাযানমতের মূল দেখিতে পাইতেছি। লঙ্কাবতারে কথা তুলিয়াছে 'তথাগত' কি অবিনশ্বর ?

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জ্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে বুদ্ধদেবের পর কোন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি "ভগবদ্গীতা" রচনা করেন। ভগবদ্গীতার মত মহাসাঙ্ঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে। একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার এবং সে বাজে কথা কহার দরুণ কেহ যেন কিছু মনে না করেন।

নেপালীরা বলে ধর্ম্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম্ম দুরকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম্ম,—(১) দেবভাজু (২) গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা কর, না হয় গুরুকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুইই গুভাজু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোন দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব ? বরঞ্চ হীনযানে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে বলে, কিন্তু মহাযানে সেটুকু বড় দেখা যায় না। একজন আচার্য্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত "মহাশয়, আমার এখনও সময় হয় নাই"। কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য্য মহাশয় আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি।" আচার্য্য বলিলেন, "কিসে

এমন হইল ?” সে বলিল, “এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি।” আচার্য্য বলিলেন, “তবে ঠিকই হইয়াছে।” ইহার উপরেও কি বলিব, যে মহাযান হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য মাত্র। তবে এক কথা,—একদেশে যদি দুই তিন ধর্ম্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়। আমাদের দেখাদেখি ভদ্রঘরের মুসলমানের মেয়েরা বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি আমরাও পীরের শিরণী দিই। ফিরিঙ্গীরা কালীর কাছে মানত করে। এই মানতের দৌলতে কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটে ফিরিঙ্গীকালীর মন্দিরে মার্ব্বেলের মেজে হইয়া গিয়াছে। এসকল গৃহস্থের মধ্যে চলিতে পারে; কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের কর্ত্তা তাদের ভিতর এসব করিলে চলে না। তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মের মত ঠিক মানিয়া চলিতে হয়, নহিলে গৃহস্থেরা তাহাকে মানিবে কেন?—তাহার কথাই বা শুনিবে কেন?

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরী আছে। যতদিন মহাসাঙ্ঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড় দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোন বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? আমার বোধ হয় মহাযান-ধর্ম্মের উদারতাই ইহার কারণ। জগৎ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে প্রকারই করুক না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বই ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ কেন? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা

কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন ?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত উহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্ম্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হাসির দাম

[কথা-নাট্য]

প্রথম দৃশ্য ।

[চন্দনার বাসগৃহ…পথের উপরেই রোয়াক, রোয়াকের ধারে জানালা…জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে…পথে সারি সারি লোক চলিতেছে—বৃদ্ধ বালক অপেক্ষা প্রৌঢ় ও যুবার দলই বেশী…তাহার মধ্যে কেহ কেহ সেই জানালার দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে…কেহবা ইঙ্গিতে রহস্য করিয়া চোখ ঠারিয়া চন্দনার পানে হাসিয়া চাহিতেছে। চন্দনা দেখিতে অনিন্দ্যা সুন্দরী…কিন্তু রোগ-ক্লিষ্টা, মুখে চোখে কালি পড়িয়া গেছে…চন্দনা কাঁদ কাঁদ মুখে জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল…বসিয়া পড়িয়া নিজের পেট টিপিয়া ধরিতে লাগিল…চন্দনা একবার করিয়া অঞ্চলকোণে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছে, আর একবার করিয়া পথের দিকে তাকাইয়া ঠোঁটের হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। একটি ছোট ছেলে মলিন বস্ত্র-পরা একটি অন্ধ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়াছে…]

চন্দনা। (পেট টিপিতে টিপিতে) মাগো তুই কোথায় মা—মাগো… আর যে হাস্‌তে পারিনে মা—উঃ…

(অন্ধের হাত ধরিয়া বালকটি সেই জানালার ধারে আসিয়া হাত পাতিল ও চন্দনার মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল)…

বালক। বাবা…এই কাণার হাতে একটি পয়সা দাও বাবা…বাবা! নারায়ণ তোমার মঙ্গল কর্‌বেন; আপনি অন্ধকে দেখ্‌লে নারায়ণ আপনাকে দেখ্‌বেন।

চন্দনা। আমার কাছে ত কিছু নেই…আমার ত একটি পয়সাও দেয় না—(কাঁদ কাঁদ ভাবে) আমি কোথা॰ পাব…ওহো দাঁড়াও

দাঁড়াও—সে দিন একটা পয়সা সেই কে ফেলে রেখেছিল .. আমি কুড়িয়ে গদির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলাম... দাঁড়াও...দাঁড়াও...দেখি.. আমি এনে দিচ্ছি...এই নাও বাবা...

(তাড়াতাড়ি পয়সা আনিয়া বালকের হস্তে দিল...বালক সেই অন্ধের হাতে পয়সাটি দিল; অন্ধকারে স্পষ্ট করিয়া চন্ননার মুখ দেখিতে পাইল না...শুধু যেন কেমন চম্‌কাইয়া উঠিল)...

বালক। জয় হোক্ রাণী মা,...জয় হোক্...

চন্ননা। এটি কি তোমার ছেলে বাবা...(অন্ধ মাথা তুলিয়া... সর্ব্বাঙ্গ নাড়িয়া...লাটিটা ঠুকিয়া—চম্‌কাইয়া কাঁপিয়া উঠিল)...

অন্ধ। আঁ এ্যাঁ...কে কে...জয় হোক্ মা জয় হোক্...

(অন্ধ ও বালক চলিয়া গেল)...

(দূরে নেপথ্যে শোনা গেল..."বাবা এই কাণার হাতে একটি পয়সা দাও বাবা...বাবা! নারায়ণ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন...আপনি এক-গুণ দিলে নারায়ণ আপনাকে দশগুণ দেবেন"—)

চন্ননা। (কাঁদিতে কাঁদিতে পেট টিপিতে লাগিল)...উঃ! বাবা, বাবা, আর যে যাতনা সইতে পারিনে মা...

[চন্ননা 'বাবা'...'বাবা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল]

(চন্ননার বাড়ীওয়ালী বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। অ গতরখাগি! আমার আড়াই শ টাকা গুণে দে...তারপর খুব কাঁদিস্—বটে আমার পয়সা বুঝি গতরের নয়—মার্‌ব মুড়ো খেংরা...আ মর্ মুখ দেখ না যেন তোল হাঁড়ী—যেন তিনটে ঝিঁক্ উঠেছে। হাস্ বল্‌ছি হাস্...অত ক'রে শিখিয়ে দিই, চোখ ট্যার্‌ছা করে ঘুরিয়ে তাকাবি, ঠোঁটে একটু হাসি টেনে হাসি হাসি মুখ করে রাখ্‌বি। তাকাবি এম্‌নি করে যেন তাকান না বুঝতে পারে, তাকিয়েই অম্‌নি একটু হেসে চোখ ফিরিয়ে মুচ্‌কে হাস্‌বি...তা নয়, কেবলই পেট টিপ্‌ছে

...আ মর্ মার্ব পেটে এক লাথি . হাস্ বল্ছি হাস্...আ মর্ মুখে যেন নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে। হাস্ বল্ছি হাস্...

(চন্দনা জড়সড় হইয়া বুকের কাপড় একটু সরাইল, আর জোর করিয়া মুখ হাঁ করিয়া হাসিতে চেষ্টা করিল)

চন্দনা। এই যে (হাসিয়া) মা...এই যে আমি হাস্ছি ত...মের না মা এই আমি হাস্ছি...

বিরাজ। হ্যাঁ অম্নি করে বোস্...আজ রাত্তির দুটোই বাজুক আর চারটেই বাজুক, এখন বারটা। দশ টাকা আজ রাতে চাই ..মনে যেন থাকে...বুঝ্লি গতরখাগি ? নইলে আজ আর ভাত দেব না...মনে যেন থাকে আ মর্ গতরে যেন শুঁয়োপোকা ধরেছে !

(বিরজা ঝঙ্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিল...নেপথ্যে..."রাম-কিষণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিল)—"লোক এলে আমায় ডাকিস্... বুঝ্লি—নইলে দেখ্বি"...

চন্দনা। (জানালার গরাদে ধরিয়া টানিতে লাগিল)...ভেঙে বেরিয়ে যাব, ছুটে পালাব...উঃ এ লোহা যে ভাঙা যায় না গো... মা...মা...নারায়ণ! তুমি মিথ্যে—নেই নেই...চোখ্খেগো সবাইকে দেখ্তে পাও, কেবল আমায় দেখ্তে পাও না... চোখ্খেগো আমায় গঙ্গা নাইতে নিয়ে এসে—এই চোখের মাথা খেয়ে এই গঙ্গায় নাওয়ালে...চোখ্খেগো, তুমি সব দেখ্তে পাও—তুমি ঠাকুর...কেবল আমায় পাও না—আমি কখন এখানে থাক্ব না (চন্দনা নিজের হাত কামড়াইতে লাগিল)। এই হাত দিয়ে হবে না...হবে না ? (আবার হাত কামড়াইতে লাগিল)।

[একটি লোক জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে অতি কুৎসিত...মুখে বসন্তের দাগ, তাহার উপরে আবার ব্রণ ঠেলিয়া উঠিয়াছে...চক্ষু মদ্যপানে রক্তবর্ণ—মাথার চুলগুলো পোড়া কোঁক-

ড়ান, মুখে বর্ম্মা চুরুট ..কর্কশ স্বরে কাশিতেছে]...চম্পনাকে দেখিয়া —বাঃ বাঃ পরীজান ওঃ কেয়া সুরৎ—আরে মেরা জানি—কি মেয়েমানুষ ! বলি—বলি ক্যা সুরৎ (চম্পনা তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল —জানালা হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল) ।

চম্পনা । না আমি পার্‌ব না, আমার অসুখ কর্‌ছে ।

লোক । অসুখ কি চাঁদ...অমন টুক্‌টুকে, দুধে আল্‌তায় ধোয়া... তায়

চম্পনা । না আমি পার্‌ব না ।

লোক । খুব পার্‌বে মাণিক মাইরি, কি ঠোঁট মাইরি, মাইরি, বুকের কাপড়টা একটু সরাও না, উঃ ! মাইরি মাইরি...

(চম্পনা বুকের কাপড় টানিয়া আরো জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল)

চম্পনা । না যাও...যাও...আমি পার্‌ব না ।

লোক । আরে শোন্‌—একটা টাকা দেব, লে শোন্‌—মদ খাবি ?— এই ছাখ্,—বিলিতী—বিলিতী—ধেন নয়—প্যাঁজ চচ্চড়ী আর ধেনো খেয়ে মরিস্, আজ বিলিতী খাবি এখন...

চম্পনা । না-না যাও, আমার অসুখ কর্‌ছে—

লোক । আলবৎ পার্‌বে...জান্‌লায় দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, টাকা নেবে...পার্‌বে না কি—চল্‌,...শালি...চল্‌...(লোকটা হাতের লাঠি দিয়া চম্পনার বুকের কাপড় খোঁচা দিয়া সরাইয়া দিল—চম্পনা—'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল...আর সেই লোকটার গায়ে থুথু দিল) ।

লোক । তবে রে হারামজাদি (লোকটা লাঠি তুলিয়া মারিতে গেল— লাঠিটা জানালার গরাদে লাগিয়া তাহারই কপালে ফিরিয়া আঘাত করিল...লোকটা আরো রাগিয়া উঠিল...এমন সময় বাড়ীওয়ালী বিরজার প্রবেশ)...

বিরজা । কি হয়েছে, কি হয়েছে...

লোক । আমার গায়ে থুথু দিয়েছে—হারামজাদি, আমি আজ মেরেই

ফেল্‌ব...পার্‌বিনি কি.. টাকা দেব...মেরেই ফেল্‌ব...গায়ে থুথু দিয়েছে।

বিরজা। থুথু কি ইচ্ছে করে দিয়েছে বাছা, অসাবধানে গায়ে পড়ে গেছে বাবু—আ মর্‌ হতচ্ছাড়ি চোখের মাথা খেয়েছিস্‌... আহা আমি জল এনে দিচ্ছি...কত টাকা দেবে ?—কুড়ি টাকা দেবে ত বল...

চন্দনা। (স্বগতঃ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া) কখন না—আমি আঁচ্‌ড়ে ছিঁড়ে খাব।

লোক। কুড়ি নয়, দশ টাকা দেব...

চন্দনা। দশে হবে না—অমন সোন্দর—তায় হুঁ অমন ডব্‌কা কাঁচা ...না বাপু...কুড়ির কম হবে না...

লোক। আচ্ছা পনের টাকা দেব।

বিরজা। যাক্‌ আপনার কথাও থাক্‌ আমার কথাও থাক্‌, ষোল টাকা দিন্‌—আসুন...

লোক। এই নাও (টাকা দেওন)। ষোল টাকা নিলে—আচ্ছা...

বিরজা। (টাকা আঁচলে গেরো দিতে দিতে) আসুন,—আপনার দিল মস্ত হ'য়ে যাবে...একেবারে নতুন...(লোকটা ঘরের মধ্যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল) বস্‌রাই গুল্‌ দেখুন দেখি...(চন্দনার মুখ ধরিয়া আদরছলে দেখাইল)।

বিরজা। ওমা—আপনি—রামরাখালবাবু—আগে বল্‌তে হয় ছাই—আপনি বাড়ীর ভেতর আগে এলেই পার্ত্তেন। দেখুন দেখি—ছিঃ ছিঃ একি কষ্ট বাছা, ছ্যা ছ্যা কি ঘেন্না...এ ত ঘরের কথা...আহা ! এ ত ঘরের কথা গা...

রাম। দেখ্‌ছিলুম তোমার পোষা মেনীর ঝাঁজ কত...ওঃ একেবারে ফ্যাঁস্‌—তা দেখ বিরজা, একটু ঝাঁঝাল মেয়েমানুষ আমি ভালবাসি—দুবার ফড়্‌কে দূরে সরে না গেলে রস জমে না ...জান ত'...একটু ঝাল না হলে তরকারী মজে না...

বিরজা। তা যা বলেছেন, আমি ত আর আজকের নই...কত রকমই দেখ্লুম আপনার...

রাম। আচ্ছা কোথা থেকে এ আমদানী কর্লে...

বিরজা। ঘাটাল—ঘাটাল...আর বলেন কেন, মানুষের দুঃখ দেখ্তে পারি নে। কি করি এসে পড়্ল আছে, দুঃখ কষ্ট পাবে, তাই দেখ্তে হয়—এই দুধরে, ছানারে, মিহিদানারে—সিঁদূর পড়ারে—যাতে স্বস্তি হয়—যাতে ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, দু'পয়সা হয়, দু'খানা পরে এই নিয়েই আছি, আর কি করি ...হরি তুমিই সার...আর এম্নি করে যে কটা দিন যায় —ভাব্ছি বামুনবোষ্টম দু'চারজন, আর ভাগবৎ সেবা দেব, কি বলেন? তা গোবিন্দের কৃপা সকলি, তিনি করাচ্ছেন... গোবিন্দ হে!

(রামরাখাল মদের বোতল খুলিয়া গেলাসে ঢালিয়া বিরজাকে দিতে গেল—)

রাম। হয়ে যাক্ পেসাদী—আর কি?

বিরজা। রাম রাম! সেসব দিন আর নেই—তায় হায় রে! আজ আবার হরির তলায় লুট দিতে হবে...মা মাপ্ কর্বেন, —এই যে আয়্না লো, বোস্, রামরাখালবাবুর মত দেল খোলসা ইয়ার আর দুটি নেই। আয় লো, বোস্, লজ্জা কি—(রামরাখালের প্রতি) নতুন কি না, এইসবে দুটো হপ্তা হয়েছে—হ্যাঁ (হাসিয়া) একেবারে তাজা...ফোটা। ...বাবুর নজর খুব উঁচু...

রাম। কি পরীজান এস, টুক্টুকে ঠোঁটে একবার গেলাসটা ছুঁয়ে দাও. হো-হো এস।

চন্দনা। কখন না, আমি আঁচড়ে ছিঁড়ে খাব—কখন না—সরে যাও বল্ছি...যাও।

বিরজা। কি হারামজাদি পার্বি নি কি? খেংরে সিধে কর্ব না—

তোর ভাগ্যি ভাল যে রামরাখালবাবুর তোর ওপর নজর পড়েছে...উনি কি একটা হেঁজি পেঁজি লোক ?

চন্দনা। আমার সাম্‌নে এসোনা বল্‌ছি—আমি কামড়ে ছিঁড়ে দেব ..

বিরজা। তবে রে ..দাঁড়ান্ ত একটু সরে মশায়, আপনি ভাল হয়ে গদির উপরে উঠে বসুন দিকি, আমি ওকে ঢিট কর্‌ছি —এখনি সোজা কর্‌ব এখন—

(বিরজা খেংরা হাতে করিয়া চন্দনাকে মারিতে গেল—রামরাখাল চন্দনার হাত ধরিল—)

চন্দনা। আমি কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে দেব—সরে যাও, সরে যাও,—ছেড়ে দাও——

(চন্দনা রামরাখালবাবুর হাতে কামড় দিল—বিরাজের গালের কাছে কামড় দিল—তাহারাও চীৎকার করিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল—)

বিরজা। তবে রে হারামজাদি...

চন্দনা। ওগো কে আছ আমায় রক্ষে কর গো—ওগো কে আছ গো ...

বিরজা। হারামজাদি ! তুই ঢাট্ হবি নি...দেখি তোর কোন্ বাবা রক্ষে করে...

রাম। হাহা-হাহা (সজোরে হাসিতেছিল)

(অকস্মাৎ পথ হইতে একটি যুবক বেগে প্রবেশ করিয়া রামরাখালের পৃষ্ঠে ও মুখে মুষ্টাঘাত করিল। রামরাখাল 'বাপ্‌রে' বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল—বিরজাকে এক ধাক্কা দিল, বিরজা ছিঠ্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। লোক'টি চন্দনাকে বুকে করিয়া তুলিয়া বিছানায় শয়ন করাইল—চন্দনা তখন হাঁফাইতেছে—)

চন্দনা। এ্যাঁ...এ্যাঁ...কে তুমি ! আমায় বাঁচাও—কে তুমি, আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও !...

বিরজা। কে মশায় ; আপনি কেমনতর নোক্ ? ভারি ভদ্দর ত

দেখ্‌ছি—আমার টাকা মাটি করতে এয়েছেন, জানেন না ও বড় বেয়াড়া মেয়েমানুষ...

লোক। কত টাকা তোমার মাটি হয়েছে বাপু...মারছ কেন আহা!

বিরজা। ত্রিশ টাকা—দেবেন?

লোক। এই নাও (টাকা দেওন), তোমরা একে এমন করে মারছ কেন, আহা!

রাম। তবে আমার ষোল টাকা ফিরিয়ে দাও।

বিরজা। আপনি ত ঘরে বিছানায় বসেছিলেন, মদ খেলেন...আপনার সঙ্গে বসে দুটো কথা ক'য়েছি—আচ্ছা পাঁচটাকা কম নিয়ে যান্‌। কাল একটু সকালে আসবেন, আমি সব ঠিক করে রেখে দেব রামরাখাল বাবু...

রাম। (লোকটার প্রতি তাকাইতে তাকাইতে) আচ্ছা শালা তুম্‌ রহো—

(রামরাখালের প্রস্থান)

বিরজা। কি করি মশায়, কাল সকালে আমার বাড়ী ভাড়া দিতেই হবে। আমার ত আর জমিদারী নেই। একটা ছেলেও নেই যে রোজগার করে এনে খাওয়াবে—দেখুন ও মেয়েটি,—আমার চন্দনা, বড় ভাল মেয়ে, মাঝে মাঝে কেবল গোলমাল করে—ওই দোষ। আপ্‌নি বসুন না। নে বাপু হ্যাঁ সে লোকটা ত গেছে—এ বাবু খুব ভদ্দর—দেখুন লোকটা বড় গুণ্ডা তাই ডরাতে হয়, কি করি বলুন?—মেয়েমানুষ...পাঁচজন নিয়ে কারবার...ভয় ডর করতে হয় বৈ কি?

(বিরজা প্রস্থান করিতে করিতে পিছন ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল)

বিরজা। কে জানে বাপু...দেখ্‌তে যেন আকাশের চাঁদ—উঃ মাইরি—কি রঙ্‌রে—ছুঁড়ী এখন আর কথাটি কয় না। রূপের

মুখে মুড়ো জ্বেলে দিতে ইচ্ছে করে। (স্বগতঃ) কে জানে কেমনতর লোক—সদরে চাবি দিই!

(বিরজার প্রস্থান)

চন্দনা। তুমি কি নারায়ণ! ঠাকুর! তবে তুমি সত্যি শুনতে পাও—তাই এয়েছ বল...আমি বড় দুঃখী ঠাকুর! ঠাকুর!

লোক। (কাঁদিয়া ফেলিল) এখন একটু সুস্থ হয়েছ...

চন্দনা। এ্যাঁ...হ্যাঁ...তুমি আগে কে বল...নারায়ণ নও—বল ঠাকুর আমার সঙ্গে ছলনা কর না—আমি যে বড় দুঃখী, বল বল, আমায় মারবে না। এখানে ত কেউ 'আহা' করে না...

লোক। সত্যি বল্‌ছি আমি মানুষ—নারায়ণ নই, তুমি অমন করছ কেন?...

চন্দনা। তুমি ছলনা কর না—আমি দুঃখী ছেলে-মানুষ, আমার সবে এই সতের বছর বয়স, আমার সঙ্গে ছলনা কর না।

লোক। সত্যি বল্‌ছি চন্দনা, আমার নাম মন্মথ...আমি মানুষ...

চন্দনা। না না, তুমি নারায়ণ, তুমি আমার দুঃখ শুনেছ, তাই ত ছুটে এসেছ। আমার দুঃখের হরি কাঙালের ঠাকুর—আমার সঙ্গে ছলনা কর না।

মন্মথ। চন্দনা সত্যিই বল্‌ছি আমি মানুষ, আমার রক্ত মাংসের শরীর।

চন্দনা। তুমি মানুষ, তুমি মানুষ? অ্যাঁ! তবে কি করে আমার দুঃখ বুঝ্‌তে পারলে?

মন্মথ। মানুষ বলেই ত তোমার দুঃখ বুঝ্‌তে পেরেছি।

চন্দনা। মানুষে কি আমার দুঃখ বুঝ্‌তে পারে—না না তুমি ঠাকুর, তুমি ত মানুষ নও, মানুষে ত আমার দুঃখ বুঝে না...আমি যে মানুষ—মানুষের দুঃখ ত মানুষে বোঝে না...

মন্মথ। না চন্দনা সত্যিই আমি মানুষ...

চন্দনা। তুমি মানুষ? তুমি আমার কাছে হাসি চাইবে না?—বল

আমি যে আর হাস্‌তে পারিনে, তুমি...আমি একটু তবে কাঁদি তুমি কিছু বল্‌বে না, তোমার পায়ের উপর মুখখানি রেখে একটু কাঁদি, তুমি হাসি চাইবে না ত' ?

মন্মথ। না আমি হাসি চাইব না.. কাঁদ অভাগিনী খুব কাঁদ (স্বগতঃ—পথের পানে চাহিয়া)—মন কেন উদ্‌ভ্রান্ত হও, এ ত সে নয়, সে নয়, কেন উন্মত্ত হ'চ্চ ? সেই রূপ, সেই আঁখি সেই স্বর, হায় অভাগিনী ! কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল ! (মন্মথ কাঁদিয়া ফেলিল)।

চন্দনা। ওকি তুমি আমার দুঃখে কাঁদ্‌ছ ! আমার দুঃখে ত কেউ কাঁদে না, সবাই হাসে...সবাই হাসি চায় আর বলে 'হাস্‌' ...আমার দুঃখের ডাক্‌ কি এতদিন পরে তোমার ওখানে পৌঁছল, এতদিন তবে কোথায় ছিলে—আজ তবে কেন কাঁদ্‌ছ, কেঁদনা আমি হাস্‌ব, আমি হাস্‌ছি, তোমার পায়ে পড়ি কেঁদনা, এই আমি হাস্‌ছি... (চন্দনা হাসিতে চেষ্টা করিল) আর আমি কাঁদ্‌ব না। তোমায় যে এত কাছে পাব সে আশা ত আমার কখন স্বপ্নেও আসে নি...আমার দুঃখও যে ভাববার জন্যে আছে, কাঁদে, এ কথা ত আর কখন মনে হয় নি...এতদিন তবে কেন ভুলে ছিলে ঠাকুর ?

মন্মথ। কেন চন্দনা, কেন, আমায় 'ঠাকুর, ঠাকুর' বল্‌ছ ?...

চন্দনা। তবে কি বল্‌ব বল, তুমিই শিখিয়ে দাও কি বলতে হয়, তুমিই তবে বলিয়ে দাও।

মন্মথ। তবে যা ইচ্ছে, আমার নাম ধরে ডাক্‌তে পার।

চন্দনা। তবে অ্যাঁ—মন্‌-মথ মন্‌...মন্‌...মোনা...মোনা বলি, তুমি মোনা না ?—বাঃ...তুমি মোনা, বাঃ তুমি মোনা...তুমি ঠাকুর নয় মানুষ বাঃ...বাঃ...

মন্মথ। হ্যাঁ আমি মোনা, এখন বল...

চন্দনা। কি বল্‌ব, না দেখ, তুমি আমায় গঙ্গা নাইয়ে, বাড়ী দিয়ে

আস্‌বে—উঃ ! না বাড়ীতে ত আর আমায় নেবেনা...আর ওই বাড়ীওয়ালী যেতে দেবে কেন...কি কর্‌ব তুমি বল...

মন্মথ। দেখ চন্দনা আমি যাই এখন (স্বগতঃ) না, বল্‌ব না সে কথা বল্‌ব না, সে ত এ নয়।

চন্দনা। কেন, তুমি আর আস্‌বে না ? আস্‌বে...হ্যাঁ আস্‌বে... আমাকে যে এরা আবার তেম্‌নি কর্‌বে...না না, তুমি যেয়ো...না...না ছিঃ তুমি এখানে থাক্‌তে যাবে কেন ? লোকে কি বল্‌বে ?—কেন লোকে কি বল্‌বে...না যদি বলে...না-না তুমি এসনা...না-না-না লোকে বলুক, তুমি আস্‌বে। লোকে জান্‌লে মেয়েমানুষেরই ক্ষতি, পুরুষের ত কিছু নয়। তাদের কি...তুমি আস্‌বে না ?...পুরুষের কি ?

মন্মথ। দেখ আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে...এখন আমি চল্লুম, আমার মাথা কেমন কর্‌ছে...আমার মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে।

চন্দনা। তুমি আবার আস্‌বে ? না তুমি আস্‌বে...না—এখানে কেউ দু'বার আস্‌তে পায় না—ওকি তুমি অমন কর্‌ছ কেন... তোমার...তোমার...

মন্মথ। (কি বলিতে গিয়া ভয়ে দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইয়া রাগে দুঃখে কম্পিতস্বরে) না-না কিছু হয়নি, কিছু হয়নি... ওঃ তিন বছর পরে কেন তোমার সঙ্গে এমন অবস্থায় এখানে দেখা হল...না না, ভ্রম ভ্রম,...তুমিও ভুল, আমিও ভুল...

(মন্মথ ছুটিয়া ঘর হইতে প্রস্থান করিল...)

(চন্দনা অবাক হইয়া মন্মথের পথের পানে চাহিয়া রহিল...তাহার পর দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ—গ্যাস নিভাইয়া দিয়াছে—ভোরের হাওয়া চলিয়াছে—একজন বৈষ্ণব নাম গান করিতে করিতে চলিয়াছে...

"হরি পতিতজন পাবনম্‌ অধম জনং
(ওহে) তারণম্‌ দেহি মে শ্রীপাদপদ্মে"...

চন্দনা। হে অনাথ নাথ...দীনবন্ধু...শ্রীপাদপদ্মে এ হতভাগীকে স্থান দাও...কিন্তু উঃ...মোনা—মোনা...

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশ ঘোর করিয়া আসিতেছে...কালবৈশাখীর সময়—ধূসর পাটল মেঘের উপর কাল ঘোর নীলাভ মেঘ হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে উঠিয়া আসিতেছে...মন্মথ তাহার ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছে—মন্মথের হাতে একখানি ফটো...মন্মথ উন্মত্তের মত একবার করিয়া সেই ছবির পানে চাহিতেছে আর এক হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শূন্যে ছুঁড়িতেছে...একবার করিয়া সেই চিত্র চুম্বন করিতেছে, একবার করিয়া ঊর্দ্ধে বাহিরের আকাশপানে চাহিয়া বেদনাপরিপ্লুত যাতনায় কাঁদিয়া উঠিতেছে...]

মন্মথ। ছবি! ছবি! তুই জীবন্ত হয়ে বল্ সে নয়...সে নয়...ছবি তুই মূর্ত্তি নিয়ে প্রাণ নিয়ে রক্তমাংসের ভিতর দিয়ে আমার প্রাণের ভাষায় এসে কথা ক'—বল্ সে নয়। উহু সুভা! সুভা! তুমি বেশ্যা...পথের লোকের কাছে তোমার এই দুর্দ্দশা—না-না এ হতেই পারে না...তোমার উদ্ধার চাই...ছবি! কথা কও, জীবন্ত হয়ে বল্, নইলে গুঁড়িয়ে ফেল্‌ব। বল্ তুই সুভা কি না, বল্...বল্...বল্?...তুই সুভা বল্...(চিত্রকে চুম্বন করিল)...বল্...কিন্তু না কি ভুল তুমি ত সুভা নয়, এটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তবু মনকে বোঝাতে পাচ্ছিনি কেন...আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মানুষের সর্ব্বাঙ্গই ঠিক আর একজনের মত হয়, কে জানে আমায় যে অবাক্ করে দিলে! সেই নয় কি...যাকে আজ এত বছর ধরে মনে মনে গড়ে তুল্‌ছি, এত বছর ধরে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বনে বনে খুঁজেছি—সে কি এই না...তার কথার ভাবও এম্‌নি, তার গলার স্বর ত

এম্নি...সেই যেন মনে পড়ে। এম্নি তার চোখ ঢল্‌ঢল্‌, তারও নাক অম্‌নি বাঁশীর মত, তারও ঠোঁট অম্‌নি পলার মত, তারও কটী অম্‌নি ক্ষীণ, তার পায়ের চেটোও অম্‌নি পাতা, অম্‌নি পায়ের নখও লাল, অম্‌নি তাকানি, আমায় সে পাগল করে দিলে, আমায় সে পাগল করে দিলে... উঃ আমি কি কর্‌ব! ওঃ সুভা! সুভা! তুমি কেন এমন হলে, ওঃ সুভা, সুভা, সুভা,...যাই একবার দেখা করে আসিগে, না না সে বেশ্যা—সে তার সেই বরাঙ্গ-বিক্রয় কর্‌ছে, ইচ্ছা করে কি কেউ বেশ্যা হয়—না যাব না, যাব না, উঃ অসহ্য ...অসহ্য...প্রাণ স্থির হও...না না সে বেশ্যা হয়ে গেছে...ইচ্ছা করে কি কেউ দেহ বিক্রয় করে? —না, কিন্তু কার দোষ? সে আমার নয় কি, আমারি দোষ, আমারি দোষ, না—সমাজের...সমাজ-ধর্ম্মে মন বলি দিতে হয়...সমাজ-ধর্ম্মে মানুষ-ধর্ম্মে গোল বেধেছে...সুভা! সুভা! সে আমারি দোষ, আমি তোমায় ত্যাগ করেছি, তাই তুমি বেশ্যা হয়ে পথে দাঁড়িয়ে...না-না কখন নয়, ও ত সুভা নয়, সুভা নয়, মন, উঃ যদি সুভা হয় (নিজের বক্ষে সজোরে আঘাত করিল)—না, যদি সুভা হয় গুলি করব—না— বুকের ভিতর থেকে হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে উপড়ে শকুনিকে ফেলে দেব, যেন মাটিতে সে বুকের রক্ত একটি ফোঁটাও না পড়ে—না-না উঃ (বক্ষে সজোরে আঘাত করিল)। কোথা যাব...না না তাকে উদ্ধার কর্‌তেই হবে, সে যে রুগ্না, সে যে ক্লিষ্টা—সে যে বেঁচে মরে আছে...না তাকে উদ্ধার কর্‌তেই হবে—সে যে অপূর্ণ—তাকে পূর্ণ কর্‌তেই হবে. যাব সুভাকে দেখ্‌ব, সুভাকে দেখ্‌ব, দেখব, দেখ্‌ব। আমার শাস্তি আমি বহন কর্‌ব...না যাব না, না যাব—ওঃ সুভা (বক্ষে সজোরে আঘাত করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল

আর সেই ফটোখানা কুড়াইয়া লইয়া মেঘের অস্পষ্ট আলোকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার পর)—না-না এ ত সেই! যাব না—না সে নয়, তারি মত বুঝি, কিন্তু আমি যে তার মোনা, আমি যে তার ঠাকুর, আমি যে তার দেবতা...আমি যে তার নিয়তি...তাকে গড়ে তুল্‌তেই হবে, সে অপূর্ণকে পূর্ণ কর্‌তেই হবে, সেই ত মানুষের ধর্ম্ম, ফোটানই ত কাজ, সেই মানুষের ধর্ম্ম...সমাজধর্ম্মে তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, মানুষধর্ম্মে তাকে হাতে ধরে তুল্‌ব, যাব—যাব—সুভা...সুভা...না সুভা নয়, চন্দনা—তবু ত সে নারী—আমি পুরুষ, নারীকে পুরুষ রক্ষা কর্‌বে না...তবে সুভা সুভা! যাব, সুভাকে দেখ্‌ব, তারি মানে যে আমার সুভা রয়েছে—যাব সুভা! সুভা!

(বাহিরে তখন ভীষণ জোরে মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল—ঝড়ও গর্জ্জিয়া উঠিয়া বৃক্ষশীর্ষে তুমুল ঝাপ্‌টা মারিতে লাগিল—গাছের ডাল মড়্‌ মড়্‌ করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। দম্‌কা হাওয়ার ঝাপটে কতকগুলা কাক ধাক্কা খাইয়া উড়িতে উড়িতে পড়িয়া যাইতেছে...মুষলধারে বৃষ্টি—তাহার সঙ্গে শিলাপাত হইতে লাগিল। অন্ধকার যেন অন্ধকারের উপর রোল করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে...মন্মথ সেই ফটোখানা হাতে তুলিয়া ধরিয়া অন্ধকারে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে...মাঝে মাঝে যেই বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে আর গৃহের ভিতর চপলার সেই চঞ্চল আলোর দীপ্তি হাসিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে সেই ছবির পানে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে...)

মন্মথ। এই সেই ওঃ ওঃ এই সেই ..

(মন্মথ সেই ছবিখানা হাতের মধ্যে গুঁড়াইয়া ফেলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, দেখিল পশ্চাতে কড়্‌ কড়্‌ করিয়া বজ্র পড়িল, তারপর অন্ধকার ঘন ঘোর!)

তৃতীয় দৃশ্য।

[চন্দনার গৃহের সম্মুখস্থ পথ...রাজপথ জলে জলময়...বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্যাসের লণ্ঠনগুলা বৃষ্টির জলের ধারায় অস্পষ্টভাবে আলো দিতেছে...কোন কোন স্থানে গ্যাস নিভিয়া গেছে...চন্দনার বাড়ীর সম্মুখে রোয়াক ডুবাইয়া জল দাঁড়াইয়াছে...চন্দনা সেই সময় জানালার ধারে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া কপোলের উপর ধারা বহিয়া পড়িতেছে। চন্দনা একবার করিয়া চক্ষু মুছিতেছে আবার চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না...]

চন্দনা। আমার কান্নায় কি সমস্ত আকাশও আজ কাঁদ্‌ছে...তোমরা এতদিন পরে আমার কান্নায় কাঁদ্‌ছ তাই এত জল, চোখের জলে আমি আলো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—চোখের জলে আকাশের তারাও নিভে গেছে...ঠাকুর! তুমি যে আস্‌বে বলে চলে গেলে...তবে আর এলে না কেন? তুমি যখন আসনি তখন সেই বাড়ীর কথা, মা'র কথা, বাবার কথা মনে পড়্‌ত, এখন আবার একি নতুন! একবার করে মন সেই পুরোণ কথা ভাবে আবার নতুনের মুখের পানে চাইতে হয়, এ ত বড় জ্বালা—তিন দিন কি করে এমন করে রইলে বল, কোথায় তুমি, আমি যে আর পারিনে, এস, এস, ওগো এস, আমার যে আর প্রাণ বাঁচে না। এস, এস, আর আমি কাঁদ্‌ব না, আর চোখের জল ত ফেল্‌ব না, তুমি এস...আমি এবার থেকে খুব হাস্‌ব, হাসিতে তোমায় ভরিয়ে দেব, হাসি মাখিয়ে দেব...এস আমার প্রাণের ঠাকুর, আমার জীবনের সর্ব্বস্ব একবার ফিরে এস, আমি যে তোমার জন্যে জেগে কেঁদে তিন দিন তিন রাত কাটালাম...এ আমার আবার নতুন কি হল...বাড়ীর কথাও ভুলে

যাচ্ছি, কেবল মোনা...মোনা...মোনা...এস আমার প্রাণের ঠাকুর! এ আবার আমার নতুন কি হল? তুমি যাবার পর আর বাড়ীওয়ালী আমাকে কিছু বলে নি, বরং আদর করেছে; আবার ঝাঁটা না মার্‌লে কি তুমি ফিরে আস্‌বে না? কই তুমি, এ জীবনে এ কি নতুন ডাক দিলে, আমায় যে পথের পানে টেনে নিয়ে চলেছ—এ আবার কার ডাক্‌ তোমার...তুমি আমায় কি করে গেলে বলে যাও, একবার এসে বলে যাও, তুমি ঠাকুর নয় মানুষ আজ বুঝ্‌তে পারছি...তাই তুমি আর এলে না আমার দুঃখও বুঝ্‌লে না ..কি করি কোথায় যাই...আর যে পারিনে। মোনা...মোনা...নারায়ণ! নারায়ণ! আর যে নারায়ণ বলে ডাক্‌তে সাধ হচ্ছে না...মোনা মোনা...

(তখন বৃষ্টি একটু কমিয়াছে, রাস্তার জল ঠেলিতে ঠেলিতে... চেরাক-বাতি হাতে মুস্কিলাসান ফকির অগ্রসর হইল...মুসলমানের মত গোঁফ ছাঁটা লম্বা দাড়ি তালি দেওয়া লুঙি পরা—)

মুস্কিলা। ইয়া পীর মৌলা মুস্কিলাসান...ইয়া পীর (সুর খুব উচ্চ পর্দ্দায় তুলিয়া) ইয়া পীর...মৌলা মুস্কিল আসান—যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান...

চন্দনা। আজ কদিন ধরে এই মুস্কিলাসানটা এখানে ঘোরে কেন .. কই এই তিন দিনই আমার নতুন মুস্কিল জুটেছে তার ত আসানের কোন উপায় নেই...আমারই জানালার কাছে ঘোরে কেন? .ভাল মুস্কিল ..ও ফকির বাবা এই দিকে এস—এই নাও...

মুস্কিল। পীর সাহেবের দোয়া দিব মা ঠাক্‌রেণ...ছেলেপিলে সব ভাল রাখেন...ইয়া পীর...(একটু অগ্রসর হইয়া, স্বগতঃ)— এই জলে কাদায় কার মুস্কিল আমার মত কাঁদে চেপেছে বাবা...না হায় রে পয়সা...তোর লোভে পড়ে ত...জেলে

তিন তিনবার ঘুরে এলুম . শেষ হিঁদুর ছেলে কলমা পড়ে ফতিমার নাকের বেসর পীরিতের ধোঁকায় মার্‌লুম, এখন এই মুস্কিলাসান সেজে চেরাকবাতি হাতে নিয়ে ঘাট্টে বাট্টে বারাণ্ডার কাপড়খানা চোপড়খানা যা হোক সরান যেত, এ বাবা আবার নতুন লোভে লোভে কোথায় গিয়ে পড়্‌লুম...শালার ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, চেরাকবাতি নিয়ে মুস্কিলাসান করে বেড়াচ্ছি—এদিকে যে বাবা সাত শ মুস্কিল কাছায় বাঁধা, কাছা খুলেও তাকে ফেল্‌তে পারি নি...না কই লোকটা ত আজও দেখা দিলে না, ছুঁড়্‌ডে ত অম্‌নি দাঁড়িয়েই থাকে...এ তিন তিন দিন কেটে গেল বাবা, আর ত এ মুস্কিলাসানী চলে না...শেষটা কি হর্‌তু-কীর লাঠির ঠ্যালায়...জ্যান্ত কলমা পড়া ভোলাবে ? ওহো ফতিমা রে...না শালী কোথায় সট্‌কেছে রে সেই অবধি সট্‌কেছে...ফতিমার পিরীতও এই পয়সার ঠেলায়, বাবা সে ঠেলার নাম বাবাজী ..এখন ঠেলায় পড়ে বাবাজী পীরবক্স মুস্কিলাসান ..কিন্তু এ মুস্কিলাসানীতে আর চল্‌ছে না, এখন কিছু খুঁজে নিতে হবে...ইয়া পীর মৌলা মুস্কিলাসান ..(পুনরায় ফিরিয়া জানালার ধার দিয়া যাইতে যাইতে) জয়নাল ফকিরে বলে পানি মেলে না...ইয়াপীর মৌলানা...(উচ্চৈস্বরে)...মুস্কিলে আসান করুণ গো .. ওই যে জল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে কে আসছে না . সেই ত, সেই না, যা থাকে কপালে বাবা টাকা বড় চিজ্‌ বাবা এই টাকার জন্যে শালার শ্বশুর বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেল মাগের কোল থেকে...ইয়া পীর মৌলা মুস্কিলাসান . .ইজ্জৎ গেল।

চন্দনা। আচ্ছা ও লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে রোজ ? ...লোকটাকে দেখলেই কেমন ভয় করে...ওকি

ওখানে...মুস্কিলাসান যদি তবে রোজ ওইখানে দাঁড়ায় কেন...

মুস্কিল। ইয়া পীর...ইয়া পীর...চলে এস বাবা চলে এস, আজ তোমায় ঠিক নেব—জয়নাল ফকিরে বলে পানি মেলে না ...চলে আয়, আয়, চলে আয়...বেঁচে থাক্ আমার রামরাখালবাবু আজ ঠিক দুপয়সা কামাব...ওই যে এসে পড়্‌ল (জল ঠেলিতে ঠেলিতে মন্মথের প্রবেশ) বেঁচে থাক্ আমার রামরাখালবাবু...

মন্মথ। ওই যে সুভা...সুভা নয় সুভার ছায়া...সুভার কায়া...ওই ত সেই...না না ওযে দুঃখী...ওর দুঃখ মোচন করতেই হবে...সুভা। সুভা! রূপ...রূপ...ওঃ!

মুস্কিল। ইয়া পীর...(চেরাক নিভাইয়া, চাপা গলায়) ইয়া পীর... ইয়া পীর...তাগ শির্ ইয়া পীর...ইয়া পীর...ওঃ কি খাপ-সুরৎ ..অমন হলে কত ফতিমা উঃ...উহুঁ মাইরি ইয়া পীর ..

চন্দনা। (মন্মথকে দেখিতে পাইয়া উল্লাসে হাত বাড়াইয়া) এসেছ ...এসেছ...

(মন্মথ যেমন সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে গেল, মুস্কিলাসান পিছন হইতে সজোরে এক লাঠি মারিল...মন্মথ মুখ থুব্‌ড়াইয়া সেই চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল।)

চন্দনা। ওগো কি হল গো (বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর মুস্কিলাসান "ইয়া পীর" "ইয়া পীর" করিতে করিতে দূরে গিয়া চেরাক জ্বালিয়া এক একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দ্রুত চলিয়া গেল।)

(চন্দনা মন্মথকে কোন রকমে তুলিয়া বুকে করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঘরের মধ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে টানিয়া তুলিল...দেখিল মন্মথের কাঁধ খানিকটা কাটিয়া ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে...ডানদিকের কাঁধ থেঁতো হইয়া গেছে)..

চন্দনা। হে ঠাকুর! হে ঠাকুর! একি করলে...ওমা একি করলে আঃ অ মোনা! অ মোনা! তুমি কেন এলে...ওমা আমি কি করব...মোনা, মোনা, মোনা...

(পার্শ্বের বাড়ীর দ্বিতলে তখন কলকণ্ঠে গান উঠিতেছিল...সারেঙের মধুর সুরে সুর মিশাইয়া নর্ত্তকী গান গাইতেছিল...

ছাড় ছলা, তোমার ও পায়ে ধরি বলনা,
কেন জানাতে এসে প্রেম, কর ফিরে ছলনা—
আমি ত হেসেছি, হেসে ফেলেছি
কি ভুলে এ বিজনে কি মালা গেঁথেছি—
নিভে যে বাতি, আঁধার রাতি
প্রাণ নিয়ে এ খেলা যে চলে না গো চলে না
ছাড় ছলা, তোমার ও পায়ে ধরি বলনা,
কেন জানাতে এসে প্রেম, কর ফিরে ছলনা।

—চন্দনা শীতল জলে সেই ক্ষত ধৌত করিতে লাগিল ও কাঁদিতে লাগিল)

চতুর্থ দৃশ্য।

[চন্দনার ঘর...শয্যায় মন্মথ শায়িত...কাঁধের ক্ষত বাঁধা রহিয়াছে। গৃহকোণে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে, ঘরের দেয়ালে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, সেই আয়নায় ল্যাম্পের আলোর ছায়া পড়িয়াছে তাহার উপর একটা উইচিঙড়ে লাফাইয়া উঠিয়া বসিতেছে, দূরে একটা টিক্‌টিকী সেই উইচিঙড়েকে খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। চন্দনার আলুলায়িত কুন্তলরাশি খাটের উপর ও মাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ...চন্দনা কাঁদিতেছিল...আর মন্মথের পায়ের বুড় আঙুলের ডগায় ধীরে ধীরে চুম্বন করিতেছিল...]

চন্দনা। চার দিন চার রাত ত কেটে যায় (চন্দনা আবার পায়ের বুড় আঙুলের ডগায় অধর ছোঁয়াইতে লাগিল।)

মন্মথ। (নিদ্রা হইতে চক্ষু খুলিয়া) সুভা! সুভা! সুভা!

(চন্দনা কান খাড়া করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল...)

মন্মথ। সুভা! সুভা!

চন্দনা। সুভা? সুভা কে?

মন্মথ। সুভা কাছে এস তোমায় দেখি!

চন্দনা। (কাছে গিয়া) কাকে ডাক্‌ছ, সুভা কে?

মন্মথ। সুভা কে জান না, সুভা যে তুমি...নিজেকে ভুলে যাচ্ছ।

চন্দনা। তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি নি।

মন্মথ। তুমি যে সুভা, সুভা নও, তুমি নিজেকে চিনতে পাচ্ছ না —তুমি নিজেকে ভুলে গেছ...তুমি যে আমার সুভা... আমার সুভা...

চন্দনা। (অবাক হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে) মোনা ..মোনা...সুভা, আমি সুভা কি...মোনা মোনা...

(বাড়ীওয়ালী বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। (নেপথ্যে কাশিয়া—স্বগতঃ) রাধা গোবিন্দ। আঃ বেটীর সোন্দর মুখ্‌রে...দুটোই সমান...এইবারই মজালে দেখ্‌ছি... (প্রকাশ্যে) কিগো দরের মেয়েমানুষ, মুখোমুখী করে খুব যে পীরিত হচ্ছে...বাঃ খুব পীরিত জমাচ্ছ...এদিকে কি করে পেট চল্‌বে তার কি বল্‌তে পার? দে দে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দে...রাজভোগে আছ বুঝ্‌বে কেমন করে...কে জানে বাপু কোথাকার রাস্তার হুজ্জুত আমার ঘরে কেন? হ্যাঁ, গতর না খাটালে কেউ একমুঠো ভিক্ষেও দেয় না। (মন্মথের দিকে চাহিয়া) ওমা জেগে যে লো...আহা বাপু দেখদিকিনি কোথাকার বিপদ...হ্যাঁগা ভালমানুষের ছেলে দেখদিকিনি আজ একটু ভাল আছ বাবা...আহা চন্দনার আমার চার দিন আহার নিদ্রে বন্ধ, মা মা ঘুম পর্য্যন্ত নেই...কি করে যে সেই দুর্য্যোগের রাত কেটেছে সে

মধুসূদন জানেন...আর কি কইব বাবা ভাগ্যিস্ চন্ননা তখন দাঁড়িয়েছিল...

মন্মথ। আপনারাই আমায় বাঁচিয়েছেন...

বিরজা। ও কথাটি বলনি বাছা...গোবিন্দ, গোবিন্দ...হরি .মধুসূদন... তবে কিনা আমরা উপলক্ষ্য বটে, তা বাবা মনে রেখ আর কি এই কটা দিন যে কি করেই কেটেছে...আর বাবা সেই রাতে বৃষ্টির সময় ঝড়ের মত কোন আবাগে অলপ্পেয়ে মড়া নিমতলার ঘাটে থাক্—বুকশূল হোক, ফিরে যেন সে যমের কোলজোড়া পো হয়ে চুলিতে শুয়ে থাক্, বাবা তুমি ত বেঁচে গেছ, এই আমার চন্নার ভাগ্যি, নইলে কি হ'ত বাবা .. (কাঁদ কাঁদ স্বরে) বাবা তোমার জন্মে রোজ ঠাকুরতলায় সন্ধ্যা জ্বালি, বলি হরি ! আমি সাত সিকের হরির লুট দেব, মা চিত্তেশ্বরী করুক, আহা বাছারে আজ এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে বাবা ! এই চার দিনে সোয়া শ টাকা বেরিয়ে গেছে বাবা...কি করি তোমার বাড়ী জানিনে ঘর জানিনে, রাস্তায় ত আর ফেলে দিতে পারিনে...মানুষের চামড়া ত বটে ...তারপর ঐ চন্নার কান্না, কি করি এই অষুধরে, বিষুধরে, ডাক্তাররে, বদ্দিরে, গরম জলরে...ইষ্যের ব্যাগরে...কি করি ভদ্দর লোকের ছেলে শেষ মারা যাবে...তারপর ওই মেয়ের কান্না দেখ্তে পারিনে...হাতে গড়ে মানুষ করেছি...আর আজ এই চার দিনে প্রায় পঞ্চাশটা টাকা ক্ষতি করে এই কি করি বল...আমি বাপু কেমন পরের দুঃখ সইতে পারিনে, ভাবি আহা আমার কাছে এসেছে, খাগ্ মাক্ স্বচ্ছন্দে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াক্...রাধাগোবিন্দ...আহা বাবা...

মন্মথ। দেখ, আমার ওই জামার ভেতর টাকা ছিল...

বিরজা। কই...কই...কই...অ্যাঁ...আগে বল্তে হয়, হায় ! হায় ! আগে বল্তে হয় !

চন্দনা। কে বল্‌বে মা...তুমি ত বেশ—

বিরজা। তাই ত বল্‌ছি, তাই ত বল্‌ছি মা, তাই ত বল্‌ছি...এই যে রয়েছে। (নোটগুলা গণিয়া) ওমা এ যে আড়াই শ টাকা... আ পোড়াকপালী, তুই একবার দেখিস্‌ও নি। যদি খোয়া যেত বাছা...ছিঃ ছিঃ আমি ভাল করে সাম্‌লে রাখিগে তবে...

চন্দনা। অ্যাঁ আড়াই শ টাকা চন্দনার দাম...মোনা...

বিরজা। বাবা একটু গরম দুধ দেব, আহা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ বাবা...আহা বাছা রে, আমি সব গুছিয়ে সাম্‌লে রাখ্‌ব...বাবা একটু বেদানা আনিয়ে দেব...হ্যাঁ বাবা···আহা বাছা রে...

(বিরজা প্রস্থান করিতে করিতে সেই নোটের তাড়া নাড়িতে নাড়িতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল ও পিছন দিকে ফিরিয়া স্বগতঃ... "হুঁ ছোঁড়াটা ত খুব লটপটে...কিন্তু ছুঁড়েও যেন হাতছাড়া না হয়" বলিয়া চলিয়া গেল)।

(চন্দনা দুই হাতে মন্মথের পা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর তুলিয়া আবার পায়ের আঙুলের ডগায় চুম্বন করিল)

চন্দনা। মোনা...মোনা··(চন্দনা কাঁদিয়া ফেলিল আবার হাসিল) না আর কাঁদ্‌ব না, আর কাঁদ্‌ব না, এইবার আমি খুব হাস্‌ব।

মন্মথ। ওকি কি কর্‌ছ, আমার মাথা কেমন করছে—মাথার ভেতর আগুন জ্বল্‌ছে...সুভা, সুভা!

চন্দনা। তুমি আমায় অমন করে সুভা সুভা বলে ডাক্‌ছ কেন... সুভা তোমার কে?

মন্মথ। ঠিক বলেছ, সুভা আমার কে, কেউ নয়—কেউ কি...কি জানি, দেখ সব মনে পড়্‌ছে। দেখ বল তুমি মনে কিছু কর্‌বে না বল···

চন্দনা। অমন কর্‌ছ কেন, তোমার মনে যেন কষ্ট হচ্চে, আমায় বল্‌বে না?...

মন্মথ। বল্‌ব, বল্‌ব, মনে করে বল্‌ব, মন দিয়ে বল্‌ব, মন তুলে

নিয়ে বল্‌ব—মনের ভুলকে মনের চাবুকেই ক্ষত বিক্ষত করব। কিন্তু তুমি ত সুভা নও—তুমি কি…

চন্দনা। (দুঃখ ও অভিমানের সুরে) আমি কি তোমার কেউ ? আমায় বল্‌বে কেন বল…

মন্মথ। তুমি আমার কেউ কিনা তা জানি না…যা কখনও কাকেও বলিনি—তা তোমাকে বল্‌তে এসেছি, তুমি আমার কেউ নও…তবু তোমার ওই মূর্ত্তিই আমার সব। তুমিই আমার সুভা, বল তুমি আমার সুভা হবে, সত্যি করে বল তুমি আমার সুভা…বল বল, না না শোন আমার ভুল হয়ে গেছে ..না না সে ভুল বিধাতার, নইলে এমন হবে কেন… তুমি কেন আমার সুভা হলে না ? ওঃ তুমি কেন আমার সুভা হলে ?

চন্দনা। তুমি কি বল্‌ছ, সুভা সুভা…আমি ত সুভা নই! বল ত তোমার সুভা হই…কিন্তু আমায় এরা চন্দনা বলে—আমি সুভাও নই, চন্দনাও নই। আমি বর্ণবালা!

মন্মথ। নও তা বুঝেছি—নও তা জেনেছি…কেবল তাই শান্তি—তাই আবার জ্বালা, তাই তৃপ্তি, তাই আবার যন্ত্রণা…তাই মনে করেছি—তাই ভুলতে চাইছি…উঃ কি করে হবে সব ভুল—বল্‌তে পার,—ওঃ তাই শান্তি, তাই জ্বালা, দেখ আমি উন্মাদ, তুমি মনে কিছু কর না।

চন্দনা। আমি আর কি মনে করব…মনে করাকরি কি…আমার আমার আমার ত বল্‌বার মনে করবার কিছু নেই—কই আমিও সব ভুল্‌তে চাইছি (চন্দনা আবার মন্মথর পায়ের বুড় আঙুলের ডগায় আবার চুম্বন করিল)।

মন্মথ। (শিহরিয়া উঠিয়া) কি কর, কি কর…সব ভুল সব ভুল—

চন্দনা। ভুল নয় প্রভু! এখন তোমার সুভার গল্প বল। আমি তোমার সুভা হব।

মন্মথ। সে অনেক দিনের কথা...আজ সাত বছর হ'য়ে গেল...এই সাত বছর অহর্নিশি পলে পলে মরে মরে মরে আছি। কেন তা বুঝাতে পারব না...সে আমার...আমার সে হারিয়ে গেছে...ছেলেবেলা থেকে দুজনে বড় ভালবাসতুম .. ঘুম থেকে উঠেই দুজনে দুজনকে দেখতাম্ আর হাস্‌তাম, আমি অঙ্ক কস্‌তাম, সে হিজিবিজি কাট্‌ত, আমি ছবি আঁক্‌তাম, সে ছবি চুমু খেয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ত, সে মালা গাঁথ্‌ত, আমি মালা ছিঁড়ে দিতাম—আমি সাঁতার কাট্‌তাম, সে হাঁসের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ত···এমনি করে...তারপর মা বল্‌লে 'গরিবের ঘরে আমি ছেলের বিয়ে দিতে দেব না'...আমার আর একটি বন্ধুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়...সুভা ফুলশয্যার রাতে কোথায় পালিয়ে গেল...তারপর জীবনটা ওলট পালট হয়ে গেছে...পাহাড় পর্ব্বত গুঁড়া হয়ে গেছে, সুভার দেখা মিলিল না, স্বপনের দেশে কত কল্পনার রঙের তুলিতে তাকে গড়ে এঁকে তুল্‌তাম, সব স্বপ্নভাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দেশে উবে যেত—তবু তার দেখা পেলাম না, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলালাম, আঁখির পথ থেকে সে স্বপ্নের ছবি নড়্‌তে চাইলে না...অকস্মাৎ সেই রাত্রে তোমার ওপর যখন সেই অত্যাচার হয়, তখন সেই গলার স্বর মনে করে ছুটে এলাম—এসে দেখ্‌লাম—সেই ত...সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই সব, সেই সুর, সেই হাসি, সেই রূপ—মাথা কেমন হয়ে গেল...দেহের রূপে মন এমনি পাগল হয় উঃ···সুভা, সুভা, না না, তারপর বুঝ্‌লাম সে নয়...এ ভুল,..ভুল মিষ্টি লাগল, আবার ভুল বুকের উপর হাতুড়ির সজোর আঘাত দিলে। শুন্‌লে আমার সুভার কথা? এখন তোমার কথা বল...এখন তাই ভাবছি—এখন তত্ত্ব ভাবছি কেন তুমি সুভা

হলেনা...আবার ভাবি কেন তুমি আমার সুভা হলে ?

চন্দনা। আমার সে অনেক দিনের কথা, বল্‌লে কার'ত মিষ্টি লাগ্‌বে না...আমার নাম বর্ণবালা, আমারও মা বাপ ভাই বোন সবই ছিল—বিয়ে হল, বিধবা হলুম, বিয়েই বা কি বিধবাই বা কি তাও জান্‌লুম না—বাপের আদুরে মেয়ে খেলে খেলে বেড়াতাম—একাদশীর দিন উপবাস করে না থাক্‌লে পাপ হয় বলে খেতে দিত না—বাবা কাঁদ্‌ত—খেত না—অ্যাঁ খেলে পাপ হয় ? তা হবে...মা আমায় দেখ্‌ত আর চোখের জল মুছ্‌ত, আমি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকাতুম্‌, বুঝ্‌তুম না...আমাকে যে ঝী মানুষ করেছিল, সে রাক্ষুসি, আমি তাকে বড়-মা বল্‌তুম্‌—সে গঙ্গা নাইতে এসে আমায় এখানে বেচে যায় এই বিরজার কাছে, এখানে আমাকে মেরে ভাঙ খাইয়ে, জোর করে মদ খাইয়ে আমার সব নিয়েছে...(নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)। আজ তিন বছর হয়ে গেল আমি ঘুমুইনি...পেটের ভিতর কি হয়েছে সেটা ঠেলে ঠেলে ওঠে, আমার ভয়ানক যাতনা হয়, কেউ শোনেনা কেউ শুন্‌তে চায় না—প্রাণ বেরিয়ে যায় তবু বিরজার টাকার কিনারা কর্‌তে পারলাম না। আমি এখানে এলে তারপর অনেকদিন বাদে আমার দেশের একটা লোক এসেছিল, সে বল্‌লে আমার মা কল্লেরায় মরে গেছে, আমার ছোট ভাইটি গেছে, আমাদের বাড়ী ঘর দোর সমস্ত দামোদরের বানে ধুয়ে পুঁছে মুছে গেছে, বাবা কেঁদে কেঁদে কাণা হয়ে গেছে ..শুনেছি কলিকাতায় আছে, ভিক্ষা করে খায় ; আমার বাবার বাড়ীর অত মান সম্ভ্রম সব আমারই এই পাপে গেছে ..দামোদর সবাইকে নিলে—আমায় ত নিতে পার্‌লে না...তা ঠাকুর ! না না

মোনা আমার এ কি পাপ আমি কেবল মরতে পারি নে—সেই টুকুই পাপ বুঝি...না হলে আমার এতে কি সুখ বল—আমি ত জ্বলে জ্বলে পুড়ে মরছি. আচ্ছা তুমি আমায় গঙ্গায় নাইয়ে আনবে? গঙ্গায় নাইলে কোটী জন্মের পাপ কেটে যায়...আচ্ছা আমি ত এখন তোমার সুভা... আমিও তোমাকে তোমার সুভার মত ভালবাসব, তুমি আমায়, আমায়, আমায় . দেখাবে? সেই কুচ্‌কুচে কাল জলে তালগাছের কালো ছায়া পড়ে, দীঘীর পাড়ে হাওয়ায় জল চল্‌কে ওঠে, তাই আবার দেখ্‌তে সাধ হয়—আর এ কেরাসিন আর গ্যাসের আলো ভাল লাগে না তুমি তুমি আমার আমায়...মোনা! মোনা! তুমি যে সত্যি ভালবেসে ফেলেছ... তুমি দূরে সরে যেয়ো না···আমি তোমারি আমি তোমারি...তোমার বুকে ফুলের মত রাখ থাকব—না হয় কাঁটার মত নরকের আগুনে ফেলে দাও জনম ভোরই পুড়ব...

(চন্দনা মুখ তুলিয়া মন্মথের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, তাহার অধরে হাসি, চোখে জল...মন্মথ দুই হাতে চন্দনার মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া চুম্বন করিতে গেল...চন্দনা হাসিয়া ফেলিল, শিহরিয়া উঠিল, তাহার চক্ষে জল আসিল...)

মন্মথ। (চন্দনাকে ঠেলিয়া দূরে সরিয়া গেল) না...না...না ..এত তার খোসা, এত তার খোলস, সে নয়, সে নয়...ওঃ সুভা সুভা...সুভা ..এযে আমার মৃত্যুতুল্য...এর চেয়ে আমার মরণ যে ভাল ছিল...না না সুভা...সুভা...

চন্দনা। মোনা...মোনা...মোনা...আমি তোমার সুভা...মোনা... মোনা...মোনা...কই আমায় গঙ্গায় নাইয়ে নিয়ে যাবে না ...না...না...আর নয়...আমার সব তীর্থ গয়া গঙ্গা বারাণসী তোমার ওই টুক্‌টুকে পায়ে···মোনা আমি কখন যা পাইনি

আজ তাই যে পেয়েছি...যা পেয়েছি তাতে আমার সব দিক যেন ভরে উঠ্ছে...কেমন যেন কি...যেই রাতে আমার মুখের পানে চাইলে, সে চোখের তাকানি আর কারো চোখে কখন দেখিনি—আমি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠ্লুম ... আমার জীবনটা ত এই আরম্ভ হয়েছিল...তবে তাকে নিভাচ্ছ কেন ? সেই রাত্তিরে যেন আমার ভোর হয়েছিল...আচ্ছা রাত্তিরের সেই অন্ধকার সকালবেলার ফুল দিয়ে হাসান যায় না ? দেখ আমার প্রাণের ভেতর একটা লুকানো কথা ছিল—সেই লুকানো কথাটা আমিও জান্তাম না—সেই লুকানো কথাটাই কিন্তু সব চেয়ে সাত্যি। সে সত্যিটাও তুমি নিয়ে গেলে ভাল...ঠাকুর ! না-না-মোনা মোনা না-না আমায় মরতে দাও, মরতে ? না—সেই স্বর্গের সুখ এনে দাও, তুমি যে আমায় বড় ভালবাস...আমি যে তোমায়...আমি তোমার সুভা নই...সুভা...বল বল আমার সব এখন হারায় নি যদিও হারিয়ে গেছে...তবে আর আমাকে এই অন্ধকারে রেখো না...প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠ্ছে...বেঁধে রেখো না,—সে পুরাণ জীবনটা যা আমার বলে মনে হ'ত সেটা... সেটা যেন আর নেই, তার ভেতর একে আর জড়িয়ে রেখ না...মোনা ! হোক্ অন্ধকার, হোক্ দুঃখ, হোক্ কষ্ট, হোক্ যন্ত্রণা, হোক্ পেটের ভাতের জন্য এমন করে দেহটা বেচা, তবু আমায় আজ এগিয়ে যেতে দাও—আমার হাত ধর, অন্ধকারে কাণার মত হাঁত্ড়ে মরছি—এগিয়ে যেতে দাও... রোজ সন্ধ্যের পর অন্ধকার আসে, যাতনা বাড়ে—একদিন সন্ধ্যের পর আলোর দেশে যাব—হাত ধর এগিয়ে যেতে দাও ..

মন্মথ। সর...সর...সরে যাও...না না তুমি বেশ্যা, না না তুমি নয়, তুমি সুভা নয়...সর সর।

চন্দনা। ঠিক বলেছ...সে আমি নয়...দেখ বাঃ বেশ বলেছ মোনা মোনা আর জলের ঢেউ চোখে উথ্‌লে উঠ্‌বে না। এখন আমি খুব হাস্‌তে পারি...হাস্‌ব...যত খুসি হাসি দিতে পারি...আমার হাসির দাম আড়াই শ টাকা...সে ত দেওয়া হয়ে গেছে এ হাসি এখন তোমার...হাসিও সরিয়ে নেব।

মন্মথ। না না সর...সর...দেখ, না সরে যাও...আমিও তোমার... না না তোমার হাসি চাইনি...দাম দিয়ে কেনা জিনিসের আদর দামের সঙ্গেই মিটে যায়...

চন্দনা। ঠিক বলেছ তবে...ঠিক বলেছ...ঝাড় লণ্ঠন, আরশী, পালঙ, ফুলদানীর মত বিরজা আমায়ও ঘর সাজাবার জন্যে কিনে এনেছিল, ঠিক বলেছ, কেনা জিনিস চেনা যায়—খুব চেনা যায়...দেখ, না না...

নেওয়া দেওয়ার দাম মিটেছে, তবু তোমায় একটা জিনিস দিলাম নিয়ে যাও সে আমার এই পাঁজরা ঢাকা বুকের ভেতরের ধড়ফড়ানি নয়, নিজের সঙ্গে ঝগড়া করে রাত্তিরে যখন জেগে কাঁদি সে কান্না নয়, বুকচেপে বুকফাটা নিশ্বেস নয়, মনের ভেতরে যে জড়িয়ে ধ'রে শপথ দিব্যি করি তা নয়, আমি যে গালে মুখে চাপ্‌ড়ে মরি তা নয়, মনের ভেতর কত তেষ্টা পায় তাও নয়—একলা পড়ে লোক-দের ঠেলে কান্না নয়—কামড়ানি নয়—হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত দিয়ে যে হাঁপিয়ে উঠি গলার স্বর বেরোয় না তাও নয়, শুধু আমার এই কেনা বেচার শুখনো এই নেঙড়ান মড়ার মত হাসিটা...

মন্মথ। তবে আমি চল্লুম...

চন্দনা। যাবে ..হাসি কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছ কিন্তু যাতে হাসি ছিল তাকে ফেলে দিলে, হাসিই চায় হাসি, যাতে থাকে তা বুঝি চায় না...যাবে আচ্ছা এস...কতদূরে যাবে সে কতদূর দাঁড়াও, সব হাসি তবে তোমার কাপড়ের খুঁটে গেরো দিয়ে বেঁধে

নিয়ে যাও, তবে আর কি নিয়েছ ? নাও...কি ? আঃ আমার হাসির দাম বিরজা পেয়েছে...তুমি কিনেছ আর আমি আঃ ..আমি কেনা বেচা বেশ শিখেছি, ফুলের বাজ্‌রা ওজন ধরে দরে বিকিয়েছি...হাসির দাম আছে, তবে হাসির দাম আছে ··তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে, ধর্ম্মের দোরে আমার মত মেয়েমানুষের কি কোন দাবী নেই...শুধু এই কেনাই লাভ, তবে নারায়ণ এ দেহ দিলে কেন ? এ দেহের মধ্যে প্রাণ দিলে কেন···যদি যাবে তবে ঘা মেরে জাগালে কেন ? উঃ যাবে ? চলে যাবে তারপর কি ভগবান ? সে কই ? (চন্না বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল... তাহার পর জোরে নিশ্বাস ফেলিল..)

(তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেছে...পার্শ্বের বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে সারেঙের সঙ্গে গান হইতেছিল—

এস হে প্রাণ এ পরাণ রতন
কি ভুলে গাঁথি মালা বেড়িছে ও চরণ
কি দুঃখ দিয়েছি
কি সুখ কিনেছি
যতনে অযতনে রতন চিনেছি
রাখিব গোপনে মরমে মরম যেন।—

—মন্মথ অনেক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া, তার চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল ; মন্মথ ধীরে অন্ধকারে নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।)

চন্না। চলে গেলে ? আর ওই যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে... এক...দুই তিন...

নেপথ্যে সেই বালক ও অন্ধ বৃদ্ধ চীৎকার করিতেছিল—'বাবা এই কাণার হাতে একটি পয়সা দিয়ে যাও বাবা'—বালক ও অন্ধের প্রবেশ)

বালক। ওগো এই কাণার হাতে একটি পয়সা দিয়ে যাও বাবা, বাবা নারায়ণ তোমার মঙ্গল করবেন— আপনি অন্ধকে দেখলে নারায়ণ আপনাকে দেখবেন।

চম্পনা। সেই কি অ্যাঁ আমার আমার...আমার কি—বাবা এদিকে এস...বাবা বাবা!

অন্ধ। (উন্মত্তের মত হস্ত প্রসারণ করিয়া) কই...কই—কই—সেই—সেই—কই—বর্ণমালা বর্ণা—মা— মা—কই— কই—আর যে চোখে...চোখে দেখতে পাইনে, কানে শুনি—আর যে চোখে দেখে চিনে নিতে পারি নে—বর্ণ! বর্ণ! বর্ণ! বর্ণ!—একবার যদি দেখতে পেতুম, কাছে আয় ত দেখি হুঁ হুঁ—

চম্পনা। এই যে বাবা! বাবা! এই যে আমি—এই যে তোমার বর্ণ—এই যে বাবা।

অন্ধ। আয়! আয়! আয়! মা আমার বুকে আয়—মা মা মা আমার বুকে আয়—

(চম্পনা বাহিরে আসিয়া রোয়াক হইতে ঝাঁপাইয়া অন্ধ বৃদ্ধের বুকের উপর পড়িল ··অন্ধ দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—)

চম্পনা। বাবা...বাবা...

অন্ধ। (উন্মত্তের মত অট্ট হাসি হাসিয়া) হাহা··হাহা হাহা... পেয়েছি··পেয়েছি...এইবার রাক্ষুসি (চম্পনার গলা টিপিয়া ধরিয়া) রাক্ষুসি..তুই তোর মাকে খেয়েছিস্, কুল খেয়ে মাকে খেয়েছিস্ ভাইকে খেয়েছিস্...আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছি...তোর সেই একটা পয়সা না জেনে বাতাশা কিনে ভিজিয়ে খেয়েছি...তখনই গলায় বাদ্‌ছিল তবু খেয়েছি, আমার গলা তখন শুখিয়ে যায়নি কেন..মান গেছে, ঘর গেছে, সব গেছে, চোখ গেছে...তবু...তবু..শুধু তোকে

তোকে এমনি করে (চন্দনার গলা আরো সজোরে টিপিয়া ধরিল)

চন্দনা। বাবা আমি ইচ্ছে করে এ করিনি বাবা...

অন্ধ। চুপ্ চুপ্ রাক্ষুসি রাক্ষুসি! ইচ্ছে কি

চন্দনা। উঃ বাবা ..বাবা...মো...না (চন্দনা চক্ষু উল্টাইয়া কাঁপিয়া উঠিল)

বালক। কি করছ ..বাবা কি করছ...মরে যাবে ও বাবা ..মরে যাবে...ওযে দিদি...ঘাড়টা যে ভেঙে গেল...

অন্ধ। চুপ্...চুপ্ ..আমি গড়েছিলুম, আমি ভাঙ্ছি—চুপ আমারই গড়া আমারি ভাঙা চুপ্...হাহা হাহা...এইবার...এইবার

চন্দনা। অস্ফুট স্বরে...মো...না...(শেষ সজোরে) মো...না...

(চন্দনা মরিয়া গেল—নেপথ্য হইতে 'যাই যাই' বলিতে বলিতে বেগে মন্মথর প্রবেশ—)

মন্মথ। সে যেন আমায় ডাক্‌লে...সে যেন আমায় ডাক্‌লে, আকাশ যেন ফেটে গেল...বুড়ো বুড়ো...কি কর্‌লি কি কর্‌লি... চন্দন...চন্দন...

(বৃদ্ধ চন্দনাকে বুকে করিয়া বসিয়া পড়িল...একটা নিশ্বাস ফেলিল...চন্দনার মস্তকে চুম্বন দিল বৃদ্ধ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল...)

অন্ধ বৃদ্ধ। কে তুমি দেখ ত...আমি কাণা, চোখ নেই, ভাগ্যটাকে আর দেখ্‌তে হয় না ভালই...শুধু শব্দ শুনি ..এ ঠিক মরেছে কি না দেখ ত...কুলের ভুল বেশ মুছে দিয়েছি...মরেছে... (চন্দনার বুকে মাথা রাখিয়া) আঃ প্রাণটা জুড়িয়ে গেল... আঃ এখন যেন বুকটা ঢিপ ঢিপ্ করছে না...না মরেছে মরে গেছে...(বৃদ্ধ জোরে হাঁপাইয়া নিশ্বাস ফেলিইয়া মরিয়া গেল)

(তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গেছে...ঠাকুরবাড়ীতে নহবতে

কানাড়া রাগিণীতে বাঁশী বাজিতে বাজিতে হঠাৎ থামিয়া খ্যাঁৎ করিয়া উঠিল...বাজনা থামিয়া গেল।)

বালক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বর্ণী দিদি ! বর্ণী দিদি ! আমি যে তোর ধম্ম-ভাই, আমায় নিয়ে যা আমি যে তোর ধম্ম-ভাই !

মন্মথ। চন্নন, কোন পূর্ব্ব জন্মের ঋণ ছিল...চন্নন...চন্নন আমার চন্নন আমি ঠাকুর তুমি মানুষ...তুমি মানুষ হয়ে আমায় ফেলে গেলে...কোথায় আলো, কোথায় আলো আমায় এ অন্ধকার রচে দিয়ে গেলে কেন আলো ! আলো ! কার ভুল চন্নন কার ভুল চন্নন আমার চন্নন...চন্নন আমার চন্নন না না তুমি...হাস্‌বারও নেই মানুষ, মুখ সেট্‌কাবারও নেই মানুষ...চন্নন আমার চন্নন, আমায় কি ফেলে দিয়ে গেলে ? কি হাসি কিনলাম চন্নন !...আমার জন্যে কি রচে গেলে ...সবাই আসে সৃষ্টি করতে...আমার জন্যে তবে কি সৃষ্টি করে গেলে...শুধু স্মৃতি . কার স্মৃতি.. যে দান করলে বুঝি তার...তাই ত...তাই ত...এই তোমার সবটা হাসি আমার কাপড়ে গেরো বাঁধা, তাই দিয়ে কি সৃষ্টি করব ? সব যে মিশিয়ে গেল...ভগবানের পায়ের শব্দর সঙ্গে তোমার বুকের শব্দও মিলিয়ে গেল...

(দূরে পথে একটা বাউল গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে...তাহার মাথায় ও গায়ে ফুল পরা, ফুলের মালা মাথায় জড়ান...দূর হইতে মন্মথ সেই গান শুনিতেছিল—)

বাউল। —(গাহিতেছিল—)

ওরে মন তোর দিশা পেলাম না
তুই কখন হাসিস্‌ কখন কাঁদিস্‌
নিজেই জানিস্‌ না...(মরি হায় হায় রে)

দিলের মাঝে বেসে আছে
পাখী প্রাণারাম...
ওরে কেউ জানে না বরণ কেমন,
কি যে সে তার নাম
কখন আলো কখন আঁধার
তারি হাসির দোলনা...(মরি হায় হায় রে)

মন্মথ। চন্নন্ আমার চন্নন্ (মন্মথের চক্ষু ছাপাইয়া জল কপোল বহিয়া পড়িতে লাগিল। তখন সেই গান চলিতেছিল—)

রূপের পানে চেয়ে ও মন,
ফেলিস চোখের জল,
রূপসাগরে ডুবলে তখন্
শুখিয়ে যাবে জল
তোর হাসি কান্না হীরে পান্না
রূপের বায়না রবে না...(মরি হায় হায় রে)
ফুল দিয়ে সব মালা গেঁথে
পৈরেছিস গলে
ওরে জনম ভোরে ভুলে ধরে
চলেছিস ভুলে,
তোর পথের ধূলায় মন যে মরে
(ভোলা—ও ভোলা মন) তুই চেয়ে দেখ্‌লি না
...(মরি হায় হায় রে)

(যবনিকা পতন)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৭]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (২)

পুরুষ ও পুরুষোত্তম।

বলিয়াছি যে ভগবদ্গীতায় আমরা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ছাড়া আর একটা নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাই। এটি পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। উপনিষদের সাধ্য যেমন ব্রহ্ম, গীতার সাধ্য সেইরূপ এই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম কথাটি গীতার নিজস্ব। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে ইহা খুবই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায় বলিয়া শুনি নাই। গীতা যদিও নিজে বলিতেছেন যে—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

—"লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ"; কিন্তু আমরা যে বেদ পাইয়াছি তাহাতে এ কথা আছে বলিয়া শুনি নাই। যে কয়খানি উপনিষদ সচরাচর প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতেও পুরুষোত্তম কথা আছে বলিয়া এখনও জানি না। বেদান্তসূত্রে বা ব্রহ্মসূত্রে এ-কথা নাই। ভারতের মোক্ষ-শাস্ত্রে, গীতাতেই এই কথাটি প্রথমে আসিয়াছে।

তবে পুরুষ শব্দ বেদে এবং উপনিষদে আছে; গীতাতেও আছে। আর গীতাতে যে কোনও কোনও স্থলে পুরুষ শব্দ পুরুষোত্তমের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বেদের বা উপনিষদের পুরুষ আর গীতার পুরুষোত্তম যে ঠিক একই বস্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না।

ঋগ্বেদের পুরুষ-দেবতা।

ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের কথা অনেকেই জানেন। দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষ-সূক্ত বলে। পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এমন সকল কথা আছে, যাহার দ্বারা এই মণ্ডলের রচনাকালকে অন্যান্য মণ্ডলের রচনাকাল অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে হয়। আর এই পুরুষ সূক্তটি এই মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীনতার একটা প্রধান প্রমাণ। এখানে বেদের পূর্ব্বতন ইন্দ্রাদি দেবতার স্বতন্ত্রতা এক মহান বিশ্ব-দেবতার অনুভূতিতে সংহত ও সমন্বিত হইয়াছে। এই সূক্তের দেবতার নাম পুরুষ, নারায়ণ ইহার ঋষি। এই পুরুষ-দেবতা সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ। যাহা হইয়াছে বা যাহা হইবে, সকলই এই পুরুষ। এই বিশাল পুরুষ-দেবতা আপনার এক-চতুর্থাংশ দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন। অপর তিন-চতুর্থাংশ বিশ্বের অতীতে আছে। পুরুষ-দেবতার এই সকল বর্ণনা দেখিয়া, ইনিই যে পরে উপনিষদে ব্রহ্মরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। উপনিষদের ব্রহ্ম জগৎ-কারণ। বেদান্ত সর্ব্বোপনিষদের সমন্বয় করিতে যাইয়া, "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এই সূত্রে এই কারণ-ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু; বিশ্বের অভি-ব্যক্তির পূর্ব্বে এই সদ্ বস্তুই কেবল ছিলেন, অপর কোনও কিছুই ছিল না। তিনিই যাহা কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া তিনি এ-সকলেতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ, আশ্রিত অনাশ্রিত, চেতন অচে-তন, সত্য ও অসত্য যাহা কিছু আছে,—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হইলেন (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। আবার এই ব্রহ্ম যেমন সমগ্র বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেইরূপ এসকল বস্তুকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছেন। ব্রহ্মের এই বিশ্বরূপত্বই সগুণ-ভাব; আর এই বিশ্বের অতীত ভাবই নির্গুণ। ব্রহ্ম সগুণ

এবং নির্গুণ, জগদ্ব্যাপ্ত ও জগদাতীত, দু-ই। ঋগ্বেদের পুরুষেও এই দুই ভাবই আছে, এক-চতুর্থাংশে তিনি জগদ্ব্যাপ্ত, তিন-চতুর্থাংশে জগদাতীত। ব্রহ্মেতে যাহা নাই, এমন কোনও কিছু ঋগ্বেদের পুরুষ-দেবতায় পাওয়া যায় না। গীতার পুরুষোত্তমের বিশিষ্টতাই এই যে তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ।

উপনিষদের পুরুষ।

উপনিষদেও পুরুষ কথা আছে। উপনিষদ নানা স্থানে, নানা প্রসঙ্গে, নানা অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ পুরুষ শব্দে মানুষাকৃতি বুঝাইয়াছেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য যে শ্রুতির অন্তর্গত, তাহাতেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনা করিতে যাইয়া "পুরুষ" শব্দে মনুষ্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ

এই পুরুষ অন্নরসের বিকার। এই অন্নরসময় কোষের অন্তর্গত প্রাণময় কোষ। আর

স বা এষ পুরুষবিধ এব

আর এই প্রাণময় কোষও মনুষ্যাকার। এইরূপে, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষও মনুষ্যাকারেই উপলব্ধ হইয়াছে। এখানে "পুরুষ" শব্দ বলিতে "মনুষ্যাকার" বুঝাইতেছে। ঐতরেয়োপনিষদেও নরাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ডকে পুরুষ বলিয়াছেন। এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনাপ্রসঙ্গে পুরুষ শব্দের একটা অতি নিগূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, পরে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিবার পথ অত্যন্ত সোজা হইয়া যায়। এই জন্য এই অধ্যায়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব। ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম শ্রুতি—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি*

অর্থাৎ—এই জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিলেন। নিমেষ-ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন—"আমি কি লোক-সকল সৃষ্টি করিব?"

তারপর তিনি এইসকল লোক সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তিনি ভাবিলেন, এই লোকসকল ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদায়ের রক্ষণার্থে লোকপাল সৃষ্টি করিব কি? এইরূপ আলোচনা করিয়া, তিনি জল (অর্থাৎ কারণ-জল) হইতে এক পুরুষের উপাদান গ্রহণ করিয়া গঠন করিলেন। তিনি এই পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা বা মনন করিলেন, চিন্তা করাতে তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল, যেমন পক্ষীর ডিম্ব ফুটে। মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইল। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রথমোৎপাদিত পুরুষকে স্রষ্টা ক্ষুৎ-পিপাসাবিশিষ্ট করিলেন। তখন সেই ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে অর্থাৎ স্রষ্টাকে বলিলেন—"আমাদিগকে এরূপ আশ্রয়স্থান দিন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন আহার করিতে পারি।" তখন স্রষ্টা তাঁহাদের নিকটে এক গবাকৃতি পিণ্ড আনিলেন। ইহাকে দেখিয়া তাঁহারা অর্থাৎ এসকল ইন্দ্রিয় বলিলেন—"ইহা আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।" তখন স্রষ্টা তাঁহাদের নিকটে একটি অশ্বাকৃতি পিণ্ড আনিলেন। তাহা দেখিয়াও ইন্দ্রিয়সকল বলিলেন—"ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" তখন—

> "তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্।"

স্রষ্টা তাঁহাদের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের) নিকটে একটি পুরুষ আনিলেন। এই পুরুষকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন—"এই অধিষ্ঠান বস্তুতঃই সুন্দর। অতএব পুরুষ বস্তুতঃই সুন্দর।" এখানে "পুরুষ" অর্থ নরাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড। অতএব উপনিষদ প্রথমতঃ পুরুষ শব্দে নরাকৃতি বুঝাইয়াছেন।

ফলতঃ বেদের পুরুষ-দেবতার বর্ণনা দেখিয়াও পুরুষ শব্দের এই মৌলিক অর্থই মনেতে জাগিয়া উঠে। পুরুষ শব্দের ধাত্বর্থের সঙ্গেও এই অর্থের বিশেষ সঙ্গতি আছে। ধাত্বর্থ বিচারে "পুরীতে যিনি শয়ান রহেন," তাঁহাকেই পুরুষ বলিতে হয়। "পুরুষং পূর্ণত্বেন পুরী-শয়ানং"—পূর্ণরূপে যিনি পুরীতে শয়ান তিনিই পুরুষ। শ্রুতিতে আছে—

> "সবাঽয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈতেন কিঞ্চ
> নানাবৃতং নৈতেন কিঞ্চ নাসংবৃতং।"

"সকল পুরীতে যিনি পূর্ণরূপে শয়ান তিনিই এই পুরুষ। এমন কোনও কিছু নাই যাহা তাঁহার দ্বারা আবৃত নহে; এমন কোনও কিছু নাই যাহা তাঁহার দ্বারা সংবৃত নহে।" পুরী অর্থ দেহ। দেহকে যিনি ব্যাপিয়া আছেন, দেহের প্রভু যিনি, তিনিই পুরুষ। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা পর্য্যন্ত যখন, যেখানে, যে ভাবে, যে প্রসঙ্গে, এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানেই ইহার এই মৌলিক, এই ধাতুগত অর্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বা অনুমানপ্রতিষ্ঠ কোনও না কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের পুরুষ-সূক্তের পুরুষ দেবতার দেহ কল্পিত হইয়াছে। সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ এসকল বিশেষণ ইহার প্রমাণ। এই পুরুষ-দেবতার "মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌ ও ভুবন সকল হইয়াছে।" পুরুষ-সূক্তের এই সকল বর্ণনা হইতে, এই পুরুষ-দেবতার যে মনুষ্যাকৃতি কল্পিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে এইরূপ আকৃতি কল্পিত হয় নাই, সেখানে পুরুষ শব্দ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই, এমন কথাও বলা যায় না, সত্য। তবে সেসকল স্থলে বেশীর ভাগ ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ যেখানে পুরুষ অর্থে আত্মা, পর-

মাত্মা বা অন্তর্যামিকে বুঝাইয়াছে, সেখানেও তাঁহার একটা পুরী বা দেহ বা কোষ পরিকল্পিত হইয়াছে। ঈশোপনিষদে ঋষি যেখানে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—“হে সূর্য্য তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর—

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি

তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা আমি তোমার প্রসাদে দর্শন করি। কেন না—

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি

ঐ যে পুরুষ তিনি আমি।” এখানে “ঐ যে” শব্দের দ্বারা সূর্য্য-মণ্ডলস্থিত যে “পুরুষ” তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সূর্য্যমণ্ডল যাঁহার পুরী সেই “পুরুষ” আমি, ঋষি এখানে এই কথাই বলিতে চাহেন।

কঠোপনিষদের পরম-পুরুষ।

কঠোপনিষদের পুরুষকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনিও একদিকে বিশ্বের অতীত হইয়াও, অন্যদিকে এই বিশ্বের ও এই জীবের অন্তর্যামি বলিয়াই পুরুষ অভিধান পাইয়াছেন। জীবের মধ্যে দেহী যে আত্মা তাঁর প্রতিষ্ঠা করাই কঠোপনিষদের মূল লক্ষ্য। পরলোকসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া, এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্যই যম-নচিকেতা উপাখ্যানের বিবৃতি। এই জন্য কঠ-শ্রুতি দেহতত্ত্বকে ধরিয়াই তিলে তিলে এই নির্গুণ ও বিশ্বাতীত পুরুষ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহান্ আত্মা বা মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও কিছু নাই। তাহাই শেষ, তাহাই পরা গতি।

এই শ্রুতি আমাদের সকল জ্ঞানের, সকল ভোগের ও সকল কর্ম্মের মূল ও আদি উৎপত্তি যে ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহারই মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসার সূত্র খুঁজিতে গিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি আলোচনা ও অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে এসকল ইন্দ্রিয় নিজেরা কোনও জ্ঞান বা ভোগ দিতে কিম্বা কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া মাত্রেই বিষয়-সাক্ষাৎকারের ও বিষয়-সম্পর্কের অধীন হইয়া আছে। চক্ষু ও রূপ এই দুই মিলিয়া তবে দর্শন-ব্যাপার সাধিত ও সম্ভব হয়। সেইরূপ কর্ণ ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, ত্বক ও স্পর্শ, এ সকল পরস্পরের সঙ্গে যথাযথ ভাবে যুক্ত না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই আপনার কর্ম্মসাধনে সক্ষম হয় না। আর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদি গুণ বস্তুর আশ্রয়েই থাকে। এই সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয়ের অধীন, এই সকল বিষয় আবার আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে। তারপর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনের অধীন; মনঃসংযোগ ব্যতীত তারা বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। চক্ষুর সম্মুখে রূপ, কানের কাছে শব্দ, নাসিকার কাছে গন্ধ, এ সকল থাকিলেও যতক্ষণ না মন ইহাদের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ ইহারা কোনও জ্ঞান বা ভোগ দিতে পারে না। এই মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণের তুলনা করিয়াই, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সাক্ষাৎকারে জ্ঞানের ও ভোগের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই তুলনার জন্য একাধিক বিষয়ের যুগপৎ ধারণা আবশ্যক। এই ধারণাশক্তি যে বৃত্তির আছে, তাহা-

কেই বুদ্ধি বলে। অতএব ইন্দ্রিয়, বিষয়, ও মন এই তিনই বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি সজাগ না থাকিলে, ইহারা কার্য্যকারী হয় না ও হইতে পারে না। আবার এই বুদ্ধি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। ইহা মহান্ আত্মা বা সাক্ষীস্বরূপ যে চৈতন্যবস্তু আমাদের অন্তর্বাহ্য সকল প্রকারের পরিবর্ত্তনের মাঝখানে আপনি এ সকল পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া নিত্যস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহার অধীন, তাঁহার অপেক্ষা রাখে। এই মহান্ আত্মাই বুদ্ধির ধারণাকার্য্য সম্ভব করিতেছেন। আবার এই মহান্ আত্মা বা জীবাত্মা যে অব্যক্ত হইতে এই বিশ্বপ্রবাহ নিয়ত স্ফুরিত ও প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার অধীন। জীবাত্মা বা individual soul, আপনার জ্ঞানের, আনন্দের ও কর্ম্মের বিষয় এবং প্রেরণা প্রতিনিয়ত এই বাহিরের বিশ্ব হইতে লাভ করিতেছে। এই বিশ্ব ছাড়া বিশিষ্ট জীবের কোনও জ্ঞান, কোনও আনন্দ, কোনও কর্ম্ম সম্ভব হয় না। এই বিশ্বের একত্ব ও প্রতিষ্ঠা যাঁহাতে তিনিই বিশ্বাত্মা বা cosmic soul; উপনিষদে ইহাকেই অব্যক্ত বলিয়াছেন। জীবাত্মা এই অব্যক্তের বা বিশ্বাত্মার অধীন। জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইয়াও আবার এই বিশ্বের অধীন, বিশ্বতন্ত্র। জীবাত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে, individual soul, cosmic soulএর সঙ্গে, মহান্ আত্মা অব্যক্তের সঙ্গে, অঙ্গাঙ্গ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইঁহারা কেহই স্বতন্ত্র নহেন। কেহই নিরপেক্ষ নহেন। ইঁহারা অন্যান্যাপেক্ষী ও অন্যান্যতন্ত্র। অতএব ইঁহাদের ভিত্তি, প্রতিষ্ঠা, সাক্ষীরূপে এক শ্রেষ্ঠতর তত্ত্বের প্রয়োজন। নতুবা ইঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও আদানপ্রদান আদৌ সম্ভব হয় না। কঠ-শ্রুতি এই শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব-কেই পুরুষ বলিয়াছেন। ইহা শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব। ইহা শেষ তত্ত্ব। ইহা পরা গতি। ইহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে এইজন্য যে এই জীবাত্মা ও ঐ বিশ্বাত্মা এতদুভয়ই ইঁহার পুরী বা দেহস্বরূপ। অথবা জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা এক বৃহত্তর পুরীর পরস্পর সংলগ্ন, দুইটি প্রকোষ্ঠ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্বান্ত সকল পুরীগ্রামসম্বলিত যে ব্রহ্মাণ্ড পুরী তাহাই এই

বৃহত্তর পুরী। পুরীর মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরীই শেষ পুরী। সকল পুরী ইহার অন্তর্গত। আর কঠোপনিষদ এখানে যাঁহাকে পুরুষ বলিয়াছেন, তিনি এই শ্রেষ্ঠতম, বিশালতম, পূর্ণতম ব্রহ্মাণ্ড পুরীর স্বামী। এই জন্যই এই পুরুষ শেষ তত্ত্ব।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।

উপনিষদ এই পুরুষকে অব্যক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এইমাত্র যে দুই বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ করিতে গেলে, উভয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ মাত্রেই একটা না একটা সামান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ মনুষ্যত্ব নামে যে সামান্য ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে আছে, তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। এই মনুষ্যত্ব বস্তু সকল মানুষে আছে, আবার সকল মানুষকে অতিক্রম করিয়াও আছে। বর্ণমালার ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সমগ্র বর্ণমালাটির অধীন, তার অপেক্ষা রাখে। এই বর্ণমালাতেই ক বর্গের সঙ্গে চ বর্গের বা ট বর্গের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আবার ক এবং খ, কিম্বা চ, ছ, এবং ঞ'র মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা আপন আপন বর্গের অধীন। ক-বর্গ ক-খ-আদি সকল বর্ণকে লইয়া, অথচ প্রত্যেক বর্ণকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই সকল বর্ণ ছাড়া ক-বর্গ যে কি, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না; অথচ আমাদের জ্ঞানেতে এই ক-বর্গ এসকল বিশিষ্ট ক-খ-আদি বর্ণকে অতিক্রম করিয়া আছে বলিয়াই, তাহার দ্বারা ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া থাকি। উপনিষদের পুরুষ সম্বন্ধেও ইহাই বলিতে পারা যায়। আমাদের জ্ঞানের মূল প্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতির অপরিহার্য্য বিধিবাঁধনের দ্বারা এই পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হন। ইংরাজিতে জ্ঞানের এই মূল প্রকৃতি ও তার অপরিহার্য্য বিধিবিধানকে necessity of thought বা logic of reason বলে। অর্থাৎ কোনও কিছু জানিতে গেলেই এই বস্তুটিকে মানিয়া লইতে হয়, না

হইলে জ্ঞানক্রিয়ার কোনও অর্থ-ধারণা সম্ভব হয় না। বিস্তৃত বা আয়তনবিশিষ্ট বস্তুকে দেখিতে হইলে, দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই, যেমন আকাশ-বস্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়; অথচ এই আকাশ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিম্বা কাল যাহাকে বলি তাহাকে জানিতে গেলেই ঘটনাপরম্পরাকে জানিতে হয়, নতুবা কাল যে কি বস্তু, তাহা জানিতে পারি না। আর কেবল ঘটনা-প্রবাহই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়; যে অখণ্ড, অনাদ্যনন্ত কাল-প্রবাহের মধ্যে এই সকল ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য বা পারম্পর্য্য দেখিতে পাই, তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না; তাহাকে কেবল এই সকল ঘটনার পারম্পর্য্যের জ্ঞানের ভূমিরূপেই মানিয়া লইতে হয়। সেইরূপ এই ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া মহৎ-তত্ত্ব এবং অব্যক্ত পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্বের জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহাদের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠতর, এ সকলের ভূমি ও প্রতিষ্ঠারূপে এই পুরুষ-তত্ত্বকে মানিয়া লইতে হয়। Necessity of thought বা logic of reasonএর দ্বারা এই পুরুষ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। কার্য্য দেখিয়া যেমন অজ্ঞাত কর্ত্তা বিশেষকে মানিতেই হয়; কারণ, জ্ঞান বলে যে কর্ত্তা ব্যতীত কার্য্য হয় না ও হইতেই পারে না; পূর্ব্ব দেখিয়াই পর, আর পর দেখিয়াই, যেমন না দেখিয়াও, পূর্ব্বকে মানিয়া লই; কারণ, পর ভিন্ন পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব ভিন্ন পর জ্ঞানেতে কিছুতেই ধরা যায় না; সেইরূপ ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মহান্-আত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য বা জীবাত্মা এবং জীবাত্মাকে দেখিয়া অব্যক্ত বা বিশ্বাত্মাকে যেমন জানি, সেইরূপ এই সকলকে জানিতে গিয়াই, এসকলের অপরিহার্য্য নিয়তি ও অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি এবং সম্ভবরূপে এই পুরুষকেও জানি। এই জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ। ইংরাজিতে ইহাকে subjective বলে। এ জ্ঞান objective বা বিষয়তন্ত্র নহে। ইহা আত্মজ্ঞানেরই বিকাশ ও স্ফুরণ মাত্র। অর্থাৎ এই পুরুষকে আত্মার মধ্যেই অনুভব করা যায়, আত্মার

সঙ্গেই তিনি অনুভবগ্রাহ্য হইয়া থাকেন। তাঁর সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিতয় সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। এই পুরুষ যে জ্ঞেয়-রূপে প্রকাশিত হন না, উপনিষদ আপনি এ কথা বলিয়াছেন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

এই আত্মা বা পুরুষ, (কারণ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতেই—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" একথা বলা হইয়াছে) সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, কোথাও তিনি প্রকাশ পান না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর হন না। সূক্ষ্মদর্শী যাঁরা, অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান-ক্রিয়ার নিগূঢ় নিয়মাদি দর্শন করিতে সক্ষম, তাঁরা বিশুদ্ধতম সূক্ষ্ম-বুদ্ধির দ্বারা ইঁহাকে দর্শন করেন বা জানেন। আর তাঁহাকে এই ভাবে জানিবার উপায় এই—

যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তং যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে (এখানে বাক্য অর্থে সমুদায় বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বুঝিতে হইবে) মনেতে প্রত্যাহার করিবেন; মনকে বুদ্ধিতে প্রত্যাহার করিবেন; বুদ্ধিকে জীবভূত যে আত্মা তাঁহাতে প্রত্যাহার করিবেন; আর এই যে আপনার অন্তরস্থিত সাক্ষীচৈতন্য বা জীবাত্মা তাঁহাকে শান্ত আত্মাতে প্রত্যাহার করিবেন। এই শ্রুতিতে যাঁহাকে শান্ত আত্মা (শান্ত আত্মনি) বলা হইয়াছে, তিনিই পুরুষ। তিনি শান্ত, অর্থাৎ তাঁহাতে কোনও সংগ্রাম, কোনও বিক্ষেপ, কোনও অবসাদ বা উল্লাসাদি নাই। এ সকলের অভাব তাঁর বিশুদ্ধ অদ্বৈত-স্বভাবের প্রতিষ্ঠা করে। কারণ যেখানে দ্বৈত সেখানেই আদান-প্রদান, সেখানেই হয়, বিরোধের বিক্ষেপ, না হয় মিলনের উল্লাস, অথবা বিরোধ-বর্জ্জনের কিম্বা মিলন-সাধনের

প্রয়াস থাকিবেই থাকিবে। এই জন্য শান্ত-আত্মা বলিলেই সর্ব্বপ্রকারের ভেদাভেদশূন্য নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে বুঝায়। অতএব কঠোপনিষদ যাঁহাকে এখানে পুরুষ বলিয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁর সম্বন্ধে, তিনি আছেন, এই মাত্রই বলিতে পারি। এতদতিরিক্ত তাঁর অন্য উপলব্ধি সম্ভবে না। সত্য বটে তিনি আব্রহ্ম-স্তম্বান্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডপুরেতে শয়ান রহিয়াছেন, তথাপি এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরে তাঁর সত্তামাত্রই বিদিত আছে। স্বরূপতঃ তিনি যে কি, তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞানের ভূমিরূপে তাঁহাকে মানিয়া লই, জ্ঞানের বিষয়রূপে জানিতে পারি না।

এইজন্য কঠোপনিষদের পুরুষ নির্গুণ ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যেমন বেদে, সেইরূপ উপনিষদেরও অনেক স্থানে পুরুষকে শরীরীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পাকতঃ কঠোপ-নিষদের এই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা পরম পুরুষকেও শরীরীরূপে কল্পনা করা যায় বটে। কিন্তু অন্যপক্ষে, ইঁহার এই অজ্ঞেয়তা নিবন্ধন, কঠ-শ্রুতি নিজেই ইঁহাকে অলিঙ্গ বা অশরীরী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কঠোপনিষদের যে শ্রুতিগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা তৃতীয়া বল্লীতে পাওয়া যায়। ষষ্ঠী বল্লীতে সেই পুরুষের কথাই আবার বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহান্ আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব বা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহান্ আত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য শ্রেষ্ঠ; মহৎ বা মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীরী পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

আর এই পুরুষ যে নির্গুণ ব্রহ্ম, পরবর্ত্তী শ্রুতির দ্বারাই ইহার প্রমাণ হয়।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

এই পুরুষকে বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কিম্বা চক্ষুর দ্বারা জানা যায় না। তিনি আছেন, এই মাত্র বলা ব্যতীত অন্যভাবে কিরূপে তাঁহার উপলব্ধি করিবে? এই পুরুষ সমাধি দ্বারা লভ্য।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয়-চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানীগণ পরম গতি বলেন। অর্থাৎ ইহাই এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এই নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয়। এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, কঠ শ্রুতির পরম পুরুষকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহাকে কিছুতেই গীতার পুরুষোত্তমেরই নামান্তর বলা যায় না।

এই কারণেই বলিতে হয় যে এই পুরুষোত্তম কথা ও পুরুষোত্তম উভয়ই গীতার নিজস্ব; বেদে বা উপনিষদে এ বস্তু নাই। পুরুষোত্তমই গীতার বিশিষ্ট সাধ্য।

এই পুরুষোত্তম কে? গীতা যে পুরুষোত্তমের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ কি?

পুরুষ শব্দের মূল অর্থ—যিনি পুরীতে বা দেহেতে শয়ান আছেন। পুরুষ শব্দের মুখ্য অর্থ দেহী। গীতায় পুরুষ শব্দ স্থানে স্থানে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

হে পুরুষর্ষভ! যে পুরুষকে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সংস্পর্শে যে সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হয়, তাহারা ব্যথিত করে না, যাঁর সুখদুঃখে সমজ্ঞান-সিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই অমৃতত্ব লাভের যোগ্য। এখানে যাঁহাকে পুরুষ বলিয়াছেন, অন্যত্র তাঁহাকেই শরীরী, দেহী ইত্যাদি উপাধির দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন। এই শরীরী বা দেহী বা পুরুষকে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের "আমি" রূপে জানি। এ জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষ; অপরোক্ষঅনুভূতিমূলক; এই আমিকে আমরা জ্ঞানের বিষয়রূপে জানি না। কিন্তু স্বয়ং জ্ঞাতারূপে জানি। আমি জ্ঞাতা, আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা,—ইত্যাদি উপলব্ধি হইতেই এই পুরুষকে আমরা জানিতে পারি। আর এই পুরুষকে দিয়াই পুরুষোত্তমকে জানি; তদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম যে কি ও কে, ইহা জানিবার ও বুঝিবার আর কোনও উপায় নাই।

কঠ-শ্রুতি যে পুরুষের কথা কহিয়াছেন, তাঁহাকে কিন্তু এভাবে জানিতে পারি না। পুরুষ-তত্ত্বের নিম্নে কঠোপনিষদ যে অব্যক্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই অব্যক্তকে পর্য্যন্ত আমরা এইভাবে জানিতে পারি না। আমাদের অহং বা আত্মা পর্য্যন্তই সর্ববিধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চরম সীমা। মহান্ আত্মা বা জীবাত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য হইয়া যিনি আমাদের ভিতরে আছেন, যাঁহাকে আমরা জ্ঞানেতে এবং মোহেতে, সকল অবস্থাতেই, "আমি" বলিয়া ডাকি ও বুঝি,—তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি। কারণ সেই বস্তু যে আমরা নিজে। কিন্তু এই মহান্ আত্মার বা জীবাত্মার, এই অহংপ্রত্যয়-বাচক অন্তর্যামি পুরুষের বা সাক্ষীচৈতন্যের বাহিরে যে বিশ্বাত্মা বা অব্যক্ত আছেন, ইহা ফলতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, এক অর্থে অনুমিত মাত্র। অর্থাৎ এই অব্যক্তকে বা বিশ্বাত্মাকে আমরা জানি না, কিন্তু যে অহংকে সাক্ষাৎভাবে জানি তাহার জ্ঞানের প্রয়োজনেই মানিয়া লইতে বাধ্য হই। যাহা অব্যক্ত, তাহা কখনওই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

উপনিষদের ব্রহ্ম জীবে ও জগতে প্রকাশিত, গীতার
জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

ফলতঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে বুঝি যে যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বা বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড বলি, তাহারও কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এক অর্থে আমাদের নাই। আমাদের নিজেদের ভিতরে যে রূপরসাদির অনুভূতি হয়, তাহাকেই বাহিরে প্রক্ষেপ বা আরোপ করিয়া, আমরা জগতের রূপরসাদি আছে বলিয়া ধরিয়া লই। এই জন্যই আমাদের ভিতরে যাহা নাই, বাহিরে আমরা কখনওই সত্যভাবে তাহা দেখি না ও দেখিতে পারি না। আমাদের নিজের অপরোক্ষ অনুভূতি অপরেতে প্রক্ষেপ বা আরোপ করিয়াই আমরা তাহাদের যা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। এরা নিজ নিজ স্বরূপে যে কি, ইহা আমাদের অজ্ঞাত। আর এই জগতের অন্তরে বা অন্তরালে যিনি বসিয়া আছেন, যাহা হইতে এই প্রবাহ অভিব্যক্ত হইতেছে, সেই অব্যক্ত পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞান ত আমাদের থাকিতেই পারে না। এই অব্যক্তের উপরে, ইঁহারাও অন্তরালে যে পুরুষ আছেন বলিয়া কঠ-শ্রুতি বলিতেছেন, তাঁহাকে জানিব এমন কোনও সূত্র ত আমাদের মধ্যে নাই। এক বস্তুর দ্বারা তাহা হইতে একান্ত ভিন্ন অপর বস্তুর কোনও জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। মাটির ঢেলা দেখিয়া পশুরাজের কিম্বা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনওই কল্পনা করাও অসাধ্য। শৃগালকে দেখিয়া সিংহকে কল্পনা করিতে পারি; কৃমিকে দেখিয়া পারি কি? তবে যদি বলা হয় যে আমরাও পুরুষ, আর কঠ-শ্রুতি যে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিও পুরুষ; তাহা হইলে তাঁর সঙ্গে আমাদের স্বজাতীয়তা বা সামান্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং এই গুণসামান্য আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যে পুরুষ, এ জ্ঞান আমাদের আছে। এই জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ। আর আমরা নিজেদের যেরূপ পুরুষ বলিয়া জানি, পরমতত্ত্বকেও সেইরূপ পুরুষ বলিয়াই জানিতে

পারি; তার বেশী যদি তাঁহাতে কিছু থাকে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না। আমরা ক্ষুদ্র পুরুষ, তিনি বৃহৎ পুরুষ; আমরা অপূর্ণ পুরুষ, তিনি পূর্ণ পুরুষ; আমরা নিকৃষ্ট পুরুষ, তিনি উৎকৃষ্ট পুরুষ; এ সকল তারতম্য তাঁর সঙ্গে আমাদের থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি যদি একান্তভাবে আমাদের হইতে ভিন্ন ও পৃথক হন, তাহা হইলে, আমরা আমাদের নিজেদেরে যে পুরুষরূপে জানি, তাহার দ্বারা তাঁর স্বরূপের কোনও প্রকারের উপলব্ধি আমাদের সম্ভব হইবে না ও হইতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, এই বলিতে হয় যে কঠোপনিষদ যে পুরুষকে পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুতেই আমাদের পুরুষত্বের দ্বারা ধরিতে ও বুঝিতে পারি না। গীতা যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের গুণ-সামান্য আছে বলিয়া, তাঁহাকে আমরা সত্যভাবে, রূপতঃ ও স্বরূপতঃ জানিতে ও বুঝিতে পারি। কারণ এই পুরুষোত্তম, আমরা যাহা তাহারই উত্তমাবস্থা। শৃগালকে দেখিয়া যেমন সিংহ যে কি ইহা বুঝিতে ও ধরিতে পারি; বিড়ালকে দেখিয়া যেমন ব্যাঘ্র যে কি ইহা বুঝিতে ও ধরিতে পারি; মাটির টিলা দেখিয়া যেমন অভ্রভেদী গিরিরাজ যে কিরূপ ইহা ধারণা করিতে পারি; সেইরূপ নিজেদের পুরুষ-লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের এই ক্ষুদ্র, নিকৃষ্ট, অপূর্ণ পুরুষত্বের দ্বারাই পুরুষোত্তম যে কি ও কে, ইহা ধরিতে পারি।

উপনিষদ জীবেতে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "শ্বেতকেতো! তত্ত্বমসি"—হে শ্বেতকেতো তুমি সেই ব্রহ্ম; "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি ব্রহ্ম; "আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং"—এই আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের অভ্যন্তরে নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছেন; "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য"—আত্মাতে এই ব্রহ্মকে দর্শন করিবে;—"প্রতিবোধবিদিতং"—এই ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা যায়;

"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু তৎসমুদায় ব্রহ্ম; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, তৎসমুদায়কে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে;—এইরূপ অসংখ্য শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে জীবে ও জগতেতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ব্রহ্মকে জীবে ও জগতে দেখা উপনিষদের সাধনার সাধ্য।

গীতা উল্টা পথ ধরিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন, উপনিষদ বাক্য সত্য। ব্রহ্ম জগতে আছেন।

ময়াততং মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত রূপিনা

"অব্যক্ত"রূপী আমার যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার দ্বারা সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই গীতার শেষ কথা নহে। ইহা সত্যের একদেশ মাত্র। ব্রহ্ম যেমন জীবে আছেন, ব্রহ্ম যেমন জগতে আছেন; এই জীব এবং জগতও সেইরূপ ব্রহ্মেতে আছে। ব্রহ্মের সত্তা জীবে ও জগতে পরিপূর্ণ, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁর প্রকাশ এখানে পরিণামী; অর্থাৎ উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম হইতেছে। জগতের ও জীবের সত্তা এবং প্রকাশ ব্রহ্মেতে উভয়ই নিত্য-সিদ্ধ, পূর্ণতম। সেখানে ব্রহ্মেতে যাহা ফুটিয়া আছে, পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত; এখানে, জগতে ও জীবে তাহা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে। এই জন্যই এখানে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, পূর্ণ-অপূর্ণ, উত্তম-অধম, এসকল ভেদ ও বৈষম্য দেখিতে পাই। আর ঠিক এই হেতুতেই সেখানে, ব্রহ্মস্বরূপে জীব ও জগৎ তাহাদের পূর্ণতা পাইয়া আছে, নিত্যকাল পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এখানে জীবাত্মার মধ্যে আমরা এই জন্যই পুরুষকে মাত্র দেখি। এই পুরুষ অভিব্যক্তিশীল। কিন্তু ঐখানে, ব্রহ্মেতে এই পুরুষ নিত্য-পূর্ণ। ঐ ব্রহ্মে আর পূর্ণ পুরুষে কোনও ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই পুরুষ। এক দিক্ দিয়া দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি; আর দিক্ দিয়া দেখিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলি। আর যেখানে ব্রহ্ম আর পুরুষ এক, সেইখানেই

পরমতত্ত্ব পুরুষোত্তম। উপনিষদ ব্রহ্মকে জীবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। গীতা জীবকে তার নিত্য, পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠতম, সর্ব্বোত্তম স্বরূপে ব্রহ্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্রহ্মকে পুরুষোত্তমরূপে জীবের নিত্য সাধ্য করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব সগুণও নহে, নির্গুণও নহে; সগুণ+নির্গুণও নহে; এ তত্ত্ব সগুণ ও নির্গুণ উভয়ের অতীত। ইহাই গীতার মূল শিক্ষা। আর এই যে সগুণ-নির্গুণাতীত পরমতত্ত্ব, তাহাই গীতার কৃষ্ণ-তত্ত্ব। এই তত্ত্বোপদেশ ধরিয়াই গীতার কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা।

ভাদ্র, ১৩২২ সাল।

সূচী।

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কীর্ত্তন	...	...	১০০৫
২।	কবিতার কষ্টি-পাথর	...	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	১০০৭
৩।	মৃত্যু স্বপ্ন (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	১০৩৩
৪।	দরদিয়া (গল্প)	...	শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	১০৩৯
৫।	অন্ধকারে (কবিতা)	...	...	১০৪৪
৬।	আমার কথা	...	শ্রীমতী জগদম্বা দেবী	১০৪৫
৭।	গান	...	...	১০৫৫
৮।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	...	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০৫৬
৯।	পুঁটুর বাপ (গল্প)	...	শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী	১০৬৮
১০।	বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে	...	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০৮৬
১১।	কালীদাসের মেয়ে দেখান	...	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০৯৬
১২।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব	...	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	১১০৫
১৩।	গান	...	...	১১১৭
১৪।	নাটুকে রামনারায়ণ	...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	১১১৮

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা ও ডাকমাশুল /০ এক আনা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন,
বিজয়া প্রেসে,—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা] [ভাদ্র, ১৩২২

কীর্ত্তন

এস আমার সাঁঝের বরণ,
এস আমার সজল আঁখি,
এস এস এস এস হে!
মান ক'রে আর থেক না হে!
ঐ দূরে দাঁড়ায়ে থেক না হে!
ওই যে তোমার সজল নয়ন,
কেমন করে পরাণ রাখি।
এস এস এস এস হে!
এস এস এস এস হে!
এস আমার আঁধার বরণ,
আজ তোমারে বুকে রাখি।
সকাল সন্ধ্যা দিবস যামি,
আর কারো পানে চাইনি আমি!—
ওগো আমার আঁধার বরণ,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
বুকের ব্যথা বুকে ক'রে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
এই অনুরাগ চেপে চেপে,

তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
লাজের ভরে নীরবে হে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।
এস আমার সাঁঝের বরণ,
এস তোমায় বুকে রাখি!
(আর) লাজের বাধা মান্‌বো না হে!
এই অনুরাগ চাপ্‌বো না হে,
সকল জীবন খুলে দিব,—
কিছুই আর ঢাক্‌বো না হে!
এস এস এস এস হে!
মান ক'রে আর থেক না হে!
ওই শুন আমার প্রাণের কান্না,
এই হের আমার সজল আঁখি।
এস আমার আঁধার বরণ,
আজ তোমারে বুকে রাখি।

কবিতার কষ্টি-পাথর

মামলার মূল।

কবিতার কথা লইয়া কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। কবিতার ভাল-মন্দের কষ্টি-পাথর কি, এই প্রশ্ন হইতেই এই গোল উঠিয়াছে। এরূপ বিষয়ে মতভেদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের মাটির গুণে মতভেদ হইলেই দলা-দলি পাকাইয়া উঠে। এক্ষেত্রেও যে তাহা হয় নাই, এমন বলিতে পারি না। মূলে দুই দলের মধ্যে যে কোনও সাংঘাতিক গরমিল আছে, এমনও মনে হয় না। বেশীর ভাগ গোল বোধ হয় কেবল কথা লইয়া। আর সকলের চাইতে এই গোলের মূল আমাদের অভিমান ও অসহিষ্ণুতা।

কবি-বিশেষের কবিতার গুণাগুণের কথা না তুলিয়া, নিতান্ত নির্গুণ (বা abstract) ও নিরাকার (বা impersonal) ভাবে এবিষয়ের আলোচনা হইলে, এতটা গোল পাকাইয়া উঠিত না। সেরূপ নির্গুণ আলোচনা-প্রসঙ্গে যদি বলিতাম যে—"কবিতার প্রাণ রস", সে কথায় কেহ আপত্তি করিতেন না। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়া আসিয়াছে।—"আর এই রস হয় বর্ত্তমান বস্তুর সাক্ষাৎকার, না হয় পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ বস্তুর সাক্ষাৎকারের স্মৃতি হইতেই কেবল উৎপন্ন হয়, শূন্য হইতে কিম্বা কেবল মনের ভিতর হইতে আপনি জন্মে না"—তাহাতেও যে বড় একটা কথা উঠিত, এমনও বোধ হয় না। কারণ, ইহা ত অতি মামুলী কথা। রস-বস্তুর অভিজ্ঞতা যারই আছে, আর কি ভাবে এবস্তু ফোটে ইহা যে'ই কোনও দিন তলাইয়া দেখিয়াছে, সে'ই ইহা জানে।—"কিন্তু বস্তু-বিশেষকে ধরিয়াই জন্মিলেও, এই রস আমাদের মনের বা আত্মারই অনুভবের বিষয়। বস্তু আমাদের

ভোগ্য, আমরা তার ভোক্তা : আর করুণ-রুদ্রাদি আগন্তুক রস, কিম্বা দাস্যসখ্যাদি স্থায়ী রস, উভয়ই আমাদের মধ্যে এই ভোগ-হইতে উৎপন্ন হয়। তবে ভোক্তা সর্ব্বদাই আপনার ভোগ্য অপেক্ষা বড় ভোগ্যকে ছাড়াইয়া থাকেন। এই কারণে, বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুর সাক্ষাৎকারে জন্মিলেও, এই সকল রস সর্ব্বদাই সে বস্তুকে ছাপাইয়া উঠে এবং ছাড়াইয়া যায়। আর এই ভাবে ছাপাইয়া উঠে ও ছাড়াইয়া যায় বলিয়াই, তাহার ভিতরে একটা সার্ব্বজনীনতা ও বিশ্ব-জনীনতা প্রচ্ছন্ন থাকে। রস মাত্রেই নানা আধারে, নানা রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এসকল নানাত্বের মধ্যে তার একটা একত্ব; এসকল চঞ্চল রূপের মধ্যেই তার একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপও বিদ্যমান থাকে। আর রসের বিশিষ্ট রূপের মধ্য দিয়া, এই সকল বিশিষ্ট রূপের আশ্রয়েই, নিপুণ কবি-প্রতিভা তার এই সার্ব্বজনীন, এই বিশ্বজনীন, এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটিকে ফুটাইয়া তুলে। এই ভাবেই শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি হয়।”—এই কথা বলিলেও, সকলেই যে ইহা ভাল করিয়া বুঝিত, এমন নাওবা হইতে পারে; কিন্তু বুঝুক আর নাইবা বুঝুক, তাহাতে কাহারও আঁতে ঘা লাগিত না; এবং সেক্ষেত্রে, সকলে না হউক, অনেকেই এসকল কথায় সায় দিয়া যাইতেন। কিন্তু প্রয়োগের বেলা, নিজ নিজ মনোমত ভাষ্যাদি রচনা করিয়া, এসকল সূত্রের এমন অর্থ করিয়া লইতেন, যাহাতে ইহার দ্বারা তাঁহাদের যে সকল কবিতা মিষ্ট লাগে, তাহারই উৎকর্ষ প্রমাণিত হইত এবং যাহা তাঁহাদের পছন্দ হয় না তাহা নিন্দনীয় হইয়াই থাকিত। সেরূপ নির্গুণ আলোচনায় কোনও গোলই বাধিত না, সত্য; অন্যপক্ষে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াও থাকিত। এখন যেমন যার যাহা ভাল-লাগে, লোকে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া ধরিয়া লইতেছে, তখনও তাহাই থাকিয়া যাইত। সাহিত্য-সমালোচনার, বিশেষ কাব্য-সমালোচনার, কোনও সত্য ও প্রামাণ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইত না।

ভাল-লাগা ও আনন্দ।

এই ভাল-লাগাটাই প্রকৃতপক্ষে, এখন আমাদের সাহিত্যে সোনার কাঠি হইয়া আছে। তবে এই উদার-শিক্ষার যুগে নিতান্ত মামুলী বস্তুরও এক একটা দার্শনিক নাম-করণ হইয়া যায়। এই ভাল-লাগাটাকে অনেকেই আনন্দ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে এই ভাল-লাগার একটা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, আমাদের ধর্ম্মে ও দর্শনে এই আনন্দ শব্দটি অতি প্রাচীন। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সাধন-সম্পদ-সম্ভার বহন করিয়া এই আনন্দ কথাটি আমাদের নিকটে আসিয়াছে। উপনিষদ এই আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ভাগবত এই আনন্দকেই নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের নিজ-স্বরূপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আনন্দ হইতেই সৃষ্টি।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

"আনন্দ হইতেই যাবতীয় ভূতগ্রাম জন্মগ্রহণ করে। জন্মিয়া আনন্দেতেই সকলে জীবিত রহে। অন্তিমে আনন্দেতেই সকলে প্রবেশ করে।" সৃষ্টির মূলে, মধ্যে, অন্তে, সর্ব্বত্র এই আনন্দ বিদ্যমান। স্রষ্টা আপনার অন্তরতম যে আনন্দ তাহারই প্রেরণায় এই সৃষ্টির প্রকাশ করিয়াছেন। এই সৃষ্টি তাঁর আনন্দেরই মূর্ত্তি।

কবির কৈফিয়ৎ।

কবি কহিতেছেন—"আমার সৃষ্টিও ত তাহাই। আমিও আমার অন্তরের আনন্দের প্রেরণাতেই কবিতা লিখি। এই আনন্দের কষ্টি-পাথরেই আমার কবিতাকে কষিতে হইবে। তোমরা বল, কবিতার প্রাণ রস। ইহা আমারই কথা। রস আর আনন্দ ত একই বস্তু। 'রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'—পরমেশ্বর স্বয়ং রস-স্বরূপ। তাঁর এই রস পাইয়াই জীব আনন্দিত হয়। রস মাত্রেই

আনন্দাত্মক। আর এই আনন্দ বাহিরের বস্তু নয়। ইহাকে চক্ষে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, হাত দিয়া ইহাকে ধরিতে বা ছুঁইতে পাই না। আনন্দের অনুভব কেবল প্রাণের ভিতরেই হইয়া থাকে। এই আনন্দ বা রস জীবের অন্তরতর, অন্তরতম কথা। ইহা শুদ্ধ অনুভূতিগ্রাহ্য। যাহা চক্ষুগ্রাহ্য, চক্ষু বা দৃষ্টি যেমন তার একমাত্র প্রমাণ, আর এই প্রমাণ যেমন তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, সে বস্তুর প্রতিষ্ঠা যেমন আর প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে না; সেইরূপ কেবল প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়াই যাহাকে জানিতে হয়, সেই আন্তরিক অনুভূতিই তার একমাত্র প্রমাণ। তার পক্ষে এই প্রমাণই পর্য্যাপ্ত, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। আমার অন্তরের আনন্দের প্রেরণাতেই যখন আমার কবিতা ফোটে; এই আন্তরিক আনন্দানুভূতিই যখন আপনি আপনার ছন্দো-বন্ধরূপ ফুটাইয়া তাহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করে; তখন সে কবিতা রসাত্মক নহে, তোমরা একথা বলিলেই আমি তাহা শুনিব কেন? মানিব কেমন করিয়া? তোমাদের কথাকে আমি মর্য্যাদা করিতে পারি; কিন্তু সেকথা যখন আমার প্রত্যক্ষের প্রতিবাদ করে, তখন তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি কিরূপে? আমি যাহাতে অমন আনন্দ পাই, তাহা তোমাদের আনন্দদান করে না, ইহা বুঝি। কিন্তু আমার মিষ্ট লাগে বলিয়া, তোমরাও কেন ইহাতে রস পাইবে না, একোর যেমন আমি করিতে পারি না; সেইরূপ তোমাদের যাহা ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগিলেও তাহাকে মন্দ বলিয়া সন্দেহ করিব, এই জবরদস্তিই বা আমার উপরে তোমরা করিবে কেন? তবে ভাল-লাগাটা ভাবাত্মক, হাঁ-প্রত্যয়-বাচক। ইহা প্রত্যক্ষের কথা। আর ভাল-না-লাগাটা অভাবাত্মক, না-প্রত্যয়-বাচক। আর 'না' কখনও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ হয় না। 'না'-প্রত্যয় মাত্রেই স্বল্পাধিক অনুমান-প্রতিষ্ঠ। অনুমানের দ্বারা প্রত্যক্ষ অসিদ্ধ হয় না।"

ইষুর গোল।

এখানে কবি মূল কথা বা ইষুটা একটু গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমতঃ, রস আর আনন্দ কি ঠিক একই কথা? কবি বলিতেছেন, "রস মাত্রেই আনন্দাত্মক"। কিন্তু রস আর আনন্দ এক হইলে, এমন কথা বলা যাইত কি? তাহা হইলে, "রস মাত্রেই আনন্দাত্মক" না বলিয়া "আনন্দ মাত্রেই আনন্দাত্মক", ইহাও বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সে কথার কোনও অর্থ হইত না। রসেতে আনন্দ আছে। আনন্দ রসের আত্মা। কিন্তু আনন্দ ছাড়াও তাহাতে আর কিছু আছে, আত্মা ছাড়াও তার একটা দেহ আছে; "রসমাত্রেই আনন্দাত্মক"—বলিলে ইহাই বুঝায়। "রস বৈ সঃ। রসোহেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"।—পরমেশ্বর রস-স্বরূপ। পরমেশ্বরের রস পাইয়াই, এই জীব আনন্দিত হয়। এখানেও রস আর আনন্দ যে একই বস্তু, এমন বলা হয় নাই। পুত্রকে পাইয়া মাতার আনন্দ হয়। এখানে পুত্রই যে আনন্দ তাহা নহে। পুত্র আশ্রয়, আনন্দ আশ্রয়ী। রস বিষয়াশ্রিত, বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম; আনন্দ বিষয়ীর আশ্রিত, তাঁর জ্ঞান ও ভোগের ফল। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে পার্থক্য, রস এবং আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ। কবি এই কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন।

তার পর, ভাল-লাগার কথা। এই ভাল-লাগাটা বা আনন্দানুভূতি রসের অস্তিত্বের প্রমাণ, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। আপনার সৃষ্টিতে যখন কবির এমন আনন্দ হয়, তখন সে কবিতায় রস নাই, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু ভাল-লাগার বা আনন্দানুভূতির দ্বারা রস আছে, এইটুকুই জানি। সে রস শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তার কোনও প্রমাণ হয় কি? ফলতঃ আনন্দানুভূতির দ্বারা রসের অস্তিত্বেরই প্রমাণ হয়, রসের আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় না। আর এই আদর্শটাই যে এখানে মূল কথা। এই মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াই, কবি আপনার কৈফিয়তে আসল ইষুটাকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

এই আদর্শ কেবল আমাদের নিজ নিজ অনুভূতির দ্বারা কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই অনুভূতি, যে ইহা অনুভব করে, তার নিতান্ত ভিতরকার কথা। কবির আপনার কাব্যে যে আনন্দানুভব হয়, ইহা তাঁর অতি অন্তরঙ্গ কথা। তিনি ছাড়া আর কেউ একথার মর্ম্ম, অর্থ, সত্যাসত্য বুঝে না ও বুঝিতে পারে না। সমালোচক যে সে কাব্যেতে কখনও সে আনন্দ পান না, ইহাও তাঁর অতি অন্তরঙ্গ কথা। তিনি ছাড়া একথার আর কোনও সাক্ষী-সাবুদ নাই। এক্ষেত্রে কবির অন্তরঙ্গ অনুভব একদিকে, আর সমালোচকের অন্তরঙ্গ অনুভব অন্যদিকে, এই দুই অনুভবের মধ্যে কোন্‌টা সঙ্গত, কোন্‌টা অসঙ্গত, ইহার মীমাংসার কোনও সূত্র, কোনও লক্ষণ, কোনও কষ্টিপাথর আছে কি নাই? যদি এরূপ কোনও সূত্র না থাকে, তবে এ আলোচনারই বা ফল কি? সেক্ষেত্রে সমালোচকের সমালোচনা এবং কবির আত্মসমর্থন, দু'ই নিতান্ত নিরর্থক হয়। কিন্তু সমালোচক যখন কবির বিরুদ্ধে এজাহার দেন, আর কবি যখন সেই এজাহারের জবাব দিতে অগ্রসর হন, তখনই বুঝিতে হইবে যে ইঁহারা দুইজনেই নিজেদের ভাল-লাগা বা না-লাগা, নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা স্বানুভূতি ছাড়া, একটা উচ্চতর আদালতের এলাকা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁদের নিজের যা ভাল লাগে, সত্য সত্যই যে তাহা ভাল; কিম্বা যা ভাল লাগে না, সত্য সত্যই যে তাহা মন্দ; এ দাবী দু'জনাই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কবির নিজের আনন্দানুভূতিই যদি তাঁর কাব্যের সত্যতার ও শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হয়, তবে তিনি কৈফিয়ৎ দেন কেন, কাহার নিকটে? কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়ার মানেই বিচারপ্রার্থী হওয়া। আর বিচার মাত্রেই প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু কবির অন্তরের অনুভূতি ছাড়া যদি তাঁর কাব্যের সত্যাসত্যের বা উৎকর্ষাপকর্ষের আর কোনও প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজে ছাড়া,

তাঁর সাক্ষীই বা আর কে আছে, বা থাকিতে পারে? তাঁর অনুভূতি সত্য কি অসত্য, শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, তাহা তাঁরই অনুভবগম্য; তিনিই কেবল তাহা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারেন, অপরে বুঝিবে কেমন করিয়া? সে অবস্থায়, তিনি আপনিই বাদী, আপনিই আপনার সাক্ষী, আপনিই আপনার বিচারক। কৈফিয়তের অবসর আর সেখানে রহিল কৈ?

তর্ক ও তত্ত্ব।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-সাধনাতে এ বিষয়টা নিতান্ত অপরিচিত নহে। কতকগুলি তত্ত্বকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মানীষীগণ শুদ্ধ অন্তরের অনুভূতিগ্রাহ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং পরলোকতত্ত্ব এই আন্তরিক অনুভূতিগ্রাহ্য তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এ তত্ত্ব অতর্ক-প্রতিষ্ঠ, শুদ্ধ অপরোক্ষ-অনুভূতিগ্রাহ্য। এইজন্য এদেশের তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা এসকল বিষয়ে কখনও তর্ক-বিতর্ক করেন না। যে পথে গেলে এই অপরোক্ষ-অনুভূতি খুলিবার সম্ভাবনা, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন শিষ্য পাইলে, তাহাকে সেই পথ কেবল ধরাইয়া দেন। কারণ, তর্কের ভূমিতে গেলেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া, আর একটা প্রামাণ্যের অস্তিত্ব মানিতে হয়। নতুবা তর্ক চলিবে কিসের উপরে?

আসল কথা এই, মুখে যিনিই যাহা বলুন না কেন, ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া সত্যাসত্যের, সুন্দর-কুৎসিতের, এবং ভাল-মন্দের একটা সার্ব্বজনীন মাপকাঠি ও আদর্শ যে আছে, যেখানেই বিচার-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বাদী-প্রতিবাদী, অর্থী-প্রত্যর্থী, পূর্ব্বপক্ষ-উত্তর-পক্ষ, সেইখানেই কার্য্যতঃ ইহা মানিয়া লওয়া হয়। না হইলে বিচার, তর্ক, মীমাংসা কিছুই সম্ভব হয় না। কবি কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়াই এটি মানিয়া লইয়াছেন।

আনন্দের বহু রূপ।

আনন্দ পাওয়া আর আনন্দ দেওয়াই-কবির কাব্য-সৃষ্টির এক-

২

মাত্র লক্ষ্য। লোক-শিক্ষা বা লোকহিত তাহাতে হয় হউক; সে কষ্টি-পাথরে কাব্য-রস কষিলে চলিবে না, ইহা মানিলাম। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও ত ইতরবিশেষ আছে? কেবল কবিতা পড়িয়াই যে লোকে আনন্দ পায়, তাহা নহে। রসগোল্লা খাইয়াও আনন্দ পায়। আর রসগোল্লার আবিষ্কার যে প্রথমে করিয়াছিল সে'ও আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। যে যাহা নির্ম্মাণ করে, যদি সে নির্ম্মাণ-কার্য্যে তার প্রাণ থাকে, সে তাহাতেই আনন্দ পায়। কবি কবিতা লিখিয়া আনন্দ পান। রাঁধুনী রাঁধিয়া আনন্দ পায়। সূত্রধর খাট-আলমারী তৈয়ার করিয়া আনন্দ পায়। মালী বাগান করিয়া আনন্দ পায়। আর নির্ম্মাণে নির্ম্মাতা, কর্ম্মে কর্ত্তা যেমন আনন্দ পান, ভোগে ভোক্তাও সেইরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন। মিষ্টান্ন খাইয়া আনন্দ হয়। পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দ হয়। তত্ত্বের অনুসন্ধানে আনন্দ হয়। ভক্তির অনুশীলনে আনন্দ হয়। কৃপণের ধন-রক্ষণে, আর দাতার সেই ধনই অকাতরে বিতরণে, আনন্দ হয়। শৈশবে গুরুজনদিগের মুখে শুনিতাম—

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরাঃ ঘনগর্জ্জনে।
সাধবঃ পরকার্য্যেষু দুর্জ্জনঃ পরপীড়নে॥

কিন্তু ব্রাহ্মণের ফলারের আনন্দ, সাধুদিগের পরোপকারের আনন্দ, দুর্জ্জনদিগের পরপীড়নের আনন্দ, সকলই কি এক? এসকলের মধ্যে কি কোনও শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদ নাই? যদি থাকে, তবে তাহার প্রমাণ কি? পরীক্ষা হইবে কিসে? আনন্দ যে পায়, তার নিজের আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা ইহার বিচার ত হয় না, হইতেই পারে না? তাহা হইলে, কবির বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের ধ্যানে ও চিত্রণে যে আনন্দ হয়, দস্যুর পরস্বাপহরণের এবং দুর্জ্জনের পরপীড়নের আনন্দের সঙ্গে তার কোনও প্রভেদ থাকে না। তারপর, একই বিষয়েতেও যখন বহুলোকে

আনন্দ পায়, তখনও তাদের সকলের আনন্দ সমান হয় না। আর এখানেই বা এই নানালোকের আনন্দের ওজন করিব কোন্ তৌলে চড়াইয়া? কেবল অনুভূতির দ্বারা এ বিচার হয় না। আমার অনুভূতি কোথায় কম, কোথায় বেশী, তার বিচার আমি করিতে পারি, তুমি পার না। তোমার অনুভূতি কতটা, তার ওজনও কেবল তুমিই জান, আমি জানি না। তবে যে বলি,—"এ বিষয়ে তোমার তেমন আনন্দ হয় নাই, দেখিতেছি," তাহা তোমার আনন্দানুভূতির বাহিরের প্রকাশ দেখিয়া। এখানে আমি ইহা ধরিয়া লই যে তোমার আনন্দ আর আমার আনন্দ, দু'ই মূলতঃ একই বস্তু। আর এই আনন্দবস্তু যে আকারে আমার বাহিরে, অর্থাৎ আমার মুখের ভাবে, চোখের চাহনিতে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুলকাদিতে প্রকাশিত হয়, তোমার মুখে চোখে দেহেতেও সেইরূপই প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকাশ বলিতেই রূপ বুঝায়। আর রূপ বলিতেই স্বরূপের কথা আইসে। যাহা প্রকাশের পিছনে থাকে, তাহাই প্রকাশিত হয়। পিছনে যাহা থাকে, তাহা পূর্ণ হইয়া আছে। প্রকট যাহা হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে। বীজেতে গাছের স্বরূপটি নিহিত। ক্ষুদ্র বট-বীজাঙ্কুর মধ্যে সমগ্র বটগাছটি লুকাইয়া আছে। সেই বীজ হইতেই গাছটি তিলে তিলে ফুটিয়া বাহির হয়। আর যে পরিপূর্ণ বটগাছ বীজের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ, তাহাই বাহিরে অঙ্কুর হইতে চারা, চারা হইতে ছোট গাছ, ছোট গাছ হইতে অসংখ্য-শাখ বনস্পতিরূপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। এই যে নিত্যসিদ্ধ বট-বৃক্ষটি বীজের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া আছে, তাহাই তার স্বরূপ। সেই স্বরূপ দিয়া নানা বট-বৃক্ষেতে যে রূপ প্রকাশিত হয়, তার ছোট-বড়র, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের, উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয়। এইটি না থাকিলে, কোন্ বটগাছ যে ভাল, কোন্‌টাই বা মন্দ, ইহা কে বলিতে পারিত?

রূপ ও স্বরূপ।

যাহা বাহিরে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই আমরা রূপ বলি। যাহা

হইতে এই প্রকাশ হয়, যাহা এই প্রকাশের পিছনে আছে, তাহাই সে রূপের স্বরূপ। আমাদের ভিতরকার অনুভবের একটা স্বরূপ আছে। বাহিরে কথায় বা কার্য্যে, বিশেষ আমাদের মুখের ভাবে, চোখের চাহনিতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিশেষ-বিশেষ সংস্থানে যাহা প্রকাশিত হয়, এগুলি সে অনুভবের রূপ। ভয়াদি আগন্তুক, কিম্বা দাস্যাদি স্থায়ী রসের অনুভবে আমাদের দেহেতে যে রূপ ফোটে তার পিছনে এসকলের একটা স্বরূপ অবশ্যই লুকাইয়া আছে; না হইলে এসকল রূপ ফোটে কোথা হইতে? এ সকল রসের প্রকাশের বা রূপের মধ্যে একটা সজাতীয়তা, কতকগুলি সামান্য লক্ষণও সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই সামান্য লক্ষণগুলির দ্বারাই তারা যে একই বস্তুকে নানাভাবে প্রকাশ করিতেছে, ইহা বুঝি। যাহাকে এখানে একই বস্তু বলিলাম, তাহাই এসকল রসের স্বরূপ। সকল রূপের বা প্রকাশের মধ্যেই তাদের নিজ নিজ স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। কোনও রূপেতে সে স্বরূপের প্রকাশ বা বেশী হয়, কোনও রূপেতে বা কম হয়। কিন্তু রূপ মাত্রেই স্বরূপকে প্রকাশিত করে। এই স্বরূপ দিয়াই রূপের তারতম্যের বিচার হইয়া থাকে। যে রূপেতে স্বরূপের যত বেশী প্রকাশ হয়, তাহাই তত শ্রেষ্ঠ, যাহাতে যত কম প্রকাশ হয়, তাহাই তত নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। আনন্দের রূপ অসংখ্য। আনন্দের এসকল অসংখ্য রূপের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিজ নিজ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটিও আমাদের চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হয়। রূপের সঙ্গেই যে স্বরূপের প্রকাশ হয়, তাহাকে অনুভূতি বলা যায় না, তাহা অনুভূতির ভূমি, রূপের মধ্যে তার আভাস পাই মাত্র। এইজন্য স্বরূপের জ্ঞানকে মামুলী অর্থে অনুভূতি না বলিয়া প্রত্যয়, perception না বলিয়া intuition বলাই শ্রেয়স্কর। কারণ বস্তুর বা ভাবের রূপই কেবল আমাদের এই অনুভবগম্য; তার স্বরূপ এই অনুভবগম্য নহে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আনন্দের যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের কথা বলিতেছি, সেই স্বরূপটি যে

আধারে আমরা আনন্দ অনুভব করি তাহার মধ্যে ফুটিয়াও সর্ব্বদাই তাহাকে ছাড়াইয়া থাকে। সেই স্বরূপ আমাদের ঠিক অনুভবগম্য নহে, কিন্তু যাহার প্রকাশে আমাদের সকল অনুভূতি সম্ভব হয়, ইহা সেই প্রত্যয়সিদ্ধ বস্তু। আনন্দকে কাব্যের একমাত্র কষ্টি-পাথর করিতে যাইয়া, কবি আপনি ইহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ মানিলেও, জ্ঞানতঃ ধরিতে পারেন নাই। পারিলে, কবিতার আদর্শ কি, এই লইয়া এত গোল পাকাইত না।

কবিতার রাজ্যে অরাজকতা।

ফলতঃ কবি নিজের বেলায় যে আন্তরিক আনন্দানুভূতির উপরে আপনার কাব্যের সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেন, অপর কবির বেলায় তাহা অকৈতব আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। আপনার ভিতরকার আনন্দের প্রেরণাতেই তাঁরা কবিতা লেখেন, সকল কবিই এই দাবী করিয়া থাকেন। এই আন্তরিক প্রেরণা ব্যতীত যে কবিতার উৎপত্তি হইতে পারে, কোনও কবিই ইহা মানেন না। কোনও সাহিত্যিকই ইহা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। আর কবিমাত্রেই নিজের কবিতাতে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করেন। সুতরাং কবি নিজে যে প্রামাণ্যের উপরে আপনার কাব্যের সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন, অপর কবির বেলায়, সে প্রামাণ্যের দাবী অগ্রাহ্য করিবেন কি করিয়া? মাইকেল "মেঘনাদবধ" রচনা করিয়া যে আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় "হেলেনাকাব্য" রচনাকালে তার চাইতে কম আনন্দ পাইয়াছিলেন এমন বলা কঠিন। হেমচন্দ্র "কবিতাবলী" লিখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, যে "মালঞ্চনিবাসিনা মধুসূদন সরকারস্য" কবিতা-পুস্তকের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র কষাঘাত পড়িয়াছিল, তিনি ঐ কবিতা রচনা করিয়া তার চাইতে অল্প আনন্দ পাইয়াছিলেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। আর কবির অন্তরের আনন্দানুভূতিই যদি তাঁর কাব্যের রসাত্মকতার বা কাব্যত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হয়, তাহা

হইলে মাইকেলের "মেঘনাদবধ" এবং আনন্দচন্দ্রের "হেলেনাকাব্য", হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী" এবং "মালঞ্চনিবাসিনা মধুসূদন সরকারস্থ" কবিতাপুস্তক, সকলই তুল্য মূল্য হইয়া পড়ে। সে অবস্থায়, কবিতার রাজ্যে সম্রাটের আসনের সংকুলান হওয়া ত দূরের কথা, ডিমক্রেসীর বা গণতন্ত্রতারও কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ঘোরতর অরাজকতাই সে রাজ্যের একমাত্র সহজ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়।

স্বানুভূতি ও সত্য।

কি রসের রাজ্যে, কি সত্যের রাজ্যে, যেখানেই ব্যক্তিগত অনুভূতি বা স্বানুভূতিকে সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে বসাইবে, সেইখানেই এই অরাজকতা অনিবার্য্য হয়। আমার নিজের অনুভূতি যদি, কোনও বস্তু যে আছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমার নিজের অনুভূতিকেই আমি সে মর্য্যাদা দিব না কেন? আমি স্থানুকে মানুষ বলিয়া দেখিতেছি। তুমি সেই স্থানুর কাছেই একজন মানুষ বসিয়া আছে, তাহাকে স্থানু বলিয়া দেখিতেছ। এক্ষেত্রে আমার স্থানুই মানুষ, না তোমার মানুষই স্থানু, ইহার বিচার করিবে কে? আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি মিথ্যা, এমন কথা বলিব বা মানিব কেমন করিয়া? তোমার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই যে মিথ্যা তাহাই বা তুমি মানিবে বা আমি বলিব কিরূপে? অথচ কাছে যাইয়া দেখি, দু'ই মিথ্যা। এই মিথ্যা প্রমাণ করিল কে? ঐ অনুভূতি ভিন্ন আর কেউ নয়। তবে এই পূর্ব্বকার মিথ্যার মূল কোথায়, আর এখনকার সত্যেরই বা প্রতিষ্ঠা কি? পূর্ব্বকার মিথ্যার মূল—অনুমান; এখনকার সত্যের প্রতিষ্ঠা—প্রকৃতপক্ষে, বস্তু-সাক্ষাৎকারে। আমিও মানুষ দেখি নাই, তুমিও স্থানু দেখ নাই। আমি দেখিয়াছিলাম মানবাকৃতি-বিশিষ্ট একটা বস্তু। তুমি দেখিয়াছিলে স্থানুর আকারের মতন আকারসম্পন্ন একটা বস্তু। আর মানবাকৃতিবিশিষ্ট বস্তুটাকেই আমি সত্য মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। তুমি স্থানুর আকারকেই যথার্থ স্থানু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলে। এই ধরিয়া লওয়াটা প্রত্যক্ষের কাজ

নহে, অনুমানেরই কাজ। প্রত্যক্ষ কখনও মিথ্যা হয় না, হইতেই পারে না। অনুমান সত্যও হয়, মিথ্যাও হয়। কিন্তু অনুমান সত্য না মিথ্যা, ইহা কেবল বস্তুপ্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্ণীত হয়। অন্য উপায় নাই। আমরা যাহাকে সচরাচর প্রত্যক্ষ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দু'ই জড়াইয়া থাকে। আর এই জন্যই সত্য-বস্তু কেবল এই স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সেইরূপ আমার ভাল-লাগার বা আনন্দানুভূতির দ্বারা রসবস্তুরও প্রতিষ্ঠা হয় না। আমাদের সত্যের অনুভূতিতে যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান দু'ই মিশিয়া থাকে, আনন্দের অনুভূতিতেও সেইরূপ বস্তু ও কল্পনা দু'ই মাখামাখি হইয়া রহে। আমি স্থানুকে কখনও মানুষ, মানুষকে কখনও স্থানু বলিয়া অনুমান করি। কিন্তু তাহাতে স্থানু মানুষ, কিম্বা মানুষ স্থানু হয় না। সেইরূপ আমি কোনও খাঁদামুখকেও সুন্দর বলিয়া দেখি। কিন্তু তাহাতে ঐ মুখের খাঁদাত্ব ঘুচিয়া যায় না। ফলতঃ, এই সুন্দর দেখার অর্থ এ নয় যে, লোকে যে মুখকে সুন্দর বলে, এই মুখ আমার চক্ষে তারই আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া উঠে; তার নাক আমার চক্ষে খাঁদা বোধ হয় না, কিন্তু "টিকাল" দেখায়; তার রং আমি কাল দেখি না, কিন্তু চাঁপার মতনই প্রত্যক্ষ করি। এই সুন্দর-বলার অর্থ এই যে, লোকে যাকে সুন্দর বলে তার সাক্ষাৎ-কারে চিত্তে যেসকল ভাব জাগে, এই মুখখানি দেখিয়া আমার অন্তরে তারই কতকগুলি ভাব জাগিয়া উঠে। সুন্দর মুখ দেখিয়া লোকের আনন্দ হয়; এই মুখখানি দেখিয়া আমারও আনন্দ হয়। সুন্দর মুখ একবার দেখিলে আবার দেখিতে সাধ যায়, বার বার দেখিয়াও দেখার সাধ মিটে না; এই মুখখানিও আমি যত দেখি ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই আনন্দ ও এই আকাঙ্ক্ষা দুই ক্ষেত্রে দুই কারণে উৎপন্ন হয়। এক ক্ষেত্রে ইহা সৌন্দর্য্য বলিয়া যে বস্তু আছে, যাহা বর্ণে গঠনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গতে প্রকাশিত হয়, তার প্রত্যক্ষ হইতে জন্মে। অন্যক্ষেত্রে স্নেহ বলিয়া

যে ভাব আছে, যাহা অন্তরেই ফুটে, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। এই স্নেহও প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। অন্তরে জাগিলেও বাহিরে স্নেহের পাত্রকে ধরিয়াই এই স্নেহ অনুভবগম্য হয়। সে পাত্রের একান্ত অভাবে হয় না। আর সৌন্দর্য্য দেখার আনন্দও অন্তরেই ফুটে, কিন্তু অন্তরে জন্মিলেও বাহিরে সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিকে ধরিয়াই অন্তরের এই অনুভূতি জাগে, সে বস্তুর একান্ত অভাবে জন্মে না।

বস্তুতন্ত্রতা ও Realism.

সত্যের অনুভূতিই হউক, আর আনন্দের অনুভূতিই হউক, সকল অনুভূতিই বস্তুসাপেক্ষ, বস্তুসাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, শূন্য হইতে জন্মে না। কিন্তু আজিকালিকার সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতেরাও এই বস্তু-কথা বুঝিতে বড়ই গোলে পড়িয়া যান : বস্তু বলিতে তাঁরা কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকেই বুঝেন। অতীন্দ্রিয় বস্তুও যে বস্তু, এ কথা তাঁহাদের মনে থাকে না। আমাদের দেশে যাহারই অনুভব হয়, তাহাকেই বস্তু বলিয়াছেন। আনন্দের অনুভূতি হয় বাহিরের বিষয়-সাক্ষাৎকারে, এইজন্য এই বিষয় বস্তু। কিন্তু নানা বস্তুতে যে আনন্দ পাইল, তার রূপ অনেক। এসকল নানা রূপের ভিতর দিয়া আনন্দের নিত্য স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। এসকল নানা-রূপ সেই স্বরূপের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রতিবিম্বেই সচরাচর আমাদের আনন্দের অনুভূতি হয়। স্ফটিকে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাতেও সূর্য্যের অনুভূতি হয়। জলেতেও হয়, আবার দিবালোকেও হয়। কিন্তু এসকল ছাড়া সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যকে দেখিয়াও সূর্য্যের অনুভব হয়। এই সূর্য্য সূর্য্যমণ্ডলে নিজস্বরূপে প্রত্যক্ষ হন। স্ফটিকাদিতে সেই স্বরূপের রূপমাত্র প্রত্যক্ষ হয়। আনন্দ সম্বন্ধেও তাহাই। আনন্দকর বস্তুতে আনন্দের রূপের অনুভূতি হয়; আবার ধ্যানযোগে আনন্দের নিজস্বরূপও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহাও অনুভবগম্য। সেইজন্য আমরা আনন্দকেও বস্তু বলি। স্নেহ, প্রেম, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতিকে ইউরোপীয়েরা ভাব বলেন, বস্তু বলেন না। আমরা

এগুলিকেও বস্তু বলিয়া থাকি। রস-বস্তু বলিতে আমাদের কিছুই আটকায় না। ইহার অর্থ এই যে আমাদের অন্তরের অনুভূতিকে আমরা কোনও দিন কেবল মনগড়া বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। আর অনুভূতি বলিতে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে বিষয়ের অনুভূতি জন্মে, তাহাও বুঝি নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন জাগতিক রূপরসাদির অনুভূতি হয়, সেইরূপ আত্মার যে জ্ঞান-শক্তি আছে, যে-শক্তি প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকলও আপন আপন বিষয়-গ্রহণে সমর্থ হইয়া আমাদিগের রূপরসাদির অনুভব সম্ভব করে, সেই জ্ঞান-শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত যে সকল সত্তা বা সত্য আছে, তারও অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হইয়া থাকে। এই অনুভূতি কেবল এক জাতীয় নহে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিও আছে, অতীন্দ্রিয়ানুভূতিও আছে। এইজন্য আমাদের চিন্তায়, সাধনায়, ভাষায়, শাস্ত্রে, সাহিত্যে, জড়-বস্তুকেও বস্তু বলিয়াছেন, আর অতীন্দ্রিয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকেও ব্রহ্ম-বস্তু বলিতে কখনও সঙ্কোচবোধ করেন নাই। আত্ম-বস্তু, রস-বস্তু, আনন্দ-বস্তু, ব্রহ্ম-বস্তু,—এসকল শব্দের বহুল ব্যবহার আমাদের শাস্ত্র-সাহিত্যে আছে; সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গলাতেও আছে। কিন্তু এ কালের লোকে এই আস্তিক্য বুদ্ধি হারাইতে বসিয়াছেন। ঘোরতর দ্বৈতবাদী প্রাচীন খৃষ্টীয় সাধনা এবং প্রকাশ্য-বা-প্রচ্ছন্ন জড়-বাদী আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থের যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, অতীন্দ্রিয় আত্মপদার্থেরও যে ঠিক সেইরূপই প্রত্যক্ষ সম্ভব, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। আধুনিক ঈশ্বর-বাদীরা পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে জ্ঞানের ভূমিরূপেই মানিয়া লন, এই ঈশ্বর যে প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য ইহা বস্তুতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন না। এইজন্যই কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে বস্তুতন্ত্র শব্দের ব্যবহার দেখিয়া, আমাদের ইংরাজি-শিক্ষিত পারদর্শী পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত এই বস্তুতন্ত্রতাকে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বাস্তবতা বা realism শব্দেরই একটা নূতন বাঙ্গলা সংস্করণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, নানাপ্রকারের

কুটিল, কল্পিত তর্কজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাকে মুনিদিগের মতিভ্রমের মতনই মনে হয়। কারণ সংস্কৃতে ও বাঙ্গলায় বস্তু বলিতে যে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থমাত্র বুঝায় না, একথা এত বড় পণ্ডিতেরা জানেন না, ইহা বিশ্বাস করা অসাধ্য। তাঁরা জানেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অজড়, অবাঙ্‌মনসোগোচর।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চন।

এই শ্রুতি তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে নিয়ত নৃত্য করে। ইহারই উপরে তাঁহাদের ঈশ্বরতত্ত্বের, ধর্ম্মতত্ত্বের, রস-তত্ত্বের সকল তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। আর এই একান্ত নিরাকার, নিতান্ত অজড়, অবাঙ্‌-মনসোগোচর যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাকেও এদেশের শাস্ত্রসাহিত্যে "বস্তু" বলিয়াছেন। এক লোকায়তগণই কেবল অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। আর তাঁহারাই কেবল বস্তু বলিতে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে মাত্র বুঝিতেন। এদেশে কেবল এক লোকায়তদিগের অভিধানেই বস্তুতন্ত্রতা আর আধুনিক ইউরোপের জড়াত্মক ও ইন্দ্রিয়াত্মক বাস্তবতা বা realism এক ছিল। এদেশের আর কোনও সম্প্রদায় এই কথার অমন কদর্থ করিতে সাহস পাইতেন না। অমন যে ঘোরতর নিরাকারবাদী শঙ্কর, তিনি পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে জ্ঞানমাত্রকেই বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তুসাক্ষাৎকারেই কেবল উৎপন্ন হয়, একথা বলিয়াছেন। শঙ্কর জ্ঞানমার্গের সাধক, জ্ঞানেতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "জ্ঞানেনৈবমাপ্নুয়াৎ"—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পরমবস্তুলাভ হয়; "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"—মুক্তির আর অপর পথ নাই; এই সকল মহাবাক্যই শঙ্করসিদ্ধান্তের মূল। ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়, যে শঙ্কর এক-দিকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তিনিই আবার অন্যদিকে এই জ্ঞানের নিত্য-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, তাহাকে বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তুসাক্ষাৎকার হইতেই কেবল এই

জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, অন্য উপায়ে হয় না ও হইতে পারে না, এই কথা বলিয়াছেন। কাষ্ঠলোষ্ট্রের জ্ঞান কাষ্ঠলোষ্ট্রতন্ত্র, কাষ্ঠলোষ্ট্রের সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মতন্ত্র, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান অনুভূতি পর্য্যবসায়ী— অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয়। "অনুভূতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং।" জড়-বস্তুর জ্ঞান জড়সাক্ষাৎকারে জন্মিয়া অন্তরে এই জড়ের পরিপূর্ণ অনুভূতিতে গিয়া শেষ বা পূর্ণ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জন্মিয়া, অন্তরে ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অনুভূতিতে যাইয়াই শেষ বা পূর্ণ হয়। এই ব্রহ্মও বস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র। এ সকল সত্ত্বেও আমাদের বস্তুতন্ত্রতা আর ইউরোপীয়দের আধুনিক বাস্ত-বতা বা realism যে এক নহে, কখনওই এক হইতে পারে না, ইহাও কি আবার অত করিয়া বুঝাইতে হয়?

অনুভূতির প্রামাণ্য।

যাহার অনুভূতি সম্ভব, আমাদের দেশে তাহাকেই বস্তু বলিয়া-ছেন। এই অনুভূতি কেবল অন্তরের ব্যাপারও নহে, কেবল বাহি-রেরও নহে। এই অনুভূতির জন্য প্রথমে একটা অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তুর আবশ্যক হয়। দ্বিতীয় এই অনুভূতির উপযুক্ত করণ বা যন্ত্র থাকা চাই। তৃতীয় যে অনুভব করিবে এমন একজন জ্ঞাতা বা ব্যক্তি থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ অনুভবের বিষয়, অনুভবের করণ বা যন্ত্র, এবং অনুভব-কর্ত্তা, এই তিন মিলিয়া তবে অনুভূতি ব্যাপার সাধিত হয়। এখানে কেবল কর্ত্তার উপরেই অনুভব নির্ভর করে, একথা বলিলে চলিবে কেন? কর্ত্তা থাকিতে পারেন, করণও থাকিতে পারে; কিন্তু বিষয় না থাকিলে, কোনও অনুভূতি জন্মিবে না। কলি-কাতার পথে দাঁড়াইয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরও হিমালয়ের কিম্বা ভারত-সাগরের কোনও অনুভূতি জন্মিতে পারে না। আবার বিষয়ও আছে, কর্ত্তাও আছেন, কিন্তু করণ নাই, সেক্ষেত্রেও অনুভূতি জন্মিবে না। করণের অভাবে বধিরের শব্দের অনুভব এবং অন্ধের রূপের অনুভব

হয় না। তার পর, কর্ত্তাও আছেন, করণও আছে, বিষয়ও আছে; কিন্তু এই তিনের যথাযোগ্য সম্মিলন হয় নাই, সেখানেও সত্য অনুভূতি জন্মিতে পারে না। সেখানে যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, তাহার সঙ্গে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ ভিন্ন বিষয়ের অনুভূতির স্মৃতি মিশিয়া গিয়া, একটা মিথ্যা অনুভবের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন ভাস্করমূর্ত্তিতে মানুষজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, বা শুক্তিতে রজত-জ্ঞান। আর সত্য অনুভূতি মাত্রেই বস্তু-তন্ত্র, বস্তুর অধীন বলিয়া, সেই বস্তুর দ্বারাই এসকল ভ্রান্তির বা সত্যাভাসের প্রমাণ হইতে পারে, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না ও হইতে পারে না। ভাস্করমূর্ত্তি মানুষের সকল লক্ষণ প্রকাশ করে না। মানুষের দেহগঠনের অনুভব মাত্রই এই মূর্ত্তি হইতে জন্মে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে পূর্ব্বকার প্রত্যক্ষ মানুষের চৈতন্যাদি লক্ষণের অনুভব মিলাইয়া তবে এই ভাস্কর-প্রতিমাকে মানুষ বলিয়া ভাবিয়া লই। এখানে মানুষের দেহগঠনের অনুভূতিটুকু সত্য, কারণ এইটুকুই বস্তুতন্ত্র। কিন্তু এই দেহের মধ্যে সমগ্র মনুষ্য-ধর্ম্মটি রহিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বর্ত্তমানের অনুভূতি নহে, পূর্ব্বকার অনুভূতির স্মৃতির আশ্রয়ে, ভাব-যোগে বা association বা ideasএ পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের পুনরুদ্দীপন মাত্র। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ যে ভাস্কর-মূর্ত্তি তাহার দ্বারা এই অনুভূতি সমর্থিত হইবে না। তাহাকে নাড়িয়া দেখিলেই দেখিব যে এ অচেতন পুতুলমাত্র, সচেতন মানুষ নহে। সুতরাং জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র একথা বলিলে, যে বস্তুকে ধরিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহার সত্যাসত্য সেই বস্তুর সমগ্রতার দ্বারাই কেবল নির্ণীত হইতে পারে; অন্য কোনও উপায়ে হয় না।

কবিতার প্রাণ যে রস তাহাও বস্তু। কারণ তাহাও অনুভূতিগ্রাহ্য। এই রসানুভূতির জন্যও প্রথমে বস্তু চাই, দ্বিতীয় করণ চাই, তৃতীয় কর্ত্তা চাই। জ্ঞান যেমন বস্তুকে ধরিয়া জন্মে, শূন্যকে ধরিয়া জন্মে না; সেইরূপ ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, করুণা, প্রীতি, প্রভৃতি রসও বস্তুর আশ্রয়েই জন্মে, বস্তু-আশ্রয় ছাড়া জন্মিতে পারে না।

যে বস্তু হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা একেবারেই নাই, তাহাকে দেখিয়া ভয়ের অনুভূতি হয় না। যে বস্তু বীভৎস, তাহার সাক্ষাৎকারে প্রীতির অনুভব সম্ভবে না। শিশুকে দেখিয়া সখ্য বা সখাকে দেখিয়া বাৎসল্যের উদয় হয় না। এসকল অতি মামুলী কথা। কিন্তু রস-মাত্রেই বস্তু-তন্ত্র, ইহাতে এই মামুলী কথাটার বেশী কিছুই বলা হয় নাই।

ভাল-লাগার ইতিহাস।

আমরা যাহাকে ভাল-লাগা বলি, কবি যাহাকে আনন্দানুভূতি বলেন, তাহা একটা মিশ্র-অনুভূতি। কবিতা-বিশেষ লিখিয়া বা পড়িয়া যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি অতিশয় ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া থাকে। কবির কাব্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, সৃষ্টিমাত্রেরই যে একটা আনন্দ আছে, কবি সে কবিতা রচনা করিতে সে-আনন্দ অনুভব করেন। শিশু যখন বর্ণ-মালা শিখিয়া প্রথম দিন, স্লেটে "বাবা" "মা" "কাকা" "দাদা" প্রভৃতি পরিচিত কথাগুলি লিখে, সে-দিন তার অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে আনন্দিত হয়। অক্ষরগুলোর ছাঁদের ভালমন্দের সঙ্গে এ আনন্দানুভূতির কোনওই সম্পর্ক নাই। কবিও কবিতা রচনা করিয়া আপনার একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হন। কবিতার ভালমন্দের উপরে এ আনন্দ তখন নির্ভর করে না। সে বিচার অপরে করিবে। সে-কথা পরে উঠিবে। তখন লোকে মন্দ বলিলে তাঁর আনন্দের হানি হইবে, কারণ সে মন্দ বলাতে তাঁর কৃতিত্বের অভিমানে আঘাত লাগিবে। লোকে সে-কবিতা পড়িয়া ভাল বলিলে, তাঁর আনন্দ বাড়িয়া উঠিবে। কারণ সে ভাল-বলাতে লোকমধ্যে তাঁর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে এ-বোধ তাঁর জন্মিবে। তারপর সৃষ্টিমাত্রেতেই স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি হয়। ইংরাজিতে এই আত্মপ্রকাশকে self expression এবং আত্মোপ-

লব্ধিকে self-realisation বলে। এই আত্মপ্রকাশের এবং আত্মোপলব্ধিরও একটা গভীর আনন্দ আছে। কবি কাব্যরচনায় এই আনন্দও অনুভব করেন। এই দুই প্রকারের আনন্দ সকল কবিরই হয়। ভাল কবিরও হয়। মন্দ কবিরও হয়। ইহার দ্বারা কোনও কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয় না ও হইতেই পারে না, ইহা দেখিয়াছি। তার পর পাঠকের কথা। কবিতা পাঠে আমরা যে আনন্দ পাই তাহাও নানা কারণে জন্মে। যে কবিতায় আমাদের কোনও পূর্ব্বপরিচিত রসানুভূতিকে জাগাইয়া দেয়, তাহাতে আমরা আনন্দ পাই। আর আমাদের স্মৃতি নানা কারণে জাগিয়া উঠে। কিন্তু যে কারণেই জাগরূক হউক না কেন, প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত স্মৃতি জন্মে না। আগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তার অনুরূপ কোনও কিছু দেখিলে, কিম্বা দেখিতেছি ভাবিলেই, সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে। এক্ষেত্রে আমি বর্ত্তমানে যাহা শুনিতেছি বা দেখিতেছি তার পরিপূর্ণ মর্ম্ম না বুঝিয়াও, সেই পূর্ব্বস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া, গভীর আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু এই আনন্দ সত্য নহে, অধ্যাসজনিত। ইহার দ্বারা যে বিশেষ কবিতার আশ্রয়ে ইহা জন্মিয়াছে, তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে না। বৈষ্ণব মহাজনগণের ললিত পদাবলি শুনিয়া এক লম্পট ব্যক্তি অজস্র অশ্রুপাত করিতেছিল। কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে তাহাকে প্রশ্ন করা হইল—"তুমি অমনভাবে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিলে কেন, বল দেখি?" সে সরলভাবে বলিল, "আর কিছু নয়, কীর্ত্তনীয়া যখন 'বঁধু! বঁধু!' বলিয়া ডাকিতেছিল, তখন আমার একব্যক্তির কথা মনে পড়িয়া গেল, যে আমাকে ঐ ভাবেই ডাকিত।" এখানে এ ব্যক্তি বৈষ্ণব কবিতার যে রস গ্রহণ করিয়া কাঁদিল, তাহার দ্বারা সে সকল পদাবলির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে কি?

ফলতঃ এই ভাল-লাগা ব্যাপারটার, এই আনন্দানুভূতিটার অন্তরালে ভাল-মন্দ, সত্য-কল্পিত, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনেক কারণ বিদ্যমান

থাকে। সে-সকল কারণের অনুসন্ধান না করিয়া, কেবল ভাল লাগে বলিয়াই, কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই, কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক লোকের কিপ্‌লিংএর কবিতা ভাল লাগে; তাদের টেনিসন্‌ একেবারেই ভাল লাগে না। অনেকের টেনিসন্‌ খুবই ভাল লাগে; কিন্তু ব্রাউনিং তারা পড়িতেই পারে না। এক্ষেত্রে কেন কার কি ভাল লাগে, ইহা না জানিয়া, এই সকল কবির কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট বিচার করা যায় না। কিপ্‌লিংকে অনেক লোকে ভালবাসে, কারণ কিপলিংএর হাল্‌কা ভাবগুলি তাদের মনোমত, এগুলিকে তাহারা সহজে ধরিতে ও বুঝিতে পারে। টেনিসনের আভিজাত্যের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই; তাঁর শব্দ-সম্পদ এবং ভাবসম্ভার দু'এর কোনওটাই ইহারা ধরিতে পারে না। যাঁরা টেনি-সনকে ভালবাসে, তাঁরা বহুলপরিমাণে তাঁর ঝঙ্কারেই মুগ্ধ হইয়া রহে; ব্রাউনিংএর সে ঝঙ্কার নাই বলিয়া ব্রাউনিংএর কবিত্ব তাহা-দের মনঃপুত হয় না। আবার হুইট্‌ম্যানের টেনিসনের আভিজাত্যও নাই, কিপ্‌লিংএর লঘুতাও নাই, ব্রাউনিংএর মার্জ্জিত রুচি (refin-ed culture)ও নাই; এই জন্য অতি অল্প লোকেই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করিয়া থাকে। এইরূপে নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতাকে বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এইসকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোন্‌টা অবান্তর বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারাই এগুলির কোন্‌টি কাব্যবিচারে গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই বা বর্জ্জনীয় ইহার মীমাংসা হইবে। কেবল ভাল-লাগার বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হইতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত।

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।

চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।

আমার নিকটে মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা গীতি অপূর্ব্ব বোধ হয়। অমন মিষ্ট গীত, আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও ফোটে নাই, কখনও ফুটিবে না। আর তোমার কানে ও প্রাণে—

যাই গো, ওই বাঁজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে।
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে
মান-ভরে।

গিরীশ ঘোষের এই সঙ্গীতটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত বর্ষণ করে। তোমার বিবেচনায় অমন মিষ্ট গীত বাঙ্গলা ভাষায় কোনও দিন কেউ গায় নাই, কোনও দিন কেউ আর গাহিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাতে তুমি কোনও রস পাও না। গিরীশ ঘোষের গানে আমিও কোনও রস পাই না। এ অবস্থায় এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট, বাস্তবিকই কাব্য-রসাত্মক, আর কোন্‌টি নয়, ইহার বিচার হইবে কিসে?

আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলিব যে তোমার প্রশ্নের ভিতরেই আমার বিচারের সূত্রটিও রহিয়াছে। “কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট?” এই বাস্তবিক কথাতেই বিচারের সূত্রটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক মিষ্ট বলিবার সময়ই, এটা তুমি মানিয়া লইয়াছ যে যাহা মিষ্ট লাগে তাহা এক নহে, দুই জাতীয়;—এক বাস্তবিক; আর এক যাহা বাস্তবিক নহে, অর্থাৎ অবাস্তবিক। যাহার বস্তুত্ব আছে, তাহাই বাস্তবিক; যাহার বস্তুত্ব নাই, তাহাই অবাস্তব। সুতরাং তোমার নিজের কথাতেই, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না, এই মিষ্টত্বের অন্তরালে বস্তুত্ব থাকা চাই। এই বস্তুত্বের দ্বারাও কবিতার বিচার হইবে,

কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা নহে। কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না। কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতা মাত্রেই রসাত্মক এবং বস্তু-তন্ত্র।

সুতরাং কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কথনও কাব্যের ভালমন্দ বিচার করা চলে না। মিষ্টত্ব একটা অনুভূতি। অনুভূতি বলিলেই যে অনুভব করে এমন কোনও ব্যক্তি, আর যাহা তার এই অনুভবের বিষয় এমন কোনও বস্তু, এ দুইটিই বুঝায়। আর এই অনুভবের বিষয় দুই জাতীয় হইতে পারে, এক তাহা বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, দ্বিতীয় তাহা অতীতে কোনও সময়ে উপস্থিত ছিল, এখন অনুপস্থিত হইয়াও ভাবযোগে কিম্বা association of ideasএর সহায়ে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা স্মৃতি, এই দুই সূত্র ব্যতীত কোনও কিছু আমাদের সত্য অনুভবের বিষয় হইতেই পারে না। সত্য অনুভব যখন বলিলাম, তখন মিথ্যা অনুভব সম্ভব, ইহাও মানিয়া লইলাম। সে মিথ্যা অনুভব কি? তার উৎপত্তি কিসে ও স্থিতি কোথায়? ইহাও জানা প্রয়োজন। নতুবা সত্য মিথ্যার প্রভেদ করিব কিরূপে? সত্য অনুভব হয় বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ, না হয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে ধরিয়া। সুতরাং যে অনুভবের মূলে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষও নাই, আর পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিও নাই, সেই অনুভবকেই মিথ্যা বলিব। এই মিথ্যা অনুভবও আবার কোনও কোনও স্থলে একান্ত মিথ্যা, আর কোনও স্থলে বা সত্যাভাস হইতে পারে। মাকে বাবার বাহুপাশবদ্ধ দেখিয়া শিশু—"বাবা মাকে মারিতেছে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শিশুর এ অনুভব সত্য নহে, কিন্তু সত্যাভাস। ভালবাসার জড়াজড়ি যে কি সে এখনও তাহা জানে না; জানিবে সখ্যের আস্বাদন যেদিন পাইবে সেদিন। এখন সে জানে মারামারিতেই কেবল জড়াজড়ি হয়। সুতরাং এখানে তাহাই সহজে কল্পনা করিল। অর্থাৎ এখানে

বাস্তবিক যে ভাবটা নাই, সে আপনার মন হইতে তাহাই তার উপরে চাপাইল। এ গেল এক প্রকারের মিথ্যা অনুভব। এ অনুভব একান্ত মিথ্যা নয়, আধখানা সত্য মাত্র। শিশুর নিজের অন্তরের অনুভূতিটা সত্য, বাহিরে তার আরোপটা কল্পিত। কিন্তু আর এক প্রকারের অনুভব আছে, যাহা আধখানা সত্য বা সত্যা-ভাসও নয়; যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আদ্যোপান্ত স্বকপোলকল্পিত। যে ব্যক্তি জন্মে কোনও দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, বরফপড়া কা'কে বলে তাহা, বা তার অনুরূপ কোনও কিছু দেখে নাই, কেবল শুনিয়াছে যে দুরন্ত শীতের দেশেই কেবল বরফ পড়ে; কেতাবে পড়িয়াছে যে এই বরফ যখন পড়িতে আরম্ভ করে তখন আশমান-জমীন যেন টুক্‌রা টুক্‌রা ফেন-পুঞ্জে ভরিয়া যায়। এই শোনা কথার উপরে সে তার মনে মনে বরফপাতের একটা মনগড়া ছবি আঁকিয়াছে। এই দৃশ্যের অনুভূতিটা নিতান্ত মিথ্যা; ইহাতে প্রত্যক্ষের লেষমাত্র নাই। ইহা অনুমান-প্রতিষ্ঠও নহে। কারণ অনুমান মাত্রেই প্রত্য-ক্ষের উপরে গড়িয়া উঠে। ইহা উপমানও নহে। কারণ একান্ত অপ্রত্যক্ষের উপমানও সম্ভবে না। ইহা উপমানের অনুমানের উপরে গঠিত। বস্তুর ছায়ার ছায়া, তস্য ছায়া মাত্র। ইহাতে বস্তুর চিহ্ন, সত্যের আভাসমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রস-মাত্রেই যখন কোনও না কোনও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ বা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের স্মৃতির আশ্রয়ে জন্মে, তখন যে রস এভাবে জন্মে না, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

এই কষ্টিপাথর দিয়াই সকল কবিতার বিচার করিতে হয়। আমার নিকটে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাগীতি বেশী মিষ্ট লাগে। তোমার নিকটে গিরীশ ঘোষের "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী" বেশী মিষ্ট লাগে। এখানেও তোমার অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ, না আমার অনুভূতি শ্রেষ্ঠ, ইহার বিচারও ঐ বস্তুর কষ্টিপাথর দিয়াই করিতে হইবে। নায়কের সঙ্কেতে তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য নায়িকার উদ্বেগই এই দুইটি

কবিতার বিষয়। এই উদ্বেগই এখানে বস্তু। এই উদ্বেগের অবস্থায়, নায়ক-নায়িকার যে সত্য অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ও এই অনুভূতি যে আকারে তাঁহাদের আচার আচরণে, মুখের ভাবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানাদিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। বস্তু-লক্ষণ দিয়াই মধুসূদনের ও গিরীশ ঘোষের এই দুইটি গানের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে, আমার বা তোমার কোন্‌টা কতটুকু ভাল-লাগে, বা না-লাগে, তার দ্বারা এ বিচার হইবে না। এই বস্তু-লক্ষণ দিয়া বিচার করিতে গেলেই দেখি, মধুসূদনের গানে এই সত্য, প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা অনু ভূতি একেবারেই নাই; আর গিরীশ ঘোষের গানেতে তাহা পূরা-মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের কথা পড়িয়া, তার একটা স্বকপোলকল্পিত মানস-ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, ললিত শব্দ যোজনা করিয়া সেই ছবিটিই এখানে প্রকট করিতে গিয়াছেন। আর গিরীশ ঘোষের এসকল কেবল পড়া-কথা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। সুতরাং তাঁর গানেতে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই।

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।

ইহাতে মধুসূদনের যে এ বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, ইহা প্রমাণ করে। রাখাল বালকেরা গ্রামের মাঠের প্রান্তে গাছতলায় বাঁশী বাজাইয়া নাচে, মধুসূদন ইহাই দেখিয়াছিলেন। তারা যে বাঁশী বাজাইয়া প্রণয়ীজনকে আহ্বান করে না, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা-বিরহে অধীর হইয়া রাধিকাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বাঁশী বাজাইতেন। আর রাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই ভাবিতেন; কান পাতিয়া তাঁর নূপুরধ্বনি শোনা যায় কি না, অনুকূল বায়ু সে অঙ্গ-গন্ধ বহন করে কি না,—বাঁশী বাজাইতেন

আর তাই নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধানামে সাধা বাঁশী বাজাইতেন, আর সর্ব্বেন্দ্রিয়কে কেন্দ্রিভূত করিয়া শ্রীরাধিকা আসিতেছেন কি না তাই দেখিতেন। এ বাঁশী বাজে ধ্যানে, যোগে, সমাধিতে। এ অবস্থায় কোনও নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তার তালে তালে নাচে না।

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!—

শুনিলেই রাধিকারমণকে মনে পড়ে না, মনে পড়ে এক সাঁওতাল যুবককে, যে এককালে আমাদের উঠানে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়া নাচিত। এক "নাচিছে" কথায়, মধুসূদন সব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাখীরা কুঞ্জদ্বারে নাচিয়া আপনার প্রণয়ীকে ডাকে। কপোতী সন্ধ্যাকালে আপনার খোপের দরজায় নাচিয়া নাচিয়া আপনার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনে। এ সকল সত্য। কিন্তু মানুষ ডাকে, নাচে না। সে ডাকে আর ধেয়ায়, ধেয়ায় আর ডাকে। ধ্যান নৃত্যের বিরোধী। কিন্তু আমি যখন "ব্রজাঙ্গনা" পড়ি, তখন এসকল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দসম্পদ। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে। এই ঝঙ্কারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ নয়, অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যা মিষ্ট লাগে, তোমার তাহা তেমন মিষ্ট লাগে না। তুমি ডাঙ্গায়, আমি জলে; এক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ অনিবার্য্য।

তবে এ মীমাংসার একটা পথ হয়, যদি কবিতার ভালমন্দের বিচারটা তোমার রসের রাজ্যে যাইয়া হইবে, না আমার ঝঙ্কারের রাজ্যে আসিয়া হইবে, এই কথাটা একবার দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মৃত্যু-স্বপ্ন

একদা আছিনু যবে নিদ্রা-ঘোরে হ'য়ে অচেতন,
দেখিলাম বিচিত্র স্বপন :—
জনক, জননী, জায়া শব-কায়া করিয়া বেষ্টন
হাহাকারে করিছে ক্রন্দন।

ছিন্ন-তার বীণা সম দেহ মম রয়েছে পড়িয়া
অযতনে ধূলির শয্যায়,
একে একে বন্ধুগণ ক্ষুণ্ণ-মন নীরবে কাঁদিয়া
চাহে তনু তুলিতে চিতায়।

মাতার রোদন-ধ্বনি আশেপাশে দীর্ঘশ্বাস সম
ভেসে আসে দূর কক্ষ হ'তে;
পাগলিনী প্রেয়সীর তপ্ত অশ্রু হিম অঙ্গ মম
পরশনে চাহে সঞ্জীবিতে।

অতীতের স্মৃতিগুলি দুলি' দুলি' লহরীর প্রায়
চিত্ত-তটে করে কোলাহল ;—
সমগ্র জীবন যেন চিত্রমাঝে জীবন্ত দেখায়
পর পর ঘটনা সকল।

প্রথমে পড়িল মনে শৈশবের সোনার স্বপন
হাস্যক্রীড়া-কৌতুক-মুখর ;
জড়া'য়ে জননী-কণ্ঠ অকুণ্ঠিত মর্ম্ম-নিবেদন,
মাতৃ-বক্ষ অমৃত-নির্ঝর।

তার পর ছুটাছুটি অন্তরঙ্গ বাল্যসখা সহ,
খেলাধূলা বহির অঙ্গনে ;
সামান্য কারণে কভু বন্ধুসনে বিষম কলহ,
ক্ষণপরে আগ্রহ মিলনে।

কৈশোরে কিশোর এক মিত্র পরে প্রগাঢ় প্রণয়,
হাসি, অশ্রু, বিরহ, মিলন ;
শয়ন অশন নিদ্রা এক সঙ্গে ; লিপি-বিনিময়
প্রাতে, সাঁঝে, মধ্যাহ্নে কখন।

বিবর্ত্তিত দৃশ্য-পট ; দেখা দিল কিশোরী কুমারী,
প্রাণ দিয়ে বাসিলাম ভাল ;
নাহি তায় কাম-গন্ধ ; অশ্রুজলে পূর্ণ প্রেম-ঝারি ;
শুধু তৃপ্তি, শুধু স্নিগ্ধ আলো।

তারপর মনে পড়ে চিতা-দীপ্ত শ্মশান তাহার,
হাহাকার হৃদয়-কন্দরে ;
গান-শেষে তান যেন ঘুরে, ঘুরে, কাঁদে অনিবার
থাকি, থাকি, গোপন অন্তরে।

ক্রমে মন্দীভূত যদি দুঃখ-নদী, তবু তার স্মৃতি
করুণায় বিগলিল মন ;
অসহায় নিরুপায় দীনজনে হৃদয়ের প্রীতি
বহি গেল স্রোতের মতন।

রোগ-জীর্ণ কতজনে বহি' বুকে আনিয়া আলয়ে
সেবা-রত রহি' নিরন্তর

ভুলিতে চাহিনু যত তার কথা,—কুটিল হৃদয়ে
        তত তার করুণ অন্তর !

প্রকৃতির প্রতি পত্রে ছত্রে ছত্রে সে করুণ গাথা,
        প্রতি ফুলে তারি দৃষ্টি হাসি ;
শারদ-পূর্ণিমা রাতে, বর্ষা-প্রাতে আসে সে বারতা
        জ্যো'স্নালোকে, মেঘ-মন্দ্রে ভাসি' ।

আত্মহারা হ'য়ে যবে এইরূপে আপনার মাঝে
        বিরচিয়া বিরল ভুবন
আছিনু প্রতিমা-ধ্যানে নিমজ্জিত,—কি অপূর্ব্ব সাজে
        নারী এক দিল দরশন !

নয়নে বিজলি-জ্বালা, বক্ষে তার মাধুরী-নির্ঝর,
        লীলা-পদ্ম শোভে চারু ভুজে ;
বাসনা-নূপুর পায়, পিপাসায় পূরিত অন্তর,
        বালা বুঝি আমারেই খুঁজে !

মধু-লুব্ধ অলি সম রমণীর হৃদয়-কমলে
        প্রেম-মধু না করিতে পান
মুগ্ধ নেত্রে নেহারিনু—কিবা শোভা সে বিচিত্র দলে,
        বাহ্যরূপে মোহিল পরাণ ।

না আস্বাদি' মধু-স্বাদ, হৃদি-পাত্র না করি' সন্ধান,
        তনু-গন্ধে হইনু পাগল ;
ডুবিনু রূপজ মোহে, অন্ধ আঁখি, আকুল পরাণ,
        ষট্‌পদে পড়িল শৃঙ্খল ।

আত্মহারা অবিবেকী ভুলে' গেনু সে প্রেম-প্রতিমা,
মুক্তি-দ্বার নারিনু লভিতে ;
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কামনার গুঞ্জন-গরিমা
অধিকার পসারিল চিতে।

হায় লুব্ধ! হায় মুগ্ধ!—বাসনার অন্ধ কারাগারে
বদ্ধ-পক্ষ হইনু বিকল ;—
থাকি, থাকি, স্বপ্নসম পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয় মাঝারে
উঁকি দিয়া করিত চঞ্চল।

বুঝিনু সে নহে মোর আজন্মের মানস-প্রতিমা,
সংসারের কুহক-মূরতি ;
নয়নে নরক-জ্বালা, বক্ষে বহে গরল-কালিমা,
ভুজ-যুগে ভুজঙ্গ-বসতি।

বিবর্ত্তিত দৃশ্য-পট ; বদ্ধ দেহ সংসার-কারায়
মৃত্যুমুখে হইল পতিত ;—
অহো কি আনন্দ মরি! কারামুক্ত চিত্ত মোর ধায়
মায়া-পাশ করি বিদলিত!

স্বাধীন আকাশ-পথে মুক্ত বায়ু করিয়া সেবন
রবি-করে জুড়া'ল হৃদয় ;
রুদ্ধ-শ্বাস তমো-পাশ চিত্ত আর না করে বন্ধন,
বন্ধ-জ্বালা স্মৃতিমাত্র রয়।

বুঝিনু—মরণ নহে চেতনার পূর্ণ অবসান,
শুধু মুক্তি জড়ের বন্ধনে ;

ওই যে পতিত শব প্রাণ-হীন, মোর পরিণাম
ও ত নহে—বুঝিলাম মনে।

বিস্ময়ে দেখিনু চেয়ে :—যেই দেহ পুড়িল চিতায়,
সে ত শুধু স্থূল আবরণ ;—
অতি সূক্ষ্ম সত্ত্বা মম ছাড়ি' তারে চলিল কোথায়
শূন্যপথে বিমুক্ত-বন্ধন !

সহসা ভ্রমণ-পথে ভাসমান দেখিনু প্রসূন,
কি বিচিত্র বর্ণ গন্ধ তার ;
সে অপূর্ব্ব পুষ্প হ'তে বাড়াইয়া বদন করুণ
চেয়ে আছে দেবতা আমার !

আবার দেখিনু চেয়ে :—মেঘ-গিরি-গুহার ভিতরে
ঝকিছে সে মাণিক আমার ;
দীপ্ত আঁখি-তারা যেন মেলি' মম বদন উপরে
দিব্যাঙ্গনা দেখে বার বার !

নয়ন ফিরা'য়ে দেখি—তরঙ্গিত জলধির তলে
শুক্তি হ'তে হইয়া বাহির
সে আমার মুক্তা-পরী সদ্য-সিক্ত টানি' নীলাঞ্চলে
ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিছে অধীর !

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখি—নাহি কিছু আর,
রাজে শুধু তাহার মুরতি ;
চাহি' পুন মোর পানে একি দেখি—প্রতি অণু তার
লভিয়াছে তাহে পরিণতি !

তার পর চেয়ে দেখি—সারা বিশ্বে; জড়তার মাঝে
বিজড়িত তাহারি চেতনা ;
নাহি মৃত্যু, নাহি জন্ম, নাহি কাল, সেই শুধু আছে ;
আর সব কেবলি কল্পনা !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ।

দরদিয়া

[গল্প]

আমি ছিলাম বালবিধবা। তার উপর আমার রঙ্ ছিল অত্যন্ত কাল।

আমার আত্মীয়েরা যখন গল্পগুজব করিতেন, মধ্যাহ্ন-আহারের পর যখন সকলে তাস লইয়া নানারূপ আলোচনা সমালোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, তখন তাহার মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমাকে থাকিতে হইত অতি দূরে দূরে।

যতকিছু খারাপের দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন হইলে, সকলে আমাকেই দেখাইয়া দিতেন এবং সকলেই তাহা অনুমোদন করিতেন। বিধবার ব্রতাদি কার্য্যবিধির একটু এদিক ওদিক হইলে সকলে 'মার মার' করিয়া ছুটিয়া আসিতেন। সকলে মিলিয়া আমাকে কাঠের পুতুল—আচার অনুষ্ঠানের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলিবার জন্য শশব্যস্ত। নিজের ইচ্ছা, নিজের ব্যক্তিত্ব এইরূপে লুপ্ত হইয়া গেল।

বাড়ীর সমস্ত কাজের ভার ছিল আমার উপর। সুতরাং অবসর আমার অত্যন্ত কম। কার্য্যের ভিতর আমি ডুবিয়া থাকিতাম। কিন্তু কার্য্যের ভিতর আমি শান্তি পাইতাম না। আর আমার কার্য্যেও কেহ বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না, সকলেই একটা না একটা খুঁত পাইতেন। সকলে মনে করিতেন কাজ আমি করিতে বাধ্য —আমি যে বিধবা! সেইজন্যই আবার আমার ভুল ত্রুটি একেবারে অমার্জ্জনীয়।

কখনও কাহার সহানুভূতি আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সকলে আমার নিন্দা করিয়াই মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতেন। ভাল কাপড় গহনা পরিয়া আমার সম্মুখে না ঘুরিলে তাঁহাদের তৃপ্তি

হইত না। আমার সাম্‌নে বসিয়া ভাল খাবার না খাইলে তাঁহা-দের পরিতোষ হইত না। আমার দুঃখ কষ্টের দিকে কাহারও দৃক্‌পাত নাই, কেহই সেজন্য ব্যথিত নয়।

আমার কষ্টে কেবল একজন মাত্র অনুতপ্ত হইয়াছিল। তা'কে আমি কেবল একদিনের জন্য দেখিয়াছিলাম। সেদিন শরতের মধ্যাহ্ন। নীল আকাশে রজতশুভ্র মেঘগুলি খণ্ডে খণ্ডে ভাসিয়া চলিয়াছিল! পার্শ্বের ঘর হইতে তাসের 'বোলে'র সহিত পুরাঙ্গণাদের উচ্চ কল-হাস্যধ্বনি ও বলয়-শিঞ্জনের শব্দ শুনা যাইতেছিল। একটা অশ্রান্ত কাক কোথা হইতে কা কা করিয়া মরিতেছিল। নিকটেই আমার পালিত বিড়ালটি রৌদ্রে পা ছড়াইয়া দিয়া আরামে নিদ্রামগ্ন। আমি শয়নকক্ষের বাতায়নটি খুলিতেই দেখি পথে সে দাঁড়াইয়া। তখন লোকের চলাফিরা কমিয়া গেছে। দ্বিপ্রহের প্রখর শান্তি চারিদিকে বিরাজিত।

তাহার মুখে কি একটা ভাব ছিল, আমি অবাক হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তা'র মুখখানির ভিতর আমি যেন সব পাই-লাম। সব সাধনার সিদ্ধি, সকল কামনার পূরণ, সব চাঞ্চল্যের—সব বিগ্রহের শান্তি। জীবনে এমন ভাব ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই। আমি আত্মহারা হইলাম। সেও আমার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। দুইজনের দৃষ্টি দুইজনার উপর নিবদ্ধ। মনে হইল আমাদের উভয়ের অনেকদিনের পরিচয়, অনেক দিনের আত্মীয়তা। কিন্তু কবে যে এই পরিচয় হইল তাহা মনে আসিল না। আমি দেখিলাম তাহার গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ভূতলে পড়িল।

কতক্ষণ যে আমি এইরূপ ভাবে বিভোর ছিলাম জানিনা।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "কি বউ, তোমার এই কাণ্ড?"

সর্পাহতের ন্যায় চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি আমার মেজ ননদ পশ্চাতে দণ্ডায়মান। কখন যে তিনি চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছেন জানিতে পারি নাই। আমি কোন উত্তর না দিয়া স্থিরনেত্রে

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি উত্তর দিব কি? আমি যে অক্ষমনীয় পাপে দূষিতা, আমি যে বিধবা। পরপুরুষের দিকে চাহিবার আমার অধিকার কি?

আমাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরঝী, বলিয়া গেলেন! "বউ, তুমি বিধবা মানুষ। তুমি কোথায় শুদ্ধাচারিণী হয়ে জপ তপ করবে, না তোমার এই কাণ্ড? পরপুরুষের সঙ্গে দুপুর বেলা আলাপ করা? লোকে বল্‌বে কি? তুমি দেখ্‌চি আমার বাপের কুলের নাম ডোবালে! আমি তথাপি নিস্তব্ধ; কিছু বলার শক্তি আমার তখন ছিল না। সে ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, মেজ ঠাকুরঝী তার চেহারা ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। তা'র নাম জান্‌বার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। আমি পাষাণের ন্যায় অচল অটল রহিলাম।

আমার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি অপ্রসন্ন মুখে প্রস্থান করিলেন, এবং ব্যাপারটিতে নানা রং দিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। শীঘ্রই শুনা গেল, আমি ভর দুপুর বেলা গৃহমধ্যে এক অপরিচিত পুরুষের সহিত প্রেমালাপ করিতেছিলাম। চারিদিকে ঢিঢি পড়িয়া গেল।

এখন আমার কষ্টের একশেষ হইল। এখন উঠিতে বসিতে কেবল গঞ্জনা। আমি মেজ ননদের নজরবন্দী হয়ে রহিলাম। কিন্তু আমার মন আজকাল সর্ব্বদা নানাভাবে আলোড়িত। সর্ব্বদা তা'রই বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি মনে পড়িত, কষ্টে ও আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া, মেজ ননদ মাঝে মাঝে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেন।

অনেক দিনের পর আজ কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া পেয়েছি।

আজ আমার ছোট ননদের বিবাহ। উৎসবে আনন্দে বাড়ীখানি আমোদিত। মধুর নহবৎ ধ্বনি। বালকবালিকাগণের উল্লাস-চীৎকার। আত্মীয় স্বজনের সম্ভাষণ ও আলাপ।

বহুকাল পূর্ব্বের এইরূপ একদিনের অস্পষ্ট ছবি আমার মনে জাগরুক হইয়া উঠিল। আমি তখন খুব ছোট—সে আমি প্রায় সব ভুলিয়া গেছি,—কেবল নিশিশেষের স্বপ্নটুকুর মতন ভাসা ভাসা রকম মনে আছে। বর আসিয়া গিয়াছে। বরণ করিবার জন্য তাহাকে ভিতরে আনা হইয়াছে।

আমি দূরে অন্ধকারে এককোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখানে আর কেহই নাই। আমি আজকের এই মঙ্গল উৎসবের দিনে অস্পৃশ্য—অশুচি। আমাকে সর্ব্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া চলিতে হইতেছে, পাছে ভুলক্রমে কোন জিনিস ছুঁইয়া ফেলি—পাছে দৈবাৎক্রমে আমার সাদা তুতির একটুখানি স্পর্শে কোন জিনিস অপবিত্র হইয়া যায়। মঙ্গল কার্য্য হইতে আমার স্থান বহুদূরে—আমি যে বিধবা, আমি যে স্বামীহীনা।

সহসা ফিরিয়া দেখি সে একজন আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বল্‌ছে! তা'র সঙ্গে যে আমাদের এতদূর আত্মীয়তা আছে—যা'তে সে অন্তঃপুরে সচ্ছন্দে আসিতে পারে—তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমার মেজ ননদ সেদিন আমার দোষ ধরায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে তা'কে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পান নি। তা'হলে জান্‌তে পার্‌তেন সে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়।

তা'কে দেখে আমার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দে কি বিস্ময়ে কি ভয়ে, স্থির করিতে পারিলাম না। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে নিকটে আসিল।

আস্তে আস্তে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চল ওখানে চল।" এই বলিয়া যেখানে বর বরণ হইতেছিল সেই মণ্ডপটি দেখাইয়া দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। জিব্ কাটিয়া বলিলাম,—"সে কি? আমি যে বিধবা!"

—"তাতে কি? তুমি যে মানুষ। তুমি যে স্ত্রী হয়ে জন্মেছ! এর চেয়ে বেশী আর কি চাও?"

আমি কি শুনিলাম! আমি যে মানুষ আমি যে স্ত্রী হয়ে জন্মেছি। এত বড় কথাটা আমাকে আগে ত কেউ শুনায় নি! সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে নূতন মনে হইল। বিশ্বছন্দের ভিতর আমি অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিলাম। "তুমি যে মানুষ তুমি যে স্ত্রী হয়ে জন্মেছ।" ওঃ! আমি রমণী, আমি মানুষ। এই দুইকে কি আমার বৈধব্য একা বাধা দিতে পারে? আমার সকল বাঁধন দূর হইয়া গেল। আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।

কতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিলাম জানিনা, হঠাৎ তা'র হাতের স্পর্শে সমস্ত শিরা উপশিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ হইল। কোমল স্বরে সে বলিল, "এখন তবে চল।"

বিহ্বল কম্পিত কণ্ঠে আমি বলিলাম, "চল।"

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকারে

কেন মালা এমন ক'রে,
আপন হাতে পরাইলে ;—
তোমার ছোঁয়া ফুলের বাসে,
পরাণখানি মাতাইলে !

কেন সেই প্রভাত বেলা,
এমন সুরে গাহিলে,
আমার এই হৃদয় মাঝে,
তারে তারে বাজাইলে !

আমি গরবে হ'নু সারা,
আমি সোহাগে মাতোয়ারা !

আজি এই আঁধার রাতে,
মালার ফুল শুকায়েছে,
তোমার সেই গানের সুর,
কোথায় জানি হারায়েছে !

চারি দিকে অন্ধকার !
সুর-হারা গানের ভার,
কঠিন এক শিলার মত,
চাপ্ছে প্রাণে অবিরত।

সুর হারাণ অন্ধকারে,
মরা ফুলের মালার তারে।

আমার কথা।

কৃষ্ণদরশন লালসে, রাই উন্মাদিনী দেহপুর ছেড়ে বিচিত্র বিলাসযাত্রা করেছিল! তার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে জেনে, আর সে এ আবাসে ফিরে আস্‌বে না ভেবে, সে ছাড়া বাড়ীতে ভূতের দৌরাত্মি হবে ভয় করে, সকলে মিলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মহামিলনের আনন্দ লয়ে, শ্যামসুন্দরের মহাপ্রাণে মিলিত হয়ে, সে যখন ঘরে ফিরে এল, তার কৃষ্ণবিলাসের দেহ আগুন পোড়াতে পায় নাই দেখে, আগুন আপ্‌নিতেই নিবে গেছে দেখে সে প্রাণ-ভরে হাস্‌ল। কি? এ অঙ্গে আগুন? হে সর্ব্বভুক্! জঠরের জ্বালা নিয়ে, লোলজিহ্বা প্রসারণ করে তুমি গ্রাস কর্‌তে এসে-ছিলে কাকে? তোমার দাহিকা শক্তি আছে, সব দহন করে তুমি আত্মসাৎ কর্‌তে জান, তা আমি জানি। তুমি জাতবিদ্, তোমার অবিদিত কিছু নাই, তোমা হ'তে কিছু লুকিয়ে রাখ্‌ব সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র, তুমি বিরাট রুদ্র। লোকে তোমার উপাসনা করে, ভয়ে তোমাকে প্রণাম করে, আমিও তা কর্‌তাম, তাই তোমার এ সাহস হয়েছিল। কিন্তু আজ তুমি তোমার লোলজিহ্বা সম্বরণ কর্‌লে কেন? তোমার জঠরের জ্বালা জুড়াবার সাধ মিটে গেল কেন? এ স্বর্ণপুরী পুড়ে ছাই কর্‌লে না কেন? তুমি তা পার্‌লে না? তোমার দুর্দ্ধর্ষ দাহিকা শক্তি সোনা থেকে গর্‌দা কেটে কেটে বের করে দিল, তখন সে খাঁটী সোনা হয়ে দাঁড়াল, দেখে তোমার গাত্রজ্বালা বাড়্‌ল। তুমি যে ইন্ধন অবলম্বন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলে, খাদ গলে গলে এসে তাতে পড়্‌ল, তোমার নির্ব্বাণ সাধন কর্‌ল। আজ দেখ সে পোড়া পুরীর একি অপূর্ব্ব কনক-কিরণ-কান্তি? এ যে দেবতার মন্দির হয়ে গেল! আজ দিব্য মাতৃমূর্ত্তি এ মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বাহিরে

তার অলৌকিক আভা প্রতিভাসিত। এক শিব-সুন্দর-শিশু মায়ের কোলে। সেই মহামিলনের আনন্দ অন্তরে ধরল না, সে বহিঃ-প্রকাশ খুঁজ্‌ল, তখন সে উপ্‌চে পড়া আনন্দ, আকার ধরে এসে কোলে ঠাঁই নিল। আজ আমার বুকভরা আনন্দ, আজ আমার কোলভরা আনন্দের আকার! এদ্দিন শুধু অন্তরের আনন্দে যে মাতৃত্বকে উপলব্ধি করে এসেছি, আজ তাকে বাহিরের চোখে দেখ্‌ছি। আমি চোখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ছি আনন্দ, আমি চোখ বুজে বুঝছি আনন্দ! এ আনন্দের আকারে রাধারাণী নিজে? না এতে শ্যামসুন্দরের আবির্ভাব? না উভয়ের মিলিত ভাব? আমি যে দেখি শ্যাম সুন্দরকে, আমার আ-নন্দ-কুল-চন্দ্রমাকে! তোমরা কাকে দেখ আমি জানি না। এ বিগ্রহ আমার বিভ্রম ঘটাবে না ত? আমি যে আকারেই সব পাই! আমার আত্মাও যে আকারই নিল! বধূরূপ ছেড়ে মাতৃ-রূপ! বধূতে মোহ আপন মনোমোহনের, আর মায়েতে মোহ বিশ্ব-বিমোহনের, সন্তানের! গণ্ডী ছেড়ে ছড়িয়ে পড়া! আমার মনো-মোহন যদি অমনিতে বিশ্ববিমোহন হ'ত, আমি তবে তাকে চাই তাম না! জগন্নাথই যে রাধানাথ, রাধা তা বোঝে কৈ? তা শুন্‌লে সে কাঁদ্‌তে বসে! তাই সে চতুর নাগর এই বিশ্ববিমোহনরূপে সন্তানে আবির্ভূত। বিশ্বজন তার সন্তানে আকৃষ্ট হউক মা তাই চায়। সন্তানের প্রিয়জন, মায়ের প্রিয় দর্শন, মায়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তু! সন্তানের স্তুতিবাদ শুন্‌তে মা উৎকর্ণ হয়ে থাকে! দেখ দেখ রসিকরাজের রসিকতা দেখ! সে কেমন কৌশলে আপনা বধুকে দিয়ে কি অসম্ভব সম্ভব করিয়ে নিল! বধূ তা টেরও পেল না! "কুলতিরপি বহুবল্লভঃ" কেমন স্বয়ং বহুবল্লভ হয়েও আপন বধূর চিত্ত কেড়ে নিল! কেমন বধূকে আপনা হাতে মা সাজিয়ে তাকে জগন্মোহিনী মাতৃরূপ দিয়ে, তার চক্ষের চাওয়া বদ্‌লে দিল, মনের বিকার শুধ্‌রে নিল! মা আজ সন্তানে আত্মহারা হয়ে ডেকে ডেকে সকলকে এরূপে আত্মহারা হ'তে বল্‌ছে। এখানে হিংসা

নাই দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই বিসম্বাদ নাই। যেখানেই সন্তানের আদর সেখানেই মা পড়ে। এই ত চাই! মনোমোহন যত যত মন ভোলাবেন, বধূ তার ততই আত্মগৌরব অনুভব করবে! আপনারি জিৎ জানবে। সৌখ্য যা দিতে পারে না, বাৎসল্য তা এনে দেয়। তাই সময় বুঝে স্বরূপ না বদলালে, সে রূপ সনাতনের আঁচ পাবে কেমনে? জান না কি যে মাধুর্য্যরসের মাধুরীই এসে সময়ে মাতৃত্বে পৌঁছায়? বিশ্বশিল্পীর শিল্পচাতুরীই এই। কিন্তু সকল মা কি তা বোঝে? সকল মা কি তা দেখ্‌তে জানে? এই দেখ্‌ছনা কি যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী" হয়েও অজ্ঞান অবোধের মত তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তাকে জিজ্ঞাসা করতে "বল বল ওহে আমার বাঞ্ছিত! তুমি নিজেই বল, শিশুরূপে আমায় ভোলাতে এসেছ কেন? মন ত আগেই সখারূপে কেড়ে নিয়েছ, তাতে কি তৃপ্ত হও নাই? আমাদের মহামিলনের আনন্দের কি কিছু অপূর্ণ ছিল? এই বিশ্বচরাচর ডুবাইয়া তুমি দেখ্‌তে আমাকে, আমি দেখ্‌তাম তোমাকে। তুমি আমি ছাড়া এ জগতে আর কিছু ত ছিল না! কেন এই "কিছু" আন্‌লে? কেন আমাদের বিশ্ববিজয়ী মোহ ভাঙ্‌লে? শুধুই শ্যামসুন্দর এ সংসারে, শুধুই রাধাময় এ সংসার! সেই ত ছিল ভাল। তোমার সেই বিলাস রভস রূপ বিলোপ করে, কেন এই শিব শিশুরূপ ধরলে? কি? দুইএর দৃষ্টি এক করবার জন্যে? দুই থেকে দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে, একদৃষ্টে বল্‌তে যে রাধা, সেই মা যশোদা! আমি যে অজ্ঞ, আমাতে এ দৃষ্টি খুলবে কি! কিন্তু রাধারাণীর শ্যামসুন্দর যশোদার নন্দদুলাল ত হয়নি! হে সন্তানবৎসল! এ তুমি কি করলে? সব উল্‌টে দিলে যে? মুগ্ধা মাতার মুক্তি কোথায়? সন্তানে খুঁজে আমি পাব কি বল? সে যে বড় ছোট, সে যে নিজেই অসহায় অকিঞ্চন! তুমি পূর্ণ, এ ক্ষুদ্রে আবদ্ধ থাকতে পার কি? সব আমার ফাঁকি হয়ে যাবে না কি? তা নয়? এ ক্ষুদ্র হতেই আমার

মহত্ব লাভ হবে! অণুপরমাণু হতেই এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড? রমণীর দেবত্ব শিশুর উৎপত্তিতে? শিশু অসহায় তাই মা সর্ব্বাশ্রয়া ধরিত্রী? শিশু মা-গতপ্রাণ তাই মায়ের এ মহাপ্রাণ! শিশুর করুণ দুইটি চক্ষের আলোতে তিনি দেখ্‌ছেন বিশ্বম্ভরা মাতাকে, আর, মা দেখ্‌ছেন সৃষ্টিকর্ত্তা পিতাকে! ও সুধাকণ্ঠের "মা" ডাকে মা জান্‌ছেন জগজ্জননীকে? ও কচি হাতের সুখপরশে, মায়েতে সকল বুঝ আসে? তাই সন্তানের কাছে মায়ের মাথা নত! এখানেই মা খাট হয়ে পড়ে! স্বর্গের সিংহাসনে মা দেখে সন্তানকে তাহার শিক্ষাগুরুকে! সন্তান যে নিয়তই মায়ের শিক্ষাগুরু, মা তা মানে! তখন আকার অদৃশ্য হয়ে যায়, মা এই সন্তানের অস্তিত্বে সেই ভূমাকে প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হয়? আকারে আবদ্ধ আখরেই না অনঙ্গ-আত্মা অনুদিন অনুলিপ্ত? আমরা যে আখরের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাই। দেখি, ক্ষণে সে ক্ষুদ্র, ক্ষণে বিরাট, ক্ষণে ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণে অবিনাশী, ক্ষণে দেহধারী জীব, ক্ষণে বিদেহী শিব, ক্ষণে পুরুষ, ক্ষণে প্রকৃতি! ক্ষণে স্রষ্টা, ক্ষণে সৃষ্ট, ক্ষণে তৃষিত প্রেমভিখারী, ক্ষণে পরিপূর্ণ প্রেমের অধিকারী। আমি তার মহিমা বুঝিব কি? আমি তার মাহাত্ম্যের জানি কি? সে নিত্য নবলীলাকর, কখনও আমাকে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে, আপন অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা দেয়, কখনও বা আপনি দেবতা থেকে আমা হ'তে ভক্তি শ্রদ্ধা গ্রহণ করে। সেও যা, আমায়ও তা সাজায়, কেউ কম হলে হবে না। যে যজমান সেই যাজক। আমাদের মধ্যে নিরন্ত এই রঙ্গ তামাসা চলেছে। তোমরা এতে বিরক্ত হচ্ছ? তা হবারই কথা। এ সংসারে সবাই দেবতাকে দূরে রেখে ভক্তি করে, কেননা ভক্তিতে ভয় লেগে রয়েছে। আমার দেবতা তা চায় না। সে চায় মানুষের মত মাঝে মাঝে হাস্‌তে, মাঝে মাঝে কাঁদ্‌তে, মাঝে মাঝে হাসাতে, মাঝে মাঝে কাঁদাতে! কখনও দৈব শক্তি দেখ্‌তে, কখনও বা দেখাতে। মা যখন বাৎসল্য রসে গদগদ হয়ে

শিশুর মুখের পানে চেয়ে থাকে, আর শিশু মৃদুমধুর হাস্য করে, মা তখন সে হাসির তুলনা পায় না, "ঠাকুর" "ঠাকুর" বলে কোলের বাছাকে প্রণাম করতে চায়। সে যে মায়ের ঠাকুরের ঠাকুর। মাকে দিয়ে তার সকল কাজ করিয়ে নেয় সেই একরত্তি প্রাণী! মায়ের আহার নাই, নিদ্রা নাই! মায়ের চোখ দুটা থাকে শিশুর বিগ্রহের উপর প'ড়ে, আর তার প্রাণটা থাকে শিশুর এই মহাশক্তির মধ্যে বিহ্বল হয়ে! একেবারে হাত পা বাঁধা। আবার ইচ্ছামত কখনও বা অশান্ত উদ্ধত হয়ে, শত অপরাধ করে, মা হ'তে শাসন যেচে নিয়ে আপনি চোখের জলে ভাসে। কখনও বা লুকিয়ে থেকে ধরা না দিয়ে, মাকে নাকাল ক'রে মনে মনে হাসে। এমন করেই হেসে খেলে মাকে জব্দ রাখে। এক এক সময় ভারি ভড়কে যাই। ভাবি যদি এত ঘনিষ্ঠতায় অবজ্ঞা আসে, যদি তখন অভি-সম্পাৎ করে তখন কি হবে? ভয়ে ত্রাসে যেন গুঁড়িসুঁড়ি খেয়ে শিশুর শিশু হয়ে পড়ি। আর অমনি অকিঞ্চন জননীকে, তার মাতৃত্বে মহীয়সী করে, উঁচু করে তুলে ধরে মায়ের আপন স্বরূপ দেখায়ে দেয়। চেয়ে দেখি মা-মণির আলো এ মুখে! সে মণি মহার্ঘ্য মণি, সে মণি রাজার রাণীর মাথার মণিকে সে দিক করে। এ মণি চোরে চুরি করতে নারে। তাই খেতে শুতে চলতে বসতে মা, এ সকল মণির শিরোমণিকে সর্ব্বাঙ্গে ধরে।

আজ আমি মাতৃপদে অভিষিক্তা। এ পদগৌরবে আমার আপাদ মস্তক পুলকিত। আর বাঁকা করে কেউ আমার দিকে তাকায় না। সাক্ষাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। আমি আজ সম্ভ্রমনীয়া পূজ-নীয়া। এ পদগৌরব আমি রাখতে পারব ত? আমার অন্তরের নিভৃত কোণে বসে, কেগো তুমি গোপনে সন্তানের শুভকামনায় মাকে পরিতুষ্ট করছ? বধূর বেয়াদপি সব বিস্মৃত হয়ে, দেবদুর্লভ মাতৃমূর্ত্তি দেখতে ছুটে চলে এসেছ? যৌবন গতেও জরা নাই

এমন তুমি দেখ নাই, তাই দেখ্‌তে এসেছ ? যৌবন যে যাবে, তার সঙ্গে যে ন্যায়ের বুনিয়ানো নাই, সে ঘুষ্‌খোর দালালের দাবী যে, মা সইবে না তা তুমি জান্‌তে। কিন্তু জরা ত যৌবন ছাড়া জননীকে জড়িয়ে জড়িয়েই থাকে তুমি দেখে এসেছ, তবে এখানে তার দেখা নাই যে ?- তুমি তাই বুঝি ভাব্‌ছ ! তবে শোন ওগো আমার দৃপ্ত "আমি" ! যদি অনুগত জনের মত অবনত হয়ে, সেধে এসেছ, তবে সব রোখ্‌শোধ ! থাক তোমরা সবাই থাক, দেখ তোমরা সবাই দেখ, আমার দেবতাকে দেখ আমার দেবত্বকে দেখ। যার প্রসাদে আমি বিগত যৌবনেও জরামুক্ত হয়ে, এক সত্য সনাতন সৌন্দর্য্যে মা সেজেছি ! তাকে দেখ। এদ্দিন তোমরা আমায় একটা ভাব নিয়ে খেলা করতে দেখে এলে। আমি সেই খন্নেশে সে ভাবের বশে, কি করতে যে কি করতাম, কি বল্‌তে যে কি বল্‌তাম, তোমরা আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। আমার ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধা হয়েছিলে। আজ আর তুমি আমি নয়। আজ আর সে খোলা ভাব নয়, আজ "কোঽপি ভাব বন্ধনঃ" সে ভাবের গতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ? এই বন্ধনে আবদ্ধ প্রাণ বাধা পেয়ে ফুলে ফুলে উঠে, এ বাঁধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনা পথ করে চলে যাবে বলে। তার বেগ সামলাবে হেন সাধ্য কার ? সমতল ক্ষেত্রে পড়ে যখন গতি ঢিমে হতে চায়, তখন তার বেগ বাড়াবার এই ত পন্থা। গতি আছে অথচ তার বোধ নাই, এতে করে জীবনীশক্তি থাকে না, জীবন চলে না। গতি মন্দ হলেই তাতে বাঁধ বাঁধা চাই ! তাই ত এই ভাব-বন্ধনের ব্যবস্থা ! আর এই ভাববন্ধন তিনি নিজে সন্তানরূপে ! আজ আমি নিবিড় করে এ বাঁধ বুকে ধরে তাকে ধরে রয়েছি। স্রোতের ঘা এসে আমার গায়ে পড়্‌ছে ! হে আমার বন্ধনকারি ! হৃদবিহারি ! তবে এ বাঁধ ডুবায়ে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কি ? এ বাহুপাশ হ'তে একে ছিন্ন করে ফেলে রেখে যেতে হবে কি ? আমি যে তোমার বেগ দেখে বড় ভয় পাচ্ছি !

শান্ত সুধীরে এ আবিল এ উদ্দাম কেন? তোমার ঐ শুভ্র ফেনিল অট্টহাসিতে আমার কান যে বধির হয়ে গেল!

এ'ত সার বালির বাঁধ নয় যে বেগের চোটে, খসে খসে ধসে পড়বে? এযে মায়ের রক্ত জমাট হয়ে স্নেহরসে আঁট হয়ে রয়েছে। হে অগতির গতি! গতিতেই মুক্তি জানি। কিন্তু তোমার এ গতির বিধিতে কি সব ফেলে চলে যেতে হয়? তবে এ গতির মুখে এই বাঁধ, তুমি যারে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছ তার করি কি? তোমার টানে যে আমার কোনই জ্ঞান থাকে না, আমাকে আন্‌মনা করে দেয়, "তবে রইল পড়ে বাঁধ, রইল পড়ে কুল, আমাকে চল্‌তেই হল, আমাকে চল্‌তেই হবে" বলে ভেসে যেতে বলে? তোমরা বিদ্রূপ করছ, মায়ের এ গতি শোভন নয় বল্‌ছ? বাঁধে ভর করে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেতে পার ত যাও, নয় ত একে এঁটে ধরে থাক ডিঙ্গিয়ে যেওনা বল্‌ছ। তোমরা এ টান বুঝবে না তাই ওকথা কইছ। এ নদীর পরাণ বাঁধের বশ হতে পারে না—"সাগর যে সদা গো টানে নদীর পরাণ"। বাঁধ ত আমার উপলক্ষ্য মাত্র, গতির বেগ বাড়াবার জন্যে। বেগ যার বাঁধও যে তারি। সে যে দূরে থেকে তামাসা দেখ্‌ছে, কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! ধরে ডুবেই মরি, না ভেসেই উঠি! বাঁধ আমায় ভাসাবে? না ডোবাবে? যদি মেলা আবর্জ্জনা এনে স্তূপীকৃত করে এ বাঁধের আকার বাড়াতে পারি, তবে তাতে ঠেকে গিয়ে, এ গতি শতধা বিভক্ত হয়ে ক্ষীণপ্রাণে চলৎশক্তি হারায়ে যাবে জানি। নগণ্য খাল বিল সরিৎ পতিকে পায় না, তাতে গিয়া পৌঁছায় না। কিন্তু আমি যে জননী জাহ্নবী। সাগরসঙ্গম আমার পরিণতি! আমি পূজার নির্ম্মাল্য মাথায় করে, প্রতিমার কাঠাম বুকে ধরে, তারি পানে ধেয়ে যাচ্ছি। কি ফেলে যেতে হবে, কি লয়ে যাব, সে ভাবনা তার। তারি জোয়ার-ভাঁটায় আমাতে জোয়ার-ভাঁটা খেল্‌ছে। ভাঁটার দিনে শুক্‌না টানে বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়ে আমার সব লুকানো জাহির করে

দিয়ে চলে যায়। তখন দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশে মৃতের মত পড়ে থাকি। আবার জোয়ারের দিনে, সোহাগের বানে আমায় ফুলিয়ে ফুলিয়ে, কূল ছাপিয়ে, কূল ছাড়িয়ে টেনে লয়ে চলে। আমি তখন আর কিছুরই দিশা পাই না আপনাতে থাকি না। তারি জন্যে বল্‌ছিলাম, তোমরা কূলে থেকে আমার এ টান বুঝ্‌বেনা।

আমি পুণ্যপিযূষবাহিনী স্রোতস্বিনী! দুকূলের সন্তান আমায় "মা" "মা" বলে ডাক্‌ছে, আমি তাদের ডাক শুন্‌ছি, কিন্তু তা বলে তাঁদের ডাকে আমি আমার অপারের টান ছেড়ে পারে এসে দাঁড়াই নি! আমি পাষাণী মা, আমি পাষাণের মেয়ে! আমার যোগা-যোগ উর্দ্ধে সেই শৈলেশ্বরের সঙ্গে, তারি বুকের রক্ত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আমার বোঝাপড়া নিম্নে ঐ দুর্জ্জয় পারাবারের সাথে। এই দুইএর ব্যবধান ব্যাপিয়া চলেছি আমি, আমার কি আর এদিক্ ওদিক্ চাওয়া চলে?

আমি যে পিতৃগৃহে অরক্ষণীয়া হয়েছিলাম, তাই তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হতে তাড়া খেয়ে, পিতৃকুল ছেড়ে, ত্বরা করে শত সহস্র যোজন দূরে, আমাকে আস্‌তে হয়েছে এই আমার চরম গতির সাথে মিলিত হতে। তদবধি তারি জীবনে জীবন ধরি, তারি বুলি আওড়াই, তারি টান টানি। এটান ছিঁড়ে নিয়ে ছিট্‌কে পড়্‌তে পায় না। এযে যাবৎ জীবন, তাবৎ টান! আর ছাড়াছাড়ি হবার যোই নাই, আর অপরাধ ঘটে না। তাই আমি জননী হয়েও সন্তানের কাছে ধরা দিচ্ছি না, সে আমায় আটকে রাখ্‌তে পারছে না। কখনও কখনও যদিও বা এ টানের চোটে আমায় অপথ ধরিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তখন মাথা খুঁড়ে মর্‌লেও আমার এই দুর্ব্বিসহ আবেগ সইবার ভার সে সর্ব্বসহাও নেয় না, পায়ে ঠেলে আমায় ফিরিয়ে দেয়। এই ভাবে ধাক্কা খাওয়ায়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তবে সে আমায় আপনার করেই রেখেছে। তাই ভাবি গো মনে, কোথায়

আমার উৎপত্তি আর কোথায় আমার পরিণতি! এ টান পথের সম্বল না হলে, কবে ঝোঁপে ঝাঁড়ে পড়ে ম'রে থাক্‌তাম।

কিন্তু আজ কি জানি কেন আর শুধু এ যোগাযোগের টানে প্রাণ মান্‌ছে না। আর নয়নে নয়ন রেখে নয়নলোভনকে দেখা, পরশের প্রেরণায় পরশমণিকে ছোঁওয়া, রসের লালসে রসরাজে নেশা, সুরভির তাড়নায় তারি পিছু ছোটা, এসবে তার আর মন নাই। সে কেবলি বল্‌ছে, "আর নয় আর নয়, আর এসব নয়, আর যোগাযোগ নয়, মিলন নয়, আর আবেগ নয়, অভিসার নয়, ত্বরা নয়, আর আবদার নয়, অভিমান নয়, আদর নয়। আহ্বান নয়, এসো এসো নয়, বসো বসো নয়, আজ আর এসব কিছুই নয়।" আজ প্রাণটা চাইছে শুধু শব্দকে আশ্রয় করে থাক্‌তে, শুধু ডাক্‌তে! দূরে সরে, গলা ছেড়ে ডাক্‌তে, প্রাণখুলে ডাক্‌তে। সে ত কাছে থেকে হবে না, মিশে গেলে চল্‌বে না, চোখে থুয়ে পার্‌বে না! ডাক্‌তে হলে দূরে যাওয়া চাই, বিয়োগ ঘটান চাই, তার ভোগ ভোগা চাই। তবেই না ডাক খুল্‌বে, পরাণ পরশ কর্‌বে, তোমায় উন্মনা বানাবে।

একদিন বসন্তের নবীন পাখীও ডেকেছিল, বাসা ছেড়ে উড়ে গেছিল, সে বসন্ত সখার অন্বেষণে তারি সহ মিলিত হবার জন্যে! কিন্তু আজ সে নবীন পাখী মা-পাখী হয়ে, মিলনের মহাযোগ উপভোগ করে, পরের ঘরে ছানা রেখে, দেখ সে কেমন নির্ব্বিকারে, নিশ্চিন্ত মনে একা চলন, উধাও হয়ে উড়ে চলন, দূরে চলন সে শুধু ডাকবার লাগি। তার এ ডাক বিশ্বজনকে বিমোহিত করে, বিশ্বজনের মুগ্ধ মনের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেই বিশ্বেশ্বরের কাছে পৌঁছিবে কিনা সে তা জানে না। তার কাজ শুধু ডেকে যাওয়া, ডাকের মত ডাক ডাকা। তোমাদের অভিযোগ, সে বসন্তের পাখী বসন্ত নইলে, সে দেখা দিবে না, ডাক্‌তে আস্‌বে না, মন মজাতে পার্‌বে না। তার দোষ কি বল? আপন আবেগ জানাতে কে না

মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করে, শুভলগ্ন খুঁজে মরে ? তাই বসন্তের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত নইলে যে তার গলার আওয়াজ খোলে না, তাতে মিষ্ট রস মিলে না, বিয়োগের ভোগ বাড়ায় না। সে যে শীতের জড়-সড় ভাব, তাপের খরতর প্রভাব, জানাতে চায় না, জানাতে পারে না, সে তা আপ্‌নি গোপনে সয়ে লয়। বসন্তের সুমন্দ শীতল বাতাসে, যখন সবার মনে উল্লাস আসে, তখন তারও দিল্‌ খুলে যায়। তখন কেবল অবিরাম অফুরাণ ডাক্, ডাকের উপর ডাক "ন যত্র দুখং ন সুখং ন চিন্তা, ন-দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদ্ ইচ্ছা।" সেখান থেকে ডাক্। তাই বসন্তের দিন তার বেরুবার দিন, গলা ছেড়ে ডাকবার দিন, ডেকে ডেকে প্রাণ জুড়াবার দিন। যদি জীবনের দোটানার দিনেও এম্‌নি করে বারে বারে বসন্তের আনাগোনা রাখ্‌তে পার; যদি বসন্তের মা-পাখী হয়ে, ছানা ছেড়ে, উধাও হয়ে উড়ে, তাপে পুঁড়ে, জলে ভিজে, হিমে জমেও, ফিরে এদিনে এসে, গলাছেড়ে ডাকতে পার। যদি ডালে নাহি বস, যদি আশ্রয় নাহি চাহ, কেবল ডাকিতেই রহ, তবেই জানবে, তবেই কানে শুনবে ঐ তোমার "কুহু" "কুহু" "কুহু" ডাকই কেমন "তুঁহু", তুঁহু", তুঁহু" বোল্‌ বল্‌ছে। "তুমি" "তুমি" "তুমি", "তৎ-ত্বম্-অসি", "তৎ-ত্বম্-অসি" "তত্ত্বমসি"। তোমার সে ডাক্ শুনে দূর হতে দশকণ্ঠ মিলে, তোমায় ফিরে ডেকে ডেকে বল্‌ছে "কুহু" "কুহু" "কুহু", "তুঁহু" "তুঁহু" "তুঁহু", "তুমি" "তুমি" "তুমি" "তৎ-ত্বম্-অসি" "তৎ-ত্বম্-অসি" "তৎ-ত্বমসি" "সে তুমি নিজে"! তাই কি ? ওরা মুখে বল্‌ছে "সোঽহম্" ? এতকাল কত কি বিঘোরে ঘুরে ঐ যে বলে এলাম "তৎত্বম্", আজ কিনা বিয়োগের বিলাসে পড়ে, এই আপন ডাকেরি জোরে জানলাম সোঽহম্। আর চাই কি ? যোগ আর বিয়োগ,—মিলন আর ব্যবধান! এই দুইএর মহিমা জান্‌তেই, এজগতে জন্ম লয়েছিলাম। এই দুইকে জেনে আজ পরমানন্দ মনে তবে আমি চল্‌লাম। আবার ঘুরে ফিরে বসন্তের পাখী হয়ে দূরে

দূরে দূরে, বিয়োগের এই বিলাস উপভোগ করতেই আসি, কি জন্মজন্মের তরে আপনা খোয়ায়ে সেই নাগরসঙ্গ সাগরসঙ্গই মাগি; সে তখন আমার ইচ্ছে।

শ্রীমতী জগদম্বা দেবী।

গান

মিটাও না এই পিয়াসা,
এই তো আমার মিষ্টি লাগে,
ওগো বিরহি! চির বিরহি!
এ তৃষা যেন নিত্য জাগে।
মিলন আমি চাই না হে!
এই পিয়াসা যেন থাকে।
চোখের জলে এত মধু,
প্রাণবঁধু হে! প্রাণবঁধু!
মুছায়ো না চোখের বারি,
নাই বা এলে আঁখির আগে।
নাই বা হ'ল মিলন যদি,
এই বিরহ নিত্য জাগে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[৮]

সহজযান।

মহাযানমতে নির্ব্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া 'দশভূমি' অতিক্রম পূর্ব্বক শূন্যের উপর শূন্য, তা'র উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্ব্বাণ-পদ লাভ হয়। এত ত লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে ত 'সাংবৃত সত্য' বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং "পরমার্থ সত্য"কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়াছে—অতএব উহা 'অস্তি'ও নয়, 'নাস্তি'ও নয়, 'তদুভয়'ও নয়, 'অনুভয়'ও নয়। তবে উহা কি?—অনির্ব্বচনীয় রূপ। কিন্তু উহার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে নয়—ইংরাজীতে বলিতে গেলে 'Positive', 'Negative' রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে ঐ অবস্থায় শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও 'ভাব'। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্ব্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই।

সহজধর্ম্মের অনেক বই বাঙ্গলায় লেখা। হওয়াই উচিত। যদি নির্ব্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন করা কেন? বাঙ্গলায় বলিলে উহা ত আরও সহজ হইবে। তাই

তাঁহারা বাঙ্গলাতেই সহজধর্ম্ম প্রচার করেন। সরহপাদ বাঙ্গলায় বলিলেন ;—

অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা,
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।
অম্হে ণ জানহু অচিন্ত জোই—
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীয়ন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো।
জা এথু জাম মরণে বিশঙ্কা
সো করউ রসরসামেরে কথা॥

লোকে বৃথা আপনা-আপনি সংসার ও নির্ব্বাণ মনে মনে রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি অচিন্ত্যযোগী—আমি জানি না জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ; জীয়ন্তে ও মরণে কোনই বিশেষ নাই। জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

ভাদেপাদের কথা এই :—

এতকাল হাঁউ আছিলেঁ স্বমোহেঁ
এবে মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ।
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা—
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহদিহ সর্ব্বই সূন
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন।
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ
চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥

এতকাল আমি আমার মোহেতেই ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টলিয়া গগন-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি দশদিক্ সকলই শূন্য। চিত্তই যখন নাই, তখন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছি। ভাদেপাদ বলিতেছেন, ভাগ ত নাই, আমি আমার চিত্তরাজকে আহার করিয়া ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে 'নিঃস্বভাব' করিয়াছি।

এই দুইটি গান হইতে আমরা কি বুঝিতে পারিতেছি? যখন সবই শূন্য—তখন উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই; জন্মও নাই, [illegible] নাই, সংসারও নাই। 'চিত্ত' 'চিত্ত' বলিয়া যে পদার্থ [illegible] তাহাও ত শূন্যসমুদ্রে পড়িয়া মিশাইয়া গিয়াছে। [illegible] হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব, তখন আমারই চিত্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কি? আমি যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবনা ভাবিতেছিলাম, তত দিন আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম। ঠিক গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ পাইয়া, আমি বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ নাই। আমি চিত্তরাজকে 'আহার' করিয়া ফেলিলাম।

যোগাচারমতে যেমন—কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে, সহজমতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনও বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষসংযোগজনিত সুখ। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে—নীচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্য আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া "নিঃস্বভাব" হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা—সদ্‌গুরুর উপদেশ।

এই যানের কথা :—

ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকম্।
নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ॥ [শ্রীসমাজতন্ত্র]

বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্ব্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্ব্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্ব্বাণের চরম ফল, যে নির্ব্বাণে আর 'বিবর্ত্ত' থাকে না, অর্থাৎ, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

গুরুর কথা শুনিলে, তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিবে। [বজ্রজাপ ?]

গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পারা যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি না। সে সুখে তন্ময়তা লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ হইয়া থাকে।

[সরহপাদপ্রবন্ধ]

সে গুরুকে আমরা বজ্রগুরু বলি কেন? বজ্র বলিতে শূন্যতা বুঝায়। যোগরত্নমালায় লিখে—

দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে॥

শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাতে ছেঁদা করা যায় না—উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয়, সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা।

শ্রীসমাজতন্ত্রে বলিতেছেন—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্ধি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা॥

যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক হইবে, ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে। দুঃখ উপস্থিত হইলে, মন স্থির থাকিবে না, মনস্থির না থাকিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না।

হেবজ্রতন্ত্রেও বলিতেছে—

রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানিত না, অর্থাৎ, অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা জানেনা, আমরা, সহজপন্থীরাই, কেবল জানি।

আবার শ্রীসমাজ বলিতেছেন :—

পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে। সেই পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।

সরহপাদ বলিতেছেন :—

তন্মুতরচিত্তাঙ্কুরকো বিষয়রসৈর্যদি ন সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে॥

যখন চিত্ত অল্পে অল্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিত্তরূপ ছোট অঙ্কুরটির গোড়ায় বিষয়রস যদি না সেক কর, কেমন করিয়া সেই অঙ্কুর কল্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে?

এই সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, যে যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর।

পঞ্চকাম উপভোগ ত সকলেই করে। তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম্ম কেন? সে ত সকলে আপনা হইতেই করে? তাহার জন্য আবার গুরু কেন? একটু আছে। মানুষ-মাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন, যে সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজীয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। তাই দারিকপাদ বলিলেন :—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুখলীলে দুলখ পরমনিবাণে॥
দুখেঁ সুখেঁ একু করিআ
ভুঞ্জই ইন্দিজানী।
স্বপরাপর ন চেবই
দারিক সঅলানুত্তরমানী॥

অরে বালযোগি, তোর মন্ত্রেই বা কি? তন্ত্রেই বা কি? ধ্যানেই বা কি? ব্যাখ্যানেই বা কি? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্ব্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ। তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা

করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার আত্মপর বোধ নাই।

তিনি এই সঙ্গেই আবার বলিতেছেন—

রাআ রাআ রাআরে অবররাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুবণেঁ লধা॥

আর যত রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরমসুখ লাভ করিয়াছেন।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজীয়াদের কি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে।

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঃস্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্চ্ছিতঃ॥

শরীর যখন সৎসুখে মূর্চ্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়াই পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই যে পঞ্চকামোপভোগ—ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? সে বিষয়ে অনুত্তরসন্ধিতে এই কথাটি দেখা যায়।—

সর্ব্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।
জ্ঞানত্রয়প্রভেদোঽয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে॥

সকল মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়াই বড়। ইহাতেই তিনটি জ্ঞানের যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটি জ্ঞান—প্রথম তিনটি শূন্য। সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় এবং বিরমানন্দ রূপ যে চতুর্থ শূন্য তাহা পাইতে পারা যায়। এই চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। ইহাতেই নিরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিত্ত মহাসুখে লীন হয়।

সবরপাদ বলিতেছেন :—

তইলা বাড়ীর পার্সের জোহনা বাড়ী তাত্রলা।
কিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিলা॥
কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুখে ভেলা॥

তৃতীয় বাড়ীর (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ী বলিতে শূন্য বুঝাইল) পাশে জ্যোৎস্না বাড়ী বা জ্যোৎস্না শূন্য। সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সর্ব্বদা উদিত। সেখান হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে। সেখানে কাঁকুড় পাকিল না (সন্ধ্যাভাষায় কাঁকুড় শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী সুখ ; পাকিল না, অর্থাৎ শেষ হইল না। অর্থাৎ, সুখই রহিল।) শবর ও শবরী (বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবী) উন্মত্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শবরের জ্ঞান—চৈতন্য কিছুই রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে মত ইহা সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায়, সহজীয়ারা তাহাই দিল ; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগ-রাগিণীতে এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কি কি যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তাহাদের খোল করতাল ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে একতারা ছিল বলিয়া জানা যায়—প্রমাণ—বীণাপাদ বলিতেছেন ;—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুকবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

সূর্য্য হইলেন লাউএর বস্—অর্থাৎ পাকা লাউএর শক্ত খোলা, তাহাতে চাঁদ, তাঁত বা তন্ত্রী লাগিল, অনহা অর্থাৎ অনাহতকে দণ্ড করা হইল ও অবধূতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়ালা হইল। হে সখি ঐ শুন হেরুকের বীণা বাজিতেছে। আর সেই তন্ত্রীধ্বনিতে শুনিয়া ও করুণা বিলাস করিতেছে।

এই যে বীণাধ্বনি ইহা একরকম music of the sphereএর মত, অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মত। মিউসিকে যে বীণা-ধ্বনিতে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বীণাধ্বনিতেও ত্রৈধাতুকময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল।

তাহারা পটহ বা ঢোল বাজাইত :—

বেটিল হাক পড়ণ চউদিশ [ভুসুকুর গান]

তাহারা ডমরু ব্যবহার করিত, মাদলও বাজাইত :—

অণহা ডমরু বাজএ বীরনাদে [কৃষ্ণাচার্য্য]

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা

মণ পবণ বেণি করণ্ডকশালা [কৃষ্ণাচার্য্য]

তাহাদের দুন্দুভি ছিল।

জঅ জঅ দুন্দুভি সাদ উছলিআঁ

কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ [কৃষ্ণাচার্য্য]

তাঁহারা যে সকল রাগে গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সঙ্কীর্ত্তনে চলিতেছে।

যথা :—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাডী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারি, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্ত্তারা সন্ধ্যাভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। ইহাকে রূপক বলিতে চাও, বল।

কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখন বিবাহ বলিতেছেন, কখন তরুলতা সাজাই-তেছেন, কখন হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখন দুধ-দোহা বলিতেছেন, কখন বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতে-ছেন, কখন বা নদীর উপর সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতে-ছেন, কখন শূন্য ও করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখন গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে নানা অলঙ্কারে তাঁহারা সহজমত নানাদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যাঁহারা গান লিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্ত্তা এবং তাঁহাদের গানের নাম পদ। বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্ত্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখি-তেন তাহার নাম চর্য্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্য্যাপদ ছাড়া আরও পদ লিখিতেন—যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশ পদ বা উপ-দেশগীতিকা।

তখন অনেক বড় বড় লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশাও বাঙ্গলায় গীতিকা লিখিতেন। যে রত্নাকর শান্তির নামে আর্য্যাবর্ত্তের দার্শনিকেরা ভয় পাইতেন, তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ ত গীতিকা লিখিতেনই, এতদ্ভিন্ন আসামী, উড়িয়া ও মৈথিলেরাও গীতিকা লিখিতেন। সহজ ধর্ম্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাঙ্গলায় বাজিল বজুল ও বজ্রগু বলিত। লোকে মনে করিত ইহা-দের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা দাড়ীগোঁপ কামাই-তেন, মাথায় বড় বড় চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা, তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াই-

তেন। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য বলিত। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্য্যের মূর্ত্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ সিদ্ধাচার্য্যদের আদি, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। লোকে বলে সর্ব্বশুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। লুইএর বাড়ী বাঙ্গলাদেশে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিব্বত দেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটা খাইতে ভাল বাসিতেন, সেই-জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্ম-ঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইএর উদ্দেশে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। লুইএর পূজার দিন তাহারা সেই পাঁটা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেনবাবু বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকু রাঢ় বলে, সেখানেও লুইএর পূজা হইয়া থাকে। লুইএর বংশে আরও কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন, এবং বাঙ্গলায় গান লিখিয়াছিলেন।

এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়াধারীদের যেমন অনেক চেলা থাকে সেইরূপ সিদ্ধাচার্য্যদেরও অনেক চেলা ছিল, যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাঙ্গলার কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কি না খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্ত্তা ছিলেন। একে ত তাঁহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায়, তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে, গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই ত শূন্য—সংসারও শূন্য,

নির্ব্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র।

এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদি-তেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা ত আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কি পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গ-বাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইঁহারা যে সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম এখনও চলিতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজীয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজীয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুঁটুর বাপ

পুঁটুর মায়ের অনেক বয়স অবধি সন্তানাদি হয় নাই। সন্তান-কামনায়, নানাবিধ ব্রত উপবাস করিয়া, ও অসংখ্য মন্ত্রপূত মাদুলী ও কবচ ধারণ করিয়াও, সে সন্তান-লাভাশায় যখন প্রায় নিরাশ-চিত্ত হইয়াছে, তখন মা ষষ্ঠী মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—সে পুঁটুকে কোলে পাইল। পুঁটু এ পৃথিবীতে আসিয়া যে আদর অভ্যর্থনা পাইল, বুঝি রাজারাজড়ার সন্তানও তাহা পায় না। বিমল সন্তানু-স্নেহ ধনী দরিদ্রের হৃদয়ে সমান ভাবেই বিরাজ করে!

পুঁটু দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। দরিদ্রের গৃহে এত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যাইত। বাপ মা আদর করিয়া নাম রাখিল "পুঁটুরাণী"। ছয় মাসের পুঁটুরাণী যখন তাহার কোঁকড়া চুলের মধ্য হইতে কালো চোখ দুটি তুলিয়া, বিস্মিত নেত্রে সকলের পানে চাহিত, তখন কেহই তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পুঁটুর বাপ বাবুদের বাড়ী কাজ করিতে যাইত, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকিত তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে। সন্ধ্যা হইলে গৃহের জন্য, পুঁটুর জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত। সে কতক্ষণে গৃহে যাইবে, কতক্ষণে পুঁটু "বাবা" "বাবা" বলিয়া তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, কতক্ষণে সে পুঁটুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উঠানে হাঁটিয়া বেড়াইবে, পুঁটু ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, সে কি রকম করিয়া, কতক্ষণ ধরিয়া, সে ঘুমন্ত মুখের শোভা বসিয়া বসিয়া দেখিবে, ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইচ্ছা হইত তখনই ছুটিয়া গৃহে যায়! যতই দিন যাইতে লাগিল, পুঁটু সম্বন্ধে হৃদয়ের এই দৌর্ব্বল্য ততই তাহাকে পাইয়া বসিতে লাগিল। তাহার আর কাজে মন লাগে না,—আর কাজ-কর্ম্মে নানা অনব-ধানতার জন্য সে প্রায়ই প্রভুর নিকট ভর্ৎসনা পাইতে লাগিল।

দিনগুলিও যেন ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া তাহার সহিত শত্রুতা সাধন করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিপ্রহরে, বাবুদের বাড়ীর খানসামাদের গৃহে যাইবার নিয়ম ছিল না। বাবুদের কখন কাহার কি দরকার হয়, বড় মানুষের মেজাজের ত ঠিক নাই! পুঁটুর বাপ কিন্তু প্রায়ই এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিল। সে আহারাদির পর বিশ্রাম না করিয়া, লুকাইয়া মাঝে মাঝে ঘরে আসিতে লাগিল। রামচরণের বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাহার কুটীরে আসিয়া তাহাকে দেখিলে, আর কেহ তাহাকে পূর্ব্বের সেই ভব্য সভ্য গম্ভীর রামচরণ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। সে এখন ঘরে আসিয়া, পুঁটুকে লইয়া, হাসে খেলে নাচে। কখনও সে পুঁটুকে কাঁধে করিয়া পাড়ার ঘরে ঘরে বেড়ায়। সকলেই পুঁটুর সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করে, তাহাতে সে বড় আনন্দ পায়। কখনও সে ঘোড়া হইয়া, চার হাত পায়ে উঠানময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আর পুঁটু তাহার মুখে রাশ দিয়া, "হেট্" "হেট্" করিয়া, টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে তাহাকে চালায়। আবার কখনও সে পুঁটুকে বুকে লইয়া, তাহাদের ক্ষুদ্র শয্যায় নিদ্রা যায়! একদিন পথে আসিতে আসিতে তাহার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল। সে দোকানে প্রবেশ করিয়া চার পয়সা দিয়া একটা মুখস কিনিল। মুখস পরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, পুঁটু মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মুখসশূন্য পিতৃমুখ সন্দর্শন করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল! রামচরণ তাহাকে কোলে লইয়া, চুম্বনের পর চুম্বনে তাহার ক্ষুদ্র মুখখানা প্লাবিত করিয়া দিল। পুঁটুকে কোলে লইলেই রামচরণের মনে হইত তাহার ঘরে যেমনটি আছে তেমনটি বুঝি আর কারো ঘরে নাই!

পুঁটুর মা কিন্তু স্বামীর এই গোপন আগমনে, আনন্দিত না হইয়া ভীতই হইত। সে বলিত,—"ওরে দেখ, তুই এমন ক'রে আর ঘরে আসিস্‌নি। মুনিব টের পেলে অনর্থ হ'বে।"

রামচরণ হাসিয়া বলিত,—"এ মেয়েটাই তো যত নষ্টের গোড়া, এটার জন্যই তো আসি। রোজই মনে করি কাল থেকে আর আস্‌ব না,—কিন্তু বেলা যতই বাড়্‌তে থাকে ততই মনটা যেন কেমন ক'রতে থাকে। তখন ভাবি আজ যাই কাল আর যাব না। মুনিব টের পেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না তা জানি।"

এই ভাবে বেশী দিন গেল না,—সে একদিন ধরা পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব রাত্রে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে কাটাইয়া আসিয়া, সেদিন মেজবাবুর শরীর ভাল ছিল না। মেজাজও যে তৎসঙ্গে ভাল ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। বাড়ীর মধ্যে রুক্ষ মেজাজের জন্য মেজবাবু প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নলিনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, রামচরণকে একবার ডেকে দে তো, আমার গা হাত পাটা একটু টিপে দেবে।" রামচরণকে কিন্তু পাওয়া গেল না,—সে তখন তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে, ক্ষুদ্র শয্যায়, ক্ষুদ্র পুঁটুকে বুকে লইয়া শুইয়া আছে।

চাকর-মহলে, রামচরণের একটু প্রতিপত্তি ছিল, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও মানিয়া চলিত। বেহারী খানসামা রামচরণের কুটীরাভিমুখে ছুটিল, ফকীর খানসামা মেজবাবুর গৃহাভিমুখে ছুটিল। ফকীরকে দেখিয়াই মেজবাবু চটিয়া লাল হইলেন,—"তোকে কে ডেকেছে রে? সে নবাবের বেটার বুঝি নাক ডাকিয়ে ঘুম হচ্ছে?" মৃদুস্বরে ফকীর বলিল,—"না হুজুর, সে আজ একবার একটু ঘরে গেছে। আমি গা টিপে দেব কি?"

মুখভঙ্গী করিয়া মেজবাবু কহিলেন,—"হুঁঃ বাপ পিতামোর দেওয়া হাড় কখানার উপর তোমার মায়া না থাক্‌লেও আমার আছে। তোমার ঐ পাথরের মত হাত দু'খানা এর উপর প'ড়লেই চিত্তির আর কি? তোমার কিছু কর্‌তে হবে না, সে নবাবের বেটা কোথায় গেল একবার দয়া ক'রে খোঁজ নাও দিকিন্।"

ফকীর হেঁটমুখে চলিয়া গেল।

এদিকে বেহারী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া যখন বলিল,—"রামচরণ দা, ক'চ্ছ কি? মেজবাবু যে তোমায় খুঁজছেন," তখন ভয়ে তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। সে পুঁটুরাণীর বাহু আপন কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মনীববাড়ী ছুটিল।

মেজবাবু ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিলেন,—রামচরণ আসিয়া নীরবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি কোন কথা না কহিয়া, পদ হইতে পাদুকা খুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। রামচরণের ললাট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। মেজবাবু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কয়েকটি পদাঘাত ও চপেটাঘাতে তাহার দেহ জর্জ্জরিত করিলেন। রামচরণ একটিও কথা কহিল না। কিন্তু, তার উপরেও মেজবাবু যখন কহিলেন,—"আজ তোর দু'টাকা জরিমানা"—তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। হায়! হায়! হায়! দুটি টাকা যে দুধের শিশু পুঁটুরাণীর দুধের দাম! একবার তাহার মনে হইল, বাবুর পায়ে ধরিয়া বলে,—"বাবু গো! আমি আমার পুঁটুকে একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। তাকে না দেখে যে আমি থাক্‌তে পারিনা,"—কিন্তু পরক্ষণেই বাবুর বিদ্রূপ-পূর্ণ উচ্চহাস্য কল্পনা করিয়া নীরব রহিল। বেটা চাকরের আবার এত! তার আবার সন্তান-স্নেহ! রামচরণ সব সহ্য করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার সুগভীর সন্তান-স্নেহের উপর বিদ্রূপের কষাঘাত সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না! সে নীরবে কপালের রক্ত মুছিয়া মনীবের গাত্রসেবায় নিযুক্ত হইল।

সেই দিন বৈকালে মেজবধূ রামচরণকে ডাকিয়া তাহার হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল,—"তোমার মেয়েকে কিছু কিনে দিও। আর তাকে একদিন নিয়ে এস, আমার তাকে দেখ্‌তে বড্ড ইচ্ছে করে।" রামচরণ দিবসের প্রহারের সকল কষ্টই বিস্মৃত হইল,—হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাহার দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইল।

এই গৃহের মেজবাবুর হৃদয় যেমনই পাষাণের ন্যায় কঠিন ছিল, মেজবধূর হৃদয় তেমনই কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল।

২।

পরদিন রামচরণ, মেজবধূপ্রদত্ত পাঁচ টাকা হইতে, এক টাকা দিয়া পুঁটুর মাতার জন্য একখানা নূতন ধৌত বস্ত্র ও পুঁটুরাণীর জন্য আট আনা দিয়া একটি নালরঙ্গের ছিটের জামা কিনিয়া আনিল। পুঁটুরাণী আজ সাজিয়া গুজিয়া বাবুদের বাড়া বেড়াইতে যাইবে। রামচরণের আজ আনন্দের সীমা নাই! বৈকালে মেজবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে, রামচরণ অর্দ্ধঘণ্টার ছুটী লইয়া গৃহে আসিল,—পুঁটুরাণী ও তাহার মাতাকে মনীববাড়ী লইয়া যাইবে তাই। দরিদ্রের গৃহের এই অমূল্য রত্ন আজ ধনীর গৃহের সকলকে ম্লান করিয়া দিবে ভাবিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইতেছিল। বাবুদের বাড়ীতে মা লক্ষ্মীর কৃপা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, মা ষষ্ঠীর কৃপা অজস্রধারে বর্ষিত ছিল না। বাবুরা পঞ্চ ভ্রাতা, কিন্তু বড় বাবুর দশ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র ও সেজবাবুর একটি শিশু কন্যা ব্যতীত সে গৃহে আর শিশু সন্তান ছিল না। বড় বাবুর পুত্রটি একেবারেই রূপবান ছিল না, এবং সেজবাবুর কন্যাটি নিতান্ত কুৎসিত না হইলেও পুঁটুর নিকট সে নিতান্তই নিষ্প্রভ। এ কথা মনে করিয়া রামচরণের বুকখানা আনন্দে ও গর্ব্বে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটু ও তাহার মাতা প্রস্তুত হইলে, রামচরণ অগ্রে ও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কন্যাক্রোড়ে তাহার পত্নী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অন্দর মহলে ঢুকিতেই, মেজবধূর দাসী বামার সহিত দেখা হইল। সে রামচরণের সমভিব্যাহারে কন্যাক্রোড়ে অবগুণ্ঠনবতী রমণী দেখিয়াই, দ্রুত অগ্রসর হইয়া বলিল, "কে? রামদাদা মেয়ে এনেছ বুঝি? এই তোমার মেয়ে? এত সোন্দর!" মাতৃক্রোড় হইতে পুঁটুরাণীকে লইবার জন্য সে বাহু প্রসারণ করিল। পুঁটুরাণী কিন্তু তাহাতে বড় রাজী হইল না। সে দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া "না" "না" করিয়া উঠিল। হাসিয়া রামচরণ বলিল,—"ওবে তোকে চেনে না বামা! ও বড় দুষ্টু! অচিন্ মানষের

কোলে একেবারেই যায় না।” যেন শিশুর পক্ষে অজানা ক্রোড়ে যাইবার এই বিতৃষ্ণাটা বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক! এরূপ বুদ্ধির পরিচয় একমাত্র পুঁটুরাণী ব্যতীত কোন শিশুই যেন এ পর্য্যন্ত দেয় নাই!

বামা দাসী বলিল—“ও মা তাই নাকি? আচ্ছা বাপু, আমার কোলে এসেও তোমার কাজ নেই, আর ঠোঁট ফুলিয়েও কাজ নেই। চল, বৌ, মেজবৌদির ঘরে চল।” পুঁটুর মাকে লইয়া যখন বামা মেজবধূর গৃহে উপস্থিত হইল, তখন আরশীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সে চুল বাঁধিতেছিল। চুলের গোড়াবাঁধা দড়ীর একাংশ সে দন্তমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, বিনুনি করিতেছিল। বামা আসিয়া বলিল,—“মেজবৌদি, রামদাদার বৌ মেয়ে নিয়ে এসেছে।” তাড়াতাড়ি চুলের আগায় ফাঁস দিয়া, বেণী ঘুরাইয়া খোঁপাটা বাঁধিতে বাঁধিতে সে বলিল,—“বোস বাছা, আমার এই হ’য়ে গেল ব’লে।”

খোঁপা বাঁধা হইলে, মাথার কাপড় উঠাইয়া দিয়া, হাস্যবদনা মেজবধূ ফিরিয়া বসিল। তাঁহার সুন্দর মুখখানাতে যেন করুণা উছলিয়া পড়িতেছে। সুমধুর হাসি হাসিয়া সে বলিল, “ও মা, কি সুন্দর মেয়েটি, দেখ্‌লেই কোলে ক’ত্তে ইচ্ছে যায়। এসতো, মণি আমার কোলে এস।” আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুঁটুরাণী এবার আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া, তাহার প্রসারিত বাহুমধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিল।

বামাদাসী একেবারে গালে হাত দিল,—“ও বাবা, এ মেয়ে ত কম নয়! আমার কোলে আসা হোল না, আর বড় মানুষের কোল দেখে ঝাঁপিয়ে পড়া হোল!”

পুঁটুর মাতা অপ্রতিভ হইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—“না দিদি, ও কি অত শত বোঝে? বৌদির গয়না দেখে ওঁর কোলে গ্যাছে।” বামা হাসিয়া কহিল,—“যাও যাও তোমার আর মেয়ের জন্য ওকেলতী ক’রতে হবেনা,”—বামার বাক্যগুলি কর্কশ হইলেও মনটা বড়ই

সাদা ছিল। পুঁটুরাণী মেজবধূর ক্রোড়ে গিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা তাঁহার অলঙ্কারগুলির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাৎ করিয়া কহিতে লাগিল,—"একি ?" "একি ?"

মেজবধূ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, বড়বধূর মহলে প্রবেশ করিল। বড়বধূ তাঁহার শয়নগৃহের সোফার উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় লেস বুনিতেছিলেন। আর অনতিদূরে, কক্ষতলে বসিয়া সেজবধূ একখানা ভিজা গামছা দিয়া তাহার কন্যাটির গাত্র মার্জ্জনা করিতেছিল, ও অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছিল। কথাগুলি বোধহয় মেজবধূ সম্বন্ধেই হইতেছিল,—কেন না সে প্রবেশ করামাত্রই সে বাক্য-স্রোত অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেজবধূর কণ্ঠেই আটকাইয়া গেল! মেজবধূর উদার সরল হৃদয়টা এই ধনীর অন্দরে সকলেরই একটা বিদ্রূপের বিষয় হইয়াছিল। তাহার গতিবিধি চালচলন যে নিতান্তই দীন দরিদ্রের মত, এবং সে যে এই জমীদার গৃহের নিতান্তই অনুপযুক্ত, তাহা বহু পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। মেজবধূ গৃহে প্রবেশ করিয়া, এক গাল হাসিয়া বলিল, "দেখ দিদি, রামচরণের মেয়ে। মেয়েটি খুব সুন্দর, নয় কি ?"

বড়বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"মেজবৌ তুই যেন কি ? কোথাকার একটা চাকর না কে, তার মেয়েটাকে কোলে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ ? তোর কি ঘেন্নাও করে না ? অবাক কল্লি বাপু!"

অপ্রতিভ হইয়া মেজবধূ বলিল,—"কেন দিদি, চাকরের মেয়ে ব'লে কি হ'য়েছে ? এমন সুন্দর মুখখানা দেখ্‌লে কার না কোলে ক'ত্তে ইচ্ছে যায় ? আর ছোট শিশু বড় সুন্দর জিনিস, এদের দেখ্‌লে কি কারুর ঘেন্না আসে দিদি ?" সেজবধূর কন্যার গাত্র মার্জ্জনা শেষ হইয়াছিল। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, একটু মুখ বাঁকাইয়া, একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল,—"মেজদির ঐ এক

রকম! রাস্তার মুটে মজুরদের ছেলেগুলি ডেকে নিয়ে এসে কত আদর করে! কে জানে বাপু”—কথা শেষ না করিয়াই সে গৃহ ত্যাগ করিল।

মেজবধূর বক্ষস্থল মথিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস বাহির হইল। ইহাদের নিকট কোন বিষয়ে সহানুভূতির আশা বৃথা!

আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মেজবধূ সিন্দুক খুলিয়া একটি ছোট বাক্স বাহির করিল। পুঁটুর মা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহা ছোট ছোট বালা চুড়ী হার প্রভৃতি ছোট শিশুর উপযুক্ত বহুবিধ অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। বাক্সটি খুলিয়া মেজবধূ, কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের স্থায় অলঙ্কারগুলির পানে চাহিয়া রহিল। বহু আকাঙ্ক্ষা, বহু আরাধনার ধনের আগমন প্রত্যাশায়, তাহার অভ্যর্থনার জন্য, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে অমূল্য ধন, দিবসত্রয় মাত্র এ পৃথিবীতে থাকিয়া, মাতৃ-বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বুকভরা আদর, প্রাণভরা ভালবাসা কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না! সেই অবধি মাতৃবক্ষ শূন্যই রহিয়াছে,—আর একটি ক্ষুদ্র শিশু আর মাতার প্রাণের সে মহাশূন্য পূর্ণ করিতে আসে নাই! অলঙ্কারগুলিও আর বাক্স হইতে বাহির হয় নাই। সেজবধূ সুতিকা-গৃহ হইতে বাহির হইলে, তাহার শিশুটিকে গহনাগুলি দিবার মানসে একদিন সে গিয়াছিল। কিন্তু, গহনার বাক্স হস্তে তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, সেজবধূ যখন কন্যাটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি মেজদি, বাছার গায়ে ওসব দিও না, ওগুলো বড় অলুক্ষুণে”—তখন সে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। যে ভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবেই ফিরিয়া গেল। অশ্রুজলে তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল,—বাকশক্তিও বুঝি ছিল না।

কিছুক্ষণ বাক্সটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর, এক জোড়া ক্ষুদ্র স্বর্ণ বলয় বাহির

করিয়া সে পুঁটুরাণীর হস্তে পরাইয়া দিল। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া নামিল। ত্রস্তে তাহা মার্জ্জনা করিয়া, পুঁটুর মুখ চুম্বন করিয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া সে কহিল,—"আজ এস বাছা, সন্ধ্যে হয়ে এল। মাঝে মাঝে এসো।"

পুঁটুর মা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে, ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণতা হইয়া বিদায় লইল।

৩।

রামচরণের সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিল। একেই দুর্ব্বৎসরে সকল জিনিসপত্র মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার উপর পুঁটুর মনোরঞ্জনার্থ এটা ওটা কিনিয়া প্রায়ই সে তাহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিতে লাগিল। সে প্রায় প্রত্যহই পুঁটুর জন্য একটা না একটা কিছু হাতে করিয়া আসিত। কোন দিন বা একটা চিনা পুঁতুল, কোন দিন বা কাঠের বাঁশী, কোন দিন বা একটা ঝুমঝুমি। যেদিন অন্য কিছু আনিতে না পারিত, সেদিন "পয়সা জোড়া রসগোল্লার" একজোড়া রসগোল্লা হাতে করিয়াই সে আসিত। পুঁটুর মাতা ঘোরতর আপত্তি করিলেও সে শুনিত না। বাপরে! এ প্রলোভন কি ত্যাগ করা যায়? না হয় অন্য কোন বিষয়ে তাহারা একটু কষ্ট করিয়াই চলিবে। পুঁটুরাণী ত আর সাধারণ ছোট শিশুর মত নির্ব্বোধ নহে? তার বুদ্ধি যে বড়ই তীক্ষ্ণ! সে ইহার মধ্যেই বাপের এই দুর্ব্বলতাটুকু বেশ বুঝিয়া লইয়াছে। কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিতে তাহার যতই রাত্রি হউক না কেন, পুঁটু কি কখনও ঘুমায়? সে তেমন পাত্রই নয়! একদিন ভুল হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? তার যে দুর্জ্জয় অভিমান! সেদিন হয় ত সে তাহার কোলেই আসিবে না। রামচরণ কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? তারপর তাহার আনীত দ্রব্য দেখিয়া পুঁটু যে আনন্দে অধীর হয়, নৃত্য করে, গলা ধরিয়া বার বার চুমা খায়, তাহার কি একটা

সুখ নাই? এই সুখের আশায় তৃষিত হৃদয়ে সে যে জীবনের অনেককাল কাটাইয়া দিয়াছে! দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া, নিরাশ চিত্তে সে ত তাহার জীবন ব্যর্থ বলিয়াই মানিয়াছিল। অবশেষে বিধি যদি দয়া করিয়া এ অমূল্য নিধি দিয়াছেন, তবে তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন তাহারা না করিবেই বা কেন? পুঁটু যখন তাহার বালাপরা হাত দুখানা নাড়িয়া, ঝাঁকড়া চুলভরা মাথাটা দোলাইয়া, নাক মুখ চোখ ঘুরাইয়া আধ আধ কথা কয়, তখন ত রামচরণের মনে হয় তাহার মত ভাগ্যবান বুঝি এ সংসারে আর নাই। বিধাতা বুঝি এ জগতের যত সুখ যত আনন্দ তাহার জন্যই সৃজন করিয়াছিলেন। সে এই সুখের প্রলোভন প্রাণান্তেও ত্যাগ করিতে পারিবে না। একথা লইয়া প্রায়ই তাহাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হইত। অবশেষে একদিন যখন সে কাটা কাপড়ের দোকান হইতে একটি সুন্দর গোলাপী রঙ্গের রেশমের জামা কিনিয়া আনিল, তখন স্বামী-স্ত্রীতে রীতিমত কলহ হইয়া গেল। পুঁটুর মা শেষে বলিল,—"সোংসার কি ক'রে চলে তার ঠিক নেই, আর দেড় টাকা দিয়ে একটা জামা কিনে নিয়ে এলে কি ব'লে? পেটে রইল খিদে আর পিঠে হোল জামার বাহার। মিন্সের জ্বালায় বিবেগী হ'য়ে বেরিয়ে যাব নাকি? আমরা কাঙ্গাল গরীব নোক, আমাদের ঘরে এত কেন?"

রামচরণ কিন্তু তাহার বাক্যে কর্ণপাতও করিতেছিল না,—সে পুঁটুকে জামা পরাইতে ব্যস্ত ছিল। তাহাকে জামা পরাইয়া, কোলে লইয়া তাহার মাতার সন্নিকট হইয়া বলিল,—"আরে পাগ্‌লি, রাগ করিস কেন? দেখ্ ত আমার মায়ের রূপ কেমন ফেটে পড়্‌ছে! আর তুই মাগী রাতদিন গরীব গরীব করিস্‌নি বলছি, দেখিস্ আমার মা রাজরাণী হবে।" পুঁটুর মা হাসিয়া ফেলিল। পুঁটুকে কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল,—"রাজরাণী হ'য়ে আর কাজ নি। বেঁচে বর্ত্তে থাক, আমার মত সুখে

ঘরকন্না কত্তে পাল্লেই হয়। তার বাড়া আর কিছু চাই নি।"

৪।

পুঁটুরাণী যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য লইয়া এ সংসারে আসিয়াছিল, সেই পরিমাণ অদৃষ্টের জোর লইয়া আসে নাই। আসিয়া থাকিলেও তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত ছিল, আপাততঃ কিছুই প্রকাশ পাইল না।

পুঁটু এখন দেড় বৎসরের বালিকা। এখন আর সে হাঁটিতে গিয়া টলিয়া পড়ে না, উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়ে না। সে এখন সারা উঠানময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়! শ্রাবণ মাস—আকাশ সেদিন বড়ই মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে গুমট্ ধরিয়া আছে, গাছের একটি পাতাও নড়িতেছে না। প্রকৃতির এই বিরাট নিস্তব্ধতা, বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বের লক্ষণ জানিয়া রামচরণ প্রমাদ গণিল। সে অতি সত্বর তাহার কাজগুলি সারিয়া লইতেছিল,—তবু যেন কাজ আর ফুরায় না!

মেজবাবু সেদিন একটু খোস মেজাজে ছিলেন। রাত্রি প্রায় তখন নয়টা। সে আকাশের অবস্থা দেখাইয়া, ও আশু বিরাট ঝড়ের সম্ভাবনা জানাইয়া, কাতরকণ্ঠে একটু শীঘ্র বিদায় চাহিল। মেজবাবু সম্মতি দান করিলে সে রন্ধনগৃহে বামুনঠাকুরকে সেদিন আর আহার করিবে না জানাইয়া, দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সে ফটক পার হইতে না হইতে, তাহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন, মেদিনী কম্পিত করিয়া ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। সমস্ত আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষলতায় যেন একটা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল। রামচরণ কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না,—দ্বারবানের ঘরের দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল। তার পরেই ঝম্ ঝম্ শব্দে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। গর্জ্জনের উপযুক্ত বর্ষণ না হইলেও, বড় কমও হইল না।

রামচরণ বড়ই বিপদে পড়িল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রায় একঘন্টাকাল অবিশ্রান্ত ঝড় ও বৃষ্টি চলিল। হরিচরণ খানসামা, এই সময়ে, গামছা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া কহিল,—"রামচরণ দা, এই ঝড়-বৃষ্টিতে আজ আর বাড়ী যেওনা। এখানেই শুয়ে থাক।"

রামচরণের বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। পুঁটুকে ছাড়িয়া সারাদিন থাকাই দায়, তায় আবার রাত্রে! সে না গেলে ত পুঁটুকে কেহ ঘুম পাড়াইতেই পারিবে না। আর এই ঝড় বৃষ্টি, বজ্রের ডাকে হয় ত পুঁটুও তাহার মাতা ভয় পাইতেছে,—সে কি তাহাদের একাকী ফেলিয়া থাকিতে পারে!

দ্বারবানের নিকট হইতে একটি ছাতা চাহিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। এই দুর্য্যোগে ভিজিয়া তিতিয়া সে যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, পুঁটুর মা রন্ধন-গৃহ হইতে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"একি সর্ব্বনাশ করেছিস! এই দুয্যুগে কি কেউ ঘর থেকে বেরোয়? ভিজে যে সারা হয়ে গেছিস!"

রামচরণ ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বলিল,—"চুপ কর হিমি, চেঁচাসনে, আমায় একখানা শুক্‌নো কাপড় দে। পুঁটু কি ঘুমিয়েছে?" শুষ্ক বস্ত্রখানি স্বামীর হস্তে প্রদান করিয়া পুঁটুর মা বলিল,—"হ্যাঁ, তোর জন্য কেঁদে কেঁদে এই ঘুমিয়ে পড়েছে—ঝড় দেখে বড় ভয় পেয়েছিল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, হুঁকা হস্তে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে রামচরণ ভাবিতে লাগিল। পুঁটু জাগ্রত না থাকাতে তাহার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগিতে লাগিল। আবার মনে হইল সে দ্বারবানের ঘরে বসিয়া একঘন্টা সময় নষ্ট করিল কেন? আহা! পুঁটু হয় ত কতই ভয় পাইয়াছিল,—তাহাকে না দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা হয় ত দুঃখ ও অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে! নিজেকে তাহার বড়ই অপরাধী বোধ হইতে লাগিল।

পুঁটুর মা নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"খাওয়া হয়েছে ত ?" রামচরণ প্রভু-গৃহেই নিত্য আহার করিয়া আসিত, কিন্তু তবু সে গৃহে আগমন করিবার পূর্ব্বে, এবং তাহাকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী কখনও আহার করিত না। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া রামচরণের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—"খাওয়া ? না, খাওয়া আর হোল কই ? মেঘ দেখে তাড়াতাড়ি ক'রে আস্‌ছিলুম, ফটকের কাছে আস্‌তেই ঝড় এল। তা তুই খা গিয়ে, আমি আজ আর খাব না।" রামচরণ জানিত যে একজনের জন্য রন্ধন হইয়াছে, সে আহার করিলে তাহার স্ত্রীকে উপবাসী থাকিতে হইবে। তাহার কথায় পুঁটুর মা জিভ কাটিয়া বলিল,—"ওমা, তাও কি হয় ? রাত-উপোসী থাক্‌লে অসুখ হয় যে ? আমি মুড়ী চিঁড়ে টিড়ে একটা কিছু খাব'খন। আর না হয় উনুনে আঁচ আছে দুটি ভাতে ভাত চড়িয়ে দিলেই হবে।"

সে জলছিটা দিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। তারপর, যত্নপূর্ব্বক অন্ন বাড়িয়া আনিয়া স্বামীকে ডাকিল। আহার অতি সামান্য,—মোটা চাউলের অন্ন, কলাইয়ের দাল ও শাকপাতা দিয়া একটা চচ্চড়ী। একটি ছোট বাটিতে করিয়া অল্প একটু ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও কয়েকখানি বাতাসা দিয়া সে আহার শেষ করিল। পুঁটুর মা নিকটে বসিয়া বলিল,—"পুঁটু আজ বিকেলে আর দুধ খায়নি, তাই ঐ ছটাকখানেক দুধ রয়েছে। সে আজ দুটি ভাত খাবার জন্য বায়না ধরেছিল। কি করব ? যে মেয়ে, কিছুর জন্য বায়না ধর্‌লে কি আর রক্ষে আছে ?"

রামচরণ কিন্তু এই সামান্য ভোজ্য দিয়া বড় তৃপ্তি করিয়া খাইল। মনীববাড়ীর পাঁচ তরকারী ভাতও বুঝি এত মিঠা লাগে না ! তা লাগিবে কেন ? সে যে বেতনভোগী পাচকের অযত্ন-প্রস্তুত খাদ্য, আর এ যে সাধ্বী স্ত্রীর সহস্ত-প্রস্তুত ও সযত্ন-পরিবেশিত অন্ন ! তফাৎ অনেক খানি।

পরদিন প্রভাতে, রামচরণ শয্যাত্যাগ করিতে গিয়া দেখিল, মাথা উঠাইতে পারে না, গাত্রে অগ্নিদাহ, বক্ষে বিষম বেদনা। সে অস্ফুট চাৎকার করিয়া উঠিল। পুঁটুর মা পুঁটুর সম্মুখে একখানা কুশের ছোট্ট থালায় এক মুষ্টি মুড়ী দিয়া, তাহাকে উঠানের এক পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া, ঘর দ্বার গোময় লিপ্ত করিতেছিল। স্বামীর চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে?" অতি কষ্টে রামচরণ বলিল,— "মাথা ঘুর্‌ছে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা, আর বুকে বড্ড ব্যথা, শ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছিনা।"

পুঁটুর মাতার দক্ষিণ হস্ত গোবরমাখা, সে বাম হস্তের উণ্টা পিঠখানা স্বামীর ললাটে রাখিয়া বলিল,—"ওমা, এ যে বড্ড জ্বর হয়েছে গো! এখন কি হবে?" রামচরণ কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিল। পুঁটুর মাতা সত্বর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া শিবুর বাপকে দিয়া কবিরাজ ডাকাইবার বন্দোবস্ত করিল,—অন্য একজন দ্বারা মনীববাড়ী সংবাদ প্রেরণ করিল।

কবিরাজ মহাশয় যখন আসিলেন,—তখন রামচরণ বিষম জ্বরে একেবারে অচৈতন্য। সমস্ত দিন, পুঁটুরাণী কতবার পিতার সংজ্ঞাশূন্য দেহের উপর পড়িয়া "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিল,—পুঁটুর মা কতবার তাহাকে ডাকিয়া পথ্য খাওয়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই কোন সাড়া পাইল না।

যে পুঁটু একবার বাবা বলিয়া ডাকিলে রামচরণ আনন্দে অধীর হইত, যে পুঁটুর বিরহ সহ্য হইবে না বলিয়া সে এই দুর্য্যোগেও গৃহে ফিরিল, সেই পুঁটুর ডাকও তাহার কর্ণে পৌছিতেছে না দেখিয়া পুঁটুর মাতা প্রমাদ গণিল। তদুপরি, রাত্রিতে সে যখন সেই অজ্ঞানাবস্থায়ও কাশিতে লাগিল, তখন পুঁটুর মাতা, বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। তিন দিবস এই ভাবে গেল, কবিরাজী ঔষধে কোন ফল দেখা গেল না। চতুর্থ দিবসে, পুঁটুর মাতা কবিরাজ বিদায় করিয়া

দিয়া ডাক্তার আনাইল। স্ত্রীর প্ররোচনায়, মেজবাবু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া পাঠাইলেন। পুঁটুর মা, মেজবধূপ্রদত্ত পুঁটুর বালাজোড়া বিক্রয় করিয়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল। তারপর পুঁটুর ভার পাড়ার কৈবর্তবধূর উপর সমর্পণ করিয়া সে রুগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যায় নিজেকে উৎসর্গ করিল। ডাক্তার বলিলেন, রোগ অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় আসিয়াছে,—কিন্তু এখনও চিকিৎসাসাধ্য। তাহা শুনিয়া পুঁটুর মাতা স্থির করিল, তাহার সাধ্যমত কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিবে না, তারপর ভগবানের হাত। সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দিনরাত্রি কেবল একই প্রার্থনা তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"হে ঠাকুর, হে মা কালী, ভাল কর মা, জোড়া পাঁঠা বলি দেব, বুক চিরে তোমায় রক্ত দেব।"

পঞ্চম দিবসে রামচরণ একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—"একটু জল"। ঝিনুকে করিয়া, পুঁটুর মা স্বামীর মুখে জল দিল। রামচরণ উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া পুনরায় বলিল, —"আমার পুঁটু মা?" সে উঠিয়া পুঁটুকে লইয়া আসিয়া, শয্যার উপর বসাইয়া দিল। পুঁটুরাণী পিতার শারীরিক পরিবর্তন দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে একবার তাহার দিকে, একবার মাতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। রামচরণ তাহার ক্ষীণ হস্ত তুলিয়া পুঁটুর কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া তাহার উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। তারপর দুইদিন রামচরণ একটু ভাল বোধ করিল। ডাক্তারও একটু ভরসা দিলেন,—পুঁটুর মায়ের প্রাণেও একটু আশার সঞ্চার হইল। সপ্তম দিবস, অবস্থার পুনরায় পরিবর্তন হইল। ডাক্তার বলিলেন নাড়ীর অবস্থা মন্দ। রামচরণ সমস্ত দিন বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিল। সে এক মুহূর্ত্ত এক ভাবে থাকিতে পারিতেছেনা,— ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছে। পুঁটুর মা ধীর ভাবে বসিয়া

তাহার সেবা করিতেছে। তৃষ্ণার সময় মুখে জল দিতেছে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতেছে,—মধ্যে মধ্যে একটু পথ্য পান করিবার জন্য কাতরে অনুনয় করিতেছে। তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে অধীর হইয়া পড়ে নাই।

সন্ধ্যার সময় রামচরণ আবার একটু সুস্থ বোধ করিল। পত্নীর আগ্রহে একটু পথ্য পান করিল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে পার্শ্বোপবিষ্টা স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বিজড়িত কণ্ঠে বলিল,—"আমার সঙ্গে সঙ্গে তুইও শেষ হলি রে! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বাঁচবি কি ক'রে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে পুঁটুর মা বলিল—"তুই ভাল হ'য়ে ওঠ,—নাওয়া খাওয়ার সময় তখন ঢের পাব'খন।

মাথাটা পত্নীর কোলের উপর উঠাইয়া দিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল,—"আর কি ভাল হব রে? আর ভাল হ'ব না। অনেক পুণ্যে তোকে আর আমার পুঁটু-মাকে পেয়েছিলুম। তোরা যে অকূল সাগরে ভাস্‌বি তাই ভাব্‌ছি, আর যেতে মন স'র্‌ছে না।"

এস্তে দু'ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া, পুঁটুর মা বলিল,—"বালাই, ভাল হবি না কেন?"

এই সময়ে পুঁটুকে কোলে লইয়া কৈবর্ত্ত বধূ সেখানে আসিল। রামচরণকে সুস্থ দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া সে বলিল,—"দাদা, এখন একটু ভাল বোধ ক'রছ কি?"

পুঁটুকে দেখিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া, আর্ত্তস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামচরণ বলিল,—"ওরে, তোরা ওকে আর আমার কাছে আনিস্ নি রে,—ওর—দিকে—আমি—আর চাইতে—পারিনি। মাকে —পেয়ে আকাশের—চাঁদ—হাতে—পেয়েছিলুম। আমার—কোন— সাধ আহ্লাদই—পূর্ণ—হোল না রে। ওযে—রাস্তার ভিকিরী— হোল রে—রাস্তার ভিকিরী—হোল।"

হতভাগিনী পুঁটুর মা আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া

লুটাইয়া পড়িল। রামচরণ তাহার পৃষ্ঠে হাতখানা রাখিয়া বলিল,—"আর—মায়া—বাড়াস্‌নে রে মাগি! ওপারের ডাক এসেছে। যেটুকু সময় আছে এপারের দেনাপাওনা চুকিয়ে নিতে দে—কেঁদেকেটে অস্থির করিস্‌নে।"

তারপর রামচরণ আর একটিও কথা কহিল না। সন্ধ্যার পর হইতে তাহার যাতনা আবার বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া, উষার তরুণ আলোক যখন সবেমাত্র আকাশে তাহার অধিকার বিস্তার করিয়াছে, শুকতারার আলো একেবারে মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই রামচরণ এপারের দেনাপাওনা মিটাইয়া, ক্ষুদ্র শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার বড় সাধের পুঁটুরাণী নিরাশ্রয় হইল।

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

শ্রাবণ মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃপ্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যখন আমরা উভয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ৺ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাটীতে মিলিত হইতাম (আমি তখন রঙ্গপুরে একজন ডিপুটি ছিলাম), ঐ সময় বঙ্কিমপ্রসঙ্গ উঠিত ও আমার পিতৃদেবের কথা আমার মুখে শুনিতেন (ইহার প্রায় আট মাস পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন) এবং তাহা অবলম্বনে আমাদের পিতৃপ্রসঙ্গ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তেজস্বী পুরুষ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সহিত তখন তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না, তথাচ তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া ডাক্তার ঘোষ গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিই মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কথা উত্থাপন করিতেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর একদিন বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী হইবেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা আসিয়াছিল যে তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অমূলক, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ একটা কথা লইয়া 'নারায়ণ'-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। সে কথাটি এই—"পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গদোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বজীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও, পরে তাহা

সংশোধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে অ্যালবার্ট হলে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহার শ্রোতা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ * * শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীগণ। ইহাতেও বঙ্কিম-চন্দ্রের উপকার হয়, পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে।"

এই কথা কতদূর অসঙ্গত তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বক্তৃতাসম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বক্তৃতা-সভায় দিন দুই যাইয়া বঙ্কিমবাবু আর যাইলেন না, তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তিনি গত বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'বঙ্কিম-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"দুই তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর আর তাঁহাকে (বঙ্কিমবাবুকে) দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছি-লাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক কোঁটা, ও শিখা রাখায় যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে, আর ঐ গুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজ-ধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কি বুঝা যায় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্কিমবাবুর উপকার হইয়াছিল ও পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছিল ?

আসল কথা এই যে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি "নবজীবনে" ও "প্রচারে" হিন্দু-ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ সভা বসে, তাহাতে অনেক সাহিত্যিক, ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান স্থির হইল, বক্তৃতার একটা দিনও স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে শ্রোতা ছিলেন এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তারপর দুই একদিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।

ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ধর্ম্মের উদ্দীপন হয়। আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন ত বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থগুলি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি নূতন খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমারী সাজাইলেন, আলমারী ভরিয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র না ছিল! এমন কি জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল, সেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই

গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে 'মাঘ' 'ভারবী' 'নৈষধ' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার খতম হইত। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তার পর যখন হুগলীতে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল, তথাপি রবিবারে রবিবারে আসিতেন, এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা হইল। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার মন কখনও ধর্ম্ম-প্রচারকদের বক্তৃতায় গলিয়া গিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হয় নাই, এই শিক্ষার ফলেই তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-চরিত্র, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, এই শিক্ষার ফলেই তিনি গীতাব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি University Instituteএ বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষ করিতে না পারিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। কোনও ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম শিক্ষা পান নাই, তাঁহার একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্রত করিয়াছিলেন—ইত্যাদি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ায় থাকা কালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন তাহাই হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন, ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ উদ্দেশ্য থাকিত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপনার কণ্ঠদ্বারা যে হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা

করিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কলমের দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের ঠিক সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না।

১৮৮১ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। উহার মাস কয়েক পরে সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে "Statesman" সংবাদপত্রে হিন্দু-ধর্ম্ম লইয়া Rev. Dr. Hastie সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধ হয়। ১৮৮৩ সালে বঙ্গদর্শনে "দেবীচৌধুরাণী" বাহির হয়। ১৮৮৪ সালে "নবজীবনে"র প্রথম সংখ্যায় "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঐ সনের শ্রাবণের "প্রচারে" প্রথম সংখ্যায় "সীতারাম" বাহির হয়। ইহার পর ১৮৮৫ সালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এখন পাঠক মহাশয়েরা বলুন দেখি, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি ?

বঙ্কিম সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ আর একটি কথা লিখিয়াছেন তাহাও অমূলক, যথা :—"সত্য মিথ্যা জানি না, স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, শেষ জীবনে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র জপের মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি যতদূর জানি বঙ্কিমচন্দ্র জাপক ছিলেন বটে, কিন্তু জপের মালা ঘুরাইয়া জপ করিতেন না। আমাদের পিতৃদেবও জাপক ছিলেন, তিনিও কখনও জপের মালা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় চারি বৎসর আমি আলিপুরে বদলি হইয়া তাঁহার নিকটেই ছিলাম ; কই কখনও ত জপের মালা ঘুরাইতে তাঁহাকে দেখি নাই।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর আমাদের পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা এরূপ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন যে উহা আমি চিরকাল স্মরণ রাখিব। তিনি লিখিয়াছেন, ঐ ঘটনাটি আমার মুখে শুনিয়াছেন, সে আজ অনেকদিনের কথা, প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। ১৮৮১ সালে আমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয়, এই

দীর্ঘকালে যে আমার পিতৃদেবের কথাটি তাঁহার স্মরণ আছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিজের ভিন্ন পরের কথা ভালরূপ স্মরণ থাকা সম্ভব নহে, এজন্য এ ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি ভুল হইয়াছে। আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালের প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। ঐ গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না; কেননা ঐগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত, তবে এইরূপ রটনাতে বুঝা যায় যে, সাধারণের ধারণা ছিল যে পিতৃদেব বাল্যকাল হইতে দেবভক্ত ছিলেন ও দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বোধ হয় এই ভক্তির জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাঁহার প্রবন্ধে দীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। ঐ মহাপুরুষের দ্বারা পিতৃদেবের দীক্ষা হওয়াতে, এই গল্পটি আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে এবং আমিও পণ্ডিতরাজকে ও ডাক্তার কে, ডি ঘোষকে বলিয়া থাকিব। প্রায় চারি বৎসর হইল দীনবন্ধুবাবুর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র এই ঘটনাটি "মানসী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার শুনা কথা। আমিও যাহা নিম্নে লিখিব আমারও তাহা শুনা কথা।

আমাদের জ্যেষ্ঠতাত ৺কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুরের নিমকপোক্তানের দারোগা ছিলেন। সেকালে ওটি একটি লোভনীয় পদ ছিল, কেননা ঐ পদের মর্য্যাদাও খুব ছিল এবং বেতনও ভাল ছিল। জ্যাঠামহাশয় ঐ স্থানে বহুকাল ছিলেন এবং সেদেশের লোকের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি উহা কাশীনাথ-মন্দির বলিয়া খ্যাত। আমাদের দেশের অনেক লোক তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইত, তিনি সকলকেই এক একটি চাকুরিও দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার

পিস্‌তুতো ভাই ৺ভজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারই নিকট নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম।—

পনর ষোল বৎসর বয়সে পিতৃদেব তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রধান পূজারির নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া একদিন রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন। যাজপুরে তাঁহার অগ্রজের নিকট যাইবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পিতামহ পরদিন প্রত্যুষে উহা জানিতে পারিয়া দুইটি বিশ্বাসী লোক তাঁহার পশ্চাৎ পাঠাইলেন, কিন্তু পথে তাঁহার সহিত তাহাদের দেখা হইল না। পিতৃদেব পদব্রজে কয়দিনে যাজপুরে পৌঁছিলেন, সেইখানে তাহাদের সহিত দেখা হইল। রাস্তায় তাঁহার কাপড় চাদর ও টাকাকড়ি চুরি গিয়াছিল কি না, শুনি নাই। যাজপুরে কিছুদিন থাকিয়া পার্‌সী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। আমার জ্যাঠামহাশয় ঐ ভাষার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। পিতৃদেবকে ঐ ভাষা শিখাইবার জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে জ্যাঠামহাশয় অনুজকে একটিন্ দিয়া পিস্‌তুতো ভাই ও দেশের লোকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া মাসকয়েকের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলেন। একজন প্রধান কর্ম্মচারী কাজ চালাইত, পিতাঠাকুর কেবল দস্তখত করিতেন। কিছুদিনের পর তাঁহার জ্বর হইল। তখন তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেস্থানের লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল, অবশেষে নাড়ীত্যাগ হইল এবং তাঁহাকে বৈতরণী তীরস্থ করিতে হইল। প্রাণত্যাগ হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহাকে একখানি চাদরে ঢাকিয়া আত্মীয়েরা সৎকারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভিড় ঠেলিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজুটধারী, পরিধানে গেরুয়া বসন, পদযুগলে খড়ম—এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার

মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইঁহাকে প্রণাম করিল। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রক্ষা করুন"। ইঁহাকে দেখিয়া কাহারও সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হইল না। সকলেই বুঝিল ইনি দেবপ্রেরিত। এই মহাপুরুষ পিতৃদেবের নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখ হইতে চাদর তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন,"কি সুন্দর! ছেলেটি কি সুন্দর!"—পরে বলিলেন, "মরে নাই, জীবিত আছে" এবং গরম দুধ আনিতে অনুমতি করিলেন। এইস্থলে পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত জল ছিটাইতে ছিটাইতে পিতৃদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই পিতাঠাকুর পাশমোড়া দিলেন, ক্রমে ঐরূপ করিতে করিতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। পরে কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল। মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় পিতার সঙ্গে বাসায় আসিলেন। পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পিতাঠাকুর শয়নাবস্থাতেই তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি সুস্থ হইয়াছ।" পিতাঠাকুর বলিলেন, "তাহা আমি জানি, তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"।

"কি ভিক্ষা? বল"

"যদি আমার জীবনদান করিলেন, তবে আমায় দীক্ষিত করুন।"

মহাপুরুষ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অনেকক্ষণ পিতাঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে স্বীকৃত হইয়া একটি দিনস্থির করিয়া বলিয়া গেলেন যে, ঐ দিনের প্রত্যুষে স্নাত হইয়া থাকিবে, তিনি আসিয়া দীক্ষিত করিবেন। ঐ দিনের ঠিক সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেবকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "না ভালরূপ তোমার স্নান করা হয় নাই, এস, আমি বৈতরণী হইতে তোমাকে স্নান করাইয়া আনি।" এই বলিয়া পিতাঠাকুরের হস্তধারণ করিয়া

বৈতরণীর জলে তাঁহাকে অনেকবার ডুব দেওয়াইয়া লইয়া আসিলেন। আমাদের ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহাদের পশ্চাদানুসরণ করিয়া ইহা দেখিয়াছিলেন। পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি ঘরে তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহা সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হইল, বাসার লোকে অনাহারে ছিল। দীক্ষাকার্য্য শেষ হইলে, পিতার গুরুদেব দ্বার খুলিয়া নিক্রান্ত হইলেন, সকলেই লক্ষ্য করিল তাঁহার পায়ে খড়ম নাই, খালি পায়ে চলিয়া গেলেন। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তখন দীক্ষাঘরে পিতাঠাকুরকে দেখিতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর কিশোর বালক পীতাম্বর-পরিধানে একটি আসনে বসিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে গামছাবাঁধা একটি পুঁটলী রহিয়াছে। তিনি পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক্রোড়ে কিসের পুঁটলী দেখি।" যেমন কোন শিশুর হাতের পুঁতুল কেহ দেখিতে চাহিলে সে উহা বুকে করিয়া 'না, না' বলে, আমার পিতৃদেব সেইরূপ চমকাইয়া "না, না, উহা দেখাইব না" বলিয়া পুঁটলীটি বুকে টিপিয়া রাখিলেন। এই পুঁটলীতে কি ছিল পাঠকের বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহাতে ছিল তাঁহার গুরুদেবের পায়ের খড়ম ও উপবীত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অষ্টাশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কখনও কোন দিন তিনি উহা নিজের কাছছাড়া করেন নাই। যদি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কোন দিন কোন স্থানে রাত্রি কাটাইবার আবশ্যক হইত, উহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে সত্তর বৎসর উহা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যুষে উহার পূজা করিতেন এবং সেই সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ ইত্যাদি করিতেন। পরে মৃত্যুশয্যায় উহা ত্যাগ করিয়া আমাদের বলিলেন, "উহাতে আমার গুরুদেবের খড়ম ও উপবীত আছে। দীক্ষার পর তিনি গলা হইতে উপবীত ও আমার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পায়ের খড়ম দিয়াছিলেন।" পিতৃদেব কখনও তাঁহার গুরুদেবের কথা কহিতেন না। আজ ঐ পুঁটলী আমাদের দিয়া আদেশ করিলেন, "উহাতে

পাথর বাঁধিয়া অতলস্পর্শে নিক্ষেপ করিবে।" অতলস্পর্শ অনেক দূর, সেই সাগরসঙ্গমে, ততদূর যাইবার সুবিধা হইল না। হুগলীর নীচে ঘোলঘাট খুব গভীর ছিল, ঐ স্থানে পাথর বাঁধিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইল। পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর আমরা উহা খুলিয়া দেখিলাম,—একজোড়া খড়ম, উহার 'বৌল' হাতীর দাঁতের, উহা এত বড় যে, কলিযুগের মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নহে; আর দেখিলাম—উপবীত, সূতার প্রস্তুত নহে, আমার অগ্রজদের বিবেচনায় উহা কোন গাছের ছাল; বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, তিব্বত দেশের গাছের ছাল; উহা তিন-দণ্ডী, মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ। ঐ উপবীতের প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পিঠে কি লেখা ছিল, কি ভাষা বুঝা গেল না; বঙ্কিমচন্দ্রের বোধ হইল উহা তিব্বত্য ভাষা। এই খড়ম ও উপবীত দেখিয়া বুঝা যায় যে, আমাদের পিতৃগুরু একজন সামান্য মানুষ অথবা বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী ছিলেন না—তিব্বত্য পাহাড়ের একজন তাপস ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে একদিন রবিবারে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ও আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সহিত বাটীর সামনের গলিতে দেখা হইল। তাহার পরিধানে মালকোচামারা গেরুয়া ধুতি, গাত্রে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন, "আপনি কি বঙ্কিমবাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি, সেইস্থানের কোন ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "সেদেশের কোন ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।" তিনি বলিলেন, "আপনার নাই বটে, কিন্তু আপনার বাবার ছিল।" তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া

গেলেন; সদর মহলের তেতালার একটা নির্জ্জন ঘরে (যে ঘরে বসিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন) প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি দোতালায় বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় রাত্রি আটটার সময় দ্বার খুলিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ ব্যক্তির সহিত কি কথোপকথন হইয়াছিল এবং উনি কে? কোন উত্তর পাইলাম না। ইহার দুই মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

আমার অগ্রজদের ধারণা ছিল, যে তাঁহার গুরুদেবের সহিত পিতৃদেবের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত, নতুবা যে ধর্ম্মে তিনি ব্রতী ছিলেন, উহা কোথায় পাইলেন? যাহাহউক পিতৃদেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার গুরুদেব যে আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় প্রলাপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কালিদাসের মেয়ে দেখান

কালিদাসের নাটকে মেয়ে দেখানর একটা বেশ কায়দা আছে,—কাব্যেও তাঁর মেয়ে দেখানর একটা কায়দা আছে। লোকে বলে, কালিদাস একজন মহামূর্খ ছিলেন; পণ্ডিত স্ত্রীর কাছে গালি খাইয়া মনের দুঃখে তিনি বিবাগী হইয়া যান, শেষে কোন সিদ্ধ-পুরুষের পরামর্শে সরস্বতীর আরাধনা করিতে থাকেন। সরস্বতী তাঁহাকে বর দেন 'তুমি বড় কবি হইবে'। বর দিবামাত্র কালি-দাসের কবিতা ফুটিয়া উঠিল,—তিনি প্রথমেই সরস্বতীর বন্দনা আরম্ভ করিলেন। যেমন অন্য লোকে স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা করে, সেইরূপে তিনিও মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সরস্বতীর রূপবর্ণনা করিলেন। সরস্বতী কিন্তু তাহাতে একটু রাগত হইলেন,—এবং "তুই একটা সামান্য স্ত্রীর মত আমার রূপ বর্ণনা করিলি, তুই দেবতার রূপ বর্ণনা করিতে জানিস্ না,—তুই কেবল আদি রসের কবি হইবি" বলিয়াই তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই কালি-দাস কুমারসম্ভবে যখন পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করেন, তখন মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বর্ণনা না করিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মেয়েকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের রূপ বর্ণনা কালি-দাসের এই প্রথম ও এই শেষ। তাহাতেই লোকে বলে কালিদাস সরস্বতীর কাছে যে পাপ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। যদি বল, মেঘদূতেও তিনি যক্ষপত্নীর সর্ব্বাঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন. কিন্তু সে বর্ণনায় ও কুমারসম্ভবের বর্ণনায় একটু বিশেষ আছে। কালি-দাস কুমারসম্ভবে উনিশটি কবিতায় পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করিয়া-ছেন, কিন্তু যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনায় তাঁহার একটি মাত্র শ্লোক খরচ হইয়াছে এবং তাহাতে উনিশটি মাত্র কথা আছে। আবার রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে তিনি ইন্দুমতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, একটিও

কবিতা খরচ করেন নাই, দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু সুনন্দা যখন ইন্দুমতীকে এক রাজার কাছ হইতে অন্য রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে, তখন এক একটি করিয়া উনিশটি মাত্র বিশেষণ দিয়াছেন; তাহাতেই একটা জমকালো রূপবর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

নাটকের রূপবর্ণনা কিন্তু আর এক রকম। প্রতি নাটকেই প্রথমেই তিনি মেয়ে দেখাইয়াছেন। মেয়েটিকে তিনটি ভঙ্গীতে দাঁড় করাইয়া অন্য ব্যক্তির মুখে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বর্ণনা করাইয়াছেন। কোন নাটকেই তিনের উপর চার অবস্থা দেখান নাই। বাস্তবিকও দেখাইতে গেলে একটু যেন লম্বা হইয়া পড়ে, একটু একঘেয়ে হয়। তাই কালিদাস তিনেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এক একবার তিন তিন অবস্থা দেখাইয়া জগতের সম্মুখে এক একটি অপরূপ রূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রবন্ধে এই তিনটি ভঙ্গীরই ব্যাপার দেখাইব।

কালিদাসের নাটক তিনখানি, তিনখানিই যে কালিদাসের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কালিদাসের কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিত। আমার সে সন্দেহ একেবারে নাই, তাই আমি তিনখানিই কালিদাসের বলিতেছি। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র পাত্রগুলি সবই পৃথিবীর। মালবিকা নিজে বিদর্ভরাজার কন্যা। মালবরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া স্থির ছিল, তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল মালবিকা। 'বিক্রমোর্ব্বশী'র পাত্রগণ প্রায়ই স্বর্গের। উর্ব্বশী নিজে অপ্সরা,—তাহার সহচরীরা অপ্সরা। ভরতমুনি স্বর্গের নাট্যকার। উর্ব্বশী তাঁহার নাটকে অভিনয় করেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের বেশ সমাবেশ আছে। শকুন্তলা ঋষির ঔরসে অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছেন। তিনি যেখানে থকেন সেটা হিমালয়ের পাদদেশে, পৃথিবীতে স্বর্গের দুয়ারে। রাজা ত্যাগ করিলে তিনি যেখানে গেলেন সেটি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে। পাত্রগুলি কতক স্বর্গের, কতক মর্ত্ত্যের, কতক মাঝ-

খানের। কালিদাস যেন প্রথমেই পৃথিবীর জিনিস লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি একেবারে স্বর্গে গিয়া উঠিলেন। স্বর্গ বড় উঁচু জিনিস,—স্বর্গের নাটক লিখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তাই যেন তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই মিশাইয়া অভিজ্ঞান-শকুন্তলা রচনা করেন।

আমি এই তিনখানি নাটকের মেয়ে-দেখানর কৌশল এই ক্রমেই দেখাইব—প্রথমে দেখাইব মালবিকাগ্নিমিত্রের, পরে বিক্রমোর্ব্বশীর, তারপরে অভিজ্ঞান-শকুন্তলার।

মালবিকাগ্নিমিত্রে অগ্নিমিত্র রাজার রাজধানী বিদিশানগরে রাজার যে প্রেক্ষাগৃহ বা থিয়েটার ঘর, সেইখানে মেয়ে দেখান হয়। রঙ্গমঞ্চ বাঁধা। প্রেক্ষকদের জন্য গ্যালারি করা। উপস্থিত আছেন রাজা, তাঁহার বিদূষক ও রাণী। আর একজন আছেন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত চৌষট্টি কলায় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ পরিব্রাজিকা। অসময়ে রাণীর নিযুক্ত নৃত্যাচার্য্য গণদাস তাঁহার শিষ্যা মালবিকাকে লইয়া প্রেক্ষাগৃহে আসিলেন। গণদাস তাঁহার শিষ্যাকে রাজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "ভয় করিও না—প্রকৃতিস্থ হও"। এই অবস্থায় রাজা তাহার রূপ দেখিয়া লইলেন। মালবিকার রূপ দেখাই রাজার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পূর্ব্বে উহার ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ছবির রূপ প্রকৃত রূপের সহিত মিলিবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। সম্মুখে মালবিকাকে দেখিয়া সে সন্দেহ ত তাঁহার দূর হইলই, বরঞ্চ তিনি ভাবিলেন ছবিওয়ালা ঠিক আঁকিতে পারে নাই। তিনি তাহার চোখ দেখিলেন, মুখ দেখিলেন, হাত দুটি দেখিলেন, বক্ষঃস্থল দেখিলেন, পার্শ্ব দেখিলেন—ভাবিলেন নর্ত্তকী হইবার জন্যই বুঝি বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর গণদাস কেমন নৃত্য শিখাইয়াছে তাহার পরীক্ষার জন্য শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত চতুষ্পদিকা গান ও সেই সঙ্গে সঙ্গে 'ছলিক' নামে নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাচিতে নাচিতে এই গান করিয়াই যযাতির প্রতি আপনার

মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মালবিকাও নাচিতে নাচিতে সেই গান করিলেন। যেখানে যেমন রস তাহার নাচও সেই রসই প্রকাশ করিতে লাগিল। কালিদাস একবার দাঁড় করাইয়া মেয়ে দেখাইয়াছেন, এবার নাচে ও গানে মেয়ে দেখাইলেন। কিন্তু কালিদাসের আর এক রকমে মেয়ে দেখাইতে হইবে। বিদূষকেরও আর এক রকমে মেয়ে দেখাইতে হইবে। নাচিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া মালবিকা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বিদূষক বলিয়া উঠিল, একটু থাক, তুমি একটা কাজ ভুলিয়া গিয়াছ। গণদাস ভাবিল বুঝি সত্যই কিছু ভুল হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—মালবিকা তোমার দোষ হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করিয়া যাও। রাণী চটিয়া উঠিলেন। রাণীতে ও গণদাসে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। পরিব্রাজিকা মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। ইত্যবসরে রাজা সে দাঁড়ান-রূপ আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। কিন্তু দাঁড়ান-রূপ ত একবার দেখান হইয়াছে—তাহা দেখাইলে ত কালিদাসের তৃপ্তি হইবে না—বিদূষকেরও তৃপ্তি হইবে না। শেষ সকলে বিদূষককে বলিলেন—মালবিকা কি ভুলিয়াছে? বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, "প্রথম শিক্ষা দেখাইতে আসিলে, আগে যে ব্রাহ্মণের পূজা করিতে হয়—সেটা যে তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।" সকলে হাসিয়া উঠিল—মালবিকাও হাসিল—রাজার হাসি দেখা বাকী ছিল—তিনি বলিলেন, ইহার হাসি দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। ইহার হাসিমুখে কচি দাঁতগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে পদ্মটি ফোট ফোট হইয়াছে—কেশরগুলি কেবল একটু একটু দেখা যাইতেছে। বিদূষক আবার দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—এবার গণদাস মালবিকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজারও কার্য্য শেষ হইল—কালিদাসেরও মেয়ে দেখান শেষ হইল—আমাদেরও ক'নে দেখা শেষ হইল।

বিক্রমোর্ব্বশীতে উর্ব্বশী অনেকগুলি অপ্সরার সঙ্গে মহাদেবের পূজা করিয়া কুবেরের বাড়ী হইতে ফিরিয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন। পথে

কেশী নামে দানব বেগে আসিয়া উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে রথে চড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। অপর অপ্সরারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা পুরূরবা সূর্য্যোপস্থান করিয়া মর্ত্ত্যে ফিরিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি থাকিতে কে আর্ত্তনাদ করে?" অপ্সরারা চীৎকার করিয়া বলিল,—"ওগো! কেশীদানব উর্ব্বশীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। দেবতাদের প্রতি যদি তোমার ভক্তি থাকে, আমাদের সখীকে বাঁচাও।" রাজা কেশীকে দূর করিয়া উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে আপনার রথে লইয়া অপ্সরাদের নিকট আসিলেন—উর্ব্বশীর রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম প্রবেশ। উর্ব্বশী তখনও চোখ চাহিতে পারিতেছেন না—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রলেখা ডান হাত দিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া রহিয়াছে—রাজা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—"আর ভয়ের কোন কারণ নাই—তুমি চক্ষু মেল।" চিত্রলেখা বলিতেছেন, "কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসেই বোধ হইতেছে ইনি বাঁচিয়া আছেন—এখনও আমাদের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না।" রাজা দেখিলেন, উঁহার হৃদয়ের কম্প কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। ঐ দেখ মন্দার কুসুমমালা কেবল উঠিতেছে আর পড়িতেছে। স্তনদ্বয়ের মধ্যে আঁচলটি একবার উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ক্রমে উর্ব্বশীর চৈতন্য হইল। রাজা দেখিলেন চাঁদ উঠিলে যেমন অন্ধকার হ্রাস হয়—ধূম গত হইলে যেমন অগ্নির শিখা বাহির হয়—পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িলে গঙ্গার জল প্রথমে ঘোলা হইয়া উঠে ও পরে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়—ইঁহার মোহ তেমনি অপগত হইতেছে—ইহার প্রাণ আবার ফিরিয়া আসিতেছে। উর্ব্বশী মনে করিয়াছিলেন ইন্দ্রই বুঝি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু যখন শুনিলেন পুরূরবা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তিনি চক্ষু মেলিয়া রাজাকে একবার দেখিলেন। দেখিয়াই মনে মনে বলিলেন,—কেশী ত তবে আমার বেশ উপকারই করিয়াছে। এইভাবে উর্ব্বশী, রাজা ও সখী পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ও পরস্পর নানারূপ ভাবনা ভাবিতে

ভাবিতে অন্য অপ্সরারা যেখানে ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উর্ব্বশীকে রথ হইতে নামানর চেষ্টা করা হইল। তিনি রথ হইতে নামিতে গিয়া ভয়ে পড়িয়া যাইতে যাইতে রাজাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রাজা মনে মনে বলিলেন, আমি যে দেশে ফিরিয়া আসিলাম তাহা সফল হইয়াছে। যেহেতু ইঁহার অঙ্গে আমার রোমাঞ্চিত অঙ্গ স্পর্শ করিল। কালিদাস মূর্চ্ছা অবস্থায় উর্ব্বশীকে একবার দেখাইলেন—মূর্চ্ছাভঙ্গের অবস্থায় একবার তাঁহাকে দেখাইলেন—রথ হইতে নামিবার সময় একবার তাঁহাকে দেখাইলেন—তাঁহার মেয়ে দেখান শেষ হইল—অমনি ইন্দ্রের দূত আসিয়া অপ্সরাদের স্বর্গে লইয়া গেলেন—রাজাকেও যাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন ইন্দ্রের সহিত দেখা করিবার এ সময় নয়। নাটকের অঙ্ক শেষ হইয়া গেল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলাতেও রাজা দূর হইতে দেখিতে লাগিলেন—তিনটি মেয়ে ছোট ছোট ঘটে জল লইয়া ফুলগাছে দিতেছে, কিন্তু এ তিনটির কোন্‌টি যে শকুন্তলা তাহা তিনি চেনেন না। সেইটি চিনিয়া লওয়া তাঁহার প্রথম দরকার। কালিদাসও তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন। একজন বলিলেন, সখিরা—এদিকে এস। আর একজন বলিলেন, শকুন্তলে, তোমার চেয়েও দেখিতেছি তোমার বাবা এ গাছগুলিকে ভালবাসেন। তোমার শরীর নবমালিকার মত কোমল—তোমাকে দিয়াও তিনি এই সকল গাছে জল দেওয়াইতেছেন! তখন প্রথম মেয়েটি বলিল, বাবার কথায়ই কি আমি জল দিতেছি, ইহারা কি আমার সহোদর নহে? ইহাদের প্রতি কি আমাদের স্নেহ নাই? এই বলিয়া সে গাছে জল দিতে লাগিল। তখন রাজা চিনিলেন—এইটিই কণ্বের মেয়ে,—শকুন্তলা। তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ মেয়েকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্বমুনি ভাল করেন নাই। তিনি কি নীলপদ্মের পাপ্‌ড়ির ধার দিয়া শাঁইগাছ কাটিতে চান?" এই বলিয়া তিনি গাছের

আড়ালে গিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। জল দেওয়ার অবস্থায় শকুন্তলাকে কালিদাস একবার দেখাইলেন শকুন্তলা ঋষিকন্যা—ঋষির আশ্রমে লালিতা, সুতরাং তিনি পরেন বল্কল। গাছের ছাল পিটিয়া পিটিয়া খুব নরম করিয়া একরকম কাপড়ের মত হইত—বেশ পুরু হইত, কিন্তু গাছের ছাল ত? আমাদের ধুতি অপেক্ষা অনেক শক্ত। আর দশহাত বাকল ত আর পাওয়া যাইত না? কোমরে বড় জোর দেড় ফের কি দুই ফের হইত। আর একখানা বাকল একটা কাঁধের উপর দিয়া বুকটা ঢাকিয়া রাখিত। এইরূপ দু'খানা বাকল পরিয়া শকুন্তলা নুইয়া নুইয়া গাছে জল দিতেছিলেন—বাকল আঁটা ছিল—তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল—তাই তিনি একজন সখীকে বলিলেন, আমার বাকলখানা একটু শিথিল করিয়া দাও। সে শিথিল করিয়া দিল—শকুন্তলা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন—আর এক ভঙ্গীতে কালিদাস রাজাকে শকুন্তলার রূপ দেখাইলেন। রাজাও বলিয়া উঠিলেন—

"সরসিজমণুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং" ইত্যাদি—

একবার নোয়াইয়া শকুন্তলাকে দেখান হইয়াছিল। এবার ঠিক সোজা করিয়া তাঁহাকে দেখান হইল। কিন্তু আর এক ভঙ্গীতে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তাই কালিদাস তাঁহাকে এক আমগাছের তলায় দাঁড় করাইলেন—সে আমগাছে একটি নবমালিকা উঠিয়াছে। নবমালিকার ফুল ফুটিয়াছিল—তাহাতে ভ্রমর বসিয়াছিল। গাছে জল দেওয়ায় গাছ নড়িয়া উঠিল—সেও উড়িয়া গেল। উড়িয়া শকুন্তলার মুখের উপর বসিতে গেল। পাছে কামড়ায় বলিয়া শকুন্তলা বড় ভয় পাইলেন। তিনি যেদিকে যান, ভ্রমরও সেদিকে যায়। কখনও কানের গোড়ায় যায়, কখনও চোখের উপর বসিতে যায়—তাড়াইয়া দিলে আবার ঘুরিয়া আসে—শকুন্তলা অন্যত্র চলিয়া গেলে, সেও সঙ্গে সঙ্গে যায়। তখন শকুন্তলা বসিয়া ভাবিলেন,—কে আমায় এই দুর্ব্বিনীত মধুকরের হাত হইতে রক্ষা করে—কালি-

দাস দু'প্রকারে রূপ দেখাইয়াছেন; ভ্রমর বাধায় তিন রকমে দেখান হইল—আর তাঁহার রূপ দেখাইবার ইচ্ছা নাই। সখীরা বলিল,—আমরা কি করিয়া তোমায় রক্ষা করিব; তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা রাজা,—তুমি দুষ্যন্তকে ডাক। এই কথা বলিতে বলিতেই দুষ্যন্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপ-দেখান পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

তিন নাটকেই রূপ-দেখান পর্ব্বই এক রকম। মেয়েটিকে তিন অবস্থায় ফেলিয়া দেখান। তবে মালবিকা রাজার মেয়ে—শিক্ষিতা, কলাপটু, এখন তিনি দাসী হইয়াছেন—আত্মগোপন করিয়া চলেন—তাঁহাকে দেখিতে রাজার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, তিনিও শিক্ষিতা যুবতীর ন্যায় দেখা দিয়া গেলেন। একবার দাঁড়াইলেন, একবার নাচিলেন, একবার হাসিলেন—তাঁহার অবস্থা যেরূপ, বেশী ক্ষণ রাজদরবারে থাকা তাঁহার অভিপ্রেত নহে—তিনি সরিয়া পড়িলেন। বেশ চতুরার মত আপনার মনের ভাব রাজাকে বুঝাইয়া গেলেন—আপনিও রাজার মনের ভাব বুঝিয়া গেলেন। এক রাজা ও বিদূষক ভিন্ন কেহই সে কথা বুঝিল না।

উর্ব্বশী অপ্সরা, থাকেন স্বর্গে। স্বর্গে সবই সুখ, বিশেষ তিনি নারায়ণের উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—তিনি অপ্সরাগণের মধ্যে সকলের অপেক্ষা শিক্ষিতা। ভরতমুনি সকল নাটকেই তাঁহাকে নায়িকা সাজাইতেন। কিন্তু দেবতাদের এক ভয়,—দানবের। উর্ব্বশীকে দানবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তিনি ভয়ে বিহ্বল—জ্ঞানশূন্য। সেই অবস্থায় কালিদাস তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে আনিলেন—তাঁহার চৈতন্য হইল—সে অবস্থাও দেখাইলেন। তাহার পর রথ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজাকে ধরিলেন। তিন অবস্থা দেখান হইল।

শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা, একজন ঋষি তাঁহার পিতা। আর একজন ঋষি তাঁহাকে পালন করেন। তিনি সংসারের কোন ধারই ধারেন না। গাছে জল দেন—বাবার পূজার আয়োজন করিয়া দেন—তপোবনের কার্য্য করেন। তিনি মালবিকার ন্যায় চতুরাও নহেন,

উর্ব্বশীর ন্যায় প্রাকাও নন—তাই কালিদাস মুগ্ধভাবেই তিন অবস্থায় তাঁহার রূপ দেখাইলেন ;—একবার দেহ বেঁকাইয়া, একবার দাঁড়-করাইয়া, আর একবার ভ্রমরের ভয়ে চকিত করিয়া। রূপ দেখান হইলে রাজার সহিত তাঁহার চাক্ষুষ হইল। যদি পূর্ব্বে চাক্ষুষ হইত, তাহা হইলে কালিদাসের আর রূপ দেখান হইত না। শকুন্তলা নিশ্চয়ই একভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু মালবিকা ও উর্ব্বশীর বেলায় রূপ দেখানর সময়েই চাক্ষুষ হইয়াছিল, কারণ কালিদাস জানিতেন ইহারা রাজা দেখিয়া জড়সড় হইয়া যাইবে না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ-তত্ত্ব

[৮]

ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ—জিজ্ঞাসা (৩)

পুরুষোত্তম-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ।

বলিয়াছি যে পুরুষোত্তমই ভগবদগীতার সাধ্য। আর গীতাতে কেমন করিয়া তিলে তিলে এই তত্ত্বটি ফুটিয়াছে, ইহা তলাইয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ আপনার অসাধারণ শক্তি ও যুক্তি প্রভাবে এই তত্ত্বটিকে অর্জ্জুনের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন।

অর্জ্জুন প্রিয়জনের বধের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়াই, ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

> কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং
> প্রপন্নম্‌॥

কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছে, অতএব আমার পক্ষে শ্রেয় কি, ইহা বুঝাইয়া বল ; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে শিক্ষা দাও। এই হইতেই গীতোপদেশের উৎপত্তি। যে স্বল্পমপি আত্মক্ষতি সহিতে পারে না, সে'ই কৃপণ। অসারে সারবুদ্ধি, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অনাত্মবস্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই এই কার্পণ্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলের আগে অর্জ্জুনকে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভগবদ্বাক্য সকল এই আত্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আসন্ন সংগ্রামে প্রিয়জনের মরণ নিশ্চিত দেখিয়াই অর্জ্জুন শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যুতে কেবল নশ্বর দেহেরই বিনাশ হয়, অমর আত্মার বিনাশ হয় না, প্রথমে ভগবান্ তাঁহাকে এইটিই বুঝাইলেন। কঠোপনিষদে যমের সঙ্গে নচিকেতার কথাবার্ত্তাতেও এই তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নচিকেতা যে জিজ্ঞাসা লইয়া যমের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ হইতেই অর্জ্জুনের এই শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা যখন মূলে এক, তার উত্তরও কাজেই এক হইবে। যম কঠ-শ্রুতিতে নচিকেতাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকেও প্রায় তাহাই বলিলেন। কঠোপনিষদে আছে—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

গীতায় আছে—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

এখানে গীতা যে কঠ-শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর, কঠোপনিষদে আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

গীতায় আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এখানেও গীতা কঠ-শ্রুতির ভাষাতেই আত্মা যে অজ, অমর, নিত্য, শরীরের বিনাশে যে আত্মার বিনাশ হয় না, এসকল কথা বলিয়াছেন।

আর উপনিষদ এবং গীতা উভয়েই এই আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, ফলতঃ ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মৃতদের সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলে তারা আছে, কেহ বলে নাই, আমি তোমার নিকটে এই কথাটির তথ্য জানিতে চাই। যম ইহার উত্তরে বলিলেন—এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, ইহা অণুপরিমাণ সূক্ষ্ম, তর্কযুক্তির দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না।

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষলাভ অতিশয় কঠিন, ইহা অত্যন্ত নিগূঢ় ও প্রচ্ছন্ন, হৃদয়ে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়াতীত ও সূক্ষ্ম, কেবল জ্ঞানগম্যদেশে ইহার অবস্থিতি। এই পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হয়েন।

নচিকেতা তখন বলিলেন—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥

ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, এই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ যে জগৎ তাহা হইতে পৃথক্, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে তাহা হইতে পৃথক্, এমন যে বস্তু দেখিতেছ, তাহা বল। তখন যম কহিলেন, তুমি যে বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমুদায় বেদ সেই পূজনীয়কেই কীর্ত্তন করে, সমুদায় তপস্যা তাঁহাকে পাইবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থীগণ তাঁহাকে পাইবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন,—

তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।

সেই বস্তুকে আমি তোমার নিকটে অতি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ওঁ। আর

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।

এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। আর এই কথা বলিয়াই বলিলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

সুতরাং আত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্ব এক, জীবাত্মা আর পরমাত্মা একই বস্তু, এই সিদ্ধান্তের উপরেই কঠ-শ্রুতির পরলোকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মবস্তুর কথা পুনরায় বলিতেছেন—

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

অনিত্য-শরীরে অবস্থিত, কিন্তু আপনি অশরীরী যে মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা, তাঁহাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কিছুতেই শোক করেন না। এখানে যে কঠ-শ্রুতি জীবাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু বলিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য।

ভগবদ্গীতাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য—

যে শরীরীকে নিত্য বলা হইয়াছে, যাহা অবিনাশী ও অপ্রমেয়, এই দেহ তারই বটে, কিন্তু ইহার শেষ আছে।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥

তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জান, যাহাদ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই অব্যয় বস্তুর কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এখানে গীতা "তৎ"-তাহাকে-বলিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা দু'ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিতেছেন—

যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা—

অর্থাৎ "যে সৎ-স্বরূপ বা সদাখ্যাত ব্রহ্মের দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে"—তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জান।

এই সকল বিচার-আলোচনা করিয়া গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে যাইয়া যে উপনিষদের পন্থা অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আত্মার অমরত্বাদি ধর্ম্মকে যে তার ব্রহ্ম-সারূপ্য হইতেই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, উপনিষদ যেমন আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, এই যে আমাদের মধ্যে অহং বা অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক বস্তু আছে, তাহাই যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মবস্তু, আর এই জন্যই এই অহং-বস্তুর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, ইহা অব্যয়, শাশ্বত, পুরাণ, "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—শরীর হত হইলে এই আত্মা হত হয় না,—গীতাও সেইরূপই কহিয়াছেন।

আর এই আত্মতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই আত্মতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে এই তত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, তোমাকে ত্রিগুণাতীত অবস্থা-লাভ করিতে হইবে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

সংসার-বীজভূত যে সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিন গুণ আছে, বেদ-

সকল এই ত্রিগুণকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি এই ত্রিগুণকে অতিক্রম কর। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। সে অবস্থা লাভ হইলে সাধক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-রহিত হন, নিত্যসত্ত্বস্থ হয়েন, আর আত্মবান হইয়া থাকেন। আর এই অবস্থাই ব্রহ্মনির্ব্বাণের অবস্থা।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥

এই ব্রহ্মনির্ব্বাণই সর্ব্বোপনিষদের চরম-সাধ্য।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ (বেদান্তসূত্র—৪-৪-৪)

বেদান্তসূত্র এখানে এই ব্রহ্মনির্ব্বাণকেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মোক্ষ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে, মুক্ত পুরুষ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন। গীতা এই বেদান্ত-সম্মত ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু পরে, এই তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভগবদ্গীতা যে আকারে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে প্রথমে বিষয়ানুসারে ভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান গীতাতে সাধনের কথার সঙ্গেই নানা তত্ত্বকথা মিশিয়া আছে। আর কোনও কোনও স্থলে এগুলি এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে তাহাদের পূর্ব্বাপরের যোগ থাকে নাই। দৃষ্টান্তস্থলে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমাংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে কামরূপ মহাশত্রুকে কি করিয়া বিনাশ করিতে হইবে, তার উপদেশ রহিয়াছে। তার পরেই, একটা অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া অবতার-তত্ত্বের কথা আনা হইল। ফলতঃ একথা গোড়ার কথাও নয়, মাঝখানের কথাও নয়, কিন্তু শেষের কথা। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে পুরুষোত্তম-

তত্ত্বের কথা আছে, এই অবতার-তত্ত্ব, প্রকৃতপক্ষে, তার পরের কথা। কারণ, ঐ পুরুষোত্তম-তত্ত্বটি না বুঝিলে এই অবতার-তত্ত্ব বুঝা আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ পুরুষোত্তম কথার পরেই এই অবতার-কথা আনা উচিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান গীতা-পুস্তকে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক না হউক, অন্ততঃ নিতান্ত অবান্তর ভাবেই, চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথাটা বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে মাত্র, প্রতিষ্ঠা ত হয়ই নাই, প্রতিষ্ঠার পথ পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে এই (গীতার ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে) যে যোগের কথা তোমাকে আমি বলিলাম, ইহা অতি পুরাতন বিষয়। আমি প্রথমে বিবস্বতকে এই যোগসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম। বিবস্বত আপনার পুত্র মনুকে এই যোগের উপদেশ দেন। এইরূপে গুরু-পরম্পরায় এই যোগবিদ্যা রাজর্ষিগণ প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি। ইহাতে অর্জ্জুনের এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক—

অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

বিবস্বত আপনার আগে আর আপনি বিবস্বতের পরে জন্মিয়াছেন। অতএব সর্ব্বাদৌ আপনিই যে বিবস্বতকে এই যোগবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন, ইহা কেমন করিয়া জানিব?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!

তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে-সকল জানি, তুমি সে-সকল জান না। এই উত্তরই ত এখানে পর্য্যাপ্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাদিব্যাপার জানি, একথা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক। কারণ জাতিস্মর যে হইতে

পায়া যায়, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি যে লাভ করা জীবের পক্ষেও সম্ভব, একথা ত সকলেই জানে। সুতরাং কেবল এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অত বড় অবতার-তত্ত্বের কথা এখানে তুলার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। আর এখানে তুলিয়াও তার কোনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু গীতার পদ্ধতি ত তাহা নয়। গীতা যে কথা যখন তুলিয়াছেন, তার একটা প্রমাণের, একটা মীমাংসার পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এই জন্যই মনে হয় যে, আমরা যে আকারে পুস্তকখানি পাইয়াছি, কোন্ কথার পর কোন্ কথা স্বভাবতঃ আসা উচিত ছিল, কিন্তু আসে নাই বলিয়া তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই। আর এই কারণেই গীতার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, তাহার তত্ত্বাঙ্গকে সাধনাঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বিবেকবৈরাগ্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানের বিশিষ্ট সাধন। বেদান্ত এই সাধন-চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার হইতে অনিত্যকে অনিত্য ও নিত্যকে নিত্য বলিয়া যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, তাহাই বিবেক। আমরা দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এই দেহ যে আত্মা নহে, এই জ্ঞানই নিত্যানিত্য-বিচারের মূল কথা। ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে এই বিবেক-শিক্ষাই দিয়াছিলেন।

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

আমি, তুমি এবং এই সকল জনাধিপ কখনও ছিলাম না যে তাহা নহে; আমরা সকলে ভবিষ্যতে যে কোনও দিন থাকিব না, তাহাও নহে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ

যাহা অসৎ তার অস্তিত্ব কখনও সম্ভবে না, যাহা সৎ তার নাস্তিত্বও কদাপি সম্ভবে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ

এই শরীর অন্ত বা বিনাশ-শীল, কিন্তু যার এই শরীর, সেই আত্মার বিনাশ নাই, তাহা নিত্য। এই সকল উপদেশই নিত্যানিত্য-বিবেক জাগাইবার উদ্দেশে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কেবল নিত্যানিত্য-বিচারের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় না। তর্ক-যুক্তির দ্বারা ইহা বুঝিলেও, তাহাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। তার জন্য বৈরাগ্য-অভ্যাস করিতে হয়। "ইহামুত্রফলভোগত্যাগঃ বৈরাগ্যঃ"—ইহ-লোকে ধনমানাদি লাভের বাসনা ও পরলোকে স্বর্গাদিপ্রাপ্তির লোভ একান্তভাবে পরিত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য। আসক্তি হইতেই বন্ধন। এই আসক্তি হইতেই আমাদের অনাত্মবস্তুতে আত্ম-বোধ, অনিত্যতে নিত্যবোধ, অসারে-অসত্যে সার-ও-সত্য-বোধ জন্মে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

পুরুষেরা বিষয়ের ধ্যান করে, এই বিষয়-ধ্যান হইতে বিষয়াসক্তি জন্মে, এই আসক্তি হইতে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কামনার উদয় হয়, কামনার ব্যাঘাতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মভ্রম) উৎপন্ন হয়; স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে জীব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব,

জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্

হে মহাবাহো! এই কামরূপ যে দুর্দ্দমনীয় শত্রু তাহাকে জয় কর। কি করিয়া এই কামরূপ মহাশত্রুকে জয় করিতে পারা যায়, গীতা

তার উপায় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, প্রথমে জ্ঞানযোগের পথ দেখাইয়াছেন। ইহাই উপনিষদের পথ। এই পথে গেলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। এই সাধন উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কোনও তত্ত্বের আশ্রয়-গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। তারপর ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের পথ দেখাইলেন। এখানেও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল তাহাতেই কুলায় না। কর্ম্মযোগের মূল কথা নিষ্কাম কর্ম্ম। কোনও কামনা না করিয়া, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিয়ত অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি, কিম্বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই কর্ম্মযোগের কথা। ব্রহ্মজ্ঞানীরাও এরূপভাবে কর্ম্ম করেন। করেন এই জন্য, যে না করিলে লোকস্থিতি রক্ষা হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোনও প্রকারের কর্ম্মের অপেক্ষা নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কোনও ফল পাইবার জন্যই লোকে কর্ম্ম করে। কিন্তু আত্মারাম মুনিগণ, যাঁহারা ব্রহ্মকে পাইয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বসংসারে কোনও প্রকারের কিছুর সঙ্গে প্রয়োজন-সম্বন্ধ নাই। অতএব কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের পুণ্য হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। তবে যে তাঁরা কর্ম্ম করেন, তাহা কেবল এইজন্য যে শ্রেষ্ঠজনেরা যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাদের দেখাদেখি, কর্ম্মের অপেক্ষা যাঁহাদের রহিয়াছে তাঁরাও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইবে। তাহা হইলে, সমাজে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া লোকসকল উৎসন্ন যাইবে।

কিন্তু এই কর্ম্মযোগও শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ নহে। ইহা অভাবাত্মক, negative; ভাবাত্মক নহে। ইহাতে জীবকে অসাড়, জড়বৎ করিয়া তুলে; যন্ত্রেতে পরিণত করে। এভাবে কর্ম্মযোগ সাধন

করিয়া কৈবল্য লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবানের প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগ। এই যোগের পথ দেখাইতে যাইয়াই, গীতা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। জনকাদি ব্রহ্মবাদীগণ যেভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রেষ্ঠতম পথ সে নয়।

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংনস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা—

নিত্যানিত্য বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, আমাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, কামনা ও মমতাশূন্য হইয়া, যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ। যাঁহারা জীব ও জগতকে ব্রহ্মভাবে দেখেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এই জ্ঞান যাঁহাদের ফুটিয়াছে, তাঁরাও যোগী। যাঁরা এই বিশ্বকে আপনার আত্মাতে দর্শন করেন, সর্ব্ব-ভূতেতে যাঁহাদের আত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, পরমাত্মার উপাসক এই সকল সাধকও যোগী। কিন্তু

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

এই সকল নানা প্রকারের যোগীর মধ্যে যে সাধক দেহ, মন, প্রাণ, অন্তকরণ সমুদায় একান্তভাবে আমাকে অর্পণ করিয়া, আমার ভজনা করেন, তিনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠতম যোগী।

আর এইখানেই গীতা উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের, পূর্ব্বতন জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্মযোগকে ছাড়াইয়া, একটা নূতন তত্ত্বের ও নূতন পন্থার নির্দ্দেশ করিলেন। এখানেই প্রশ্ন উঠে—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববুদ্ধিতে যে যোগ লাভ হয় না, পরমাত্মার উপাসনাতে যে যোগ লাভ হয় না, তোমার ভজনাতে তাহা লাভ হয়,—এই তুমি কে?

আর ভক্তিযোগে ও পরমাত্মা-উপাসনাতে দেহাদিকে অবিদ্যা-বদ্বিষয়ানি বলিয়া উপেক্ষাই করিতে হয়। ইন্দ্রিয়াদির সংযমই সে পথের উপদেশ। এখানে সংযমের উপরেও যে আর একটা উন্নত-তর সাধন ও সিদ্ধি আছে, তার কথা বলিতেছ। তোমাতে ইন্দ্রি-য়াদি অর্পণ করিব, এই দেহ তোমাকে বিকাইয়া দিব, এই মন, বুদ্ধি সকলই তোমার করিয়া দিব, এও ত এক নূতন, এক অদ্ভুত কথা। কিন্তু এই বস্তুই ত আমি সজ্ঞানে অজ্ঞানে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া খুঁজিতেছি। এই তুমি কে?

এই প্রশ্নই গীতার মূল কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা। পুরুষোত্তম তত্ত্বেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইয়াছে। আর গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতেই, তিলে তিলে এই তত্ত্বটিকে গড়িয়া তুলা হইয়াছে,—পর-বর্ত্তী প্রবন্ধে ইহা দেখিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গান

মেঘের মাঝে অই যে ভাসে,
নীল-সাগরে নীলমণি!
আমার প্রাণের মাঝে কেমন করে,
আমি ঝাঁপ দিব তবে এখনি।
ওরে, অই যে হাসে,—অই যে ভাসে,
নীল-সাগরে নীলমণি!
এত দিনের সাধের ধন,
অই যে ডাকে ভয় কিরে মন!
ওরে তোরা ধরিস্ না মোরে,
আমি ঝাঁপ দিব আজ এখনি!
অই যে ডাকে, অই যে হাসে,
নীল-সাগরে নীলমণি!

নাটুকে রামনারায়ণ

[বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য]

মধ্যযুগ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুন্তীর জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছুপূর্ব্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথাতে সমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা দেখাইয়া যিনি একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি পতিব্রতোপাখ্যান নামক প্রবন্ধের রচয়িতাকে ঐরূপ পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই পুরস্কার রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় লাভ করিয়াছিলেন। এবারের পুরস্কারও তিনিই পাইলেন। চৌধুরী মহাশয় পঞ্চাশৎ মুদ্রাব্যয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক অফলা গাছে ফল ধরাইয়াছিলেন, তাহার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নাম চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিবে। কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শুধু যে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গলা সাহিত্যের কর্ণধারগণও শিক্ষানবিশী অবস্থায় তাঁহারই নিকটে বিশেষ উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের "প্রভাকরের" যখন পূর্ণ প্রভাব তখন কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রভাকরে কবিতার কুস্তি লড়িয়া হাত পাকাইতেছিলেন। প্রভাকরে সেই কবিতার লড়াই অনেকদিন ধরিয়া "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রকাশিত হয়। কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যুযুধান বালকবীরগণকে ৫০৲ পুরস্কার দিয়া সেই কবিতা-যুদ্ধের অবসান করেন। রঙ্গলালের

কালীচন্দ্র চৌধুরী।

পদ্মিনী উপাখ্যান রচনায়ও কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহ কার্য্যকরী হইয়াছিল। বস্তুতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই নবজাগরণোৎসবে কমলার বরপুত্রগণের সহিত বাগ্দেবীর চির-দরিদ্র উপাসকগণের এমন আশ্চর্য্য মিলন সংঘটিত হইয়াছিল যে, সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের নিকট তাহা অনুকূল দৈবঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণস্থ হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। যৌবনে তিনি সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করেন এবং তথায়ই পাঠ সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইবার দুই বৎসর পরে ঐ কলেজেই তিনি এক অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই পদেই জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখনই তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখকরূপে অবতীর্ণ হইয়া পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক রচনা করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উপাধি লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ লাভ করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কুলীনকুলসর্ব্বস্ব রচনা করিয়া পুরস্কৃত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার অল্পকাল মধ্যে তিনি শকুন্তলা, রত্নাবলী ও বেণীসংহার, এই তিনখানা সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুদিত করেন। স্বনামখ্যাত আশুতোষ দেবের বাটীতে শকুন্তলা, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে বেণীসংহার, এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রত্নাবলীর অভিনয় হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গাস্থ জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহে গঠিত যোড়াসাঁকো নাট্য-

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

সমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার নবনাটক রচিত করেন এবং তাহার জন্য পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পান। রুক্মিণী-হরণ নামক আর একখানা নাটকও তর্করত্ন মহাশয় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অমুদ্রিত কয়েকখানি নাটকও নাকি আছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন।

পরিশিষ্ট।

এই অমুদ্রিত নাটকগুলি কোথায় কি অবস্থায় আছে জানি না। যদি নষ্ট হইয়া না গিয়া থাকে তবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য এইগুলি উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করা। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের জীবনের বেশী কিছু বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১ম সংস্করণ—১২৮০ সন) এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মাইকেলের জীবনচরিত হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ভিন্ন তর্করত্ন মহাশয়ের আর কোনও মুদ্রিত নাটক সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলীর ভাল এক সংস্করণ কোন প্রকাশক বাহির করেন না কেন? আমরা শুধু কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটকখানার আলোচনা করিয়াই তর্করত্ন মহাশয়ের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিব। বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় হাত দিয়া বুঝিতেছি যে, মফঃস্বলে বসিয়া একাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠা কঠিন। লেখকই যখন লিখিয়া তৃপ্তি পাইতেছে না, তখন পাঠকের তৃপ্তি ত সুদূরপরাহত। রামনারায়ণের জীবন-কাহিনী, রামনারায়ণের নাট্যাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস ও বিবরণ এখনও কলিকাতায় বসিয়া একটু চেষ্টা করিলেই উদ্ধার করা যায়। কলিকাতায় এমন উৎসাহী লেখক কি কেহই নাই যিনি একটু খাটিয়া রামনারায়ণের নাট্যজীবনের কাহিনী উদ্ধার করিয়া অন্ততঃ একটা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও ধরিয়া রাখিয়া বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের ভাবী ইতিহাস লেখকের পথ একটু কম বন্ধুর করিয়া রাখেন?

নবনাটকের উৎপত্তির ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ১৩২১, ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনস্মৃতি হইতে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার গুণু দাদারও খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দু'জনে নিখিয়া বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। সমিতির নাম হইল Committee of Five। কৃষ্ণবিহারী সেন কেশব সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজনে এই নাট্য-সমিতির সভ্য হইলেন। * * * ইঁহারা দেখিলেন বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটকমাত্র দুই তিন খানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন জিনিসই নাই। আমোদের পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া যাহাতে শিক্ষায় হয় তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইলেন। * * কাগজে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, যিনি একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল; কিন্তু পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগীতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া Committee of Five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকারের উপর ভার অর্পণ করাই সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এ সময়ে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামে একখানা নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই শেষে এই ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে তখন তাঁহারাই এ কার্য্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিষ্কৃতি পাইলেন তেমন অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন। নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম ছিল নবনাটক। যেদিন এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার দেওয়া হয়, সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভার মধ্যস্থলে একটি রূপার থালায় নগদ ৫০০৲

সাজাইয়া রাখা হইল এবং সভাস্থলে নাটকখানি আগাগোড়া পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইলেন। * * অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজনে কিছুকাল খুব আমোদে কাটিয়া গেল। * * অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কখনও বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত কখনও বা অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত। প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া "শা—রা পলাট্ (plot) নাই পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্"। সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। এ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী নবনাটক অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম, তাহা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেন না নবনাটক তখন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতী, ভাদ্র ১৩২১)

ক্রমশঃ।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ   দ্বিতীয় খণ্ড   পঞ্চম সংখ্যা।

আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

সূচী।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কিশোর-কিশোরী (কবিতা) ...	...	১১২৩
২।	নাটুকে রামনারায়ণ ...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	১১৩০
৩।	মুসলমান অদ্বৈতবাদী মন্সুর ...	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন	১১৪৫
৪।	গিন্নী (কবিতা) ...	(জনৈক লেখক)	১১৫২
৫।	সীতার স্বপ্ন ...	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১১৫৯
৬।	ধর্ম্ম, নীতি ও আর্ট ...	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	১১৬৪
৭।	চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ ...	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১১৮৮
৮।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ...	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১১৯৯
৯।	শর্ম্মার ঝুলি ...	শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ নাগ	১২১০

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।/০ পাঁচ আনা.

ডাকমাশুল /০ এক আনা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন,
সর্ব্বজয়া প্রেসে,—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২২

কিশোর-কিশোরী

কেন হাস ? মিথ্যা একি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে ?

এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ !
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস ? মিথ্যা এ গৌরব ?

সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মত এই প্রাণ পুরে !—

কভুবা গভীর কভু মধুর সরল,
কভুবা কঠিন কভু করুণা তরল!
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায়!

এও মিথ্যা! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে?
আমি নাই! তুমি নাই কিছু নাই ভবে!
মিথ্যা তবে সেদিনের ধূসর গগন!
তুমি মায়া, আমি মায়া! মোদের মিলন

মিথ্যা সে মায়ার খেলা! সেই মধু হাসি?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি?
তাও ভুল? তাও স্বপ্ন? তাও মিথ্যা তবে?
চোখের চাহনি সেই? তাও মিথ্যা হবে!

সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি!
অবাক বিভোর সেই চক্ষের চাহনি!
যেন কোন দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি!

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মূরতি!
সকল চাঞ্চল্যভরা, অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!

এও তবে মিথ্যা কথা! শুধু স্বপ্ন বুঝি?
আমি তো হেরিছি সদা দুটি চক্ষু বুজি!
হারাইয়া যায় ব'লে বক্ষ চেপে রাখি
আমি যে হেরিছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি?

তবে মিথ্যা মিথ্যা সেই আনন্দের ভাস
আমি, মিথ্যা, মিথ্যা সেই, মায়া সন্ধ্যাকাশ!
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম দুর্ব্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছল ছল!

মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মূরতি তোমার
আমি মিথ্যা তুমি মিথ্যা সবি মিথ্যাকার!
জগৎসংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা!
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা?

মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিনী!
বুঝিবা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভাল করে' সন্ধ্যালোকে, সেই সে তোমারে
মায়া-সন্ধ্যালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে!

কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম
নয়ন-পুত্তলি—মম আঁখি অভিরাম!

তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ?
ওগো মায়া! ওগো মিথ্যা! সত্য ক'রে কহ!
কোন্ দানবের সৃষ্টি দেবীর আকারে
কেন এলে সেই দিন মোরে ছলিবারে?

তবে কোন ছদ্মবেশী রূপসী রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি
যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে যেন করেছিল পান,

চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে ?
আনন্দ-আবেশ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !

আজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিশীথ আঁধারে !
সকল জীবন ভরি প্রত্যেক নিমেষে
সকল কর্ম্মের মাঝে সব কর্ম্ম শেষে !

সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মুরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !

সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত !
সকল করম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় !

সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !

মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু বল, ফুল শ্যামদূর্ব্বাদলে
অবাক নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায় ! সেই সে তখন—

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ
চমকি' থমকি' যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে ;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে

অফুরন্ত চির-সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ !
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে !
তুমি আমি যত দিন তত দিন রবে !

সেই সে নিমেষ মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কিগো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে ?
কোন্ মহা-পরাণের বাঁশরী শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে !

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার !
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি, সত্য রূপাধার !
সত্যই সেদিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভ'রে পরাণে তুলেছি !

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির !
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা ।

এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে !
কেমনে বুঝাব তোমা ! ওগো বঙ্গবাসি,
আমি সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি !

মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই !
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি !
এখনো সন্দেহ তব ? ফের ওই হাসি ?

আরে আরে অবিশ্বাসি ! আরে রে নির্দ্দয় !
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয় ?
সেদিন কি প্রাণে প্রাণে ডাকে নাই বান ?
ফুলে ফুলে উঠে নাই সকল পরাণ ?

ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে,—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে ?

আমার পরাণ ভ'রে কি গীত গুঞ্জরে !
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে !
বুঝাতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরাণ ছাপায়ে তাই ভাসে দুনয়ান !

ওগো মর্ম্মলতা ! মরমে জড়ায়ে থাক !
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ !
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে !

রাখি বুকে বুক, করগো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, দিবসরজনী
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি !

বুঝিতে পার না কিছু? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক!
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয়!

কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে অন্তরে!
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায়!

ওগো মর্ম্মলতা! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক!
তুমিও শুনিবে প্রাণ! আমি যদি শুনি!
সেই তার নূপুরের মধু রুণু রুণী!

তুমিও হেরিবে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্তমাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন মরণ ভ'রে জনমে জনমে!

নাট্যকে রামনারায়ণ

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত ছয় অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। প্রথমে নাট্যারম্ভে নান্দী, তাহাতে উমা মহেশ্বরের স্তব করা হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধার ও নটী প্রবেশ করিয়া নাটকের বিষয়টি সূচিত করিয়া দিয়া প্রস্থিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের যেমন গদ্যাংশের মধ্যে মধ্যে পদ্য সন্নিবিষ্ট, কুলীনকুলসর্ব্বস্বেও সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। আদিযুগের নাট্য-চেষ্টা ও মধ্যযুগের নাট্য-চেষ্টায় যে হঠাৎ কত বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব পাঠমাত্র তাহা বোধগম্য হয়। কৃষ্ণযাত্রা এবং রামযাত্রাগুলি যেপথে চলিতেছিল, এ সে ধারাই নহে, একেবারে ভিন্ন। বাঙ্গলা ঘর-গৃহস্থালীর অশ্রুময়ী-ভাব-বিগলিত-হৃদয়া বিপর্য্যস্তবেশবাসা স্বর্গস্বপন-বিভোরা অবগুণ্ঠনবতী বধূটি যেন হঠাৎ সমস্ত ভাবের আবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অধিকাংশ অলঙ্কার ছুড়িয়া ফেলিয়া স্বর্গের স্বপ্নকে একান্ত অলীক বলিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া একখানা সামান্য শাড়ী পরিধান করিয়া নুণ তৈলের হিসাব লইয়া বসিয়া গেলেন। কবিত্ব হিসাবে, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হিসাবে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য যাহা হারাইল তাহা আজিও সম্যক ফিরিয়া পায় নাই। গভীরতা ফিরিয়া পায় নাই বটে, কিন্তু বিস্তৃতিতে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য বিশ্বসাহিত্য স্পর্শ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। দৃশ্যকাব্য সামাজিক জীবনের পরিচালক, পরিমাপক এবং চিত্র—সমস্ত দেশে সমস্ত যুগেই দৃশ্যকাব্যের ইহাই কার্য্য। কিন্তু চৈতন্যের জন্মস্থান এই বাঙ্গলা-

আদিযুগ ও মধ্যযুগের বিভিন্নতা

দেশে, বাউলগান ভাটিয়াল গানের জন্মস্থান এই বাঙ্গলাদেশে, দৃশ্যকাব্য দৃশ্য অংশকে হীন করিয়া কাব্য অংশকে আশ্চর্য্য প্রাধান্য প্রদান করিয়া এক নূতন হ্রস্ব পথ অবলম্বন করিয়া সহজে যাইয়া আনন্দ-সমুদ্রে লীন হইয়াছিল। মধ্যযুগের নাট্যকারগণ দৃশ্যকাব্যের স্রোতকে সর্ব্বজনপরিচিত পথে ফিরাইয়া আনিয়া সমাজকে আবেষ্টিত করিয়া তাহা বহাইয়া দিলেন। লক্ষযোজন দূরের তারকার রহস্যময় আলোকবিন্দু সহসা গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত ধূমোদ্গারী দীর্ণ কেরাসিন শিখায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন হইতে আর দৃশ্যকাব্যে লোকাতীত প্রেমোন্মাদের স্থান নাই—এখন সমস্ত সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ ফিটফাট ও হিসাবী। বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য যেন কোঁচে গণ্ডূষ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশ্য হইয়া দাঁড়াইল।*

কুলীনকুলসর্ব্বস্বকে প্রাণবান্ সাহিত্যের আদর্শে বিচার করিতে

---

* সঞ্জীববাবু পুরাতন বঙ্গদর্শনে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—"বিদ্যাসুন্দরের ভক্তগণ বোধ হয় এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন পূর্ব্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। সচরাচর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বেগ দেখা যায় তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধারণ চাই। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয় সুখ-সৌরভমাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও সুখ হয়। * * * বাঙ্গলায় আর পূর্ব্ব সুর নাই। যে সুর শুনিলে যেন জন্মান্তরীণ সুখ চকিতের ন্যায় স্মরণপথে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যাইত, আর সে সুর নাই। যে সুর ধীরে ধীরে তোমার রক্ত স্তম্ভিত করিয়া তোমায় অবশ করিয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে সামান্য প্রদীপ হইতে নয়ন ফিরাইয়া চন্দ্রালোক প্রতি চাহিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে আতর দূরে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মগন্ধ আকাঙ্ক্ষা করিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গলার সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

গেলে, এমন কি সম্পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকাব্য হিসাবে দেখিতে গেলেও তাহার মূল্য খুব বেশী হইবে না। দৃশ্যকাব্যের একটা নূতন ধারার আদি নাটক বলিয়াই ইহার প্রধান গৌরব। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব পাঠ করিয়াই বুঝা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় ভাষার আসরে নামিয়া কালিদাস ভবভূতিকে স্মরণে রাখিতে পারেন নাই। ছয়টি অঙ্ক কোনরকমে একত্র গাঁথিয়া তিনি যে একখানি নাটক গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ছয় অঙ্কব্যাপী সামাজিক বিতর্কসঙ্কুল কথোপকথনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে,—তাহাতে "পলাট্" (plot) তো নাই-ই, চরিত্র-চিত্রণের কোন চেষ্টাও দেখা যায় না। এই নাটকে কৌলীন্য প্রথার এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের যে একখানা অবিকল ছায়াচিত্র দেখিতে পাই তাহা উপভোগ্য বটে এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাহাই এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ দান; কিন্তু যে রসের স্পর্শে কথোপকথন সাহিত্য হইয়া উঠে, সেই প্রাণরসের বিকাশ পুস্তকে কোথাও বিশেষ নাই। তাই পরবর্ত্তীকালে সামাজিক নাটক অনেক রচিত হইয়া থাকিলেও এমন কঠিন ভাবে নিঃসঙ্কোচে সমাজের দুর্ব্বলতাগুলি আক্রমণ করিতে আর কাহাকেও দেখি না। সামাজিক দিকটা কুলীনকুলসর্ব্বস্বের এখনও এমন তাজা রহিয়াছে যে কয়েক সহস্র কুলীনকুলসর্ব্বস্ব মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বাঙ্গলার কুলীনপ্রধান গ্রামগুলিতে বিতরিত হইলে প্রভূত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

দৃশ্যকাব্য হিসাবে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

কিন্তু সামাজিক নাটক হিসাবে এই গ্রন্থের যে একটি বিশেষ গৌরব আছে, বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসলেখক তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। শিশু যেমন শৈশবের সরলতায় ভয় বা সঙ্কোচ কাহাকে বলে তাহা জানে না, বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের অতি শৈশবাবস্থায় রচিত এই নাটকখানিতে সেইরূপ শিশুসুলভ একটা

সামাজিক নাটক হিসাবে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

সরলতা, নির্ভীকতা ও সঙ্কোচহীনতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষতঃ কুলীন সমাজের গলদগুলিকে এমন নির্দ্দয়ভাবে উলঙ্গ করিয়া দেখান হইয়াছে, এমন নির্ভীকভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলা কঠিন,—এক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গানগুলির কথা মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর কুটিল সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে বাসকারী আমরা, এই সরলতা, এই সঙ্কোচহীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের মধ্যে, বক্তব্য ও অবক্তব্যের মধ্যে আমরা দৃঢ় রেখা টানিয়া দিয়াছি, "হিতং মনোহারী চ" আমাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে।

এই পুস্তকের সেকেলে রসিকতাগুলি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু একালে তাহারা বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অসাধারণ প্রতিভাবান্ ভিন্ন কালের এবং বেষ্টনীর প্রভাব কেহ বড় অতিক্রম করিতে পারেন্ না; তর্করত্ন মহাশয়ের নাটকাবলী তাহার এক বড় প্রমাণ। শকুন্তলা রত্নাবলী উত্তররামচরিত মৃচ্ছকটিক পাঠ করিয়াও তর্করত্নমহাশয় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দরাদি হীন ধরণের নাট্য-চেষ্টার পাতনামির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং সমাজের চিত্র আঁকিতে তাঁহার পাঁক ঘাঁটাই সার হইয়াছে; এমন কিছু আমাদের সম্মুখে তিনি ধরিতে পারেন নাই যাহা দেখিবামাত্রই হৃদয়ে আনন্দের আবির্ভাব হয়—মন উন্নত ও পবিত্র হয়।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব হাস্যরসপ্রধান গ্রন্থ—কিন্তু সে হাস্য সাময়িক হাস্য—কালক্রমে তাহা এখন পচিয়া গিয়াছে। শুভ্র শাশ্বত কৌতুক-

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের স্বাভাবিকতা।

রস কুলীনকুলসর্ব্বস্বে বেশী নাই। কিন্তু হাস্যরস ছাড়া এই গ্রন্থে আর এক রস আছে—তাহা স্বাভাবিকতা। তর্করত্ন মহাশয়ের হাস্যরস কালক্রমে বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যকে অনুপ্রাস যমক সমাসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি যে তাহাতে স্বাভাবিক

কথাবার্ত্তা চালচলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, দৃশ্যকাব্য এখনও সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। অভিধান-সম্বল মাইকেল নাট্য-সাহিত্যে ইংরেজী রীতির প্রচলন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার ইংরেজী রীতির নাটক সংস্কৃত-পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের নাটকের চেয়ে বেশী সংস্কৃত ঘেঁষা। দীনবন্ধু মিত্র তর্করত্ন মহাশয়ের স্বাভাবিকতার প্রধান উত্তরাধিকারী এবং তিনিই নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতার জন্য স্থায়ী আসন নির্ম্মিত করিয়া যান। দীর্ঘকালস্থায়ী গৈরিশ ছন্দের বজ্রনাদেও তাহা যে স্থানচ্যুত হয় নাই—"বলিদান" ইত্যাদি নাটকই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গলা নাটকে এখনও অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসময় দীর্ঘ বক্তৃতার (Declamation) প্রাধান্য রহিয়াছে কিন্তু বাঙ্গলা নাটকে নূতন যুগের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে এবং স্বাভাবিকতা ক্রমেই জয়লাভ করিতেছে।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের গল্পাংশ অতি হ্রস্ব, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কুলপালক নামক রূপক নামধারী এক প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ লোক-নিন্দায় অস্থির হইয়া অদিনে অক্ষণে তাঁহার ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮ বর্ষ বয়স্কা চারি কন্যাকে একই দিনে একই বৃদ্ধ মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিলেন—ইহাই কুলীনকুলসর্ব্বস্বের বর্ণিতব্য বিষয়। ইহার সঙ্গে নানা বাজে কথা জুড়িয়া দিয়া নাটকখানিকে বড় করা হইয়াছে।

প্রথম অঙ্কে নট ও নটী নাটক সূচিত করিয়া দিয়া প্রস্থিত হইলে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রবিষ্ট হন। কুলপালক মহাশয় দুঃখ করিতে থাকেন যে, তাঁহার ৩২,২৬,১৫,৮ বৎসর বয়স্কা চারি কন্যার বিবাহ হইতেছে না বলিয়া লোকে অন্যায়মত তাঁহার নিন্দা করিতেছে। কুলধন মহাশয় সায় দিয়া বলিলেন যে কন্যাদের কিছুই বয়স্ হয় নাই, এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া কোন কাজের কথা নহে—লোকের নিন্দায় কি আসে যায়?

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের গল্পাংশ।

তথাপি লোকনিন্দায় ও ব্রাহ্মণীর আদেশে কুলপালক মহাশয় নিজে এবং শুভাচার্য্য ও অমৃতাচার্য্য নামক দুই জন ঘটক নিযুক্ত করিয়া পাত্রের খোঁজ করিতেছেন—জানাইয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

শুভাচার্য্য ও সুধীর নামক দুই ঘটকের কথোপকথনে দ্বিতীয় অঙ্ক আরব্ধ হইয়াছে। শুভাচার্য্য কুলশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সুধীর শুনিতেছিলেন, এমন সময় অমৃতাচার্য্য প্রবেশ করিল। ইহার পরে ঘটকদের কলহের একটি কৌতুকাবহ পরম উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেমন স্বভাবানুযায়ী তেমনি তীব্র শ্লেষপূর্ণ। গণ্ডমূর্খ, অথচ দাম্ভিক ও মুখসর্ব্বস্ব অমৃতাচার্য্যের নিকট বাগ্‌যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মানে মানে সুধীর ও শুভাচার্য্য প্রস্থান করিলে, কন্যা-বিবাহ বিলম্বে খেদ করিতে করিতে কুলপালক প্রবেশ করিলেন। অমৃতাচার্য্য তাঁহাকে জানাইল যে তাঁহার কন্যাদের জন্য ষষ্ঠীবৎসর বয়স্ক এক পাত্র বহু পরিশ্রমে সে ঠিক করিয়া আসিয়াছে, বিলম্ব করিলে এমন সুপাত্র হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তখনি গ্রহাচার্য্য ডাকিয়া বিবাহের দিন দেখান হইল, কিন্তু শীঘ্র বিবাহের দিন ছিলনা। এবং অদিনকে গ্রহাচার্য্য অমৃতাচার্য্যের অশেষ বাক্‌চাতুরীতেও কিছুতেই সুদিন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেনা দেখিয়া, তাহাকে বিদায় দিয়া দিনক্ষণ না দেখিয়া তাহার পরদিনই বিবাহ ধার্য্য হইয়া গেল। পাত্র হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে কুলপালক মহাশয়ও আপত্তি করিলেন না।

তৃতীয় অঙ্কে কুলপালকের স্ত্রী আসন্ন কন্যাবিবাহের আনন্দে হৃষ্টা। চারি কন্যা জাহ্নবী শাম্ভবী কামিনী ও কিশোরীকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে আজই তাহাদের বিবাহ—

> "এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
> ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল॥"

শুনিয়া জাহ্নবী বিষণ্ণা ও শাম্ভবী আশ্চর্য্যান্বিতা হইল এবং কামিনী বরের বাসা কোথায়, দেখিতে কেমন, কত বয়স ইত্যাদি জানিবার

জন্য অত্যন্ত উৎসুকা হইয়া পড়িল। আর কিশোরী বিবাহ যে কি তাহা বুঝিতেই পারিল না। তাহাদিগকে শান্ত করিয়া কুলপালকের স্ত্রী নিজ কাজে চলিয়া গেলেন, কন্যাগণও চলিয়া গেল। ইহার পরে রসিকা নাম্নী এক নাপ্তিনী এবং দেবল নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণকে অনর্থক আনিয়া তাহাদের মুখে কতকগুলি ছদ্ম অশ্লীল কথা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা প্রস্থিত হইলে, কুলপালকের বাটীতে এয়োগণের আগমন হইল। ব্রাহ্মণী তাহাদের জলসৈতে যাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। এয়োগণ বরের সমালোচনা করিতে করিতে নিজেদের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নিজ নিজ শোচনীয় দাম্পত্যাবস্থার বিবরণ বলিতে লাগিলেন এবং যেমন তেমন করিয়া উপকরণ সাজাইয়া জলসৈতে চলিয়া গেলেন। কেবল যশোদা নাম্নী একটি বিধবা সদীর্ঘ নিশ্বাসে আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিল; কারণ তাহার কোন শুভকার্য্যে যোগদান করিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই। এমন সময় ফুলকুমারী নাম্নী তাহার নাতিনী সম্পর্কীয়া এক কুলীন কুমারীর প্রবেশ। ফুলকুমারীর চক্ষু লাল দেখিয়া একটু পরিহাস করিতেই ফুলকুমারী সবিষাদে নিজের দুঃখকাহিনী বলিতে লাগিল।—ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়া সে সমাচার পাইল যে স্বামী আসিয়াছে। চিরপতিবিরহিণী কুলীনকন্যা—বহুদিন পরে স্বামী আসিয়াছে—কত সাধ কত সোহাগ ফুলকুমারীর মনে উঠিতে লাগিল। আহ্লাদে, গর্ব্বে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ী আসিয়াই স্বামীর "রঙ্গ দেখিয়া হরিভক্তি উড়িয়া গেল।" জামাই দেখিয়া সকলে শশব্যস্ত হইয়া বসিবার জন্য গালিচা পাতিয়া দিল, কিন্তু জামাইয়ের ধনুর্ভঙ্গপণ, ব্যাভার না পাইলে সেই বাড়ীতে পাও ধুইবে না। ফুলকুমারীর দুঃখিনী মাতা খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু টাকা প্রতিবাসীর নিকট হইতে লইয়া আসিলেন,—সেই টাকা জামাইয়ের হাতে দেওয়া হইল, তার পরে জামাই পা ধুইলেন—তাও অল্প হইল বলিয়া তীক্ষ্ণ দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। জামাইয়ের জন্য যথাসাধ্য খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন

হইতে লাগিল, ফুলকুমারীর ভাই গিয়া নিজে হাতে ধরিয়া জামাইকে নিয়া আসিল। জামাই বড় পীড়ির উপর বসিয়া এটা ফেলিয়া ওটা ছড়াইয়া নবাবী করিয়া খাইয়া উঠিলেন।

ইহার পরের বিবরণ হৃদয়বিদারক, কিন্তু এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন-প্রধান গ্রামসকলে ইহার সতত পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ফুলকুমারী একাকিনী পতির অপেক্ষা করিয়া শয্যায় শুইয়া পতির নিকট কত অভিমান করিবে, কত আদর পাইবে তাহাই কল্পনা করিতেছে ও নিদ্রার ভাণ করিয়া চুপ করিয়া আছে। জামাই আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল—"শীঘ্র করিয়া আমাকে টাকা আনিয়া দাও।" মুহূর্ত্তে ফুলকুমারীর সমস্ত স্বপ্নের প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। ফুলকুমারী স্বামীকে অনেক স্তবস্তুতি করিল, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। অবশেষে স্বামীর দুর্ব্বাক্যে অস্থির হইয়া এবং পাছে স্বামী রাগ করিয়া চলিয়া যান এই ভয়ে তাহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ যাহা কিছু ছিল তাহা সে স্বামীকে আনিয়া দিল। কিন্তু স্বামীপ্রভু আরও অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ইহাতে ফুলকুমারী দুই এক কথা বলিতেই পুরুষ-প্রবর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি! নারী হইয়া তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আস।" রাগ করিয়া স্বামী যাইয়া বাহিরের ঘরে শয়ন করিলেন, ফুলকুমারী কাঁদিয়া রাত্রি পোহাইল!

যশোদা ফুলকুমারীকে সজলনয়নে প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেল—ফুলকুমারী জলসেঁচে চলিয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্কে কুলপালকের ভৃত্য ভোলা পুরোহিত ধর্ম্মশীলকে কুলপালকের কন্যাগণের বিবাহের বার্ত্তা দিতে আসিয়াছে। ধর্ম্মশীল খবর পাইয়া ছাত্র তর্কবাগীশকে লইয়া কুলপালকের বাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টরজস্কা কন্যার বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় অধর্ম্মরুচি নামক বিবাহব্যবসায়ী কুলীন সন্তানের প্রবেশ। ধর্ম্মশীল

তাহার সহিত আলোচনা করিয়া কুলীনগণের বিবাহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। অধর্ম্মরুচি তাহাদের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়া নিজ পিতার তল্লাসে চলিয়া গেল—তর্কবাগীশের সহিত ধর্ম্মশীল কুলীন কন্যাগণের অদৃষ্টের বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজ পিতা বিবাহবণিককে সঙ্গে লইয়া অধর্ম্মরুচির পুনঃ প্রবেশ। উভয়ের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে অধর্ম্মরুচি কিছু বিষাদগ্রস্ত। একখানা পত্র আসিয়া তাহার হাতে পৌঁছিয়াছে এই মর্ম্মে যে, নকুলপুরে তাহার স্ত্রীর এক কন্যা হইয়াছে, কিন্তু সে তিন বৎসর হয় সেই দিকে পদার্পণ করে নাই। বিবাহবণিক তাহাকে নিম্নলিখিত বাক্য বলিয়া প্রবোধ দিয়া বিদায় দিল ;—

"বাপু হে তাতে ক্ষতি কি ? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও-রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে, যাও, লজ্জা কি ?"

অধোমুখে অধর্ম্মরুচি প্রস্থান করিলেন। বিবাহবণিক কোথা হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করা যায় কি না সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ। পরিচয় হইলে জানা গেল যে উত্তম বিবাহবণিকেরই পুত্র ;—জন্মাবধি পিতার শ্রীচরণ দর্শন পুত্রের ঘটে নাই। বিবাহবণিককে মৃত মনে করিয়া উত্তমের মাতা বৈধব্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাই উত্তম বিবাহবণিককে সশরীরে বাড়ী লইয়া যাইয়া মার সধবা দশা ফিরাইয়া আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা বিবাহবণিককে স্বীকৃত হইতে হইল। উভয়ে চলিয়া গেল !

ধর্ম্মশীল ও তর্কবাগীশ স্তম্ভিত মূক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময় এক রোদনশীলা গর্ভবতী রমণী যাইয়া ধর্ম্মশীলকে প্রণাম করিল

এবং অশ্রুবিগলদ্ নয়নে এবার যেন তাহার মেয়ে হয় এই উদ্দেশ্যে স্বস্ত্যয়ন করিতে পুরোহিত ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রশ্ন করিয়া জানা গেল যে কন্যাবিক্রয় তাহাদের কুলের প্রথা,—তাহার ভাশুর কন্যাবিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাই তাহার কেবলি পুত্র হইতেছে দেখিয়া স্বামী তাহাকে মারিয়াছে, আর শাসাইয়াছে যে এবারও পুত্র হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সমাজের এই এক নূতনতর দৃশ্য দেখিয়া কন্যাবিক্রয়ের দোষসম্বন্ধে ধর্ম্মশীল ক্ষুব্ধচিত্তে শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন এবং স্বস্ত্যয়ন ভিন্নই তাহার কন্যা হইবে বলিয়া গর্ভবতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে কন্যা বিক্রয় ও ক্রয় উভয়ই যে মহাপাতক এই বিষয়ে অনেক শাস্ত্রীয় আলোচনা করিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্কে উদরপরায়ণের স্ত্রী তাহার শিশুকে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, উদরপরায়ণকে কুলপালকের বাড়ীর বিবাহের ফলারের নিমন্ত্রণের খবর দিবে। উদরপরায়ণ আসিয়া রাস্তায় স্ত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভারী চটিয়া গেল, কিন্তু ফলারের কথা শুনিবামাত্র একেবারে জল! দুর্গা দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় শিশুটি সঙ্গে যাইবার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিল। শুভ যাত্রায় বাধা পড়াতে উদরপরায়ণ বিষম চটিয়া গেল। পরে যখন শিশুকে জেরা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, ফলারতত্ত্বে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই, পিতার সে একান্ত অযোগ্য পুত্র, তখন লেখাপড়া শিখিতে দিয়া সুমতি ছেলেটাকে মাটি করিতেছে বলিয়া সুমতির উপর রাগ করিয়া শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক সে প্রস্থান করিল। পথে তর্কালঙ্কারের সহিত দেখা, সেও বিবাহ দেখিতে চলিল।

উভয়ে প্রস্থিত হইলে, জলের কলসকক্ষে মাধবী ও মহিলা নাম্নী দুই কুলীন কন্যা প্রবেশ করিল। মাধবী কিছু অতিরিক্ত রসিকা, কিন্তু শুদ্ধচরিত্রা। মহিলা অত রসের ধার ধারে না, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার নিয়া বিশেষ ব্যস্ত নহে। পূর্ব্বকালে কুলীন কন্যাগণ কিরূপে

ধীরে ধীরে অধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিত, উভয়ের কথোপকথনে তাহার একখানি পরিষ্কার আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভে জাহ্নবী ও শাম্ভবী কিছুতেই তাহাদের বিবাহের বিবরণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছে। এমন সময় কামিনী ও কিশোরী চুরি করিয়া বর দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বরের যে বর্ণনা দিল তাহাতে তিন বোনে পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে—

"এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশী ফল।"

চারি বোন প্রস্থিত হইলে, মৃতপত্নীক বংশজ বিরহী পঞ্চানন প্রবেশ করিল। পূর্ব্বকালে বংশজের একবার বিবাহ করাই কষ্টকর ছিল, কাজেই প্রথম বারের স্ত্রী মরিয়া গেলে আবার বিবাহ করিবার বড় বিশেষ আশা থাকিত না। কন্যার অভাবে বংশজ সমাজে "ভরার মেয়ের" প্রচলন হইয়াছিল। তাই মৃতপত্নীক বিরহী পঞ্চানন আসিয়া শকুন্তলার দুষ্মন্তের অনুকরণে অতি কঠিন বিদ্যাসাগরীয় সাধু ভাষায় হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। অবিবাহিত বংশজ "বিবাহ-বাতুল" আসিয়া তাহাকে কুলপালকের বাড়ী বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, কারণ বিবাহ-বাতুলের তো বিবাহ করিবার সম্ভাবনা জীবনে বিশেষ নাই, অন্যের বিবাহ দেখিয়া যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সে ছাড়িবে কেন? কিন্তু "সর্ব্বস্ব বিক্রয়-পূর্ব্বক বিবাহ-বিষ ক্রয় করিয়া যাতনাক্লিষ্ট" বিরহী পঞ্চানন কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না এবং বিবাহ-বাতুল একাই চলিয়া গেল। অতঃপর কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ। ধর্ম্মশীলকে সম্বর্দ্ধনাদির ভার দিয়া কুলপালক চলিয়া গেলেন। এমন সময় বর, ঘটক অমৃতাচার্য্য ও অভব্যচন্দ্র নামক এক নূতন পুরোহিত প্রবেশ করিলেন। অভব্যচন্দ্র অসহ্য জেঠামি করিয়া কুলপালককে যাজনের অধিকার লইয়া ধর্ম্মশীলের সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধাইয়া দিল। অবশেষে গমনোদ্যত হইলে উভয়কেই দক্ষিণা দেওয়া হইবে বলিয়া কুলপালক

ধর্ম্মশীলকে শান্ত করিলেন। কুলপালক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মশীল যখন বরের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন বর চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু অমৃতাচার্য্য তাহার হইয়া আগুবাড়াইয়া সমস্ত কথার উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মশীল বেশী প্রশ্ন করিলে বরের গুণাবলি সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় গোপনে ধর্ম্মশীলকে ডবল দক্ষিণা দিবার প্রস্তাব করিয়া তাহার মুখবন্ধ করিয়া দিল এবং—

"বিবাহ নির্ব্বাহ হ'লো হরি হরি বলো।"

এইখানেই কুলীনকুলসর্ব্বস্ব সমাপ্ত।

পূর্ব্বে আমরা কুলীনকুলসর্ব্বস্বের স্বাভাবিকতার প্রশংসা করিয়াছি। বস্তুতঃ যেখানে নাটকীয় চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তা চালচলন স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে, সেই সেই স্থলে নাটকখানি পরম উপভোগ্য, কিন্তু এই স্বাভাবিকতার স্রোত নাটকের সর্ব্বত্র অব্যাহত নহে।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের ভাষা।

তোত্‌লা যেমন মধ্যে মধ্যে বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে, আবার মধ্যে মধ্যে কথা বাধিয়া যাইয়া তাহার চোখ মুখ উল্টাইয়া প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয়, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের ভাষাও কতকটা সেই রকমের। বেশ দিব্য স্বাভাবিক ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতেছে—সহসা উৎকট বিদ্যাসাগরীয় ভাষার বিষম উচ্ছ্বাসে পাঠকের দংষ্ট্রা স্বস্থানচ্যুত হইবার উপক্রম করে—আরামে ভাত খাইতে খাইতে সহসা কঙ্কর দাঁতের নীচে পড়িলে যে রকম হয়, কতকটা সেই রকম আর কি! কুলীনকুলসর্ব্বস্বের কট্‌মটে ভাষার নমুনা—কুলপালক বেলা দুপুর হইয়াছে দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন—

কুলপালক। (ঊর্দ্ধাবলোকন করিয়া,) একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত! সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর-কিরণে নিতান্ত

ক্লান্ত পান্থলোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার ভজনা করিতেছে। মহারুহচয় একান্ত পবন-পতি-বিরহে সজ্জন-মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরাহগণ পল্বল পঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে। কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে! * * * অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি! গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করি।

সহজ ও সরল ভাষার নমুনা—ব্রাহ্মণী কন্যাগণকে জানাইতেছেন যে আজ তাহাদের বিবাহ হইবে।

ব্রাহ্মণী। তোদের ছোট বোন আদরিণী কিশোরী কোথায় রে?

কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণসঙ্গে পূব পাড়ায় খেল্‌তে গেছে এখনো আসে নাই।

ব্রাহ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে?

কামিনী। ও-ও-ও কিশোরী ই-ই-ই—কিশোরীরে-এ-এ-এ

কিশোরী। (নেপথ্যে) যাই গো যাই।

কিশোরীর প্রবেশ।

কিশোরী। কেগা আমায় ডাক্‌লে।

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লে?

ব্রাহ্মণী। তুই কোথায় গেছ্‌লি? দেখ্‌তে পাইনে কেন?

কিশোরী। ওমা, ওমা, আমি ওপাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা আর এমন যেয়োনা, ডাগর ডোগর হচ্যো,

আর অমন কি যেতে আছে? লোকে নিন্দে করবে, ছিঃ।

কিশোরী। ওমা, কেন নিন্দে করবে মা? করবে না। হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা যেয়োনা, আজি এক কর্ম্ম আছে।

কিশোরী। কি কর্ম্ম মা?

ব্রাহ্মণী। বাছা আজ আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম্ম হবে।

কিশোরী। ওমা কি শুভ কর্ম্ম বল্‌না মা। হে মা বল্ কি শুভ কর্ম্ম বল্‌না। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্‌বো না কেন? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) 'বে' কাকে বলে মা?

ব্রাহ্মণী। বে কাকে বলে তাও জানিস্‌নে বাছা? প্রধান সংস্কার।

কিশোরী। ওমা, তাকি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা, 'বে' কি খেতে হয়? রাঙ্গা বর আস্‌বে, তোদের বে কর্ব্বে, কত ঘটাঘটি হবে, সেকি বাছা কিছুই জানিস্‌নে?

কিশোরী। হাঁ সেই বে ত, আমি জানি, তা কার হবে মা?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে আর তোমার তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ওমা! তবে তোর হবে না?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বল্‌তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝেছি, তোর হয়ে গেছে; ওমা কার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে বল্‌না মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমাকে ব্যস্ত করিস্‌নে, মচ্চি নানান জ্বালায়, তোরা সকলে এখন বাড়ীতে যা।

কন্যাগণের প্রস্থান।

তর্করত্ন মহাশয় যেখানে এইরূপ সহজ সরল ভাবে "ভাষায়"

লিখিয়াছেন সেখানে সহজেই প্রাণের রং ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দেবভাষাগ্রস্ত স্থানগুলি পূর্ব্বে সাধারণ মানবের সম্ভ্রম উৎপাদন করিত এখন ভয়ের উদ্রেক করে।

তর্করত্ন মহাশয়ের নবনাটক'ও এক সময়ে খুব সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বহুবিবাহের দোষ প্রদর্শনই এই নাটকখানির উদ্দেশ্য। এই নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। "নরেশ-বাবু নামক একজন জমীদার স্ত্রীপুত্র সত্ত্বেও অধিক বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, তাহার নব প্রণয়িণীর উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভস্থ পুত্র দেশত্যাগী হয়, বিষয় বিভব নষ্ট হয়, পূর্ব্ব পত্নী যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন এবং তিনি নিজেও নবপত্নীদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের গুণে অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হন—এই সামান্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে।" কুলীনকুলসর্ব্বস্বে হাস্যরস-সৃষ্টি-চেষ্টা বেশী বিকশিত, মধ্যে করুণ রসের একটা ক্ষীণ প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু নবনাটকে করুণ রসেরই প্রাধান্য। দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীতে এই নবনাটকের প্রভাব পরিদৃশ্যমান—দীনবন্ধুর নাটকা-বলীর আলোচনার সময় আমরা তাহা দেখাইব। বিয়োগান্ত কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বড় নাই, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিষেধে তাহার সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় ভাষার আসরে নামিয়া এই নিষেধ মানেন নাই—বিয়োগেই নবনাটকের সমাপ্তি। নব-নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মুসলমান অদ্বৈতবাদী মনসুর

"কহে মনসুর সুন্ কাজী
গয়ের কা পেয়ালা মৎ পী।
আনল্‌হক্ পর্ হো তু সাবিদ্
ওহি কল্‌মা পঢ়াতা যা॥"

—মনসুর বলেন শুন কাজী
অপরের পেয়ালা পান করিও না।
সোঽহম্ বাদের উপর দাঁড়াইয়া
সেই কল্‌মা পড়াইতে থাক।

অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে তুরস্ক, পারস্য, তাতার, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশে অনেক অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ঐ সকল দেশের আপামর সাধারণে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা আপনাদের অদ্বৈতমত ত্যাগ করেন নাই। ক্রমে তাঁহারা উহা ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোককে "সুফী" বলে। সুফী শব্দের অর্থ তত্ত্বদর্শী। উহা সম্ভবত গ্রীক সোফিয়া (sophia—wisdom) শব্দ হইতে আরবী ভাষায় গৃহীত। যদিও অনেক গোঁড়া মুসলমান ইঁহাদিগকে কোরাণের বিরুদ্ধবাদী মনে করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মোস্‌লেম উন্নত জ্ঞানী বোধে উঁহাদের সম্মান করিয়া থাকেন। বোধ হয় অনেকে জানেন যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বাহ্য ও অন্তর দুইটি বিভাগ আছে যাহাকে ইংরাজীতে exoteric ও esoteric বলিয়া থাকে। সুফীগণকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ বা গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী বলিতে হইবে। উক্ত অন্তরঙ্গ মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিতে অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক হউন

না কেন, সকলেই একমত, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ ভিন্নতা লক্ষিত হয় না। ব্যোমযানাবলম্বনে খুব উচ্চ আকাশে উঠিলে যেমন দৃষ্টির সীমা প্রসারিত হয়, এবং নিম্নস্থ বাড়ী ঘর, গাছ পালা, ক্ষেত খোলা, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, হ্রদ সরোবরাদি সমস্ত এক ভাবাপন্ন দেখায়, কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য অনুভব করা যায় না, এস্থলেও ঠিক তাই ঘটে;—যাঁহারা নীচে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহারাই জড়জগতের সম্পত্তির মত এটা আমার, ওটা তোমার, সেটা তাহার, এবম্বিধ পার্থক্যবাচক বাক্য দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপনে প্রয়াস পান; আর যাঁহারা উচ্চে উঠিয়া অন্তরঙ্গের প্রাপ্য গূঢ় সত্যসমূহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ভেদ-জ্ঞান একেবারে তিরোহিত। এরূপ অবস্থায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মহাবাক্য "সোঽহম্" এবং সুফীশ্রেষ্ঠ মহর্ষি মনসুর প্রচারিত "আনল্-হক্" যে এক সুরের গান হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

হোসেন মনসুর কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক বলা সহজ নয়। তবে অনেকের মতে ইহা একপ্রকার স্থির হইয়াছে যে হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পরে খলিফাদের রাজধানী প্রাচীন বোগ্‌দাদ নগরে কোনও সুফী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন পরম ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদিতে তিনি সকলের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসিতকে জল, নগ্নকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ পথ্য দেওয়া তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। মনসুরের মাতাও সতী সাধ্বী পুণ্যবতী ছিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মনসুর সৈয়দ জুনেদ শাহ ফকিরের অলৌকিক জ্ঞান-ধর্ম্মোন্নতির বার্ত্তা শ্রবণান্তর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার চিত্তের এমন একটা পরিবর্ত্তন হয় যে তাহা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি

এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে অনেককেই তাঁহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইয়াছিল। ধন-কুবের বা পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মন্‌সুরকে দেখিলে সমুচিত সম্মান দিতে যেন উপর হইতে কোন শক্তি দ্বারা বাধ্য হইতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মন্‌সুর মক্কা যাত্রা করেন। এরূপ শুনা যায় যে তথায় তিনি এক বৎসর-কাল কঠোর তপস্যা করেন;—ধর্ম্মমন্দির কাবা মস্‌জিদের সম্মুখে দিবাভাগের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রজনীর শিশিরে বিনা আচ্ছাদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। আহার ছিল দিনান্তে সামান্য এক টুক্‌রা রুটীমাত্র। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া আবার মক্কায় যান।

অতঃপর তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করতঃ অবশেষে ভারতবর্ষে আগ-মন করেন। এখানে আসিয়া কোথায় কি কি কার্য্য করেন সে বিষয়ে সকল কথা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতীয় উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি কবিতামাত্র আমরা জানি। একটি সঙ্গীতা-কারে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বাইজীদের মুখে গীত হইয়া থাকে, * অপরটি একটু দীর্ঘ, তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যারূপে মৌলভীদের মুখে শুনা যায়; † উহারই শেষাংশ প্রবন্ধের শিরোদেশে দেওয়া গেল।

দেশ পর্য্যটন হইতে বোগ্‌দাদে ফিরিয়া আসিবার পর মন্‌সুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার মাত্রা কিছু বেশী পরিমাণে প্রকাশ পাইল। একদা তিনি গুরু জুনেদকে অদ্বৈতবাদসম্বন্ধীয় এমন এক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

---

* "মোকদ্দর আপ্‌না আপ্‌না,
অজমা লে যিস্‌কা জী চাহে। ইত্যাদি"।

† "অগর্ হয় শওক মিল্‌নেকা,
তো হরদম্ লও লাগাতা যা। ইত্যাদি"।

করিলেন যে তদুত্তরে গুরুকে বলিতে হইল, "মনসুর সাবধান, রসনাকে শাসনে রাখিও। নতুবা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি রাজাজ্ঞায় প্রাণ হারাইবে।" অবশেষে তাহাই ঘটিল।

গুরুর নিকট উৎসাহ না পাইয়া মনসুর নির্জ্জন প্রদেশে যোগাবলম্বন করতঃ সমাধিস্থ হইলেন। কয়েক বৎসর তিনি যোগাসনে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে নীরব নিস্পন্দভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া হঠাৎ একদিন প্রেমের পূর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আনল্ হক্" (আমিই ঈশ্বর)। এই সংবাদ বোগ্‌দাদের চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে এক মুখে বলিতে লাগিল, "কি স্পর্দ্ধার কথা! ক্ষুদ্র মানুষ হইয়া ঈশ্বরত্ব অধিকার! ভক্তের কি এই উক্তি? ইহা নিশ্চয় বাতুলের প্রলাপ; মনসুর নিঃসন্দেহ পাগল হইয়াছে।"

মনসুরের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রে তাঁহাকে কত রকম বুঝাইতে লাগিলেন। মনসুর কিন্তু কাহারও কথায় মন দেন না, কেবল উর্দ্ধনেত্রে "আনল্ হক্" মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। একদিন বহুসংখ্যক বন্ধু একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া নিষেধবাঞ্জক উপদেশ দিতে লাগিল। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি ত বহুদিন হইল জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি। মৃতব্যক্তির কিসের ভয়? যদি তোমরা বল, আমার দেহ ও প্রাণ আছে, নতুবা কথা কহিতেছি কি প্রকারে? সে দেহ ও প্রাণ অতি তুচ্ছ জিনিস! যাহা এই আছে, এই নাই, তাহার মূল্য কি? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও ত তাহা কেনা উচিত নয়। তাহার জন্য ভয় কি? তাহার মমতা যত্নই বা কি নিমিত্ত?" এবম্বিধ নির্ভীকতা দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া নক্ষত্রবেগে বহির্গমনান্তর আবার সেই প্রাণপ্রিয় মহাবাক্য "আনল্ হক্" প্রচার করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

মনসুরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী একজন তপস্বিনী ছিলেন। তিনিও এই মহাসত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় প্রেমে পাগলিনী হয়েন নাই। তিনি মনসুরের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করতঃ ভ্রাতাকে একদা বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমি ত বেগ ধারণ করিয়া আছি; তুমি কেন এরূপে ক্ষেপিলে? আমি বিশ বৎসর এই তত্ত্বসুধা পান করিতেছি, কিন্তু মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ত কখন বিচলিত হই নাই।" কে কাহার কথা শুনে? মনসুর অনবরত একধ্যানে "আনল্ হক্" প্রচার করিতে থাকিলেন।

... বিন্দু মিশাইয়া গেলে একরূপ হয়, পরন্তু বিন্দুমধ্যে সিন্ধু ... প্রারে কি না, ইহা ...

"বুঁদ্ সমহানা সমন্দরমে
সো মানে সব কোই।
সমন্দর সমহানা বুঁদমে
পঁহুছে বিরলা কোই॥"

যাহা হউক ...

বারে ...

তালা হক্ৎ তব[illegible] আসমানের উপর সদরতোল্নেসাতে রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন, মনসুর কি প্রকারে তাঁহার পদে বসিতে পারে? অতএব মনসুর ঈশ্বরদ্রোহী, সুতরাং প্রাণদণ্ডার্হ। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা মহান, জীবাত্মা অণুবৎ; জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, পরমাত্মার অধীনে তাহাকে চিরকালই থাকিতে হইবে। ইহাই ইস্লামী সাধারণের শিক্ষা। এরূপস্থলে যদি কেহ "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে ঘোর অপরাধী মহাপাপী মনে করিয়া রাজদ্বারে

অভিযুক্ত করিতে বাধ্য। মনসুরের অদৃষ্টে তাহাই ঘটে। সাধারণ প্রকৃতিবর্গ বারম্বার খলিফার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল। মনসুরের ন্যায় বৈরাগী ফকিরের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি সর্ব্বজনপূজ্য মনসুর-গুরু শাহ জুনেদের নিকট দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। জুনেদ্ অনেকবার ফিরাইয়া দিয়া, এবং মনসুরকে বুঝাইয়া বিফলমনোরথ হওয়ার পর অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও, মনসুরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

মনসুর রাজাজ্ঞায় কারারুদ্ধ হইলেন। কয়েকবার ম... শক্তিপ্রয়োগে তথা হইতে ...

ক...

...ও ধার্ম্মিক এবং গুপ্ততত্ত্বাভিজ্ঞ মহাত্মা শেখ কবির তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কবির মনসুরকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনার মহান্ বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুগৃহীত সাধক পুরুষ ব্যতীত অন্য

...

ভ্রান্ত বলিয়া তাহার পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যসমাজে সেই কঠিন জটিল সমস্যার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে নিরস্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। যে তত্ত্ব গুপ্ত, তাহা চিরকাল গুপ্তই থাকুক।"

মনসুর যাহা প্রচার করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন তাহা সকলে কি প্রকারে বুঝিবে? অত বড় গভীর দার্শনিক সত্য জনসাধারণের পক্ষে অবোধ্য বলিলে দোষ হয় না। তখনকার যোগদাবী লোকের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক কয়জন শিক্ষিত লোক "অহং ব্রহ্মাস্মি" বুঝিয়া উঠিতে পারেন? সাধারণ ভাবে পরমাত্মার ও জীবাত্মার

সীতার স্বপ্ন

উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কটিকেই একখানি পূরা নাটক বলিলে হয়। কারণ ভবভূতি মহাবীরচরিতে রামায়ণের যে কয় কাণ্ড লইয়াছেন এক চিত্রদর্শনে প্রায় সেগুলি সব লওয়া হইয়াছে তবে এই চিত্রদর্শনের দরকার কি—একথার জবাব দিবার জন্য আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না। চিত্রদর্শনের পর সীতার নিদ্রা—সীতার স্বপ্ন, রামের সীতাপরিত্যাগ, সীতার নিদ্রাভঙ্গ এই সব লইয়া প্রথম অঙ্ক। প্রথম অঙ্কেরও সব কথা আমরা বলিব না। কবি কেমন কৌশলে সীতাকে ঘুম পাড়াইয়াছেন ও কেমন সময়ে কি অবস্থায় তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন শুদ্ধ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

চিত্র খুব লম্বা। বিশ্বামিত্রের নিকট রামের অস্ত্রলাভ হইতে আরম্ভ হইয়া সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত। চিত্র সব দেখানি হয় নাই। সব দেখাইবার ভবভূতির ইচ্ছাও ছিল না। যাহাতে রামের চরিত্র ফুটে, যাহাতে সীতার চরিত্র ফুটে, যাহাতে রামসীতার অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রেম ফুটে, ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া সেইগুলিই দেখাইয়াছেন। তাহারও মাঝে মাঝে রামচন্দ্র ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, পরশুরামের ব্যাপারটা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কৈকেয়ার কীর্ত্তি একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং খুব সংক্ষেপই করা হইয়াছে। চিত্রটা বোধ হয় একালকার ম্যাপের মত গুটান ছিল। লক্ষ্মণ একটু একটু খুলিতেছিলেন, ও দেখা হইলেই অমনি গুটাইতেছিলেন। রাম যেখানটা দেখাইতে বারণ করিলেন সেখানটা লক্ষ্মণ না দেখাইয়াই গুটাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে পঞ্চবটী আসিল; সূর্পণখা আসিল; অমনি সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই তোমায় আমায় শেষ দেখা"। রাম বলিলেন, "ভয় কি! এ ত

ছবি বই কিছু নয়"। সীতা বলিলেন, "যাহাই হউক, দুর্জ্জনের ছবি দেখিলেও কষ্ট হয়"।

সীতাহরণের পর রামের যে দুঃখ, কান্না, হা হুতাশ, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখান হইল। রাম আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। সীতা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ অন্যরস আনিবার চেষ্টা করিলেন—জটায়ুর বৃত্তান্ত আনিলেন, হনুমানের চিত্র দেখাইলেন—রামের দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সীতা একে পূর্ণগর্ব্ভা, নড়িতে চড়িতে, ভাবিতে চিন্তিতে, সকল অবস্থাতেই তিনি ক্লান্তি বোধ করেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে, অনেক পুরাণ কথা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই। শেষ রাম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"বৎসৈতস্মাৎ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি
"প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ।"

লক্ষ্মণ দাদা ও বড়বৌএর এইরূপ ভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ছবি গুটাইয়া বলিলেন, "এর পর আরও ছিল; এর পর আরও ছিল। বানর ও রাক্ষসদের অদ্ভুত যুদ্ধ ইত্যাদি অনেক ছিল। তা, আর্য্যা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন —আপনারা বিশ্রাম করুন।"

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে রাম সীতাকে বলিলেন, "চল আমরা জানালার ধারে একটু বসি"। সীতা অমনি বলিলেন, "বড় ক্লান্ত হইয়াছি—ঘুমে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে"। রাম বলিলেন, "আমারই গায়ের উপর গা দিয়া শয়ন কর, তোমার হাত আমার গলায় জড়াইয়া দাও। আমার মৃত শরীরে জীবন আসুক"। এই বলিয়া তিনি সীতার হাতদুখানি আপনার গলায় জড়াইয়া লইলেন। সীতা যতই নিদ্রায় কাতর হইতে লাগিলেন, তাঁহার হাত ক্রমেই রামের শরীরে বসিতে লাগিল এবং সীতার করস্পর্শে রাম আনন্দে অভিভূত হইয়া

পড়িতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "একি! সুখ বা দুঃখ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, আমি জাগিয়া আছি না ঘুমাইয়া আছি; বিষে আমায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে, না নেশায় আমায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে? তোমার অঙ্গ যতই আমার অঙ্গে গাঢ় হইয়া বসিতেছে ততই আমার ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আমার মনের ভাব আর এক রকম হইয়া গিয়াছে—আমার চেতনা লোপ হইতেছে, ভ্রম উপস্থিত হইতেছে।"

সীতার ঘুমের ঘোরে, অধিক কথা কহিবার ইচ্ছা নাই—তাই তিনি গোটাকতক কথা কহিলেন,—"থিরপ্পসাদা তুজ্ঝে, ইদোদানিং কিমবরং" একটি কথার বাঙ্গলা করা বড়ই কঠিন। ইহার সব ভাবগুলি ফুটাইয়া বাঙ্গলা করিতে গেলে লম্বা হইয়া পড়ে। ঘুমের ঘোরে তত কথা কেহ কয় না, তাই মোটামুটি বাঙ্গলা করিতেছি "তুমি বড় ভালবাস—তা ছাড়া আর কি?" তখন সীতার চোখদুটি ঘুমে গোল হইয়া আসিতেছে তাই রাম বলিলেন, "হে সরোরুহাক্ষি! জাগিয়া থাকিলে যে চোখ পদ্মের পাপ্ড়ীর ন্যায় বা চেরা পটলের মত হয়—ঘুম আসে আসে এমন সময়ে সেইটি গুটাইয়া একটু গোল হইয়া আসে।" তাই রাম এখানে "সরোরুহাক্ষি" বলিয়া সীতাকে সম্বোধন করিয়াছেন। সম্বোধন করিয়া রাম বলিলেন, "জীবনের ফুল যখন মলিন হইয়া আসে, তোমার এই মধুর কথা শুনিলে তাহাকে আবার ফুটাইয়া দেয়—আত্মা, শরীর ও মন সকলের তৃপ্তি করিয়া দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে মুগ্ধ ও শিথিল করিয়া দেয়, কাণে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দেয় এবং মনের বল আনিয়া দেয়।"

সীতার ঘুমের ঘোর ক্রমে অধিক হইয়াছে—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না,—বলিলেন, "পিঅংবদ! এহি সংবিসম্হ"—আমি শোব বলিয়া চারিদিকে কি খুঁজিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন, "কি খুঁজিতেছ?—বালিশ!—এই ত আমার হাত আছে, শোও। যে-দিন বিবাহ হইয়াছে সেইদিন হইতে ঘরে বল, বনে বল, বাল্যে বল,

যৌবনে বল, এইখানেই তুমি শয়ন করিয়াছ—এই তোমার বালিশ—আর কেহ কখনও এ বালিশে শোয় নাই।" ঘুমে সীতার কথা আরও জড়াইয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—"একথা ঠিক, একথা ঠিক"—তখনই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাম বলিলেন, "সীতা সত্যসত্যই আমার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল?" তিনি স্নেহের চক্ষে সীতাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী, চক্ষে অমৃতের বাত্তি, ইঁহার স্পর্শ যেন আমার শরীরের ঘন চন্দন। এই যে আমার গলায় ইঁহার হাত রহিয়াছে, ইহা মুক্তার মালা, সরস, শীতল, এবং সুখস্পর্শ। ইঁহার কোন্ জিনিসটি আমার প্রিয় নহে? কেবল একমাত্র আমার পক্ষে অসহ্য—ইঁহার বিরহ।

রামের মুখে এই "বিরহ" শব্দটি বাহির হইবার পরক্ষণে দ্বারী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেব উপস্থিত"। 'বিরহ' শব্দটি উচ্চারণ হইবার পরই 'উপস্থিত' শব্দটি শুনিয়া রামের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে! কে উপস্থিত?" দ্বারী বলিল, "দুর্ম্মুখ—আপনার খানসামা"। রাম মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দুর্ম্মুখ আমার ভিতর বাড়ীর চাকর, আমি তাহাকে চর করিয়া পাঠাইয়াছি। নগরের লোক ও দেশের লোক আমার সম্বন্ধে কে কি বলে সে আমায় তাহাই জানাইয়া যাইবে"। বলিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

দুর্ম্মুখ আসিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিল আমি কেমন করিয়া রামের কাছে সীতার সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত অপবাদের কথা বলিব। অথবা আমি বড় হতভাগা! আমার চাকরিই এই।

দুর্ম্মুখ এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় সীতা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হা আর্য্যপুত্র! তুমি কোথায়?" রাম বলিলেন, "ছবি দেখিতে দেখিতেই বিরহের একটা উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তিনি সেই বিরহই স্বপ্নে দেখিতেছেন। বলিয়া সীতার গায়ে হাত বুলাইতে

বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সুমানুষের এমন প্রেম অতি কষ্টেই পাওয়া যায়। ইহা এক, এক ছাড়া দুই নহে; ইহা সুখে ও দুঃখে একরূপ; সকল অবস্থাতেই অনুকূল কথনও প্রতিকূল হয় না—ইহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম হয়; বৃদ্ধবয়সেও ইহার আনন্দ হ্রাস হয় না বরং যত কাল যাইতে থাকে, উভয়ের মধ্যে যে আবরণ ছিল তাহা সরিতে থাকে, তখন ঘন ও নিবিড় স্নেহে গিয়া দাঁড়ায়।"

গর্ব্ভাবস্থায় বিশেষ পূর্ণগর্ব্ভ অবস্থায় স্ত্রীলোকের মনে কোনরূপ ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ না হয়—এটি সকলেই দেখিয়া থাকেন। লোকের মনের ধারণা ওরূপ অবস্থায় ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ হইলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে, সেইজন্য জনক বাড়ী যাইবেন শুনিয়া পাছে সীতার মনে উৎকণ্ঠা হয় তাই রামচন্দ্র ধর্ম্মাসন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত হইবার পরই সীতার মনে স্ফূর্ত্তি হইবে বলিয়া ভবভূতি অষ্টাবক্রকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অষ্টাবক্র আসিয়া উঁহাকে তাঁহার গুরু গুরু-পত্নী শ্বাশুড়ী ও ননদ সকলে ভাল আছেন একথা বলিলেন। সীতা ব্যস্ত হইয়া প্রত্যেকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা আমাদের মনে করেন কি?" অষ্টাবক্র বলি-লেন, "শুধু কি মনে করেন—সর্ব্বদাই কামনা করেন তোমার যাহাতে একটি বীরপুত্র হয়।" অষ্টাবক্র বেশ চতুর লোক—সীতার যাহাতে স্ফূর্ত্তি হয় এমন কথাই কহিয়া গেলেন। তিনি যাইতে না যাইতেই ভবভূতি লক্ষ্মণকে ছবি লইয়া উপস্থিত করিলেন। রামের তাহাতে বড়ই আনন্দ—আপনাদের পুরাণ বৃত্তান্তের ছবি দেখিলে, বাপ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সীতা আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না—বলিলেন, "দেবীর উৎকণ্ঠা হইলে কেমন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে হয়, ভাই লক্ষ্মণ, তুমিই তাহা জান"। প্রথমেই ব্রহ্মাস্ত্রের ছবি। রাম বলি-লেন, এসব অস্ত্র এখন তোমার ছেলেদেরই হইবে। সীতা মা হইতে যাইতেছেন, ছেলেদের ভাল হইবে শুনিলে কোন্ মায়ের না আনন্দ

হয় ? সীতারও তাহাই হইল। তাহার পর বিবাহের ছবি। বিবাহের দিনের কথা মানুষের যত মনে থাকে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কথাই তাহার তত মনে থাকে না। মনে থাকে কেন ?—সেদিন বড় আনন্দের দিন,—সেকথা যতবার স্মরণ হয় ততবারই আনন্দ হয়। সীতারও তাহাই হইল। সীতার বিবাহের সময় একটা ভয়ের কারণ হইয়াছিল—পরশুরামের আসা। রাম সে ছবি দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। সীতার মনে পাছে ভয় হয়, সেটা তিনি বন্ধ করিলেন আর আপনারও যেটা গরিমার কথা সেটা লইয়াও আলোচনা করিতে দিলেন না। এইরূপে চলিতে লাগিল। পাছে কৈকেয়ীর দুর্ব্যবহার মনে পড়িলে সীতার দুঃখ হয়,—সে ছবিও রাম দেখিতে দিলেন না—আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষ লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাম করিলেন। দুঃখেও যেমন লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—আনন্দেও সেইরূপ লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—বিশেষ সীতার মত অবস্থায়। সূর্পণখা দেখাইবার আগেই যদি সীতা ক্লান্তিবোধ করিতেন, বোধ হয় এতটা ঘটিত না—বিরহ বিরহ বলিয়া মনে একটা ত্রাস জন্মিত না। কিন্তু নিষ্ঠুর কবি সেকথা শুনিবেন কেন ? তিনি তাঁহার কলাকৌশল দেখাইতেই ব্যস্ত। ঐ সময়ে সূর্পণখাকে না আনিলে যে ভবভূতির নাটক লেখা হয় না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের মুখে সূর্পণখার নামটি করাইলেন—ছবিও দেখাইলেন। এতক্ষণে বাপের জন্য সীতার যে উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা ত দূর হইয়াছিল; নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া কেহ ছিল না—তিনজনে আনন্দে ভোর হইয়া যাইতেছিলেন। তখন যে সূর্পণখার নাম উপস্থিত করিলেই সীতার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইবে লক্ষ্মণের তাহা মনেই ছিল না। তিনি পঞ্চবটীর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্পণখার নাম করিলেন ও তাহার ছবি দেখাইলেন—হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। সীতার বিরহে রামের যে কি অবস্থা হইয়াছিল সীতা ত তাহা দেখেন নাই—সেগুলি দেখাইয়া সীতাকে খুশী করিতে গেলেন;

আবার বিপরীত ফল ফলিল—রাম সে সব কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। রামের দুঃখে সীতারও দুঃখ বাড়িয়া উঠিল। রসান্তর উপস্থিত করিয়া রামকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতেও তত কৃতকার্য্য হইলেন না। শেষ ছবি গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

রাম পুরুষ মানুষ, বিশেষ তিনি একটা প্রকাণ্ড পুরুষ, তিনি সহজেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। সীতা কিন্তু পরিশ্রমে, ভাবনায় ও উৎকণ্ঠায় ঘুমে ঢলিয়া পড়িলেন। রাম আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে কত মিস্ট কথাই কহিতে লাগিলেন। রাম একটি একটি কবিতা বলিতে লাগিলেন। সীতা ছয়টি কথায় প্রথম কবিতাটির উত্তর দিলেন, দ্বিতীয়টির তিনটি কথায়। রাম যখন তৃতীয়টি বলিলেন,—তখনও সীতা দুইটি ছোট ছোট কথায় জবাব দিলেন, কিন্তু সে দুটি দুবার করিয়া বলিলেন। নিদ্রার আগে লোকে এইরূপ এককথা দুইবারই বলে—তাহার পরই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুর্ম্মুখ প্রবেশ করিয়া যখন সীতার সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতেছিল, তখনই সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র তুমি কোথায়?" সূর্পণখার নাম শুনিয়া অবধি সীতার মনে যে বিরহের উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা নিদ্রায়ও যায় নাই। তাই এই স্বপ্ন। এই স্বপ্নই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া। কিন্তু আমরা সীতার নিদ্রার ও স্বপ্নের কথাই কহিতেছি—ভবিষ্যৎ বিপদের কথা এখন তুলিব না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ধর্ম্ম, নীতি ও "আর্ট"

গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের "নারায়ণে" তিনটি "কথা-নাট্য" প্রকাশিত হইয়াছে। চারিদিকে এগুলির অত্যন্ত নিন্দা হই-তেছে। আবার কেহ কেহ এগুলির খুবই প্রশংসাও করিতেছেন। যাঁরা নিন্দা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ধর্ম্মের ও নীতির দোহাই দেন। যাঁরা প্রশংসা করেন, তাঁরা ইংরাজিতে যাহাকে "আর্ট" বলে, তার দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁরাও "আর্টে"র বাঙ্গলা করেন না, আপাততঃ আমিও সে চেষ্টা করিলাম না।

ধর্ম্মের ও নীতির বিচারে সত্য সত্যই এগুলি কতটা, কিভাবে, নিন্দনীয় এবং আর্টের হিসাবেই বা কতটা প্রশংসাযোগ্য, এই কথাটা একবার পরখ করিয়া দেখা মন্দ নয়। আর লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম ও নীতি বলে, তার দ্বারা আর্টের বিচার করা আদৌ সঙ্গত কি না, সে কথাটার মীমাংসা হওয়া আরও আবশ্যক। এই কথানাট্যগুলির নিজের দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন, এগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া, নীতি ও আর্টের পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া যে কথাটা উঠিয়াছে, সাহিত্যসমালোচনায় তাহা কোনও মতেই উপেক্ষ-নীয় নহে। এই জন্যই আমি এই কথানাট্যগুলির একটা বিস্তৃত সমালোচনা করিতে রাজী হইয়াছি।

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এগুলির অমন নিন্দা, কিম্বা আর্টের দোহাই দিয়া অত প্রশংসা না করিলে, আমি এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই-তাম না। কারণ, সাহিত্য-সমালোচনার একটা আদর্শ আছে। সে সমালোচনার একটা ক্ষেত্র চাই। তাহার একটা বিশেষ মর্য্যাদাও

আছে। এই কথা-নাট্যগুলিতে সমালোচনার সেই ভূমি গড়িয়া উঠে নাই। এগুলি এই মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য নহে।

সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ।

যে যাহা লিখে ও ছাপায়, তাহাই সমালোচনার যোগ্য হয় না। সরাসরিভাবে যে-সে'ই যে-কোনও বিষয়ে একটা মতামত প্রকাশ করিতে পারে। এক্ষেত্রে লোকে শুদ্ধ নিজ নিজ রুচি বা প্রবৃত্তির দ্বারা অপরের কর্ম্মাকর্ম্মের ভালমন্দের বিচার করে। কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা কেবল স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ নহে। আর এসকল সরাসরি রায় খুব জাঁকাল ও ঝাঁঝাল ভাষায় প্রকাশিত হইলেও শ্রেষ্ঠ বা সত্য সমালোচনা হয় না।

কোনও বস্তুর ওজন করিতে একটা পাল্লাবাটখারার আবশ্যক হয়। আর এই পাল্লাবাটখারা আমরা সকলে আপন আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না ও তুলিতে যাই না। সে ওজন বাজারে চলিবে না। আমাদের ব্যক্তিগত রুচি, শক্তি, বা স্বার্থের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নাই, যাহা আমরা নিজেদের মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলি নাই, যাহা সমাজের সমষ্টিভূত শাসন-শক্তির প্রতিনিধি রাজা সকলের উপর হইতে, সমানভাবে সকলের উপরে, জারী করিয়া দেন, অমন পাল্লাবাটখারা দিয়াই আমরা পণ্য বিনিময়কালে বস্তুর ওজন করিয়া থাকি। এ ওজন তোমারও নয় আমারও নয়, ইহা সকলের। সেইরূপ কেবল তোমার বা আমার নিজের রুচির, প্রবৃত্তির, বা খেয়ালের দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টির সত্য ওজনও করিতে পারি না। এরূপ সমালোচনার কোনও প্রকারের সার্ব্বজনীনতা বা প্রামাণ্য-অধিকার থাকিতে পারে না। দুই জনের মতের অমিল হইলে, এক্ষেত্রে তার কোনও মীমাংসার পথ থাকে না।

সাহিত্য-সমালোচনার একটা মাপকাঠি চাই। সে মাপকাঠি সরকারী মাপকাঠি হওয়া চাই; দশজনে তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিবে বা মানিতে বাধ্য হইবে, এমন মাপকাঠি চাই। না হইলে

এসকল সমালোচনা কেবল বাক্‌বিতণ্ডাতেই যাইয়া শেষ হইবে। এখানে, এইজন্য প্রথম প্রশ্ন এই—এই মাপকাঠি কোথায় পাইব ?

এই মাপকাঠিটি খুঁজিতে যাইয়া, প্রথমে সাহিত্য-সৃষ্টির কথা ছাড়িয়া, একবার প্রাকৃত সৃষ্টির দিকে চাহিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। এক বাগানে বহুতর গোলাপ ফুটিয়া আছে, সে-গোলাপগুলির মধ্যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তার বিচার করিব কিসে ? সচরাচর সকলেই সে বিচার করে কি দিয়া ? ঐ গোলাপ-বাগানের দিকে তাকাইলেই দেখি সকল গোলাপই যেন প্রাণপণ করিয়া এমন একটা আকারে ফুটিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা সকলের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোনওটিতেই নিঃশেষিত হয় নাই। প্রত্যেক গোলাপের আড়ালে একটা আদর্শ-গোলাপ রহিয়াছে, আর প্রত্যেক গোলাপই সেই আদর্শ-গোলাপটিকে নিজেদের আকার ও আয়তন, বর্ণ ও গন্ধের ভিতর দিয়া ফুটাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই যে আদর্শ গোলাপটি যার আভাস প্রত্যেক স্বতন্ত্র গোলাপটি একদিকে ও সকল গোলাপ মিলিয়া অন্যদিকে আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দেয়, তাহাই গোলাপের বাজারের বাটখারা। ঐ আদর্শের ওজনেই কোন্ গোলাপ ভাল আর কোন্ গোলাপ মন্দ, তার বিচার করিয়া থাকি ; আমার বা তোমার একটা স্বকপোল-কল্পিত আদর্শের দ্বারা এবিচার করি না। এই আদর্শটিই গোলাপ-জাতির নিজের স্বরূপ। ঐটিকে ফুটাইয়া তোলাই গোলাপ-জীবনের স্থির লক্ষ্য। গোলাপের অভিব্যক্তি-গতির ঐটিই চরম গন্তব্য। গোলাপ-সমাজের নীতির ঐটিই পরম নিয়তি। গোলাপের বেলায় আমরা সকলেই এটি বুঝি ও মানি। তারই জন্য শতদলপদ্মের মতন গোলাপ কেন অত বড় হয় না, এ দুঃখ করি না। শতদলের দ্বারা গোলাপের ভালমন্দের বিচার করিতে যাই না। গোলাপের দ্বারাও অপরাজিতার বা রজনীগন্ধার বিচারে প্রবৃত্ত হই না।

এইরূপে প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে আমরা প্রত্যেক বস্তুরই এক

একটা নিজস্ব স্বরূপ উপলব্ধি করি। জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আদের এই নিজস্ব স্বরূপটিকেই ফুটাইবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কোনওটি বা আপনার স্বরূপকে আপনার রূপের ভিতরে একটু বেশী ফুটাইয়া তোলে; কোনওটি বা একটু কম ফোটায়; কিন্তু কোনও বস্তুই আপনার এই স্বরূপকে নিঃশেষে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। এই সৃষ্টি-ধারাতে পারে না; তবে সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে যাহা এরূপভাবে নিয়তই ফুটিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাই, তাহা যে কোথাও নিঃশেষে নিত্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া আছে, তাহাও মানিতেই হয়। এটি না মানিলে এই সৃষ্টির মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা, কোনও নিয়ম, কোনও অপরিহার্য্য কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ কিম্বা পৌর্ব্বাপর্য্য কল্পনাও করিতে পারা যায় না। আর এই কল্পনার কোনও আশ্রয় না থাকিলে, আমরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত স্পর্দ্ধা করি, সকলই তাসের ঘরের মতন গড়িতে গড়িতে ক্ষণে ক্ষণে নিজেদের নিঃশ্বাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে গোলাপ-রূপ ভিন্ন ভিন্ন গোলাপের অসংখ্য আকার বর্ণাদির ভিতরে, কোথাও বা কম, আর কোথাও বা বেশী ফুটিয়াছে, তাহা যদি কোথাও নিঃশেষে নিত্যকাল ফুটিয়া না থাকে, তবে এই প্রত্যক্ষ গোলাপের অভিব্যক্তির কোনও অর্থ হয় না। যে কোকিল-রূপ অসংখ্য কোকিলের ভিতরে, কোথাও বা কম, আর কোথাও বা বেশী ফুটিয়াছে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা যদি নিঃশেষে কোথাও নিত্যকাল প্রস্ফুট না থাকে, তবে কোকিল-জীবনের সার্থকতা থাকে কৈ? জীব-সমাজে প্রত্যেক জীবের এই নিজস্ব স্বরূপটি কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া আছে বলিয়াই জীবের ক্রমবিকাশ বা ইভোলিউশন সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের, এবং জন-সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা পরিপূর্ণ, নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ কোথাও আছে বলিয়াই ব্যক্তিগত জীবনের এবং সমাজ-জীবনের বিবিধ সম্বন্ধসকলের একটা অর্থ আছে। আর এই যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-বস্তু তারই আরা ভিন্ন ভিন্ন

ব্যক্তির ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সম্বন্ধ সকলের সত্যাসত্যের ও ভাল-মন্দের বিচার করিয়া থাকি। এটি না থাকিলে, আমাদের এসকল বিচার-আলোচনার, এসকল শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টভেদের কোনও ভিত্তি, কোনও যুক্তি, কোনও সঙ্গতি থাকিত না। আর এই প্রত্যক্ষ জড়, উদ্ভিদ, জীব ও মানব-জগৎই ত সর্ব্বপ্রকারের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উপাদান। সুতরাং সাহিত্যের সৃষ্টি-বিশেষ যেসকল উপাদান লইয়া যেসকল রস-চিত্র ফুটাইতে চাহে, তার যে নিজস্ব ও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটি আছে, তাহারই দ্বারা সে সাহিত্য-সৃষ্টির ভাল-মন্দের বিচার করিতে হইবে। যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ফুলের প্রাণ, মলয়ের গান, পতঙ্গের রূপ, আকাশের মহিমা, কিম্বা মানব-সমাজের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ বা প্রয়াসকে ফুটাইতে চায়, সেই ফুলের, মলয়ের, পতঙ্গের, আকাশের, বা বিশিষ্ট মানবীয় সম্বন্ধের নিজস্ব নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের দ্বারাই তার সত্যাসত্যের ও ভালমন্দের বিচার করিতে হইবে। অন্য কোনও কিছুর দ্বারা এ বিচার হয় না ও হইতেই পারে না। ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধের সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ নায়ক-নায়িকার মাধুর্য্যের ওজন দিয়া ঠিক করা যায় না। মায়ের বাৎসল্যকেও পত্নীর অনুরাগের দাঁড়িপাল্লায় চড়ান যায় না। হাস্যের দ্বারা কারুণ্যের, কিম্বা বীভৎসের দ্বারা ভয়ানকের, কিম্বা দাস্যের দ্বারা সখ্যের ওজন কখনও সম্ভব হয় কি? প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক রসকে তার নিজের ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটির দ্বারাই বিচার করিতে হয়।

এই জন্য সাহিত্য-সমালোচনা বলিতে আমি সাহিত্য-সৃষ্টি-বিশেষের নিজের আদর্শের দ্বারা তার বাস্তবতার, নিজের লক্ষ্যের দ্বারা তার প্রয়াসের, নিজের গন্তব্যের দ্বারা তার গতির, নিজের নিয়তির দ্বারা তার নীতির, নিজের স্বরূপের দ্বারা তার রূপের—সত্যাসত্যের ও উৎকর্ষা-পকর্ষের বিচার বুঝি। ইহাই সাহিত্য-সমালোচনার সত্য আদর্শ।

সাহিত্য-সমালোচনার ভূমি

কিন্তু সকল সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই সমালোচনার ভূমি গড়িয়া উঠে না। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর এই যে স্বরূপের কথা বলিলাম, ইহা প্রথ-

মতঃ সেই বস্তুর মধ্যেই ফুটিয়া উঠে, সে বস্তুর বাহিরে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গোলাপের স্বরূপ অপরাজিতাতে, কিম্বা ফুলের স্বরূপ ভূমিলতাতে, কিম্বা কুমির স্বরূপ পাখীতে, পশুরাজের স্বরূপ শশকে, অথবা হরিণের স্বরূপ ভল্লুকেতে পাওয়া যায় না। মানুষের স্বরূপ-বস্তু যে কি, তাহা কেবল মানুষের রূপের ভিতরেই দেখিতে পাই। আর দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বস্তুর বিকাশ-ক্রমের একটা বিশেষ অবস্থাতে বা সোপানেই কেবল তার নিজস্ব রূপের প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে, আর তখনই কেবল আমরা তার এই স্বরূপটিরও আভাস পাইয়া থাকি, তার পূর্ব্বে পাই না। যে আদি-কোষাণু বা cell হইতে মানুষের জন্ম হয়, তাহাতে মানুষের এই স্বরূপটির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কোষাণুতে জীবের জীবন-বীজ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে। ভগবান্ ভাষ্যকার সৃষ্টির আদিতে যে নাম-রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাহাকে তিনি অব্যাকৃত কিন্তু ব্যাচিকীর্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, জীবের কোষাণু সেই নাম-রূপেরই পর্য্যায়ভুক্ত। জীবের এই আদি কোষাণুগুলি সব একাকার। কুকুরের কোষাণু দেখিতে যেমন, ঘোঁড়ার বা মানুষের কোষাণুও ঠিক সেইরূপই। এমন কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার আজি পর্য্যন্ত হয় নাই,—কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না—যাহার সাহায্যে আমরা কুকুরের বা বানরের কোষাণু হইতে মানুষের কোষাণুকে পৃথক্ করিতে পারি বা পারিব। আর ঐ মানব-কোষাণুর মধ্যে, মানব-দেহের রূপ যে কি, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। আর যেখানে বস্তুর রূপ ফোটে নাই, সেখানে তার নিজস্ব স্বরূপ যে কি, তাহাও ধরা পড়ে না। বস্তুর গঠনটি কিছু কিছু জমাট বাঁধিতে আরম্ভ না করিলে, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিতে আরম্ভ করে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে আরম্ভ না করিলে, অঙ্গীর রূপ ও স্বরূপ, নীতি ও নিয়তি, কিছুই ধরা পড়ে না। সে অবস্থায়, সেই নির্ব্বিশেষ একাকারত্বের মধ্যে, কিম্বা সেই অসম্বদ্ধ সমষ্টির ভিতরে কোনও

নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ ও সম্বন্ধ যে কি, ইহা তার অভিব্যক্তি ধারার একটা বিশেষ অবস্থাতেই কেবল প্রত্যক্ষগোচর ও জ্ঞানগম্য হয়, তার পূর্ব্বে হয় না।

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একথা খাটে। এমন সকল লেখা ত সর্ব্বদাই চক্ষে পড়ে, যাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি স্বল্পবিস্তর সুললিত কিম্বা শ্রবণকটু, সার্থক কিম্বা নিরর্থক শব্দসমষ্টি ব্যতীত আর বড় বেশী কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও মানুষকে দেখিবামাত্রই যেমন তার বৈশিষ্ট্যটুকু আমাদের নেত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যায়, সেইরূপ কোনও রচনা পাঠ করিবামাত্রই তার বিশেষত্ব, তার সাধ্য, তার অভিপ্রায় ও প্রয়োজন আমাদের মনেতে মুদ্রিত হয়। আবার এমন রচনাও ত সর্ব্বদাই চক্ষে পড়ে, যাহার কোনও প্রকারের বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই বুঝা যায় না। এমন সকল কাব্য, উপন্যাস, নবন্যাস, নাটকাদি বিস্তর আছে, যাহাতে ঝঙ্কার আছে, ভিন্ন ভিন্ন রসও স্থানে স্থানে আছে, ভিন্ন ভিন্ন চিত্র বা চরিত্রও অল্পাধিক ফুটিয়াছে; কিন্তু যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে, কিম্বা এ সকল বিভিন্ন অংশের সে রচনার সমগ্রের সঙ্গে কোনওই সুস্পষ্ট, অপরিহার্য্য সম্বন্ধের প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই; যাহার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র একে অন্যের প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং যাহার সকল চরিত্র মিলিয়া কোনও বিশেষ লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করে না। ইট-কাঠ, লোহা-লক্কড়, চূন-সুরকী একত্র করিয়া রাখিলেই যেমন সে স্তূপের মধ্যে কোনও এমারতের রূপ পাওয়া যায় না; এই সকল রস-চিত্র এবং লোক-চরিত্রের গোলাঘরে বা তোষাখানাতেও সেইরূপ কোনও সাহিত্য-সৃষ্টির রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ সকল সাহিত্য-চেষ্টাতে কোনও বিশেষ স্থানে কোনও রস-বিশেষের বা চরিত্রবিশেষের অবতারণা কেন যে করা হইয়াছে, এই প্রশ্নের কোনই সঙ্গত ও সন্তোষকর উত্তর পাওয়া যায় না। যাহার ভিন্ন

বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ মিলিয়া কোনও বিশিষ্ট চরিত্রকে বা রসের রূপকে গড়িয়া ও ফুটাইয়া তোলে নাই, কিম্বা কোনও বোধগম্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করে নাই, এমন রচনা গদ্যে পদ্যে হাজার হাজার আমাদের মাসিকে ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। এসকল অসম্বদ্ধ, অগঠিত, অপরিণত ও অপরিপক্ব সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে সত্য সাহিত্য-সমালোচনার কোনও ভূমিকা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সাহিত্য-সৃষ্টিকে তার নিজের স্বরূপ দিয়াই তার বিচার করিতে হয়। কিন্তু এসকল সাহিত্য-চেষ্টাতে কোনও প্রকারের স্বরূপের সন্ধান মিলে না। এইজন্য এগুলি সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য হয় না।

আমার বিবেচনায় "নাস্তিকগণের" এই কথানাট্যগুলিও এই মর্য্যাদা লাভের যোগ্য নহে। কারণ, এসকলের মধ্যে বিশেষ কোনও রূপের, কোনও লক্ষ্যের, কোনও একটা স্থির ও কেন্দ্রস্থ উদ্দেশ্যের, কোনও আদর্শের সন্ধান পাই না। লেখক কোন্ নাটে কোন্ মূল বস্তু বা চরিত্র বা রস-চিত্রকে ফুটাইতে চাহিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। "আঁধার ঘরে"র মধ্যে একটা আনন্দের অতি ক্ষীণ আভাস হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে; "মরণের জয়ে", কিম্বা "হাসির [illegible]" তাহা একেবারেই পাওয়া যায় না।

আর্টের অন্তরঙ্গ লক্ষ্য

যাঁহারা, আর্টের দোহাই দিয়া এই কথা-নাট্যগুলির অত প্রশংসা করেন, এইখানেই বোধ হয় তাঁহাদের সঙ্গে আমার বিরোধের প্রথম সূত্রপাত হইবে। আর্টবাদীগণ, বলিবেন, আর্টের আবার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নের দ্বারা নীতিবাদী বা ধর্ম্মবাদী বা সংস্কারবাদী বা হিতবাদী সমালোচককে নিরুত্তর করা কঠিন নহে। কিন্তু আমি এখানে যে উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের কথা তুলিয়াছি তাহা আর্টের বাহিরের নয়, আর ভিতরের কথা। আর্ট ধর্ম্ম-প্রচার করে না, মত

প্রতিষ্ঠা করে না, সমাজ-সংস্কার বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যাহাতে হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখে না। এসকল মানিলাম। কিন্তু আর্টের নিজের যে একটা লক্ষ্য আছে, এই সকল মামুলী কথা দিয়া, তার বিচার আলোচনার মুখ বন্ধ করা যায় না। আর্ট ত একটা কর্ম্ম। কর্ম্মমাত্রেই ত কতকগুলি উপায় অবলম্বনে একটা উদ্দেশ্য-সাধন করে। নিষ্কাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত লক্ষ্যহীন হয় না। কবিতাকে আমরা আর্ট বলি। কিন্তু কবিতা ত শুকদেবের মতন একেবারে শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। তাহাও ত তিলে তিলে গড়িয়া উঠে। আর যাহা ক্রমে ক্রমে গড়ে, অনেক-গুলি বস্তুকে এক করিয়া, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে বস্তুর রূপকে ফুটাইতে হয়, সে বস্তুর এই সকল অঙ্গ-যোজনা বা সম্বন্ধ গঠনের একটা মূল লক্ষ্য না থাকিলে চলে কি? ইংরা-জিতে শব্দ-নির্ম্মাণ ও শব্দ-গ্রহণ (word-making and word-taking) নামে একটা ছেলেদের খেলা আছে। অনেকগুলি ছোট ছোট তাসে ইংরাজি বর্ণমালার ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরগুলি মুদ্রিত থাকে; এই তাসগুলিই এই খেলার সাজ-সরঞ্জাম। এই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরাঙ্কিত তাসগুলিকে একটা কৌটায় পুরিয়া কিছুক্ষণ নাড়িলেই ত আর শব্দ-নির্ম্মাণ বা word-making হইবে না। প্রত্যেক অক্ষরটিকে এমন ভাবে পর পর সাজাইতে হইবে যেন তারা সকলে মিলিয়া একটা সার্থক শব্দ-রচনা করিতে পারে, তবেই সে সাজান সফল হইবে। এখানে ঐ শব্দটি গড়িয়া তুলাই ঐ বর্ণ-বিন্যাসের লক্ষ্য। ঐ শব্দ শুনিয়া বা পড়িয়া কে কি ভাবিবে বা করিবে, তার সঙ্গে এই লক্ষ্যের সম্বন্ধ নাই। শব্দটি গঠিত হইলেই, এই চেষ্টাটা সফল হইল। আর্ট বা রস-সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। কবির কাব্য বা নাট্য বা উপন্যাস পড়িয়া, কিম্বা চিত্রকরের চিত্র অথবা ভাস্করের ভাস্কর্য্য দেখিয়া কে কি ভাবিবে বা করিবে; তাহার বিচার-বিবেচনা আর্টের নয়। কিন্তু ঐ কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, চিত্র, বা ভাস্কর্য্য রচনার

নিজের ও একটা অন্তরঙ্গ লক্ষ্য আছে। কবি যখন একটি শব্দের পর আর একটি শব্দ বসান; নাট্যকার যখন একটি দৃশ্যের পর আর একটি দৃশ্য প্রকাশিত করেন ও সেই দৃশ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকে আনিয়া উপস্থিত করেন; চিত্রকর যখন তুলি ও রং লইয়া একটি রেখার পর আর একটি রেখা টানেন; অথবা ভাস্কর যখন সম্মুখের মর্ম্মরখণ্ডের উপরে বাটালি দিয়া এদিকে ওদিকে আঘাত করেন; তখন এসকলের মধ্যে কি একটা লক্ষ্য থাকে না? কবির প্রত্যেক শব্দ-যোজনার অন্তরালে সমগ্র চরণটির, প্রত্যেক চরণটির সংস্থানের মধ্যে সমগ্র কবিতাটির প্রতি কি লক্ষ্য থাকে না? ঐ সমগ্রতার দ্বারাই কি তাঁর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, চরণ প্রভৃতি এক একট বিশেষ স্থানে যাইয়া বসিতে বাধ্য হয় না? আর ঐ সমগ্র কবি-1 তাটি যে কি, তাহা কি এই শব্দ ও চরণ-বিন্যাসের মধ্যেই প্রকাশ পায় না? নাট্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর, সকল-রস-স্রষ্টা বা আর্টিষ্ট সম্বন্ধেই কি একথা খাটে না? এই নিজস্ব, অন্তরঙ্গ লক্ষ্যও কি আর্টের নাই? আর্টবাদীগণ এমন অদ্ভুত কথা কহিবেন বা কহিতে সাহসী হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

নাট্যের লক্ষণ

লেখক এগুলিকে কথা-নাট্য বলেন। আমাদের নাট্যকলায় কথা-নাট্যের কোনও বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে কি না, জানি না। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, কথার দ্বারা যে নাটকের অভিনয় হয়, তাহাকেই কথা-নাট্য বলা যাইতে পারে। গানের দ্বারা যার অভিনয় হয়, তাহাকেই আমরা গীতি-নাট্য বলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া এই "কথা" বিশেষণের আর কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে কি না, পণ্ডিতেরা জানেন, আমি জানি না। জানাও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এগুলি যে নাট্য, ইহা জানাই এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত। কারণ, নাট্য কাহাকে বলে, নাট্য কিসে হয়, এজ্ঞান মোটা-

মোটি সকলেরই আছে। দেশ-কাল ও কর্ম্ম-বিশেষের যথাযোগ্য সমাবেশের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির আচার-আচরণ ও উক্তি-প্রত্যুক্তির সাহায্যে তাহাদের চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলাই, মোটামোটি নাট্য-সাহিত্যের লক্ষ্য। নাট্যে একাধিক চরিত্রের অবতারণা করা হইলেও, প্রত্যেক নাট্যেই একটি কি দুইটি মূল চরিত্র থাকে। সেই মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই অপর সকল চরিত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করে। নদীসকল যেমন ঋজু-কুটিল পথে একই সাগরাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ ঐ নাট্যের সকল দৃশ্য, সকল কর্ম্ম, সকল কর্ত্তা, সকল কথাবার্ত্তা, কেন্দ্রস্থিত চরিত্রটিকে বা চরিত্রগুলিকেই ফুটাইতে চেষ্টা করে। সহজ বুদ্ধিতে ইহাই নাট্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। এই লক্ষ্য বাহিরের নয়, ভিতরের; এটি নাট্যের নিজস্ব অন্তরঙ্গ লক্ষ্য। গীতি-নাট্যেরও এই লক্ষ্য। কথা-নাট্যেরও; নাট্য বলিয়াই, এই লক্ষ্য থাকা চাই। যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই লক্ষ্যটি ফোটে নাই, তাহা আর যাহাই হউক না কেন, নাট্য নহে, ইহা নিশ্চিত।

তার পর কেবল চরিতচিত্রাঙ্কনই নাট্যের উদ্দেশ্য নহে। নাট্যের চরিত্রসকল সমাজের লোক-চরিত্র হইতেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই সকল লোক-চরিত্র অসংখ্য। কবি কাব্য বা নাট্য রচনাকালে এসকলের মধ্য হইতে দুই চারিটি চরিত্র বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে আপনার কাব্যে বা নাট্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই বাছুনির সূত্র কি? কবি কোন্ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সমাজের বহুবিধ লোক-চরিত্রের মধ্যে এই দুই চারিটি চরিত্রকে বাছিয়া লন? এ বাছুনির কি কোনও লক্ষ্য নাই? এ কি কেবল একটা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র? কেবল একটা খাম-খেয়াল? তা ত নয়। এই বাছুনির একটি লক্ষ্য থাকে। সে লক্ষ্যটি রস। আর ঐ রসই কাব্যের বা নাট্যের চরিত্রাঙ্কনের মূল কথা। ঐ রসের প্রয়োজনেই কবি চারিদিকের সমাজের অসংখ্য লোক-চরিত্র হইতে দু'চারিটি চরিত্রকে বাছিয়া, তাঁর কাব্যে বা নাট্যে সন্নিবেশিত ও

অঙ্কিত করেন। কবি কোন্ রস ফুটাইতে চান, তাহা ভাবিয়াই তাঁর কাব্যের মূল নায়ক-নায়িকা নির্বাচন করেন। ইহাদিগকে তিনি একটা বিশিষ্ট রসের মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। কিন্তু কোনও রসই নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে থাকে না। রস বৈচিত্র্য না হইলে কোনও রসই ফোটে না। এই রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার জন্যই কবি আপনার কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের, ঘটনার এবং ইতর চরিত্রগুলির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইজন্য সকল কাব্যেই নানা রসের অবতারণা হয়; কিন্তু এসকলের মধ্যে একটি রসই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফোটে। সেইটিই সে কাব্যের বা নাট্যের মূল আশ্রয় হয়। কিন্তু এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কোনও একটা বিশিষ্ট রসের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। নানা চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে, ইহা দেখিতেছি। ইহাতে নানাবিধ রসের আভাসও পাওয়া যায়, ইহা মানি। কিন্তু মূল রস যে কোন্‌টা, ইহার সন্ধান মিলে না। কোন্ চরিত্র যে মূল চরিত্র, আর কোন্ গুলিই বা সেই মূল চরিত্রকে ফুটাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা ঠিক করা কঠিন। আর এই জন্যই বলি, এগুলিতে কোনও রসের বৈশিষ্ট্য, কোনও রূপের বৈশিষ্ট্য, কোনও লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে নাই। যে সকল উপায় ও উপকরণে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের বা নাট্যের নিজস্ব স্বরূপ ও লক্ষ্য তার নিজের অঙ্গেই ফুটিয়া উঠে, এগুলিতে তাহা পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই এগুলির মধ্যে সত্য সাহিত্য-সমালোচনার ভূমি প্রস্তুত হয় নাই। এগুলি সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার একেবারেই যোগ্য নহে।*

---

* প্রথমে—জ্যৈষ্ঠের "নারায়ণে" প্রকাশিত "মরণের জয়" নামক কথা-নাট্যের কথাই বলি। এখানি কোন্ রসাশ্রিত নাট্য? অনেকেই হয় ত এক নিঃশ্বাসে এটিকে আদিরসাশ্রিত বলিবেন। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এ রসের আশ্রয় কে? আঙুর? না রমেন্দ্র? না রমেন্দ্রের স্ত্রী? ইহাদের কাহার মধ্যে

নাট্যকলা ও রসসৃষ্টি

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এই কথানাট্যগুলি সকলই আদিরসাশ্রিত। কিন্তু যেখানে কামের ক্রীড়া, সেখানেই যে আদিরস ফোটে, তাহা নয়। আর কাব্যে বা নাট্যে কেবল রস থাকিলেই হয় না, সে রস সাকার, মূর্ত্তিমান হওয়া আবশ্যক। অমূর্ত্ত রসকে মূর্ত্তিমান, নিরাকার ভাবকে সাকার করিয়া তোলাই কাব্যের লক্ষ্য। আর যে কাব্যে বা নাট্যে যে রসকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলে, তাহাকে সেই রসাশ্রিত-কাব্য বা নাট্য বলা যায়। যাহাতে আদিরসের মূর্ত্তি ফোটে, তাহাকে আদিরসাশ্রিত কহে। কালিদাসের "শকুন্তলা" আদিরসাশ্রিত। প্রীতি ইহার মূল রস। এইজন্য দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা দুইজনাতেই আদিরসের একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটিয়াছে। ভবভূতির "উত্তররামচরিত" আদি-

---

আদিরসের মূর্ত্তি ফুটিয়াছে? আঙুর রমেন্দ্রকে ভালবাসে না। সে এককালে আর একজনকে ভালবাসিত। সেই অবর্ত্তমান আশ্রয়কে ধরিয়াও তার রস মূর্ত্তিমান হইতে পারিত। কেবল মিলনের আনন্দেই যে আদিরসের মূর্ত্তি ফোটে, তাহা নহে; বিরহের নিরাশা ও নিরানন্দে বোধ হয় আরও বেশী ফুটিয়া উঠে। "মেঘদূতে" যক্ষের অবর্ত্তমানেই যক্ষপত্নীর মধ্যে আদিরসের একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটিয়াছে। "উত্তররামচরিতে" ভবভূতি দণ্ডকারণ্যে সীতাবিরহ-ক্লিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে এই রসের একটি অপূর্ব্ব রূপ ফুটাইয়াছেন। কিন্তু একদিন যাহাকে ধরিয়া আঙুরের রস ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল, এখানে সে কেবল অবর্ত্তমান নয়, সে অদৃশ্য হইয়া বিরহের দ্বারাও আঙুরকে অধিকার করিতে পারে নাই। এ নাট্যে সে রসের চিহ্নমাত্রও নাই। তার একটা ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র, বহুদিনের পূর্ব্বকার নিশাশেষের সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মতন, মাঝে মাঝে আঙুরের প্রাণে ভাসিয়া উঠে। সে স্মৃতি তাহাকে দখল করিতে পারে নাই। সে রস আঙুরকে গ্রাস করে নাই। আর রসবিশেষ যতক্ষণ আপনার আধারকে একেবারে গ্রাস করিতে না পারে, ততক্ষণ তার মূর্ত্তি গড়ে না। আঙুরের মধ্যে বারবনিতাবৃত্তির একটা মামুলী অতৃপ্তি মাত্র দেখি। এই অতৃপ্তির আশ্রয়েও একটা অপূর্ব্ব করুণ-রস ফুটিয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু লেখকের অক্ষমতা-নিবন্ধন তাহাও ফোটে নাই। আঙুরে কি আদি, কি করুণ, কোনও রসই

রসাশ্রিত, শ্রীরামচন্দ্রেতে এই রস মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। দুষ্মন্ত ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কত বৈষম্য, কত বৈচিত্র্য, দুই যে একই রসমূর্ত্তি সহজে এমনটা নাও বা মনে হইতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের, নায়কধর্ম্মের সঙ্গে রাজধর্ম্মের বিরোধ দেখিতে পাই। আর দুইজনে এই বিরোধের মধ্যে মাধুর্য্যের দুইটি মূর্ত্তি ফুটাইয়াছেন। শেক্ষপীয়ারের "রোমিও-জুলিয়েট", "ওথেলো," "হ্যামলেট," প্রভৃতি আদিরসাশ্রিত; আর এই নাটকগুলির প্রত্যেক নায়ক ও নায়িকা এক একটি রসমূর্ত্তি হইয়া, এই অনঙ্গ রসকে পুষ্টাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ" কৃষ্ণকান্তের উইল", এগুলি আদি-রসাশ্রিত। আর "চন্দ্রশেখরের" শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর নিজে; "বিষবৃক্ষের" নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি, হীরা, দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত—এক একটি রসমূর্ত্তি হইয়া ফুটিয়াছে, ইহারা সকলেই এই উন্নতোজ্জ্বল রসের বিবিধ বিলাসদেহের সৃষ্টি করিয়াছে। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী তিনটিই আদি-

---

ফোটে নাই, দু'য়েরই একটা কল্পিত আবছায়া মাত্র দেখা যায়। ইহাতে রস ফোটে নাই, রসাভাস মাত্র দেখা যায়: ফলতঃ আঙুরে কোন মৌলিকতাও নাই। পৌষের "নারায়ণে" "ডালিম" নামে যে ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, "আঙুর" সেই "ডালিমে"রই একটা ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। দু'য়ের আকার ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপ এক। আর ঐ ডালিমের আবছায়াটুকুই আঙুরের যা কিছু মিষ্টত্বের ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর রমেন্দ্রের কথা। রমেন্দ্রকেই কি আদিরসের মূর্ত্তি বলা যায়? রমেন্দ্রের সে অনুরাগ কৈ? তার মধ্যে কামোন্মাদই বা ফুটিয়াছে কৈ? রমেন্দ্রের মধ্যে একটা নেশার ঝোঁকই কেবল ফুটিয়াছে, কোনও রস আদৌ ফোটে নাই। এই নেশাতে যদি আঙুরকে বা তার নিজের স্ত্রীকে কোনও বিশিষ্ট রসমূর্ত্তিরূপে ফুটাইতে পারিত, তাহা হইলে এই নাট্যে, এই মাতাল-চিত্রেরও একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু তাহাও ত দেখা যায় না। তারপর, রমেন্দ্রের স্ত্রী। তাহার মধ্যেই বা কোন্ রস প্রত্যক্ষ হয়? আঙুর, রমেন্দ্র, রমেন্দ্রের স্ত্রী, তিন জনের মধ্যেই একটা

রসের মূর্ত্তি। চন্দ্রশেখরও যে আদিরসের মূর্ত্তি হঠাৎ তাহা মনে নাও বা হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন রসতত্ত্ববিদেরা যে চতুর্ব্বিধ নায়কের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রেণীবিভাগ দিয়া বিচার করিলে, প্রতাপকে আদিরসের ধীরোদাত্ত এবং চন্দ্রশেখরকে ধীর-শান্ত মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হইবে। বারবনিতাকে আশ্রয় করিয়াও যে অতি শ্রেষ্ঠ আদিরস ফুটিতে পারে, গীরিশবাবুর "বিল্বমঙ্গল" তার সাক্ষী। এখানে আমি কৃষ্ণ-ভক্ত বিল্বমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না, কিন্তু চিন্তামণি-প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গলের কথাই বলিতেছি। বিল্ব-মঙ্গল যদি ভক্তরূপে ফুটিয়া নাই উঠিতেন, তাহাতেও তাঁর এই অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি অপূর্ণ থাকিত না। হয় ত বা তাহা হইলে, "বিল্বমঙ্গল" নাট্য হিসাবে, রস-চিত্র হিসাবে, বর্ত্তমান "বিল্বমঙ্গল" অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত। পরিণামে ভক্তপ্রধানরূপে পরিণত হইয়া, বিল্ব-মঙ্গল, সত্য অনুরাগ ও প্রেমবস্তু যে আধারে বা যে আশ্রয়েই ফুটুক না কেন, তাহা বস্তুতঃ ও স্বরূপতঃ যে এক, ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। এটি

স্বল্পাধিক বলবতী কাম-প্রবৃত্তির বা sex-impulseএর আভাস পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ জীব-ধর্ম্ম মাত্র। এই জীব-ধর্ম্ম যখন কোনও জীবকে গ্রাস করিতে পারে, তখনই কামোন্মাদ জন্মে। তাহাও একটা রস-মূর্ত্তি। কিন্তু এই মূর্ত্তিই বা ইহাদের মধ্যে ফুটিয়াছে কৈ? আঙুরের সঙ্গে আর দশজন বারবনিতার কোনও পার্থক্য আছে কি? রমেন্দ্রের সঙ্গে তার সম-সামাজিক অবস্থার আর দশজন মাতালের প্রভেদ আছে কি? আর রমেন্দ্রের স্ত্রীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাতেই বা কোনও বস্তুতন্ত্রতা আছে কি? আঙুর ও রমেন্দ্র চিত্র নহে, ফটোগ্রাফ মাত্র। রমেন্দ্রের স্ত্রী চিত্র বটে, কিন্তু কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত, বস্তুতন্ত্রহীন। যে রসের দ্বারা ফটোগ্রাফ চিত্রে পরিণত হয়, সে রস আঙুরে বা রমেন্দ্রে নাই। যে বস্তু দ্বারা রস সত্য হয় সে বস্তুও রমেন্দ্রের স্ত্রীর মধ্যে নাই। এই জন্যই এই তথাকথিত কথা-নাট্যে কোনও রসের রূপ ফোটে নাই। তারপর এই নাট্যের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে সেই সেই দৃশ্যের কর্ম্মের, সেই সকল দৃশ্যের ও কর্ম্মের সঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের, এবং এ

প্রমাণ না করিলে, মধ্যযুগের মায়াবাদী ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হইত না, ইহা বুঝি। কিন্তু চিন্তামণির ভজনায় বিল্বমঙ্গলের যে অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল, ভক্তমূর্ত্তি বিল্বমঙ্গলে তাহাই কেবল শুদ্ধ ও মার্জ্জিত হইয়াছে মাত্র, তার গঠনের বা উপাদানের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু "নারায়ণের" এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিতে কোনও বিশিষ্ট রসমূর্ত্তি ফোটে নাই। এগুলিতে রসের কথা আছে, কিন্তু রস নাই। রসের ঢং আছে, কিন্তু রূপ নাই। রূপের ছায়া আছে, কিন্তু বস্তু নাই। আর ইহাদের মধ্যে কোনও রসের রূপ ফোটে নাই বলিয়াই, ইহাদের স্বরূপেরও কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বরূপের পরিচয় যার নাই, তার সত্য-সমালোচনা করা অসাধ্য।

ধর্ম্ম ও নীতির বিচারে "নারায়ণের" কথানাট্য

তথাপি এই হেয় ও অযোগ্য রচনাগুলির এমন সুদীর্ঘ সমা-

সকল চরিত্রের একের সঙ্গেও অন্যের কোনও অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। প্রথম দৃশ্যে গোলাপগাছ পুড়িয়া গেল। এই গোলাপগাছের ধ্বংসের সঙ্গে নাট্যের কোনও ঘটনার আন্তরিক সম্বন্ধ নাই। বাসন্তী রজনী, পূর্ণিমার চাঁদ, চূতগন্ধ, ফুলের বাগান, এ সকল আদিরসের মামুলী অবলম্বন। এ সকলে বিরহিণীর বিরহ-জ্বালা বাড়াইয়া দেয়। রমেন্দ্রের স্ত্রী বিরহিণী। এ সকল বুঝা যায়। কিন্তু গোলাপগাছটি পুড়াইবার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? আর রমেন্দ্রের স্ত্রীর যে অবস্থা,—যে পরিবারে সে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তার এই গোলাপগাছ "অমন সাধের"ই বা হইল কিসে? কোন্ চিত্রকে বা ভাবকে ফুটাইবার জন্য লেখক এখানে গোলাপ গাছটি আনিয়াছেন, কেনই বা তাহাকে পুড়াইয়া মারিলেন ইহার মর্ম্মবোধ হয় না। হয় ত তিনি বলিবেন যে একটা প্রতীক বা symbol রূপে এটিকে আনিয়াছেন। রমেন্দ্রের স্ত্রী যে শেষে পুড়িয়া মরিবে, তার পূর্ব্বাভাস দিয়া লেখক খুব একটা কাব্য-কৃতিত্ব ফুটাইয়াছেন, কেহ হয় ত এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু কাব্যকলায় প্রতীকের বা symbol-এর প্রতিষ্ঠা হয়, মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনে। এখানে সেরূপ কোনও প্রয়োজন বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধ ফুটিয়াছে কৈ? এই গোলাপগাছের উপরে অত ঝোঁক যে কেন দেওয়া হইল, ইহার এরূপ কোনও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার অন্য কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে এপর্য্যন্ত প্রায় কেহই শুদ্ধ নাট্য-কলার বা সাহিত্য সৃষ্টির দিক্ দিয়া এগুলির কোনও বিচার করেন নাই, কেবল তথা-কথিত ধর্ম্মের ও নীতির দোহাই দিয়াই ইহাদের এমন নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ফলতঃ এগুলি এ নিন্দাবাদেরও যোগ্য নহে। আর যাঁহারা ধর্ম্মের ও নীতির নামে ইহাদের অমন নিন্দা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও কোথায়, কি ভাবে যে ইহাদের দ্বারা লোকের ধর্ম্মের হানি বা নীতির ভিত্তি শিথিল হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। অথচ এইরূপ নিন্দাবাদের দ্বারাই সাহিত্য-সমালোচনার সত্য আদর্শকে নষ্ট করা হয়। সেই আদর্শকে রক্ষা ও প্রস্ফুট করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনানুরোধেই এমন অযোগ্য রচনা লইয়া এত কথা বলিতে হইতেছে।

ধরিয়া লইলাম রমেন্দ্রের স্ত্রী গোলাপগাছ ভালবাসিত। কিন্তু তার আরও বহুতর ভালবাসার বস্তুও থাকিতে পারিত, হয় ত নিশ্চয়ই ছিল। সে হয় ত আমচুর ভালবাসিত; মিনি বিড়াল ভালবাসিত; পাড়ার নাপিত-বউয়ের কচি ছেলেটিকে ভালবাসিত। এত সব ভালবাসার বস্তুর সম্ভাবনা থাকিতে, গোলাপটিকে বাছিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? এটি না হইলে নাট্যের অধ্যাত্মিকার বা কোনও চরিত্রের বিকাশের ব্যাঘাত হইত কি? প্রথম দৃশ্য হইতে এই গোলাপ-পুড়ান ব্যাপারটি বাদ দিলে নাট্যের কোনও অঙ্গহানি হয় না। আর এই গোলাপ-পুড়ানতেও লেখক একটা সামান্য সঙ্গতি পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই। প্রথম দৃশ্যের বর্ণনায় আছে—"বহ্নি সুন্দর মুকুলবেষ্টিত গোলাপবৃক্ষকে গ্রাস করিতে ধাইয়াছে"; আর পরে, রমেন্দ্র যখন হীরার হার লইয়া চলিয়া গেল, তখন তার স্ত্রী বলিতেছে—"শুকন গোলাপের গাছশুদ্ধ ছাই হয়ে গেল।" এ সকল দেখিয়া এই মনে হয় যে লেখক তাঁর নাট্যের কোনও অন্তরঙ্গ প্রয়োজনে এ সকলের সমাবেশ করেন নাই—কোনও অন্তরঙ্গ প্রয়োজনের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁর নাই—কেবল কতকগুলি চুট্‌কি ও চটক্‌দার বোল ঝাড়িবার জন্য, যখন যেখানে যে দৃশ্যের অবতারণা আবশ্যক হইয়াছে, তখনই সেখানে তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। মাতালেরা প্রায়ই বড় অদ্ভুত রসের কথা বলে।

ফলতঃ এগুলি পড়িয়া কাহারও যে অধর্ম্মে মতি জন্মিতে বা বাড়িতে পারে, এমন মনেই হয় না। যে সাহিত্যে পাপের চিত্রকে মোহিনী-বেশে লোকসমক্ষে উপস্থিত করে, তাহারই দ্বারা এ অধর্ম্ম হইবার আশঙ্কা থাকে। অতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও এসকল বিপদের ভয় থাকিতে পারে। কিন্তু এই তথা-কথিত কথা-নাট্যগুলির আর দোষগুণ যাহাই থাকুক বা না থাকুক, এগুলির মধ্যে একটিও পাপের বা দুর্নীতির মোহিনী-মূর্ত্তি ফোটে নাই। "মরণের জয়" পড়িয়া আঙুরের চরিত্রকে যাঁরা বেশ ফুটিয়াছে মনে করিবেন, তাঁদের মনেও বারাঙ্গণাবৃত্তির জ্বালার ভাবই জাগিবে, বারাঙ্গণার মৌখিক প্রীতির হীনতাবোধই প্রবল হইবে, এই চিত্র তার প্রতি কোনও

"বাঃ মাকড়া তুই যে খুব জাল বুনছিস্‌···এই যে তুমিও কি জাল বুন্‌তে এলে নাকি ?" রমেন্দ্রের মুখে এই চটকদার কথাটা দিবার জন্য তার বসিবার ঘরের দৃশ্যে—আবর্জ্জনা, ধূলা, জানালার মাকড়সার জাল-বুনা আনিতে হইয়াছে। কিন্তু রমেন্দ্র মদই খায়, টাকারও অভাব তার নাই, বাড়ীতে চাকর-বাকরেরও অভাব নাই। তার প্রতি তার স্ত্রীর অনুরাগের, কিম্বা তার উপরে তার মার স্নেহের অভাব নাই। সে যখন বাড়ীতে থাকে ঐ বাহিরের ঘরেই ত পড়িয়া থাকে। তার দু'পাঁচজন বন্ধুবান্ধবও ত আছে। তার মতন লোক নিঃসঙ্গভাবে থাকে না। এ অবস্থায় তার বসিবার ঘরের এ দৃশ্য কল্পনাতীত। ছেঁচ্‌কা মাতালের খোলার ঘরে এরূপ হওয়া কেবল সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রমেন্দ্র ত সে শ্রেণীর নয়। রমেন্দ্র ত নর্দ্দামায় গড়াগড়ি দেয় না। সে ত নীচশ্রেণীর কামুক বা মাতাল নহে। রমেন্দ্রকে লেখক পশু করিয়া আঁকেন নাই। সে সৌখিন। সে ভাবুক। সে রূপ-পিয়াসু। তার বসিবার ঘরের সঙ্গে এসকলের সঙ্গতি কৈ ? ফলতঃ এই তিন-খানি তথা-কথিত কথা-নাট্যেই এই চুট্‌কি ও চটকদার কথা বলিবার ও সাজাইবার প্রয়াসই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফুটিয়াছে। এই "মরণের জয়ে" এরূপ কতকগুলি কথা ছাড়া আর কিছু ফোটে নাই। আঙুর একটু ফুটিয়াছে রমেন্দ্রের স্ত্রী একটুও ফোটে নাই, আর্টের হিসাবেও ফোটে নাই, আদর্শের হিসাবেও ফোটে নাই। রমেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যুতেও কোনও কিছুই ফোটে নাই।

লোভ জন্মিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। "আঁধার ঘরে" কাদম্বিনীর চরিত্রটি প্রথমে একটু মিষ্ট লাগে, সত্য; কিন্তু ক্রমে তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিও একটা গভীর বিতৃষ্ণার উদয় হয়। "হাসির দামে"ও এমন কিছুই নাই, যাহাতে কাহারও মনে কোনও পাপ-প্রলোভনের উদ্রেক হইতে পারে। ফলতঃ এসকল প্রলোভনের আশঙ্কা অনেক সর্ব্বজনপ্রশংসিত সাহিত্যে যতটা দেখিতে পাওয়া যায়, এসকল নিকৃষ্ট সাহিত্যে প্রায়ই তত থাকে না। আর এই তথাকথিত কথানাট্যগুলির অপর দোষগুণ যাই থাকুক বা না থাকুক, এগুলিতে পাপের মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য কোনও আগ্রহ বা চেষ্টা পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং অন্যদিকে লেখক প্রাণপণ করিয়া পাপের প্রতি একটা অপ্রবৃত্তি ও ঘৃণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা তাঁর নিষ্ফল হইয়াছে। সে চেষ্টা না করিলে, আর যাহাই হউক না কেন, সম্ভবতঃ তাঁর চিত্রগুলি বস্তুতন্ত্র হইতে পারিত। কিন্তু এখানে

আর রমেন্দ্রের শ্বশুর বেচারীকে কেন যে আনিয়া পুড়ান হইল, তাহারও কোনও হদিস পাওয়া যায় না। রমেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যুতে "মরণের জয়" কোথায় হইল, তারও কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল কতকগুলি বক্তৃতা করিবার অবসর পাইবার জন্যই যেন এই স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করিয়াছে। এখানে দৃশ্যের, ঘটনার, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের পরস্পরের সঙ্গে কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের, কোনও ঘাত-প্রতিঘাতের, এবং যে সকল উপকরণে নাট্য-কলা গড়িয়া উঠে, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই যতই চটক্‌দার কথার বুক্‌নি থাকুক না কেন, এই তথাকথিত কথা-নাট্যে সাহিত্য-সমালোচনার ভূমি প্রস্তুত হয় নাই, ইহা সে সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার কোনওরূপ যোগ্যতা লাভ করে নাই।

তারপর "আঁধার ঘরে"। এখানি এই তথাকথিত কথা-নাট্যগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানি পড়িতে যাইয়া, প্রথমেই একটা চটক্ লাগে। প্রথম-দৃশ্যটির সূচনাতে মনে হয় এখানি বুঝি অতি উচ্চ-গ্রামে যাইয়া পৌঁছিবে।

ধর্ম্ম ও নীতির মান রাখিতে যাইয়াই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি আত্মঘাতী পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে। এই জন্মই এগুলি উভয়ভ্রষ্ট হইয়া সাহিত্যে ছিন্নাভ্রের মতন অসম্বদ্ধ ও অসংলগ্ন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আমার মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া যে পরিমাণ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিবার আশঙ্কা আছে, এই তথাকথিত কথা-নাট্য-গুলিতে তার শতাংশের একাংশও নাই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শকে সর্ব্বদাই লোকচক্ষে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর "বিষবৃক্ষে" সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিত্র, নীতি বা ধর্ম্মের হিসাবে নয়, কিন্তু কেবল চিত্রের হিসাবে, কুন্দনন্দিনীও নহে সূর্য্যমুখীও নহেন, কিন্তু হীরা এবং কমলমণি। আর কমলমণির মধ্যে মাধুর্য্য

সূচনায় একটা শ্রেষ্ঠ রস যেন স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু সেই দৃশ্যের মাঝা-মাঝি তাহা উভিয়া যাইতে আরম্ভ করে। "আঁধার ঘরে" যে আদি-রসাশ্রিত নাট্য, এ কথা স্বীকার করা যায় না। কাদম্বিনী ইহার নায়িকা, শেখর নায়ক ও রাজচন্দ্র প্রতিনায়ক। এই তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই এই নাট্যখানি গড়িবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে যে শ্রেষ্ঠ আর্টের আভাস জাগিয়াছে, তাহা ফোটে নাই, সে আদর্শে বিচার করিলে, ইহার গুণের ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগ অতিমাত্রায় বাড়িয়া পড়ে। কাদম্বিনীর চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। মানব চরিত্রের জটিলতার অজুহাতেও এ অসঙ্গতির সমর্থন করা যায় না। কারণ এই জটিলতার মধ্যেও একটা একত্ব, পূর্ব্বাপরের মধ্যে একটা গভীর অঙ্গাঙ্গী বা organic যোগ থাকে। সকল সময় লোকে এই যোগটিকে ধরিতে পারে না। আর যাহা আপাতত অত্যন্ত স্ববিরোধী ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যেও যে একটা একত্ব ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা ফুটাইয়াই শ্রেষ্ঠ আর্টের কৃতিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখক এক্ষেত্রে কাদম্বিনীর চিত্রাঙ্কনে এইটি একেবারেই করিতে পারেন নাই। এইজন্য কাদম্বিনীর চিত্রটি প্রথমে মিষ্ট লাগিলেও, শেষে সে রস থাকে নাই। আর্টের ওজনেও ইহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। কাদম্বিনী প্রথমে যে ভাবে

আছে, মিষ্টত্ব আছে, স্নিগ্ধতা আছে ; কিন্তু হীরাতে "প্রখরে মধুরে" মিশিয়াছে। এই জন্যই হীরার অমন উৎকৃষ্ট, অমন মোহিনী রূপও ফুটিয়াছে। হীরার মধ্যে খর স্রোতধারের ন্যায় একটা সর্ব্বগ্রাসী প্রবৃত্তি ফুটিয়াছে। তাহার উপেক্ষার মধ্যে একটা passion, কঠোর সংগ্রামের মধ্যেই একটা abandon দেখি, যাহা অপর কাহারও মধ্যে নাই। আর এই বস্তুটিই ত মানুষের প্রাণকে টানে। এই জন্যই হীরার একটা প্রলোভন জাগাইবার শক্তি আছে। "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র মোহিনা রোহিণী ; ভ্রমর তার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই জন্য "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র মধ্যেও অধর্ম্মের বা দুর্নীতির প্রলোভন জাগাইবার একটা আশঙ্কা আছে।

আসিয়া দাঁড়াইল, শেখরের প্রবেশে তাহার সত্যতা বঞ্চিত হইল না। শূন্য হৃদয়ের হাহাকারে একটি শক্তিশালিনী রসিকা রমণীর যে অবস্থা হয়, প্রথমে কাদম্বিনীতে তাই দেখি। কাদম্বিনীর ঐ সকল হাল্কা রসের ভিতরে একটা গভীর টান আছে, তাহা বেশ বুঝি। এই বৈচিত্র্যটি, এই ভিতরে জ্বালা বাহিরে ক্রীড়াশীলতা, এই দৌর্ভাগ্য এবং অন্তর্জ্বালাকে হাসিয়া উড়াইবার ভাবটা বড় মিষ্টি। এখানে পিপাসা আছে, কিন্তু আত্মস্থতাও আছে। এ আত্মস্থতা ক্রমে থাকিবে না, ইহাও বুঝি। থাকিবে না যে, তার প্রমাণ এই হাসি-কান্নার ভিতরেই লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে ভাবে এটি গেল, তাহা অস্বাভাবিক, তাহাতে চরিত্রের একত্ব, চিত্রের পূর্ব্বাপরের সঙ্গতি নষ্ট হইল। কাদম্বিনী একদিকে শেখরকে দুয়ার খুলিয়া দিবে না বলিতেছে। আবার অন্যদিকে তার কামকে প্রদীপ্ত করিবার জন্যও যেন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

—"না খুল্‌ব না, তুমি কেমনতর মানুষ গা? না মিন্‌সে বড় বজ্জাত বাপু। কিন্তু তাই ত···আচ্ছা আমি একলা বুকে হাত দিয়ে শুয়ে থাকি, তায় তোর মাথার টন্‌ক নড়ে কেন?"

আবার—"আমি একলা ঘরে, একলা, খালি বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে থাকি, তোমার কি এই উচিত?"

এ ত সে কাদম্বিনী নয়, যার চিত্র ও চরিত্র প্রথমে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে দেখা

এমন কি অমন যে বিশুদ্ধ উপন্যাস "আনন্দমঠ" তার মধ্যেও দুই একটি দৃশ্যতে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিতেও বা পারে। জীবানন্দের ও নবীনানন্দের রস-লীলার ছবি এপক্ষে নিতান্ত নিরাপদ নহে। নীতি-বাদীরা বহু বহু দিন পূর্ব্বে এইজন্য "আনন্দমঠে"র তীব্র সমালোচনাও করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই তথাকথিত কথা-নাট্যগুলিতে অমন কিছু নাই, যাহাতে ভালমন্দ কোনও প্রবৃত্তিকে জাগাইতে পারে। এগুলি গ্রাম্য—vulgar মাত্র। ভক্তি-সাধনে এ সকল গ্রাম্যতা বর্জ্জনীয় বটে: কিন্তু তথাকথিত ধর্ম্মের বা নীতির খাতিরে নহে, শুদ্ধ আর্টের খাতিরে। এ সকল গ্রাম্যতা বা vulgarity মানুষের কল্পনাকে পঙ্গু করে, তার ভাবাঙ্গ-গঠনের শক্তিকে নষ্ট করে, রসাভাস হইতে রসকে পৃথক্ করিবার

দিল একটি পূর্ণ যৌবনভার-ক্লিষ্ট, উদ্দামপিপাসা-জর্জ্জর, নিঃসঙ্গ, দরিদ্র পুরস্ত্রীর বেশে। আর হঠাৎ শেখর আসিবামাত্র সে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, কাদম্বিনী একেবারে বারাঙ্গনা-সুলভ হাবভাব ধারণ করিল! শেখর নূতন নাগর নহে। কাদম্বিনীর বাল্য-সহচর। স্বামী বিদেশে গেলে দীর্ঘকাল এই শেখর কাদম্বিনীর কাছে যাতায়াত করিয়াছে। কিন্তু তার সতীত্ব-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্ম নষ্ট করে নাই। সেই শেখর আসিবামাত্র আজ কাদম্বিনী অমন করে কেন? ঝড়-বাদল কি আর আগে ওদেশে হয় নাই? তার পরে কথায় কথায় এক হাতে শেখরকে বারণ করিতেছে, আবার কেবলি মুখে বলিতেছে—"অ্যাঃ তুমি বড্ড সোন্দর।" "উঃ তুমি যে বড্ড সোন্দর, বড্ড সোন্দর, ওগো! তুমি যাও, যাও, যাও, আমার মাথা কেমন করছে, আমি কি করব, আমি কি করব, শেখর!" গৃহস্থ বধূ, বিশেষ আমাদের দেশে, হঠাৎ অমন বেলেল্লা, অমন নির্লজ্জ হয়, বা হইতে পারে কি? অন্ততঃ প্রথমে কাদম্বিনীকে যাহা দেখি, তার পক্ষে এটি আদৌ সম্ভব কি? মোট কথা এই মনে হয় যে, এই লেখক কেবল বারবনিতার কথাই জানেন, গৃহস্থের ঘরের কথা জানেন না। তাই "মরণের জন্যে" রমেন্দ্রের স্ত্রীকে আঙুরের প্রতিনায়িকারূপে আঁকিতে যাইয়া, বস্তুতঃ—কার্য্যে নয় কিন্তু কথায়-বার্ত্তায় ও হাবভাবে—বারবনিতা সাজাইয়াছেন। "আঁধার ঘরে" গরিব কাদম্বিনীকেও সেই সাজই পরাইয়াছেন। তিনি এখানে পল্লীচিত্র আঁকিবার ছল করিয়াছেন; কিন্তু চটি, চূণী, বটগাছ, গড়ের ঘর, এ সকলের মধ্যেও প্রকৃত

বিচারবুদ্ধিকে ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেয় না। আর এইরূপ ভাবাঙ্গ স্ফুরণের বা idealisationএর ব্যাঘাত দেয় বলিয়াই, ভক্তি-পথের পথিকের পক্ষে এসকল গ্রাম্যতা বা vulgarity বিষবৎ বর্জ্জন করা অমন প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তির এ আপত্তি ও অভিযোগ ফলতঃ আর্টেরই, তথাকথিত ধর্ম্মের বা নীতির নহে। সেরূপ বিচারে সহিত্যের আদর্শ মলান হয় না, আরও উজ্জ্বল হইয়াই উঠে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের বা নীতির দিক্ দিয়া এই তথাকথিত কথা-নাট্যগুলি কোনও প্রকারে অনিষ্টকর হইয়াছে বা হইতে পারে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারি না। ললিতকলার দ্বারা লোকের সমাজ-দ্রোহী ইন্দ্রিয়-লালসা উত্তেজিত হইতে পারে, ইহা জানি। এমন সকল চিত্র, ভাস্কর্য্য, কাব্য, নাট্য, সংগীত অনেক আছে, যাহার

পক্ষে সহরের বারবনিতা সমাজের পরিচিত দৃশ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তাই ঐ চটির অধিকারিণী, চূনীতীরবাসিণী কাদম্বিনী কেবল কলিকাতার কবিতা-আবৃত্তি-পরায়ণা অভিনেত্রীদের কথা কপ্চায় নাই; কিন্তু রাজচন্দ্রের টাকা দেখিয়া বলিতেছে—"কি আশ্চর্য্য, অত টাকা, অবাক্ করেছে, এ যেন আলাদীনের পিদ্দীম!" "মরণের জন্যে"ও রমেন্দ্রের স্ত্রীর মুখে বিস্তর কাব্য-কলা ফুটিয়াছে। এখানে "কাদী"ও এই কলাভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর স্থানে স্থানে এ কলার-বোঝা কোথা হইতে সংগৃহীত, তারও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

তার পর, "হাসির দাম"। এই তথা-কথিত কথা-নাট্যেরও কোনও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা স্বরূপ ফোটে নাই। ইহা যে কোন্ রসাশ্রিত, তাহাও বলা কঠিন। আপাতত মনে হয়, "চন্দনা" ও "মন্মথই" ইহার মূল চরিত্র। কিন্তু অপরাপর চরিত্রগুলি ইহাদের সঙ্গে কেবল বাহিরের সম্বন্ধ বা ঘটনার দ্বারাই যুক্ত হইয়াছে, কোনও রূপেই ইহাদের প্রকৃতির নিগূঢ় ধর্ম্মটিকে ফুটাইয়া তোলে নাই। নাট্যো-ল্লিখিত ব্যক্তিগণের অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইবার জন্যই,—ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্রের ও প্রকৃতির ভিতরে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া নাট্যবিশেষকে আপনার বৈশিষ্ট্যলাভে সাহায্য করে, সেই সকল পরিবর্ত্তন কেন হইল, তার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই নাট্যের ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়। কিন্তু এই কথানাট্যের মধ্যে যেসকল ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের ও ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা

দ্বারা অতি ধীর ব্যক্তিরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সে-সকল অতি সুনিপুণ সৃষ্টি। লৌকিক ধর্ম্মের বা নীতির বিচারে যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়া তারা জগতের অমূল্য সম্পত্তি। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলার প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি পড়িয়া মুনিজনেরও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য জন্মিবার আশঙ্কা আছে। আর জোলার রসমূর্ত্তি-রচনার অলোকসামান্য নিপুণতাই এই অমঙ্গলের নিদান। এই জাতীয় বাস্তবতা অন্য হিসাবে যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, চিত্র-নৈপুণ্যের হিসাবে, ললিত-কলার বিচারে, রস-তত্ত্বের আলোচনায় অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। জোলা রক্তমাংসই কেবল আঁকিয়াছেন। এই রক্তমাংসের যে কত রূপ, কত রস, কত আনন্দ, কত উন্মাদনা, তাহাই দেখাইয়াছেন। এর ভিতরে যে অতীন্দ্রিয় রস আছে, যার গুণে এই রক্তমাংস এমন মিষ্ট, জোলা তাহাকে ফুটাইতে যান নাই। তাহা হইলে তাঁর রস-সৃষ্টি পূর্ণতালাভ করিত। কিন্তু ইহ-সর্ব্বস্ব, নাস্তিক্য-বুদ্ধিপ্রবণ, সমসাময়িক ফরাসী সমাজের মতিগতির সঙ্গে যে অতীন্দ্রিয় রসের সঙ্গতি

ইহার বাহিরের ঠাট্‌টা মাত্র গড়িয়াছে, গল্পাংশটি মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঘটনাবলির পৌর্ব্বাপর্য্যমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও চরিত্রের উন্মেষ হয় নাই। চন্দনা, মন্মথ, বিবজ্রা, অন্ধ-বৃন্দ, সকলে প্রথমে যেমনটি ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তেমনিই থাকিয়া গিয়াছে। এই জন্যই ইহাতেও কোনও অঙ্গাঙ্গী, কোনও organic সম্বন্ধের প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর রসের হিসাবে, এখানেও কোনও রসই ফোটে নাই। পড়া শেষ হইলে কেবলমাত্র একটা ন্যক্কারজনক ভাবের আমেজ মনে থাকিয়া যায়, কিন্তু কি আদি, কি বীভৎস, কোনও রসই জাগে না। পথে চলিবার সময় হঠাৎ একটা পচা জন্তুর বা পুরীষস্তূপের উপরে পা পড়িলে, শরীরে যে ভাব জন্মে, এই "হাসির দামে"ও মনোমধ্যে ঠিক সেই ভাবই জন্মে। ইহাকে যদি কেহ বীভৎস বলিতে চাহেন, বলুন। কিন্তু আমি ইহাকে বীভৎস রসও বলিতে পারি না। কারণ হাস্যোদ্ভূত-করুণ-রুদ্র প্রভৃতি একটা বিশেষ প্রগাঢ় ও গভীর অবস্থালাভ না করা পর্য্যন্ত রস-পদবাচ্য হয় না।

হইত না। লোকে তাহা ধরিতে ও বুঝিতে পারিত না। যে প্রতিক্রিয়া-মুখে ইউরোপে ক্রমে আধুনিক Impressionist-আদর্শের বা ভাব-বাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, উনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর প্রথমে ও মধ্যভাগে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সাধনা পাপ বলিয়া এই রক্তমাংসকে একেবারে নিষ্পেষণ, এই সংসার ও মানবীয় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফুরণকে বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল। মধ্যযুগের খৃষ্টীয়ান্ ঈশ্বরতত্ত্ব নিতান্ত অতীন্দ্রিয় ও নিরাকার; মধ্যযুগের ধর্ম্ম একান্ত সংসার-বিমুখ ও সন্ন্যাস-প্রধান; মধ্যযুগের নীতি অত্যন্ত অন্তর্মুখীন এবং মানব-প্রকৃতির সহজ-স্ফুর্ত্তির বিরোধী হইয়া, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্ববিধ প্রয়াসের বস্তুতন্ত্রতা নষ্ট করিয়াছিল। বিমানচারিণী কল্পনা মানবজীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল বাধা ও বন্ধনে মানুষের মর্ম্ম নিপীড়িত ও জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক জড়বাদ, সন্দেহ-বাদ, নাস্তিক্য-বাদ, প্রত্যক্ষ-বাদ, অজ্ঞেয়তা-বাদ,—ধর্ম্মেতে ও তত্ত্বেতে; আধুনিক রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রতা—সমাজ-জীবনে; আধুনিক বাস্তবতা বা realism—সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে,—একটা নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়া, ইউরোপের মানব-প্রকৃতিকে ধর্ম্মের নামে প্রচারিত মধ্যযুগের মর্ম্মঘাতী বন্ধনজাল হইতে মুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে। এই বিদ্রোহ, এই প্রতিক্রিয়া, এই দেহসর্ব্বস্বতা, এই ইহলোকতন্ত্রতা মুক্তির প্রয়োজনেই ইউরোপে আপাত-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এ ভাঙ্গা ইউরোপের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। আর জোলা, টলষ্টয়, ইব্‌সেন্, বার্ণাড্ শ' প্রভৃতি আধুনিক যুগের ইউরোপীয় সাহিত্য-সেবীগণ এই কাজটি

বিশেষতঃ নাট্যকলার কেবল রসের আব-হাওয়া প্রস্তুত করে না, রসের মূর্ত্তি গড়িয়া তোলে। অমূর্ত্ত, নিরাকার রস বা রসাভাসের দ্বারা নাট্য রচিত হয় না। এই কারণে এই "হাসির দাম"ও প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইতে পারে না।

করিয়াছেন ও করিতেছেন। মানুষের রক্তমাংস, কেবল রক্তমাংসরূপেই, কোনও প্রকারের অতীন্দ্রিয় রসাশ্রিত না হইলেও যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর; এগুলি যে, রক্তমাংসরূপেই, মানবজীবনের সার্থকতা সাধনের একটা অতি শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইহারা যে ঘৃণ্য বা বর্জ্জনীয় নহে; দেহের স্বাস্থ্য, শক্তি, সৌন্দর্য্যসাধন, শারীর উৎকর্যের যথাসাধ্য অনুশীলন ও সম্ভোগ যে মানবের একটা অতি উচ্চ অধিকার; জোলা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পরে মানবীয় বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকলের অনুশীলনের কোনও ব্যাঘাত জন্মাইবার যে কোনওই অধিকার সমাজের রীতিনীতি ও লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের নাই; এই অনুশীলনের অবসরলাভ ও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য এই সকল লৌকিক রীতি-নীতি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকে উপেক্ষা করিয়া চলাতে যে কোনও অধর্ম্ম নাই; এইটি টলষ্টয়, ইব্‌সেন, শ' প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ প্রাণপণে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল প্রতিবাদ ও দ্রোহীতার ফলেই আজ ইউরোপে একটা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম-নীতি ও সমাজ-নীতির বিকাশের সূত্রপাত হইয়াছে। জোলা, টলষ্টয়, ইব্‌সেন, শ' প্রভৃতির সাহিত্য-কলাকে প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়া চাপিয়া রাখিলে, ইউরোপ আজ অজ্ঞাতসারে যে পরমার্থের ও পূর্ণতার দিকে তিলে তিলে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত না।

গতানুগতিক ধর্ম্ম ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য

আমাদের দেশেও যে এ ভাঙ্গার প্রয়োজন নাই, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। ধর্ম্মে, নীতিতে, সাহিত্যে, শিল্প-কলায় আমরাও একটা কৃত্রিমতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, এখনও রহিয়াছি। তত্ত্বে—সত্যকে ছাড়িয়া সত্যাভাসের, নীতিতে—নিজের প্রকৃতিকে ছাড়িয়া পরের পুরাতন অনুশাসনের, সাহিত্যে—প্রত্যক্ষ ও সত্য রসকে উপেক্ষা করিয়া, কল্পিত ভাবের দ্বারা আমরা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া আছি। তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারকে, নীতির

প্রতিষ্ঠার জন্য স্মৃতিকে, সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই কল্পিত, বিমানচারী-ভাব ও আদর্শকে নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু ভাঙ্গিতে যাইয়া আমরা ইউরোপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব না। ইউরোপ দিশা-হারা হইয়া ভাঙ্গিতেছে। আমরা দিক্ ঠিক রাখিয়া ভাঙ্গিব। ইউরোপের বন্ধনের বেদনা-জ্ঞানই কেবল আছে, মুক্তির প্রকৃতি যে কি সে জ্ঞান এখনও ফোটে নাই। যাহা আছে তাহা ভাল নহে, তাহাতে তার চলে না; ইউরোপ এইটুকুমাত্র বুঝিয়াছে; কিন্তু কিসের দ্বারা যে তার চলিবে, ভাল যে কি, তাহা এখনও জানে না। আমরা ত এ অজুহাত দিতে পারি না। ইউরোপ তার আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তির উপরে, সে সভ্যতা ও সাধনার উপকরণ দিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ গুলি তার বর্ত্তমান সভ্যতার মূল উপাদান; হিব্রু, গথিক প্রভৃতি সাধনার কিছু কিছু ঐ মূল উপাদানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে মাত্র। আর কি গ্রীসে, কি রোমে, কি ইহুদায়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া ফোটে নাই। এজন্য ইউরোপ এখনও অনিত্যতে ও নিত্যতে, অপ্রাকৃতে ও প্রাকৃতে, অতীন্দ্রিয়ে ও ইন্দ্রিয়েতে, স্বরূপে ও রূপে, পর মার্গে ও সংসারেতে, যে একটা অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। এটি কিন্তু আমাদের প্রাচীন সাধনাতে বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তবে মধ্যযুগের মায়াবাদ তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে উভয়দিকেই এই সনাতন সত্যকে আমাদের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে আবার তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি। এ অবস্থায় জীবনের কোনও ক্ষেত্রে কেবল পুরাতনের বা প্রচলিতের দোহাই দিয়া সহজ মানব-প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির সম্প্রসারণের ও বিকাশের পথ আটকাইতে চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? আর এই অনিষ্টপাত নিবারণ করিতে গেলে, সকলের আগে জীবনের প্রত্যেক বিভাগকে তার

নিজস্ব স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এ সময়ে শাস্ত্রের নামে বাহিরের প্রত্যক্ষ ও স্বানুভূতির প্রামাণ্যকে, পুরাতন স্মৃতির নামে সামাজিক জীবনের আধুনিক প্রয়োজনকে, ধর্ম্ম ও নীতির নামে রস-সৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টার মতন আর কিছু এমন আত্মঘাতী হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। আর এইজন্যই একদিকে যেমন এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিকে অত্যন্ত হীন, হেয়, ভদ্রসমাজে অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি; অন্যদিকে সেইরূপ, যে কৃত্রিম, কল্পিত, গতানুগতিক ধর্ম্মের, নীতির ও শীলতার দোহাই দিয়া এগুলির অমন নিন্দাবাদ হইতেছে, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া তদপেক্ষা শতগুণে বেশী প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ

কন্দর্পনারায়ণ রায়।

"Is there such a thing as an impartial history? And what is History? The written representation of past events. But what is an event? Is it a fact of any sort? No! it is a notable fact."

বারভূঁইয়ার ইতিহাস মুসলমান রাজত্বকালীন হিন্দুর তেজোবার্য্যের অপূর্ব্ব পুণ্য-কথা। 'বারভূঁইয়া' কথাটা মোগল রাজত্বকালে সমধিক প্রচলিত হইলেও উহা নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'দ্বাদশমণ্ডল' বা বারভূঁইয়ার নাম ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। মনুসংহিতা শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থেও দ্বাদশমণ্ডলের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্রাট বা বিজয়ী নৃপতির অধীনে বরাবরই দ্বাদশ জন সামন্ত নৃপতি দ্বাদশ-মণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশের দ্বাদশমণ্ডলের কতটা প্রতাপ ছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতেই অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকালে বারভূঁইয়াগণ প্রতাপশালী ছিলেন। তাহাদিগকে একরূপ স্বাধীন নরপতি বলা যাইতে পারে, কারণ উঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত কেহই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, বরং সকলেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ অতুল্য বিক্রমে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ফিলিপ ডি ব্রিটো ডি নিকোটি (Philip de Brito de Nicote) বারভূঁইয়ার বীরত্বসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "of the whole of Bengal, of the Boioes, (or twelve lords) each of them a sovereign in his own territory and all of them united against the Mogor king and against the Mogo

(Magh) and of his other enemies. These twelve Boioes of Bengal ruled over all the low lands watered by the Ganges (*eram senhores de todas terras de baixo queregao orio Ganges*") পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকগণ এবং যেসব জেসুইট পাদ্রী ঐ সময়ে বাঙ্গলাদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বারভূঁইয়াগণের অপূর্ব্ব বীর্য্যবত্তার কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বারভূঁইয়াদের মধ্যে প্রায় সকলেই তেজবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ও খিজিরপুরের ঈশাখাঁর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এই দুই মহাপুরুষের পুণ্য-জীবন-কথা লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি রচিত হওয়ায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরেই ইঁহাদের নাম সুপরিচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ইতিহাস এবং তৎসহ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

চন্দ্রদ্বীপ নামোৎপত্তির কারণ।

উপাখ্যানবহুল বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক ব্যাপারের সহিতই কোন না কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ইতি-কথার সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। সে সমুদয় বংশপরম্পরানুগত কিংবদন্তীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহা সামান্য অনুসন্ধিৎসার সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি শ্রীচন্দ্রদেবের একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল কিংবদন্তী বা কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই যে সকল পূর্ব্বরতন ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ সম্বন্ধে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে।

এতকাল চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত কিংবদন্তী

প্রামাণিক রূপে গৃহীত হইয়াছিল, আমরা একে একে সে সকলের উল্লেখ করিতেছি।

(১) অতি পূর্ব্বকালে বিক্রমপুরে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভগবতীর উপাসক ছিলেন। চন্দ্রশেখর বিবাহের পরে নবপরিণীতা পত্নীকে গৃহে আনয়ন করিবার কালে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পরিণীতা বনিতা ও তাঁহার উপাস্যা দেবী একই নামে অভিহিতা। তখন তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইষ্টদেবীর নাম গ্রহণ সময়ে কিরূপে তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করা যাইবে। এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, যে সময়ে চন্দ্রশেখর একখানি তরাতে আরোহণ করিয়া অকূল সাগরজলে ভাসিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে একটি ধীবর বালিকা ঐ অসীম জলরাশির মধ্যে একমাত্র ক্ষুদ্র তরী আরোহণে মাছ ধরিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে যারপর নাই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তুমি কে এবং কোন্ সাহসে একাকিনী এই অকূল পারাবারে অবস্থান করিতেছ? তদুত্তরে বালিকা বলিল যে, মদীয় প্রিয় শিষ্য অকূলপাথারে ভাসিতেছে, আমি কিপ্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমি তাহার অপেক্ষায় এই সলিলরাশি মধ্যে অবস্থান করিতেছি। তাহার ভ্রম নিরসন করাই আমার উদ্দেশ্য। তাহার সহধর্ম্মিণীর নামের সহিত আমার নামের একতাপ্রযুক্ত সে কিরূপে আমাকে মাতৃসম্বোধন করিবে তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যদি বুঝিত যে জগতের যাবতীয় নরনারী ও সমুদয় বস্তুনিচয়ই আমাতে প্রতিবিম্বিত এবং আমারই অংশসম্ভূত, তাহা হইলে সে কখনও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবাগী হইত না। বালিকার এই উপদেশ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই ইষ্টদেবী আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সন্দেহ দূর করিতেছেন। তখন ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! এতদিনে

আমার ভ্রম দূর হইল, এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?" দেবী বলিলেন, "যাও বৎস, এখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণীতা বনিতা-সহ সুখ-সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর।"

দেবী আরও বলিলেন, 'এই যে অকূল সাগর বিদ্যমান দেখিতেছ, ইহা ত্বরায় লুপ্ত হইয়া এইস্থান দ্বীপে পরিণত হইবে। এবং তোমার নামানুসারে তাহার নাম হইবে চন্দ্রদ্বীপ।"

অপর কিম্বদন্তী এই যে পূর্ব্বকালে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে একজন সাধু মহাত্মা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। একবার স্বীয় ভক্ত-ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দেকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হ'ন। একদিন চন্দ্রশেখর রাত্রিতে নৌকায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে দেবী পার্ব্বতী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! আগামী কল্য প্রত্যূষে তোমার নৌকাসংলগ্ন জলমধ্যে তোমার ভৃত্যকে নামাইয়া দিও, দনুজমর্দ্দন জলমধ্যে ডুব দিলেই তিনটি শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, ঐ শ্রীমূর্ত্তি তিনটি যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে, সে নিশ্চয়ই এই প্রদেশের রাজা হইবে।" ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দুইবার ডুব দিয়া দুইটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সে পুনর্ব্বার আর ডুব দিতে রাজী হয় নাই, যদি পুনরায় ডুব দিত তাহা হইলে দেবীর কৃপাবলে চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীকে অচঞ্চলারূপেই গৃহে পাইত, কিন্তু দৈব-চক্রে তাহা হইল না! যে নদীর জলমধ্যে ঐ মূর্ত্তি দুইটি পাওয়া যায়, ঐ নদীর নাম সুগন্ধা বা সোন্ধা। সোন্ধার সহিত পৌরাণিক উপাখ্যানের একটু সংযোগ আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সতী-বিয়োগ-বিধুর মহাদেব যখন সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু-চক্রে ছিন্ন হইয়া তাঁহার নাসিকা সোন্ধার জলে পড়িয়া যায়, এই জন্যই এই নদীর নাম সুগন্ধা হইয়াছে। বাখরগঞ্জের বহুস্থানই এই সুগন্ধার জলনিঃসরণের সঙ্গে ক্রমে * জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে।

* J. A. S. B. 1874. History of Bakarganj, Beveridge.
ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

(২) "সমুদ্র-পরিবেষ্টিত চন্দ্ররাজবংশের অধিষ্ঠান ভূমিই চন্দ্রদ্বীপ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চান্দ্র-ব্যাকরণ রচয়িতা চন্দ্রগোমার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিব্বতের জ্ঞান-ভাণ্ডার টেঙ্গুর গ্রন্থে লিখিত আছে, 'বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্র-গোমীর জন্ম। আচার্য্য স্থিরমতির নিকট ইনি সূত্র ও অভিধর্ম্ম-পিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধরাচার্য্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। তৎকালে বরেন্দ্র হর্ষের উত্তরাধিকারী শিলের সাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল এবং সিংহ নামক এক লিচ্ছবি এই প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ শিল নিজ কন্যার সহিত চন্দ্রগোমীর বিবাহ দিবেন ইচ্ছা করিয়া বরেন্দ্র-রাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। চন্দ্রগোমীও প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই রাজকন্যার তারা নাম শুনিয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী তারার নামের সহিত মিল হওয়ায় আর বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বরেন্দ্ররাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তখন একটি সম্পুটে আবদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। পেটকাটি ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় একটি দ্বীপ উৎপন্ন হইল। চন্দ্রগোমীর নামানুসারে এই ভূভাগ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল।' * এই কিংবদন্তীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত কিংবদন্তীর যথেষ্ট ঐক্য আছে। চন্দ্রগোমী ও চন্দ্রশেখরের মানসিক বিপ্লবের একই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একটু সামান্য ঘটনা-বৈচিত্র্য আছে এই পর্য্যন্ত। প্রাচীন বাঙ্গলার ভৌগোলিক বিবরণ আলোচনা করিতে গেলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানই সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল, পরে কাল-পরিবর্ত্তনে সমুদ্র দূরে সরিয়া যায় এবং ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রদ্বীপও এইরূপ ভাবে উদ্ভূত, এই অনুমান করা যাইতে পারে।"

* রাজন্যকাণ্ড—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

চন্দ্রদ্বীপ নামের প্রাচীনত্ব।

চন্দ্রদ্বীপ যে অতি প্রাচীন স্থান তাহা সহজেই সপ্রমাণ হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত পুস্তকাগারে 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে; ঐ গ্রন্থখানা ১০১৫ খ্রীঃ অঃ নকল হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ 'ভগবতীতারা' নামক এক দেবীর চিত্র আছে। ভগবতীতারাকে দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ আসিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। *

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ।

বিশ্বকোষকার প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে চন্দ্রদ্বীপ শব্দে সেনবংশীয় শেষ নৃপতি দনুজমাধব সেন ও দনুজমর্দ্দন দেবকে অভিন্ন ব্যক্তিরূপে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গের অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক নগেন্দ্রবাবুর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবাদকারীগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, ৺রাবেশচন্দ্র শেঠ ও রাখালবাবু দনুজমর্দ্দন দেবের দুইটি মুদ্রার দ্বারা তাঁহাদের উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। মুদ্রাদ্বয় মধ্যে একটি গৌড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত হয়, অপরটি বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ হইতে পাওয়া যায়। সে সকলের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, "দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজিসার-সংগ্রহে লিখিত আছে,—

* Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge by Cecil Bendall, M. A. P. 151. A. Foucher, Page 192.

'দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপ পতি —
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ॥'

মূল পুঁথি হইতে নকলকারীর দোষে একস্থানে 'দনুজমর্দ্দন' স্থানে 'দনুজমাধব' পাঠ হইয়া ভ্রমক্রমে পূর্ব্বে দনুজমাধব সেন ও দনুজমর্দ্দন দেবকে অভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, এখন উভয়ে ভিন্ন বংশীয় ও ভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছেন।"*

বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বহুপূর্ব্বে তথায় চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হয়। চন্দ্রবংশের পরিচয় শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে একরূপ অজ্ঞাত ছিল বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লেখক তারানাথ ব্যতীত চন্দ্রবংশ সম্বন্ধে আর তেমন কেহই বিশেষ কোনও আলোচনা করেন নাই। তারানাথ খ্রীঃ ১৬শ।১৭শ শতাব্দীর লোক, কাজেই তাঁহার লিখিত বিবরণী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতেই চন্দ্রবংশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। উক্ত তাম্রফলকে চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা :— * * আধারো হরিকেলরাজককুদছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোমঃ—ইত্যাদি। মোট কথা, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই চন্দ্রদ্বীপের উদ্ভব এবং চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হয়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। চন্দ্রবংশের সহিত বিক্রমপুরের ইতিহাসেরও সংযোগ আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বিজয়শ্রীমণ্ডিত শ্রীবিক্রমপুর নামক জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমি দান করিতেছেন। অতএব চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের শ্রীচন্দ্র কোনও সুযোগে বিক্রমপুরে একটি বৌদ্ধরাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ; কাজেই এত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা দূরীভূত হইল। চন্দ্রবংশ কতদিন পর্য্যন্ত যে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চন্দ্রবংশের বহুপরে দনুজ-

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড (অষ্টম অধ্যায়, ৩৭০ পৃষ্ঠা)।

মর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দনুজমর্দ্দন দে উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। ঘটকগণ তাঁহাকে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি এবং রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। দেবরাজবংশীয়-গণের বংশাবলী সম্বন্ধে নানারূপ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের প্রদর্শিত বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম।—

(ডাক্তার ওয়াইজ ও বঙ্গীয় সমাজে প্রকাশিত বংশাবলী)

রাজা দনুজমর্দ্দন
|
রমাবল্লভ রায়
|
কৃষ্ণবল্লভ রায়
|
জয়দেব (নিঃসন্তান) — কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ বসু (রায়)
(চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন)

(মিঃ বিভারেজ প্রদত্ত বংশাবলী)

দনুজমর্দ্দন
|
রামনাথ
|
জানকীবল্লভ
|
রামবল্লভ
|
শ্রীবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ বসু (রায়)

কন্দর্পনারায়ণ।

'বিশ্বকোষ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উক্ত দেববংশ সম্পর্কে ভিন্নরূপ আলোচনা করিয়াছেন। এখানে বাহুল্য ভয়ে সে সকল আলোচনার উল্লেখ করিলাম না। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কন্যা কমলার বংশধরগণ বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ। পরমানন্দের পুত্র জগদানন্দ, জগদানন্দের পুত্র কন্দর্পনারায়ণই বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। আমাদের দেশের কুলাচার্য্য-গণ কুলীন ব্যতীত অন্য কোন বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন না, ইহাই তাঁহাদের সনাতন রীতি। সে জন্যই কোনও ঘটককারিকায় চাঁদ রায় কেদার রায় সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় কন্দর্পনারায়ণ রায় বসুবংশীয় কুলীন, কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে কুল-গ্রন্থে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। ঘটককারিকায় দেখিতে পাওয়া যায় :—

কন্দর্পোকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্ধীরঃ সব্যসাচী সমোরণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারিমর্হাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজি, রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মগবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ॥
স্থাপয়মাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটি সংজ্ঞবাম্।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈবচ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যা পুরোত্তথা।
রথীনাঞ্চ রথীশূরঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥

কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বসম্বন্ধে ঘটককারিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। কন্দর্পনারায়ণ যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা, তখন রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রীঃ অঃ চাটিগাঁ হইতে বাঙ্গলাদেশে

আগমন করেন এবং অবশেষে বাক্‌লায় উপস্থিত হন। তিনি বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"From Chittagong in Bengal I came to Bacola (Bakla), the king whereof is a gentile, a man very well disposed, and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses be very fair and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waist. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephant's teeth."*

কন্দর্পনারায়ণ তিনবার রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। (১) সনদ্বীপের যুদ্ধ, (২) মাসুম কাবুলির সহিত রণ, (৩) মোগল সেনাধ্যক্ষ মুরাদখাঁর সহিত সংগ্রাম। এই তিন যুদ্ধেই তিনি বিশেষ বীর্য্যবত্তার এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঠান এবং মোগল এ উভয়ের সঙ্গেই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আকবরনামায়ও কন্দর্পনারায়ণের নামের উল্লেখ আছে। আকবর বার-ভূঁইয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বহুদিন হইতেই যত্নপরায়ণ ছিলেন এবং তারজন্য মানসিংহ, মন্দারায়, কিলমক্, মুরাদ প্রভৃতি মোগল সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈশাখাঁ, প্রতাপ, কেদার রায় প্রভৃতির ন্যায় কন্দর্পনারায়ণ রায়ও মোগলসেনাপতি মুরাদখাঁর অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অন্যান্যের ন্যায় তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।† শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়

---

* Hackluty's Voyages, Vol. II P. 257.

† Bakla or Chandradwip was invaded by Muradkhan, one of the generals of Akbar and annexed to the empire. H. Bloch-

বলেন, "বারভূঞার বিদ্রোহদলের সহিত যোগ দিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।" এ উক্তির তিনি কোনও প্রমাণ দেন নাই।

এই রাজবংশের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি মাত্র কামান বিদ্যমান আছে। কামানটি পিত্তল-নির্ম্মিত। শ্রীপুরনিবাসী রূপিয়া খাঁ কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৸০ ফিট, বেড় ২।০ ফিট, মধ্যভাগের ব্যাস ১৯৷৷০ ইঞ্চি। ঐ কামানের গায়ে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ লিখিত আছে। রূপিয়া খাঁ সাং শ্রীপুর লেখা থাকায় তাহাকে শ্রীপুরের অধিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।

কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী কাচুয়া নামক স্থান হইতে মাধবপাশায় স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমান সময়েও কন্দর্পনারায়ণের বংশধরগণ তথায়ই বাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের এবং মগগণের ঘন ঘন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কাচুয়াতে অদ্যাপি বহু প্রাচীন দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। কন্দর্পনারায়ণের পুত্রের নাম রামচন্দ্র রায়। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনারোহণ করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

man. A. S. Bengal 1873, Elliot's History VOL. III.—'Akbarnama.'

বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম

[৯]

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপাত ।

সহজযানের কথা গত মাসে বলিয়াছি। সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্য্যদেব 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্ব্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম 'নেড়ানেড়া'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলোআঁধারী ভাষা। কাণে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড এই দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করি-লেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্ব্বাণ পাই-বার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কি দুর্দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে

হয়। দেশের লোকে এই ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে দেখিত তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কটি একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ঐ নাটকখানি ১০৯০ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিদের যে 'কেচ্ছা' দেওয়া আছে, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তখনও খুব বড়মানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা ছোবান কাপড় পরেন; কিন্তু সে রেশমের কাপড়। পুঁথি পড়েন—সে পুঁথির পাটায় সোণালী কাজকরা; যে কাপড়ে পুঁথি বাঁধা থাকে, তাহা রেশমের, তাহার উপর নানারকম কাজকরা। ভিক্ষুরা তখনও খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।

এই অধঃপাতের একটা দিক্। আর একটা দিক্ হইতে অধঃপাতের কারণ দেখাই। মহাযান ধর্ম্ম খুব উঁচু ধর্ম্ম—সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মত কর্ম্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—অনেক পড়িতে হয়—অনেক ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্য্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন—তাহারা বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ কর—'ধারণী' জপ কর—ধারণার পুঁথি পূজা কর। তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়—যোগ—সকলের ফল হইবে। মনে কর 'প্রজ্ঞাপারমিতা' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ—পড়িতে অনেক দিন লাগে—আয়ত্ত করিতে আরও দিন লাগে—তাহার মত কাজ করিতে আরও দিন লাগে। আচার্য্য বলিয়া দিলেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-ধারণী'—মুখস্থ কর—তাহা হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যদি

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ কীলে কীলে তথাগতোহধ্যবসান্তে বরদে উত্তমোত্তমতথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এইটি কণ্ঠস্থ কর তাহা হইলে গণ্ডব্যূহসূত্র পাঠের ফল হইবে।

ওঁ নমঃ সমন্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা”—এই ধারণী পাঠ করিলে সমাধিরাজসূত্র পাঠের ফল হইবে।

ওঁ নমঃ সমন্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ মনিধরি বাজ্রণি মহাপ্রতিসরে ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা”—এই মন্ত্র পাঠ করিলে মহাপ্রতিসরা পাঠের ফল হইবে।

এইরূপ যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক “বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে” আমরা চারি শত এগারটি ধারণী পাইয়াছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অক্ষর—দুই অক্ষর—মন্ত্র হইতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন ‘হুং’ ‘ফট্’ ‘ক্রীং’ ‘স্বাহা’ এই সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান ধর্ম্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে ‘হুং’ ‘ফট্’ ‘স্বাহায়’—দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দেবতার সংশ্রব নাই—দেবতার পূজা-অর্চ্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনও মতভেদ আছে—কেহ বলেন চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন পাঁচ শত বৎসর পরে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরীতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্ত্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্ব্বাণলাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি একটি করিয়া ধ্যানী বুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম ‘অমিতাভ’, তারপর ‘অক্ষোভ্য’, তারপর ‘বৈরোচন’, তারপর ‘রত্নসম্ভব’, তারপর ‘অমোঘসিদ্ধি’ আসিয়া জমি-

লেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরীতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারিদিকে চারিটি 'তথাগতের' মূর্ত্তি আছে। প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপাস্য হইয়া গিয়াছেন—স্তূপে তাঁহার স্থান নাই—তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির—তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধেরা বলিতেন, তিনি 'পঞ্চতথাগতে'র অথবা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের কলম মাত্র—তিনি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মত কলম-বন্দী করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চতথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম—'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পাণ্ডরা', 'আর্য্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা মন্ত্রে থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্ত্তি হইল। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তিতে পাঁচজন 'বোধিসত্ত্ব' হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্ত্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান ধ্যানী বুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্ত্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক হইতে লাগিল; —তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানারূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধ-গণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক 'অভিধানোত্তরতন্ত্রে' 'সম্বরবজ্র' 'পীঠপর্ব্ব' 'বজ্রসত্ত্ব' 'পীঠদেবতা' 'ভেরুক' 'যোগবীর' 'পীঠমালা' 'বজ্রবীর-বড় যোগসম্বর' 'অমৃতসঞ্জীবনী' 'যোগিনী' 'কুলডাক' 'যোগিনী যোগ-হৃদয়' 'বুদ্ধকাপালিকযোগ' 'মঞ্জুবজ্র' 'নবাক্ষরালীডাক' 'বজ্রডাক' 'চোমক' প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে।

বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে সাধনমালা বলে। একখানি সাধনমালায় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্ররাবাহী', 'বজ্রযোগিনী', 'কুরুকুল্লা', 'মহাপ্রতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই সকল সাধন লইয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্ত্তি লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকী কি রহিল ?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না ; এ পূজার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, সে সকল দেবমূর্ত্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। একে ত অশ্লীল মূর্ত্তি—তাহাতে ভাল কারিগরের হাতের তৈয়ারী—তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল মূর্ত্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর অধঃপাতের বাকী রহিল কি ? সে সকল উপাসনার প্রকার আরও অশ্লীল—সভ্য-সমাজে বর্ণনা করা যায় না একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'। আমি বলি তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ। অধিক পুঁথির নাম করিব না। 'গুহ্যসমাজ' বা তথাগত গুহ্যক নামে বৌদ্ধদের একখানি পুঁথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন,—

"But in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the

words and specimens of Holiwell Street literature of the last Century would appear absolutely pure".

অর্থাৎ এই বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্ম্মের কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওয়েল ষ্ট্রীটে যে সকল পুঁথি-পাঁজি বাহির হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব প্রাণিহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

"হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদাহারকৃত্যর্থন্ন চান্নন্তু বিভক্ষয়েৎ॥"
"অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিম্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ॥"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ।
বিম্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং॥"

এই ত গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই—নহিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হইবে না। অন্যকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়,—হয় ত পিনাল কোডের ধারায়ও পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই একটি নমুনা দিতেছি—

"দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ॥"

মোটকথা এই যে,

"দুষ্কবৈর্নিয়মেস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি॥"

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না—সর্ব্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা কর—তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর। অধঃপাতের আর বাকা কি?

'তথাগত গুহ্যকে'র স্থায় আরও অনেক পুস্তক আছে। 'চণ্ডমহারোষণ তন্ত্র', 'চক্রসম্বর তন্ত্র', 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র', 'উড্ডীষ তন্ত্র', 'সেকোদ্দেশ', 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র', 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র', 'সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনী-জাল-সম্বরতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ', 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প', 'মহামুদ্রাতিলক', 'জ্ঞানগর্ভ,' জ্ঞানতিলক নামে 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরমমহাদ্ভুত', 'তত্ত্বপ্রদীপ', 'বজ্রডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়', 'হেরুকাভ্যুদয়', 'যোগিনীসঞ্চার্য্য', 'সম্পুট-তন্ত্র', 'চতুর্যোগিনী সম্পুট', 'গুহ্যবজ্র', ইত্যাদি। আর কত নাম করিব—কত নাম করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব? এ সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্যক' হইতে একবিন্দুও ভাল নয়। যখন এইরূপ শত শত পুস্তক আছে—সে সকল পুস্তক পড়া হইত—সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম হইত—তখন আর অধঃপাতের বাকী কি?

এ সকল গুহ্যতন্ত্র—মূলতন্ত্র—সঙ্গীতি আকারে লেখা। সঙ্গীতির গোড়াতে এইরূপ থাকে—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং
জেতবনে বিহরতি স্ম, অথবা রাজগৃহে বেণুবন্যে, বিহরতি স্ম, অথবা
এইরূপ আর কোনও স্থানে বিহরতি স্ম"

অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি একদিন ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরে অথবা রাজগৃহে বেণুবনে অথবা আরও এইরূপ কোথাও বেড়াইতেছেন। এই সকল গুহ্য উপাসনার গ্রন্থগুলিও এই ভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং

বিহরতি স্ম নাই—তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মূল যদি বিশখানি থাকে—টীকা টিপ্পনীতে তাহা পাঁচশত হইয়া দাঁড়ায়। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভুগিলেও এত বড় জাতিটা—এত বড় ধর্ম্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা ত বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও না কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্ততঃ বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ—যে পদে গেলে জন্ম জরা মরণের আর ভয় থাকিবে না—যে পদে গেলে সংসারের কোন চিন্তা থাকে না—যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়—সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষ ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপূতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনেকদিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-

দের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্য্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু আর্য্যরা অনার্য্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত—তাহারা আপনাআপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। এক-জন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে হইত—তাহার পর 'পুণ্যানু-মোদনা' শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা' শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, দশশীল গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত' ধারণ করিতে হইত—আরও কত কি করিতে হইত—অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে—সে একে-বারেই ভিক্ষু হইত। যে সকল জিনিষ অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সেসকল বাড়ীতেই শিখিত—তবে আমাদের যেমন এখন পৈতা হয়—একটা সংস্কার মাত্র—উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণ গমন', 'পঞ্চশীল গ্রহণ', এক একটা, সংস্কারের মত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও তেমনি 'জাত ভিক্ষু' বলিয়া একটি জাতির মত হইয়া-ছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্ম্মও করিত, পূজা পাঠও করিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের

পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম—ঘরে বসিয়া করা যায়—একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়—দু'পয়সা আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড় বড় উৎসবে দু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনরূপে দিন গুজরাণ করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্ম্মী হইয়া উঠিল! বৌদ্ধ পণ্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোট ছোট রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্ম্মী বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফ্‌গানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইঁহাদের অপেক্ষা যে বেশী জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাঙ্গলায় ত সেনবংশ রাজা—কিছু বড় রাজা মাত্র। আশে পাশে চারিদিকে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমশুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু

হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল; পাথরের মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলা হইল; সোণা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলা হইল; পুঁথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা জগদ্দল প্রভৃতি বড় বড় বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারের ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনও কোন খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্ম্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুঁথি-পাঁজির এই পর্য্যন্ত শেষ।

এক একবার মনে হয় তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখান—এই সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল। দেশে রহিল—কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল। ইহার পর কি হইল পরে বলা যাইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শর্ম্মার ঝুলি।

[১]

ঝুলির ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

শর্ম্মার প্রকৃত নাম সাতকড়ি সরকার; লোকে ডাকিত সাতু-রাম শর্ম্মা। সাতুরাম নদীয়া জেলায় মোক্তারি করিত। একদা তথাকার একটি বাঙ্গালী বিচারপতির সহিত তাঁহার ঝগড়া হয়, এবং তাহারই ফলে তিনি উক্ত কার্য্য হইতে খারিজ হন। সাতু-রামের অন্য কোনও আয় ছিল না। মোক্তারি করিয়া খরচ বাদে তাহার মাসিক আট দশ টাকা বাঁচিত এবং তদ্দারা কোনও মতে তাহার পরিবার প্রতিপালিত হইত। এক্ষণে সেই কার্য্যের বহালীশোনদ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দারিদ্র্য আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল এবং বহুদিন উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ঠাকুরজী পরাস্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দারিদ্র্যের এলাকায়ভুক্ত হইলেন—গোল মিটিয়া গেল।

সাতুরাম মোক্তারি হইতে বরতরফ হইয়া, অন্যান্য অনেক কার্য্যের উমেদার হইয়াছিলেন এবং কোন কোন কার্য্যে বহালও হইয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও তিষ্ঠিতে পারেন নাই। কোনও স্থানে পাঁচ দিন, কোনও স্থানে দশ দিন, কোথাও বা একমাস—ঐ পর্য্যন্ত। ইহার কারণ এই যে, লোকটা কিছু তেজস্বী ও উচিতবক্তা ছিল—ধামা ধরিতে পারিত না। এই দোষে তাহার কপালে যত দুঃখ। এই শ্রেণীর দুরবস্থাপন্ন লোককে এখনকার সভ্য মহোদয়েরা 'মাথা পাগ্‌লা' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

বিক্রমপুর পরগণায়, বিশালোরসী পদ্মার সন্নিকটে কৃষ্ণ-পুর গ্রামে সাতুরামের বাড়ী। সাতুরামের পরিবারে বেশী লোক

ছিল না—তাহার ব্রাহ্মণী, বিধবা পুত্রবধূ, আর একটি অনূঢ়া কন্যা মাত্র।

সাতুরাম ভিক্ষা করিয়া যে তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহাতে প্রায়ই সকলের কুলাইয়া উঠিত না। সুতরাং ব্রাহ্মণীকে প্রায়ই উপবাস থাকিতে হইত; কেন না তিনি গৃহিণী, স্বামী ও সন্তানকে আহার না করাইয়া কেমন করিয়া আহার করেন? বিশেষতঃ বিধবা পুত্রবধূটি একরূপ বালিকা এবং তাহার এক বেলা আহার। আরও মেয়েটির প্রাতর্ভোজনের জন্যও কিছু অন্ন হাঁড়ীতে জমা থাকা চাই। সুতরাং সকলকে যথাসম্ভব প্রবোধ দিয়া, তিনি দিনের দিন অনাহারে পীড়িতা হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে একদিন ঠাকুর বলিলেন—

"সে কি কথা, উপবাস করিতে হয়, দুইজনেই করিব। তুমি একা করবে কেন? তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আর তুমি অধিক দিন জীবিতা থাকিবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। রন্ধন করিয়া সকলকেই সমান ভাগে দিও। কেবল মেয়েটির সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিও। চারিজনের এক গ্রাস করিয়া কম পড়িলে বড় বেশী আসে যায় না। কিন্তু একজনের চারি গ্রাস কম হইলে তাহার কষ্ট হয়। আমার মাথা খাও, আমার এই উপরোধ উপেক্ষা করিও না।"

ব্রাহ্মণী ঈষদ্‌হাস্যে বলিলেন,—"তোমাদের কাছে অন্ন দিয়া উপবাসেও আমার কোনও কষ্ট হয় না। অন্য কোনও ব্যারামের দরুণ বোধ হয় আমার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। তা একটা মানুষ ত আর চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে না? এক্ষণে তোমাদের কাছে আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হয়—শরীর জুড়ায়। তোমাদের কষ্ট আর দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

ঠাকুর তখন দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"শোন ব্রাহ্মণি, বিধিলিপি কখনও খণ্ডন হয় না। তাঁহার বিধানোচিত অবস্থায় সন্তুষ্ট

থাকাই মানুষের কর্ত্তব্য। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা মহাপাপের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। সেজন্য মানুষকে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"পাপ পুণ্য বুঝি না প্রভো! যেদিন শ্রীমান আমার চলিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতেই আমার মৃত্যুর ইচ্ছা বলবতী। কেবল তোমাদের মায়া এড়াইতে পারিতেছি না। তাই এতদিন বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এতদিনে আত্মঘাতিনী হইতাম।"

ব্রাহ্মণ। ছিঃ! ওরূপ কথা মুখে আনিও না ব্রাহ্মণি; ইহকাল ত এইরূপ ভাবেই গেল। পরকালের জন্যও কি একবার চিন্তা কর না?

ব্রাহ্মণী। আমার চিন্তা করা না করার কোন ত অধিকার নাই। সেই চিন্তামণিই এই চিন্তা আমার মনে যোগাইতেছেন।

সাতুরাম বুঝিলেন, মতান্তরে ব্রাহ্মণীর কথা সত্য। সুতরাং তিনি আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না।

কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মণীর সেই চিন্তার চিরাবসান হইল—তিনি এই জ্বালাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া চিতা-শয্যায় শয়ন করিলেন। বিধবা পুত্রবধূটিও তদনতিবিলম্বে শ্বশ্রূমাতার ক্রোড়ে যাইয়া শরীর জুড়াইল। রহিবার মধ্যে রহিল, সাতুরামের এক কন্যা। তৎপক্ষেও অতি শীঘ্র তিনি প্রতিবিধান করিলেন—কন্যাটি পাত্রস্থা করিলেন। সচরাচর যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, সাতুরাম সেরূপ ভাবে কন্যার বিবাহ দিলেন না—পাঁচটি হরিতকী দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত অভিনব ভাবের উদ্বাহক্রিয়া বর্ত্তমানযুগে এদেশে এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য সাতুরামের পাগ্‌লামীর উপর কোনও কোনও গ্রাম্য সামাজিক ব্যক্তি মন্তব্যের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করিলেন না। ঐ এক রকমের লোক, যাহা মনে আসে তাহা করে, যাহা মুখে আসে তাহা বলে।

যাহা হউক, সাতুরামের এক্ষণে সংসারে অনেকটা অবসর হইয়াছে, কেননা ব্রাহ্মণ এখন একা।

এই সময়ে তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তদ্রূপ যদি অন্যের ঘটিত, তবে সে শোকে দুঃখে অনাহারে নিতান্তই অভিভূত হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতুরামকে কেহ কখনও শোকদুঃখ-প্রপীড়িত বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। বরং তাঁহার চিত্তপ্রসন্নতা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে তাহাই উপলব্ধি হইত। এইরূপ ভাব সংসারের চক্ষে পাগ্‌লামার একটা প্রধান উপসর্গ। এখন থেকে ঠাকুরকে লোকে 'পাগ্‌লা সাতুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণপুরে আমার কোনও আত্মীয়ের বাড়ী। তথায় যাতায়াতোপলক্ষে ঠাকুরের সহিত আমার আলাপ। গ্রাম্য সুবাদে আমি তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে স্নেহ করিতেন ঠাকুরজীর সহিত সময়ে সময়ে আমার নানা বিষয়ে বিতর্ক হইত। এই বিশাল হিন্দুসমাজের উপর তাহার বিজাতীয় ক্রোধ ছিল —তিনি অনেক সময়ে স্বদেশের নিন্দাচর্চ্চা করিতেন।

সাতুরামের বড় একটা ভিক্ষার ঝুলি ছিল। একদা আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া উহা পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইলাম। কেননা ঝুলিটা একেবারে পূর্ণ বোঝাই করা ছিল।

যখন আমি ঝুলির নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এখন ধরিও না। উহা আমি তোমাকেই দিয়া যাইব।"

আমি তখন ঈষদ্‌হাস্যে বলিলাম—"আপনি উহা ব্যবহার জন্য আমাকে অনুমতি করিবেন না ত?" সাতুরাম তখন উচ্চ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি ধনে জনে সুসম্পন্ন হও। আমি অন্যরূপ উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঝুলি তোমাকেই দিয়া যাইব।"

আমি 'যে আজ্ঞে' বলিয়া তখন তাহার নিকট বিদায় হইলাম

এবং আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়া অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ স্থানান্তরে যাত্রা করিলাম।

কিছু দিবস পরে আবার আমাকে কৃষ্ণপুর যাইতে হইল। তথায় যাইয়া শুনিলাম, সাতুঠাকুর মুমূর্ষু। আমি অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া সেই মৃত্যু সময়েও প্রসন্ন ভাব প্রকাশিত করিলেন, এবং ইঙ্গিত করিয়া সেই ঝুলিটি আমাকে দেখাইয়া দিলেন—বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না। কিছু-ক্ষণ পরেই মৃত্যু তাঁহাকে অধিকার করিল। অমনি পাঁচ সাত জনে তাঁহাকে ভাবোচিত বন্ধনপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া চলিল। কেহ কেহ এই ঝুলিটি ঠাকুরের সঙ্গে দিবে বলিয়া উহা লইতে আসিল—টানাটানি করিল। আমি অনেক অনু-নয় বিনয় করিয়া তাহা রক্ষা করিলাম। তজ্জন্য অনেকে আমাকে কটুবাক্য বলিল, কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল। কিন্তু কি করি, কর্ত্তব্য ও কৌতূহলের অনুরোধে তাহা নীরবে সহ্য করিলাম; এবং সুযোগ বুঝিয়া, ঝুলিটি লইয়া সরিয়া পড়িলাম। আমি শবানুগমন করিলাম না; অবশ্য তাহার একটা শাস্ত্রসঙ্গত কারণ ছিল।

রাত্রিযোগে যখন সকলে নিদ্রিত হইল, তখন আমি ঝুলিটি লইয়া বসিয়া গেলাম। দিবাভাগে উহা খুলিলে নানারূপ জটলা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সচরাচর আমরা ভিখারীদের যেরূপ ঝুলি দেখিতে পাই, এটি সেরূপ নহে। একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাঁথাদ্বারা বিশেষ নিপুণতার সহিত ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঝুলির অভ্যন্তর ভাগ পাঁচ অংশে বিভক্ত। অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী সহজে পড়িয়া যাইতে না পারে, এজন্য প্রত্যেক অংশেই কাপড়ের কবাট ছিল, এবং তাহাতে বোতাম আঁটিয়া অর্গলের উদ্দেশ্য সাধিত হইত।

আমি ঝুলির এক অংশ মুক্ত করিয়া পাইলাম বহুজীর্ণ ক্ষুদ্রা-কারের একখানি ভগবদ্গীতা আর একখানি নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির অর্দ্ধাংশ। তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়া ঝুলির অন্য ভাগ মুক্ত

করিলাম। তদভ্যন্তরে পাওয়া গেল একটি নস্যাধার। নস্যাধারটি শিল্প-প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত, কারণ তাহাতে বহুতর কারুকার্য্য বিদ্যমান। বাঁশের একটুকু অংশ। তাহার দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম বেত্রে চেলা মোড়াই করা। মধ্যভাগে নানারূপ লতা-রেখা খোদিত। একটি রন্ধ্রপথে নস্য বাহির হয়। এই নস্যাধারটি আমি স্বীয় পকেটে রাখিয়া দিলাম। ঝুলির আর এক অংশ খুলিয়া পাইলাম কতকগুলি বিল্বপত্র—পত্রগুলি অসংখ্য দুর্গানাম বক্ষে করিয়া শুকাইয়া আছে। উহা আগামী কল্য জলে ফেলিয়া দিবার জন্য সযত্নে স্থানান্তরে রাখিলাম। অতঃপর আমি ঝুলির চতুর্থ ভাগ মুক্ত করিলাম। কিন্তু তন্মধ্যে বেশী কিছুই মিলিল না—বহু অনুসন্ধানে দুই একটি তণ্ডুলকণা পাওয়া গেল। বোধ হয় ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি রাখিবার জন্য ঝুলির এই ভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ভাগের আয়তনও কিছু বেশী। তদনন্তর ঝুলির অবশিষ্ট ভাগ মুক্ত করিয়া, হস্ত দ্বারা জানিলাম শুধুই গাছের পাতা। এজন্য ঠাকুর যে কত বৃক্ষ নিষ্পত্র করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পত্রগুলি এলোমেলো নহে—তাম্বূলাকারে বিন্যস্ত হইয়া, ঝুলির অর্দ্ধাংশ অধিকার পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। মনে করিলাম, বুঝি এই ভাগ দুর্গানামের মূল দপ্তরখানা। পত্রগুলি বাহির করিয়া নিরীক্ষণে জানিলাম, দুর্গানাম নহে। তবে কি? তখন ধীরভাবে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিলাম—নানাবিষয়িনী রচনা। সাতুরাম এ সংসারে কিছুই বাকী রাখে নাই, সমস্তই লিখিয়া ফেলিয়াছে।—সামাজিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, পৌরাণিকাদি প্রবন্ধ, উপন্যাস নবন্যাস, কথা উপকথা, গল্প উপগল্প শাখাগল্প, চুটকি ও বৈঠকী সমালোচনা, যাত্রা নাটক ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রত্যেক রচনা যে কয়েকটি পত্রে শেষ হইয়াছে, সে কয়েকটি পত্র একত্র গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহাতে পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে। সাতুরাম অসামাজিক নহেন। কেননা, প্রবন্ধাদিতে

তিনি বৃক্ষপর্ণের দুই পৃষ্ঠা ব্যবহার করেন নাই। বনজাত নানা-রূপ বৃক্ষপত্র তিনি স্বীয় রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন। কালি—তাহাও বনলতার ফল-নির্য্যাস—লাল, নীল, কাল, তিন চারি রকমের। লেখা ক্ষুদ্র, স্থানে স্থানে পাঠ-কৃচ্ছ্রতা দোষ আছে; এবং ভ্রম প্রমাদাদি যথেষ্টই আছে। বিশ্রাম-যতি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বর্ণাশুদ্ধি—তাহাও অপ্রচুর নহে। এই সকল দোষ লেখক মাত্রেরই আছে, তবে কাহারও কম, কাহারও বেশী। সাতুরামের অনেক বেশী। তথাপি তাহা ক্ষমার যোগ্য। কেননা, সাতুরাম অন্নচিন্তাগ্রস্ত লেখক—বিশেষতঃ এই কার্য্যে তিনি অভিধানাদি কোনও পুস্তকেরই সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। মনে যাহা উদয় হইয়াছে, বৃক্ষপর্ণে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভাষা প্রাঞ্জল, তেজস্বিনী এবং মনোমুগ্ধকারিণী আমরা যতদূর পারি সংশোধন করিয়া, সাতুরামের ঐ ঝুলির বৃক্ষপর্ণপৃষ্ঠস্থ প্রবন্ধগুলি পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

গুরুদেবের আজ্ঞা।

[ঝুলির এই প্রবন্ধটি বিল্বপত্রে লিখিত। প্রথম প্রবন্ধ বলিয়া কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করিয়াও বোধ হয় ঠাকুর ইহা পবিত্র দেবভোগ্য বিল্বপত্রে লিখিয়া থাকিবেন। ত্রিপল্লব নিবন্ধন প্রতি সংখ্যাকে তিন পৃষ্ঠা করিয়া, এরূপ চতুঃষষ্টি সংখ্যক পত্রে প্রবন্ধ শেষ করতঃ, বৃন্ত-সমষ্টি বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। লেখা বড় ক্ষুদ্র। তবে সুবিধা এই যে লালকালি। পাঠ-কৃচ্ছ্রতা না আছে এমন নহে। আবার বুঝা যায় না, এমনও আছে।]

চৈত্রমাস শুক্লা-সপ্তমীর নিশি। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। আমরা সকলেই শয়ন করিয়াছি। আমাদের কাহারও আজ আহার হয় নাই। একজন লোকের একটি ভোজ্য—তণ্ডুলাদি আহার্য্য সামগ্রী—লইয়া সকালে আসিবার কথা ছিল। তাই আজ ভিক্ষায় বাহির হই নাই। তাহার আসাপথে চাহিয়া চাহিয়া, বেলা যখন

আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইল, তখন ব্রাহ্মণীকে বলিলাম—"কাজ ভাল করি নাই। আজও বোধ হয় আমাদের কপালে উপবাস লেখা আছে।" তখনও যদি বাহির হই, তবে অন্ততঃ মেয়েটির অন্নের উপযোগী তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলাম না। পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির আসার আশায় মুহুর্মুহুঃ পথ পানে চাহিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইল, তথাপি সে আসিল না। কাজে কাজেই যেই কথা সেই কাজ—একেবারে উপবাস। পর্য্যুষিত অন্ন হাঁড়ীতে যাহা কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা কন্যাটিকে পূর্ব্বাহ্নেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমতীর জন্য প্রায় প্রত্যহই এইরূপ কিছু অন্ন ব্রাহ্মণী সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখেন।

কিন্তু সে বালিকা—এই মাত্র-আট বৎসর বয়স। সুতরাং অনাহারে বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমতী আমারই কাছে শুইয়াছিল—বরাবর এইরূপ শোয়। ব্রাহ্মণী পৃথক শয্যায়, বধূমাতাকে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বধূমাতা বৈধব্য-ব্রতে অনশনে অভ্যস্তা। সুতরাং তাহার পক্ষে বেশী চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু শ্রীমতীর অবস্থা দেখিয়াই চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার অনশনক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি করি, তখন নিরুপায়। আজ অন্নদাত্রী অপরাজিতার প্রথম পূজা, কিন্তু আমার ঘরের কেহই আজ অন্ন পাইল না। আমি ব্যাকুলিত চিত্তে দয়াময়ীর করুণা-কার্পণ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। মহিষমর্দ্দিনা দশভুজার আরতি-নিনাদ সময়ে সময়ে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। কৃষ্ণপুরের কেহই বাসন্তী পূজা করে না—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে করে।

রাত্রি তখন দুই প্রহর। কন্যাটি একরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণী অমনি প্রদীপ জ্বালিয়া কন্যার কাছে আসিলেন। আমরা তখন দেখিলাম, শ্রীমতীর মুখখানি একেবারে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে, যেন মুমূর্ষাবস্থা। দেখিয়া ভয় হইল, ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলাম। তৎপর

ব্রাহ্মণীকে বলিলাম,—"কাঁদিও না, তুমি ইহার কাছে বস, আমি একবার আসি।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"এত রাত্রে তুমি আবার কোথা যাবে?"

"ভয় নাই, আমি এক্ষণই আসিতেছি"—এই বলিয়া আমি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন আমার মনে যে কি ভাব, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। যদি কেহ ভুক্তভোগী থাকেন, তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন—অন্যে পারিবে না।

কৃষ্ণপুরে হরিদাস ঘোষাল নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। ঘোষাল মহাশয় সে-কালের লোক—প্রাচীন, কিন্তু বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম। পৌরোহিত্যই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। হরিদাস নিঃসন্তান। পরিবারে অন্য কোনও লোক নাই—তিনি আর তাঁহার ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণীর নাম বিদ্যা—লোকে ডাকিত 'বিদ্যা ঠাক্‌রুণ'। এক-গ্রামের মেয়ে বলিয়া লোকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। আমার ৺মাতা ঠাকুরাণী এই বিদ্যা ঠাকুরাণীকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দুইজনের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। আমিও মাসী-মা বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এবং তিনিও আমাকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন। আজ, এই রাত্রে আর কোথায় যাইব? একেবারে ঘোষাল-বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঘোষাল মহাশয় আহারান্তে শয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা ঠাক্‌রুণ শয়নের প্রাক্কালিক ক্রিয়া সম্পাদনে ব্যস্ত আছেন। আমার পদশব্দ পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে গা?"

আমি বলিলাম—"আমি"।

"আমি, কে? সাতকড়ী নাকি, দেখি দেখি"—এই বলিয়া তিনি প্রদীপ হস্তে আমার নিকট আসিয়া আগে আমাকে নিরীক্ষণ করিলেন; তৎপর বলিলেন—"তাই ত বটে; তা এত রাত্রে এসেছিস্ কেন বাবা? বড় কাতর যে, তোদের বুঝি আজ খাওয়া হয় নাই রে।

তোর আকার প্রকার দেখিয়া আমার তাই বোধ হয়। আমার মাথার দিব্বি, মিথ্যা বলিস্ না।”

আমি কোনও বাক্যব্যয় করিলাম না—অধোবদনে দরজার সোপানে বসিয়া পড়িলাম।

বিদ্যা ঠাক্‌রুণ বলিলেন—“তা কি চাই বাবা, বলনা, লজ্জা কি?” আমি তখন কন্যাটির অবস্থা বিবৃত করিয়া, মাত্র তাহার জন্য কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী প্রার্থনা করিলাম। ঘোষাল পত্নী প্রথমতঃ আত্মীয়ের যেরূপ দস্তুর—আমাকে কিছু মন্দ বলিলেন। তৎপর পরমেশ্বরের সুবিচারের প্রতিকূলে তীব্র সমালোচনা করিলেন। অতঃপর শীঘ্র আমাকে কন্যা সম্প্রদানান্তে চাকুরির জন্য বাহির হইবার অনুজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—“আমার সঙ্গে এস।”

আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম। তিনি বরাবর যাইয়া রসুইঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকেও প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। আমি তাহা করিলাম। তৎপর তিনি আমাকে বলিলেন—“ঐ যে ঢাকা রহিয়াছে, উহা মহামায়ার ভোগের প্রসাদ, উনি এনেছেন। আমরা উহা স্পর্শ মাত্র করি নাই। কারণ বৈকালিকের দ্বারাই আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে। তোমরা সকলেই আজ মায়ের প্রসাদ পাইও।”

আমি বলিলাম—“ঘোষাল মহাশয় নিজে বহিয়া প্রসাদ আনিয়াছেন অথচ—

আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি সক্রোধে বলিলেন—“তোমার ‘অথচ’ রাখ। আমরা যাহা খাইয়াছি, তাহাও মায়ের প্রসাদ বটে। উহা আর আমরা খাইব না। তুমি যদি আজ না আসিতে, তবে এই অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্তই কাল সকালে, দীনার মাকে দিতাম। দীনাই পোদ্দারের মা আমাদের কাজকর্ম্মটুকু করে—পেটে দুটি খায়। তা বাবা পেটে না দিয়া ত কাহাকে খাটান যায় না? তার জন্য কাল অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে। আমি নিজে বাসী অন্ন খাইব না, কেননা

আমার ব্যারাম। আর উনি যে ইহা খাইবেন না, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য। আমার স্মরণ হয় না যে, আর কোনও দিন, অন্ন-প্রসাদ বহিয়া এইরূপ বাড়ীতে আনিয়াছেন। এবার যে কেন আনিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা। আমার বোধ হয়, দয়াময়ী ইচ্ছা করিয়া তোমাদেরই জন্য আজ অন্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং লইতে আর আপত্তি করিও না।"

আমি আর কোনও কথা বলিলাম না। অন্নপাত্র হাতে করিয়া একেবারে বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। বিদ্যা ঠাকুরাণী বহির্দ্দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং অন্ধকারে সাবধানে হাঁটি-বার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ উপদেশ দিয়া দ্বার যোজনা করিলেন। আমি অন্নপাত্র লইয়া যথাসময়ে বাড়ী পঁহুছিলাম। আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হেতু ব্রাহ্মণী চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন—হইবারও কথা বটে। এক্ষণে আমার পায়ের শব্দ পাইয়া অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন,—"তুমি কোথা গিয়েছিলে? মেয়ে যে তোমাকে বার বার ডাকিতেছে।"

"এই যে আমি এসেছি"—এই বলিয়া আমি অন্নপাত্রসহ ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং পাত্র যথাস্থানে রাখিয়া বলিলাম,—"ইহাতে মহামায়ার প্রসাদ আছে। আগে মেয়েটাকে দাও। তৎপরে আমাকে দিয়া, তোমরা প্রসাদ পাও।"

খাবার সামগ্রী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রীমতী অমনি যাইয়া যথাস্থানে বসিয়া গেল। তখন তাহার মুখে পূর্ব্ববিকৃতিভাব কিছুমাত্র নাই দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আনন্দময়ী আজ আমাদের ঘরে যথেষ্ট আনন্দ বিস্তার করিয়াছেন। মানুষ নিতান্ত ভ্রান্ত জীব, তাই অবস্থান্তর ঘটিলেই ঐশী-শক্তির বিরূপ সমালোচনা করে।

ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্রহস্তে কন্যাটিকে অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া, আমার জন্য আসন করিলেন। সুতরাং আমিও যথাবিহিত কার্য্যে যোগদান করি-লাম। অন্ন ব্যঞ্জন ডাল তরকারী, মিষ্টান্ন, পরমান্ন আমাদের

কয়েক জনের পক্ষে যথেষ্ট। ইদানীং আমাদের এরূপ উপাদেয় আহার্য্যসামগ্রী অদৃষ্টে ঘটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের উভয়ের আহার সম্পন্ন হইলে, আমরা আচমনপূর্ব্বক আসিয়া শয়ন করিলাম। ব্রাহ্মণী তখন কোথা হইতে কিছু তণ্ডুল ও নারিকেলের অর্দ্ধভাগ আনিয়া বধূমাতার সম্মুখে রাখিলেন। এবং আমাকে পশ্চাৎ করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন। বধূমাতা আমার আদেশেও রাত্রে অন্নাহার করিলেন না।

আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম—"এই তণ্ডুলাদি কোথায় ছিল?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"ঘরেই ছিল, কিন্তু আমার তাহা স্মরণ ছিল না।"

আমি তখন সানন্দিত চিত্তে বলিলাম, "উত্তম, দয়াময়ীরই এ সব ব্যবস্থা।" বাস্তবিক বধূমাতারও আহারের যোগাড় হইল দেখিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারিতেছি না। তখন আমার মনে হইল, "যাহার ঘরে দুঃখ নাই, তাহার ঘরে সুখও নাই।"

কন্যাটি এইবার সময় পাইয়া কাচের চুড়ীর জন্য বায়না ধরিল—"বাবা আমাকে চুড়ী আনিয়া দিবে না?"

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"মা আমরা ভিখারী। পয়সা কোথা পাব যে তোমাকে চুড়ী কিনিয়া দিব?"

কন্যা বলিল,—"তোমার এই ঝুলির ভিতর পয়সা আছে।"

আমি তখন স্নেহ ও ক্রোধমিশ্রিতভাবে বলিলাম,—"দূর বেটী ভিখারীর মেয়ে। পয়সা থাকিলে কি আমরা এইরূপ উপবাস করি?"

কন্যা। কাল আমি তোমার এই ঝুলি খুঁজিয়া দেখিব।

আমি। দেখিস্।

শ্রীমতি আর কোন কথা বলিল না। সে অবিলম্বেই নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। এই সময়ে ব্রাহ্মণী ও বধূমাতা আসিয়া শয্যাগতা

হইলেন, এবং অনতি বিলম্বে তাহারাও শ্রীমতীর দশা প্রাপ্ত হইলেন। কেবল আমি শুইয়া শুইয়া ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ পরে একটু তন্দ্রা আসিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নের আবির্ভাব হইল। স্বপ্ন অপূর্ব্ব।

এক অতি প্রাচীন পুরুষ আসিয়া আমার শিয়রে উপবেশন-পূর্ব্বক সস্নেহে ডাকিলেন—"সাতুরাম!"

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম—"আপনি কে?"

প্রাচীন পুরুষ উত্তর করিলেন,—"আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

তখন আমি ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলাম—তিনিই বটেন। তখন বিনীতভাবে বলিলাম,—"মহাশয়, আপনার সহিত আমার কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনার গ্রন্থাদিতে আপনার দৈহিক-চিত্র দেখিয়াছি এবং তাহাতেই আপনাকে চিনিতে পারিতেছি। আপনি আমার আরাধ্য দেবতা। অতএব ভক্তিভাবে আপনাকে নমস্কার করিতেছি।"

তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন,—"বৎস, একেবারে বসিয়া আছ?"

আমি একটু রাগতভাবে বলিলাম,—"বলেন কি মহাশয়? ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বাহির হই, আড়াই প্রহরে ফিরি। পুনঃ অপরাহ্ণে বাহির হই, ফিরিতে রাত্রি এক প্রহর। এতখানি সময় আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই। আমি বসিয়া আছি?"

প্রা-পুরুষ। সে ত তোমার নিজের কাজ। দেশের কাজ কি করিতেছ?

আমি। আমি ভিখারী। আমাদ্বারা দেশের কোন্ কার্য্য সম্ভবে?

প্রা-পু। তোমা দ্বারা দেশের একটি গুরুতর কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমি। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রা-পু। বলিতেছি এই যে, তুমি লিখিতে আরম্ভ কর। তোমার

উত্তম হাত, এবং দিব্য কল্পনা শক্তি। তোমা দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক উপকার হইবে।

আমি। ওঃ হরি! এই কথা! মাপ করিবেন মহাশয়! আমি কখনও লেখালেখির মধ্যে যাইব না।

প্রা-পু। কেন বৎস?

আমি। আমি যখন মোক্তারি করিতাম, তখন দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া মুদ্রিত হওয়ার জন্য কোনও পত্রিকা আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার প্রেরিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় নাই।

প্রা-পু। হইতে পারে তোমার প্রবন্ধের বাহ্যিক ভাব দেখিয়া সম্পাদক উহা উপেক্ষা করিয়াছেন। অথবা তোমার নাম দেখিয়াও সেরূপ করিতে পারেন।

আমি। তবে আর আমাকে লিখিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন? যাহা সাধারণের পড়িবার সুযোগ হইবে না, তাহা লিখিবার প্রয়োজন কি? আর তদ্দারা দেশের কোন্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে?

প্রা-পু তোমার লিখিত প্রবন্ধ একদিন সাধারণের পড়িবার সুযোগ হইবে এবং তদ্দারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে।

আমি। গুরুদেব! আপনার আজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এক কথা—লিখিবার উপকরণাদি আমার কিছুই নাই—বহুদিন সে সকলের সহিত সম্পর্করহিত হইয়াছি। অর্থ না হইলে ত সে সকল সংগ্রহ করা যাইবে না?

প্রা-পু। বৎস সাতুরাম! এজন্য তোমার কোনও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তুমি গাছের পাতায় রচনা লিখিয়া রাখিও। অনেক বনলতার একরূপ ফল জন্মে ... তাহার কাথ দ্বারা উত্তম কালি প্রস্তুত করা যায়। বংশদণ্ড দ্বারা লেখনী প্রস্তুত করিয়া লইবে।

আমি। গুরুদেব! এরূপ আজ্ঞা যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে করিতেন, তবে এতদিনে কতকগুলি বিষয় লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। এক্ষণে আমার যেরূপ অবস্থা তাহা আপনি অন্তর্যামী সমস্তই অবগত আছেন। কত দূর যে কি করিয়া উঠিতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রা-পু। বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার প্রনষ্ট প্রবৃত্তি পুনরুদ্দীপিত হউক। এই সময়ে 'বাবা' সম্বোধনে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুতরাং স্বপ্নেরও অবসান হইল। চাহিয়া দেখিলাম সূর্য্যোদয়ের অধিক বিলম্ব নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় শয্যায় থাকিয়াই আমাদের আকাশ দেখার সুযোগ ছিল। আমি আর বিলম্ব করিলাম না। 'দুর্গে দুর্গে' বলিয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঝুলিটি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলাম।

শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ।